



# বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা

Dr Girindra Nath Das

ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস

এম. এ., পি-এইচ. ডি. ( কলিকাতা ),

সাহিত্য-ভারতী ( বিশ্বভারতী )

শেহিদ লাইব্রেরী

কাজীপাড়া, বাবাসত

চব্বিশ পবগণা

প্রকাশক :

কাজী আবদুল ওহুদ,

শেহিদ লাইব্রেরীর পক্ষে

কাজীপাড়া (নর্থ)

বারাসভ, চব্বিশ পবনগা

© Girindra Nath Das

প্রথম প্রকাশ : রবিবার ৫ই বৈশাখ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ-  
১৮ই এপ্রিল, ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ

মূল্য—৩০ টাকা

মুদ্রাকর :

শ্রীসনৎকুমার চৌধুরী

নিও প্রিন্ট

২০এ পটুয়াটোলা লেন

কলিকাতা-৭০০০০৯ এবং

শ্রীভারতচন্দ্র নাথ

ইন্স বেঙ্গল প্রেস

৫২/৯ বিপিন বিহারী গান্ধলী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০১২

## উৎসর্গ

পরম আদ্য

.. শ্রীযুক্ত সখী প্রধান

শ্রীযুক্ত শান্তি প্রধানের

করকমাল



## কৃতজ্ঞতা

মরহুম কাজী আবদুস শেহিদ, মবছুম কাজী আবদুল ময়িদ ও মবছুম কাজী কামকস ইসলাম ট্রাস্ট ফাও ( কাজীপাড়া ), সমাজ কল্যাণমূলক এই গবেষণা কার্যের জন্য অত্রগ্রন্থ প্রকাশের বিভিন্ন খরচ বাবদ পুস্তক-স্বকপ দুই হাজার টাকা প্রদান করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন ।

—গ্রন্থকাব

## গ্রন্থকারের নিবেদন

সর্বাগ্রে আমি আমার পরম গুরু স্বর্গতঃ পিতা অধরচন্দ্র দাস ও মাতা ববদামুন্দরী দাসের পুণ্যকথা শ্রবণ করি।

আমার সহোদর দাদা শ্রীযুক্ত হাজীবীচরণ দাসকে প্রশংসা জানাই।

কাজী আবদুল মুজিদ, কাজী আবদুল ওহুদ, কাজী আবদুল রসিদ, মোসাম্মেৎ খাশকরেন্সা ও কাজী নুরুল ইসলাম এই গ্রন্থ প্রকাশের সর্বপ্রকার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে অপবিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ কবেছেন।

আচার্য ডক্টর মুকুমার সেন, আচার্য ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য সহযোগিতা না কবলে আমার এ কাজ সুসম্পন্ন হত না। তাঁদের কাছে আমি চিব-ঋণী বইলাম।

শ্রীপ্রফুল্লকৃষ্ণ কর (সাংবাদিক), শ্রীববীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আই. এ. এস, কাজী আজিজাব বহমান, শ্রীচিন্ময় চক্রবর্তী, শ্রীঅজিতকুমার সাংখ্যাল, শ্রীনবেশচন্দ্র গুপ্ত, ডাঃ ধীবেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবজ্রিতকুমার বসুমল্লিক, শ্রীগণেশচন্দ্র দাস, মহম্মদ হুমুজ আলি, শ্রীপ্রীতীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীঅহিভূষণ মুখার্জী, শ্রীপূর্ণচন্দ্র সবকাব, ডাঃ কাজী আবুল হাসেম, শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ, ডাঃ ভবানীপ্রসাদ বাব, শ্রীমধুসূদন হাউলী, শ্রীদীনেন বিশ্বাস, বৌদি শ্রীমতী সরলা দাস, সহধর্মিনী শ্রীমতী ককণাময়ী দাস প্রমুখ আমাকে আন্তরিক সহযোগিতা দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কবেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থশালা (কলিকাতা), আচার্য ডক্টর মুকুমার সেনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ, হজবত একদিল শাহ্ সাধাবণ পাঠাগার, শেহিদ স্মৃতি পাঠাগার এবং আরো অনেক প্রতিষ্ঠান আমাকে এই কার্যে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

সাউথ ইন্টার্ন রেলওয়ে

কোয়ার্টার নং ৮২ বি/৩

শালিমাব বি, এফ, সাইডিং,

হাওড়া-৩।

১৮ই এপ্রিল, ববিবার

সন ১৯৭৬

শ্রীগিরীন্দ্র নাথ দাস

## বিষয় সূচী

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

ক) প্রকাশকের নিবেদন

খ) ভূমিকা

গ) উপক্রমণিকা

১—৩১ক

পাঁচ সাহিত্য ১১, পাঁচ সাহিত্যের মূল্য ১৩, পাঁচ সাহিত্যের ঐতিহাসিক  
পটভূমি ১৪, পাঁচ মঙ্গল-কাব্য ১৯, পাঁচ-মঙ্গল কাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য  
২১, পাঁচ জীবনী গদ্য সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ২৫, পাঁচ নাট্য সাহিত্যের  
সাধারণ বৈশিষ্ট্য ২৬, ও পাঁচ লোক-সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ২৭।

ঘ) প্রথম খণ্ড	:	ঐতিহাসিক পাঁচ	৩২—৩৭০
প্রথম পবিচ্ছেদ	:	আদম পাঁচ	৩২
দ্বিতীয় পবিচ্ছেদ	:	আবালসিদ্ধি পাঁচ	৩৬
তৃতীয় পবিচ্ছেদ	:	একদিল শাহ	৪০
চতুর্থ পবিচ্ছেদ	:	কান্ত দেওয়ান	৯২
পঞ্চম পবিচ্ছেদ	:	কালু পাঁচ	৯৬
ষষ্ঠ পবিচ্ছেদ	:	খাজা মঙ্গলদীন চিশ্তী	৯৯
সপ্তম পবিচ্ছেদ	:	খান বিবি	১০৯
অষ্টম পবিচ্ছেদ	:	গোবাচাঁদ	১১১
নবম পবিচ্ছেদ	:	গোবা সহৈদ	১৬১
দশম পবিচ্ছেদ	:	চম্পাবতী	১৬৫
একাদশ পবিচ্ছেদ	:	ঠাকুরবাব সাহেব	১৬৮
দ্বাদশ পবিচ্ছেদ	:	ভিত্তু মীর	১৭৬
ত্রয়োদশ পবিচ্ছেদ	:	দাদা পাঁচ	১৯৩
চতুর্দশ পবিচ্ছেদ	:	নির্ধীন শাহ	২০১
পঞ্চদশ পবিচ্ছেদ	:	পাঁচ পাঁচ	২০৩
ষোড়শ পবিচ্ছেদ	:	ফাতেমা বিবি	২০৫
সপ্তদশ পবিচ্ছেদ	:	বদর পাঁচ	২১৯

অষ্টাদশ পবিচ্ছেদ	:	বডৰ্খা গাজী	২২৪
উনবিংশ পবিচ্ছেদ	:	বড পীব	২৯৬
বিংশ পবিচ্ছেদ	:	বাবন পীব	৩১১
একবিংশ পবিচ্ছেদ	:	মসনদ আলি	৩১৫
দ্বাবিংশ পবিচ্ছেদ	:	মাদাব পীব	৩২১
ত্রয়োবিংশ পবিচ্ছেদ	:	ব্রওশন বিবি	৩২৮
চতুর্বিংশ পবিচ্ছেদ	:	লালন শাহ	৩৩৪
পঞ্চবিংশ পবিচ্ছেদ	:	শফীকুল আলম	৩৪৩
ষট্‌বিংশ পবিচ্ছেদ	:	শাহ সুফী সুলতান	৩৪৬
সপ্তবিংশ পবিচ্ছেদ	:	শাহ চাঁদ	৩৫১
অষ্টবিংশ পবিচ্ছেদ	:	সাভবন পীব	৩৫৬
উনত্রিংশ পবিচ্ছেদ	:	সাহান্দী সাহেব	৩৬০
ত্রিংশ পবিচ্ছেদ	:	হাসান পীর	৩৬৬
একত্রিংশ পবিচ্ছেদ	:	হাযদাব পীব	৩৬৯
		কাল্লনিক পীব	৩৭১—৫৯৮
১৬) দ্বিতীয় খণ্ড	:	ওলা বিবি	৩৭৩
দ্বাত্রিংশ পবিচ্ছেদ	:	মুন্ডি বিবি	৩৭৮
ত্রয়োত্রিংশ পবিচ্ছেদ	:	ত্রৈলোক্য পীব	৩৮২
চতুস্ত্রিংশ পবিচ্ছেদ	:	পাগল পীব	৩৮৬
পঞ্চত্রিংশ পবিচ্ছেদ	:	বনবিবি	৩৯০
ষট্‌ত্রিংশ পবিচ্ছেদ	:	বিবি ববকত	৪১৩
সপ্তত্রিংশ পবিচ্ছেদ	:	মানিক পীর	৪১৭
অষ্টত্রিংশ পবিচ্ছেদ	:	সত্যপীব	৪৪৭
উনচত্বাবিংশ পবিচ্ছেদ	:		

চ) পরিশিষ্ট : বাংলা পীর-সাহিত্যের গ্রন্থ তালিকা	
ছ) গ্রন্থ-নির্ঘণ্ট	৫০৫
জ) গ্রন্থকারসহ অন্যান্য ব্যক্তি-নির্ঘণ্ট	৫১০
ঝ) শব্দার্থ	৫১৮
ঞ) শুদ্ধিপত্র	৫২৪
ট) তথ্যপঞ্জী	৫২৫

## চিত্র সূচী

১। পীর গোবাটাঁদেব সমাধি-স্থান	হাডোয়া	প্রথম পত্র্য
২। পীর একদিল শাহেব সমাধি-স্থান	কাজীপাড়া	ঐ
৩। পীর গোবা সঈদ বা দাযুদ আকবরের সমাধি-স্থান	সুহাই	ঐ
৪। পীর বড়খাঁ গাজীব সমাধি-স্থান	ছুট্টোবা শবীক	ঐ
৫। পীর শাহ সুফী সুলতানের সমাধি-স্থান	পাণ্ডুয়া	ঐ
৬। ভিতুমীর এখানে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে শহীদ হয়েছিলেন	নাবিকেলবেড়িয়া	ঐ
৭। দাদাপীর সাহেবেব সমাধি-স্থান	ফুবফুবা শবীক	দ্বিতীয় পত্র্য
৮। ঠাকুরবব সাহেবেব সমাধি-স্থান ( সমাধিব গায়ে পৈতা জড়ানো )	চাবঘাট	ঐ
৯। চাঁদখাঁর মসজিদের ধ্বংসাবশেষ	শ্রীকৃষ্ণপুঁব	ঐ
১০। ওলাবিবিব দবগাহ	গৈপুঁব	ঐ

## প্রকাশকের নিবেদন

পবন সৃষ্টি-উৎস আল্লাব অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সমাজের খেদমতে পেশ করার সাফল্যে আমবা আনন্দিত।

— যতদূর জ্ঞান যার সুফী বা পীর-দববেশগণের জীবনাদর্শ অষ্টম শতাব্দী হতে প্রথম এ দেশে আসতে শুরু করে। সর্বপ্রথম তাঁরা সিন্ধু প্রদেশে বসতি স্থাপন করেন এবং তাঁদের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বহিরাগত ও এদেশের ধর্মাস্ত্রিত মুসলমান, স্থানীয় হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মিশে বসবাস করতে থাকেন।

আববগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো নিয়ে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়া ভূখণ্ডে ইসলামকে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব, ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদ ধ্বংস করে হালাণ্ড, শেষ নামমাত্র খলিফা, মোস্তাসিম বিলাহকে সবংশে নিহত করেন। সেই সাথে খেলাফতের শেষ চিহ্নটুকু জগত থেকে বিলুপ্ত হয়। খেলাফতের সূত্র ধরে তুর্কীগণ বিজেতা হিসাবে প্রবেশ করলেন এদেশে। তুর্কীদের আগমনে প্রতিজ্ঞা দেখা দেয় হিন্দুদের মধ্যে।

তুর্কীদের বাঙ্গানৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়। বাঙ্গানীতির ক্ষেত্রে সফল হলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁরা সফল হন নি। ভারতের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব আজও বিদ্যমান। মুসলিম সংস্কৃতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মত এদেশে সফল হতে পারে নি।

সুফী বা পীর-দববেশগণের ভৌহিদ অর্থাৎ সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং স্বাধীনতা-ভিত্তিক জীবনধারার অনুপ্রেরণা নিয়ে রামানন্দ, নানক, চৈতন্য প্রমুখ সংস্কারকগণ হিন্দু সংস্কৃতিকে নূতন করে প্রাণবন্ত করলেন। আর এদেশীয় ধর্মাস্ত্রিত মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে দেশীয় প্রাচীন বীতি-নীতির সংমিশ্রণ ঘটল। ষোড়শ শতাব্দীতে যোগলদের সময় হতে মুসলমানগণ এ বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন। তাঁরা মুসলিম সংস্কৃতি, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। এই সময়ে জোড়া-তালি দেওয়া মুসলিম

সভ্যতাব বিকল্পে মুজাদ্দিদে আলফিসানী বিদ্রোহ ঘোষণা কৰেন। আলফিসানী মুসলমানদেৰ জানালেন জীবনেৰ প্ৰকৃত লক্ষ্যেৰ কথা, ঘোষণা কৰলেন ইসলামেৰ মহৎ আদৰ্শেৰ কথা। তিনি বিশেষভাবে বললেন যে, বাজনীতিৰ স্বাতিবে ইসলামেৰ বিশ্বজনীন মানবীয় সভ্যতাকে বিসৰ্জন দেওযা চলবে না। দেশ এবং কালগত কাৰণে ইসলামেৰ মৌলিক জীবনধাবাব (সাম্য, ভ্ৰাতৃত্ব ও স্বাধীনতা) কোন পৰিবৰ্তন হ'ব না। এ বিষয়ে বাদশাহ আওবজ্জেৰ মুসলানদেৰ সাংস্কৃতিক আন্দলনেৰ নেতৃত্ব দেন শেষ মুহূৰ্তে। কিন্তু স্বাৰ্থান্বেষী বাধাৰ জগা তিনি কিছু কৰে উঠতে পাবেন নি। কাৰণ গণ-চেতনাৰ উদ্ভূত ইউৰোপীয় শক্তিৰ নিকট মুসলিম শক্তি তখন হীন বলে প্ৰতিপন্ন হয়। ঊনবিংশ শতকে ভাৰতীয় স্বাৰ্থান্বেষী সম্প্ৰদায় ইংবেজদেৰ সহিত হাত মিলিয়ে তাৰ সাংস্কৃতিক শ্ৰেষ্ঠত্বেৰ প্ৰতিষ্ঠায় প্ৰচাৰ কৰেন যে,—হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতাই ভাৰতেৰ একমাত্ৰ সংস্কৃতি ও সভ্যতা। অপৰ দিকে আৰ এক সম্প্ৰদায় হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতিৰ কথা জোৰ দিযে প্ৰচাৰ কৰলেন। এই সময়ে মুসলমানৰা ছিলেন দিশেহাৰ।

সৰ্বপ্ৰথম কবি মুহম্মদ ইকবাল প্ৰচাৰ কৰলেন যে এই ভাৰতবৰ্ষ তাঁদেৰও দেশ। অতীতে যে সকল সাধক, পীৰ-দববেশ এই দেশেৰ সঙ্গে একাত্ম হ'বে জন মানসে স্থান লাভ কৰেহেন তাঁদেৰ অনুসৰণ কৰা কৰ্তব্য। মুসলিমদেৰ পূৰ্ব-পুৰুষ (মুফী বা পীৰ-দববেশ) এদেশে এসে ত্যাগ, ধৈৰ্য্য, হৃদয়েৰ প্ৰসাবতা প্ৰভৃতি মানবিক ব্যৱহাবেৰ মাধ্যমে প্ৰমাণ কৰলেন যে ইসলাম সৰ্বকালেৰ এবং সৰ্বমানবেৰ জীবন ধাবাব একমাত্ৰ অবলম্বন। তিনি আৰও বললেন যে, এদেশবাসীকে অতীতেৰ সামন্ততান্ত্ৰিক মনোভাব থেকে মুক্ত হ'বে আসতে হ'বে আধুনিক চিন্তা-ভাবনাৰ জগতে। মানবতাবাদ প্ৰতিষ্ঠা হওযাৰ অন্তৰাৰ জাতীয়তাবাদ। সেই জাতীয়তাবাদেৰ সম্পৰ্কে ইকবাল গাইলেন :—

সব দেবতাৰ সেৱা সে দেবতা

স্বাহাবে কহিছ স্বদেশ ফেৰ।

বসন তাহাৰ বনেছে কাফন

আববি বদন ইসলামেৰ।

(অনুবাদ : মনিব-উদ্দীন ইউসুফ)

এই প্ৰসঙ্গে বিশ্বকবি ববীজনাথ ঠাকুৰেৰ উক্তি প্ৰাধিকানযোগ্য—

জাতি প্ৰেম ছুটিয়াছে মৃত্যুৰ সন্ধান

বাহি স্বাৰ্থ-ভৰ্তা শুণ্ড পৰ্বভেব পানে।

বিশ্বমানবতাৰ আদৰ্শে সজ্জীৰ্ণ এই কল্পিত শব্দকে প্ৰতিবোধ কৰে সাম্য, ভ্ৰাতৃত্ব  
ও স্বাধীনতা প্ৰতিষ্ঠাৰ মাধ্যমে প্ৰকৃত মুক্তিৰ পৰিচয় রয়েছে।

হজবত মোহাম্মদ (দঃ) মানবাতাবাদেৰ ব্যাখ্যা দিষেছেন আজ থেকে প্ৰায়  
চৌদ্দশত বৎসৰ পূৰ্বে। সুফী বা পীৰ-দৰবেশগণ এই মানবতাৰ আদৰ্শকে  
বাস্তবায়নেৰ জন্ম, ভৌগলিক সীমা পেৰিয়ে যেখানে মানবতাৰ পতন ঘটেছে  
সেখানে হাজিৰ হবে জীবন-পণ সংগ্ৰামে রত হয়েছেন। সমগ্র মানব-জাতিৰ  
অগ্ৰগতিতে—সুফী বা পীৰ-দৰবেশগণেৰ প্ৰযোজনীয়তা এখনও নিঃশেষিত  
হয় নি। সুতবাং সুফী বা পীৰ-দৰবেশগণেৰ জীবন-সম্বলিত সাহিত্যেৰ  
ইতিহাস কোন সাম্প্ৰদায়িক ব্যাপাৰ নহ বহু তা হজে গোটা মানব  
জাতিৰ ইতিহাস ও আদৰ্শ।

সমগ্ৰ বিশ্বে পৰিপূৰ্ণ জীবন-ধাৰাৰ জন্ম এক সৰ্বজন গ্ৰাহ্য আদৰ্শেৰ  
প্ৰযোজন। ইসলামেৰ আদৰ্শ হলো সকল জাতিগত, বৰ্ণগত, ত্ৰেণীগত এবং  
অৰ্থনৈতিক অবস্থাৰ কৃত্ৰিম বিভেদগুলিৰ মূল উচ্ছেদ কৰা।

এই কাৰণে সুফী বা পীৰ-দৰবেশগণেৰ জীবনাদৰ্শ তথা ইসলাম, কোন  
দেশ ও কাল সম্পৰ্কিত গণ্ডীৰ মধ্যে সীমিত নহ। এই কাৰণে এই সকল মহৎ  
ব্যক্তিৰ্গেৰ ইতিহাস ও সাহিত্য সমগ্ৰ মানব-জাতিৰ ইতিহাস ও সাহিত্য।

কাজিপাড়া নৰ্থ, বাবাসত

১৮ই এপ্ৰিল, ববিবাব,

সন ১৯৭৬ খ্ৰীষ্টাব্দ

ইতি—

কাজি আবদুল ওহুদ

শেহিদ লাইব্ৰেৰীৰ পক্ষে



## ভূমিকা

আর্য ভাষার উৎপত্তি ধর্মকে আশ্রয় করে। বাংলা ভাষাও উৎপত্তি হয়েছে তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য-জৈন-বৌদ্ধাদির মিশ্রিত ধর্মাদর্শকে আশ্রয় করে।

বাংলা সাহিত্যের জন্মালয় থেকে বাঙালী নর-নারীর সমাজ-চিত্র তাতে সর্বপ্রথম প্রতিফলিত হতে শুরু করে। মধ্যযুগের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সে ধাবান্ন কপান্তব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে বঙ্গদেশে তুর্কীগণের আগমন ঘটে। চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কী সুলতানগণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে এখানে ইসলাম ধর্ম বিস্তারের পথ আবারো প্রশস্ত হয়, এবং তখন থেকে হিন্দু সমাজ-ব্যবহার পাশাপাশি ইসলামি বীড়ি-নীতি-অনুসারী আর এক নতুন সমাজ-ব্যবহার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ফলে নব দীক্ষিত মুসলিমগণের পক্ষে বংশ পবম্পবাব অর্জিত হিন্দু-সংস্কার তৎক্ষণাৎ পূর্ণ মাত্রায় পরিভ্যাগ করা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া হিন্দু ও মুসলিম পবম্পব পবম্পবের পাশাপাশি বসতির ফলে স্থানীয় সামাজিক ও ব্যবহারিক কাবণে এক মিশ্র সংস্কৃতি সে সময় থেকেই গড়ে উঠতে থাকে। হিন্দু ও মুসলিমের উভয় তবফ থেকে সমন্বয়ের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টার মধ্য দিবে সে সংস্কৃতি দৃঢ়তব হয়। ইসলাম ধর্ম প্রচারক পীব ও পীবানী প্রভাবারিত হিন্দু মুসলিমের সেই মিশ্র সংস্কৃতিকে 'পীব-সংস্কৃতি' বলা হয়েছে।

মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম প্রচারক পীব-পীবানীগণের অলৌকিক কীর্তিকলাপপূর্ণ কাহিনী-সাহিত্যে পীব সংস্কৃতি-ভিত্তিক সেই সমাজ ব্যবহার প্রতিফলন হয়। তখনই বাংলা সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় এক বিশেষ কপান্তব। সমগ্রভাবে কপান্তবিত সেই সাহিত্য-

শাখাই হল পীর-সাহিত্য শাখা। অভাব বাংলা পীর-সাহিত্য, বাংলা-সাহিত্য ও তার ইতিহাসেব এক অবিচ্ছেদ্য মূল্যবান অঙ্গ।

বাংলা পীর-সাহিত্য প্রধানতঃ চাবভাগে বিভক্ত। যথা,—১। পীর লোককথা, ২। পীর কাব্য, ৩। পীর জীবনী গদ্য-রচনা ও ৪। পীর নাটক।

পীর লোককথা, যা অনাদৃত অবস্থায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে, তার সামান্য কিছু সংগ্রহ করে এখানে প্রদত্ত হল। বলা বাহুল্য কত পীর লোককথা যে এদেশে ছড়িয়ে আছে তার ইয়ত্তা কবা দুঃসাধ্য।

পীর কাব্য, মঙ্গল কাব্য জাতীয় পাঁচালী কাব্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উক্তের সুকুমার সেন মহোদয়ের আগে আব কেউ এ শাখাটি নিয়ে আলোচনা করেন নি। অথচ এই শাখাটি সাহিত্য গুণসম্পন্ন হয়েও এতদিন তা বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে অনাদৃত ছিল।

পীর জীবনী গদ্য-বচনাগুলির কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত। আবার কিছু কিছু গদ্য-রচনা গ্রন্থ, পীর চরিত-গ্রন্থরূপে বিবেচিত।

পীর নাটক সমূহ সাধারণভাবে ঐতিহাসিক এবং কল্পনাশ্রমী নাটকের অন্তর্ভুক্ত।

কাব্য-শাখার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কতকগুলি পীর পাঁচালী নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হল। বাকী শাখাগুলি অর্থাৎ পীর জীবনী গদ্য-বচনা, পীর নাটক ও পীর লোককথা,—বাদের নিয়ে ইতিপূর্বে আদৌ আলোচনা হয় নি, —সে সব সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে আলোচিত হল। তাছাড়া পীর-পীরানীর বিশেষ প্রভাবযুক্ত অঞ্চল চব্বিশ পরগণার পূর্বভাগ ও যশোহর-খুলনা জেলায় পশ্চিম ভাগের প্রায় সকল পীর-পীরানীকে নিয়ে কিছু বিশেষ আলোচনা করা হল। আশাকরি এ সবই বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকে সম্পূর্ণতা দান,—বাংলা জীবনী গদ্য-রচনা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস এবং বাংলা লোক-সাহিত্যের ইতিহাস তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে সমৃদ্ধতর করতে সাহায্য করবে।

পীর-পীরানীগণকে সাধারণভাবে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। যথা—ঐতিহাসিক পীর-পীরানী ও কাল্পনিক পীর-পীরানী।

এ দেশের অসংখ্য পীর-পীবানীর কথা জানা যাব। সকল পীর-পীবানীর নামে সাহিত্য বচিত হয় নি। এ পর্যন্ত অনুসন্ধান-প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত পীর-সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বচনাসমূহ এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

মধ্যযুগীয় সাহিত্য-ধারার পাঁচালী কাব্য বচনার ধারা বন্ধ হলেও আধুনিক যুগধারার জীবনী গদ্য-রচনা বচিত হতে আবশ্য হওয়ার পূর্বে ধারা আজও রয়েছে অব্যাহত। কাল্পনিক এমন কি প্রাচীন ঐতিহাসিক পীর-পীবানীর জীবনী নিয়ে যদি ভবিষ্যতে গ্রন্থ রচনা বন্ধ হয়ে যায়ও তবু সাহিত্যের ইতিহাসে এ সব বচনাবলীর উল্লেখযোগ্য স্থান অবশ্যই থাকবে।

# বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা

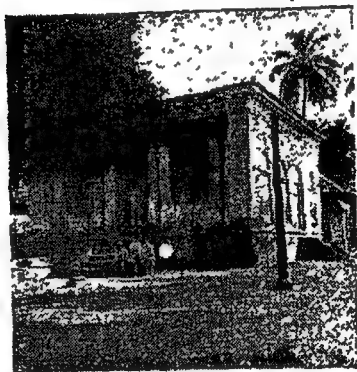
প্রথম ভাগ

ঐতিহাসিক পীর





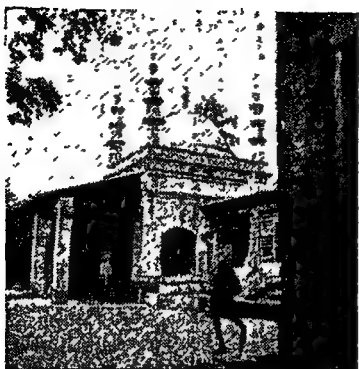
১। গীব গোরাচাঁদের  
সমাধিস্থান  
(হাডোয়া)



২। গীব একদিল শাহেব  
সমাধিস্থান  
(কাছীপাড়া)

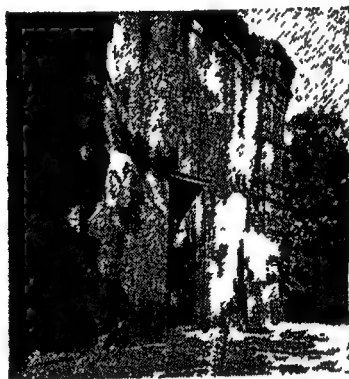


৩। গীব গোরা সর্দার বা  
গীব দাযুদ আকবরের সমাধিস্থান  
(সুহাই)

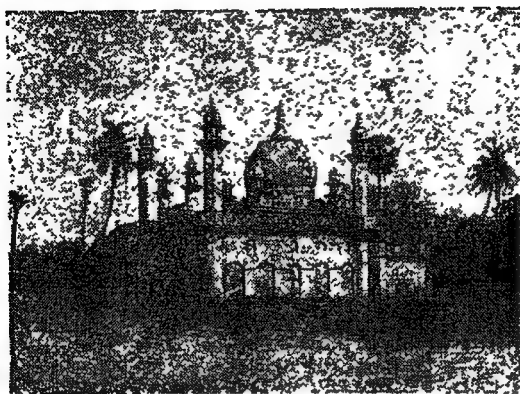


৪। পীর বড় ঠা  
গাজীব সমাধিস্থান  
(ঘুটিষাবী শবীহ)

৫। পীর শাহ্ হুফী  
মুলতানের সমাধিস্থান  
(পাণ্ডুবা)



৬। তিতুমীর এখানে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে  
শহীদ হইবেছিলেন।  
(নারিকেলবেড়িয়া)



৭। দাখানীৰ সাহেবেৰ সমাধিস্থান  
(সুবলুয়া শৰীফ)



৮। ঠাকুৰৰ সাহেবেৰ সমাধিস্থান  
সমাধিৰ গাঁবে পৈতা জড়ানো  
(চান্দমাটি)





৯। চাঁদ খাঁব মসজিদের ধ্বংসাবশেষ  
(শ্রীকৃষ্ণপুর)



১০। ওলাবিবির দরগাহ  
(নৈপুৰ)

## উপক্রমণিকা

‘গীব’ শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধ বা প্রাচীন এবং ভাবার্থ আধ্যাত্মিক গুণ। শব্দটি ফারসী শব্দ। কবিসী ‘গীর’ শব্দের ত্র্যম্ব বৌদ্ধগণ কর্তৃক ব্যবহৃত ‘ধের’ শব্দের অর্থ বৃদ্ধ। সংস্কৃত ‘স্থবির’ শব্দেরও অর্থ বৃদ্ধ।

গীবগণ ছিলেন ইসলাম ধর্মপ্রচারক। তাঁরা সূফী নামে অভিহিত।

‘সূফী’ শব্দটি আরবী ‘তসাউওফ্’ বা ‘সুফ্’ শব্দ থেকে এসেছে। ‘তসাউওফ্’ শব্দের অর্থ পবিত্রতা। ‘সুফ্’ শব্দের অর্থ পশম।

কাবো মতে, ধাঁবা পশমী বস্ত্র পবিধান কবতেন তাঁরা সূফী। কাবো মতে, ‘আছিন্-উস্-সফ্-কা’ অর্থাৎ হজবত মহম্মদ (দঃ)-এর সময় ধাঁবা মসজিদেব মেখেতে বসে সাধনা করতেন তাঁদের থেকেই সূফী শব্দের উৎপত্তি। কাবো মতে, ‘সাক্-ই-আউয়াল’ অর্থাৎ ধাঁবা সামনের সাবিত্তে নামাজ আদায় কবতেন, তাঁদের থেকেই সূফী শব্দের উৎপত্তি। (সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ)।<sup>১০</sup>

সূফীবাব সহল তত্ত্ববী বলেন, তিনিই সূফী যিনি মালিক্ত হতে মুক্ত।

বাগদাদেব সূফী মারফ্-আল্-কবখী বলেন,—ভক্তিই মুক্তিব পথ, কিন্তু তা মাহুদেব সাধনায় মিলে না,—তা আল্লাহ্-ব দান। তিনি যাকে কক্ণা কবেন তাকে দান কবেন। ‘তসাউওফ্’ হল সত্য বস্ত্রসমূহেব উপলব্ধি। আব স্ট জীবগণেব হাতে যা ববেছে তা ত্যাগেই উপলব্ধিব সূচনা। এক কথায়—বিষয় নিস্পৃহতােব উপবই তত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

সূফীবাদেব সংজ্ঞা দিতে গিষে John A. Subhan তাঁর Sufi Saints and shrines in India গ্রন্থে লিখেছেন: Sufism is that mode of religious life in Islam in which the emphasis is placed not so much on the performances of external ritual as on the activities of the inner self—in other words it signifies Islamic Mysticism. তিনি আরো লিখেছেন,—This term has been popularised by western writers, but the one in

common use among Muslims is 'Tasawwuf' while its cognate 'Sufi' is used for the mystic.

প্ৰখ্যাত তাপস জ্বনিদ বাগদাদী বলেন,—সুফী হলেন পবিত্ৰাতা ঈশ্বৰ। যুক্তিকাৰণ তাঁৰ ওপৰ সমুদয় জজ্ঞাল নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু তা হতে সমুদয় কল্যাণ বহিৰ্গত হয়। যিনি সংসাৰে নিৰ্গিপ্ত তিনিই সুফী।

সুফীদেব নিজেদেব কথাৰ 'সুফী' শব্দেৰ ব্যাখ্যা আছে,—একদা তাপস মহম্মদ ওয়াসা, 'সোফ' নামক স্থল কয়ল-বিশেষ পৰিধান ক'বে 'কতিবা' নামক এক সাধু-পুৰুষেৰ নিকট উপস্থিত হন। কতিবা তাঁকে 'সোফ' পৰিধান কৰাব কাৰণ জিজ্ঞাসা কৰলে ওয়াসা নিকন্তব থাকেন। কতিবা পুনৰায় জিজ্ঞাসা কৰলেন,—তুমি উত্তৰ দাও না কেন ?

ওয়াসা বললেন,—যদি বলি বৈবাগ্যবশতঃ 'সোফ' পৰেছি, তবে আত্মপ্লাৱা কৰা হয়। যদি বলি দাবিত্ততা হেতু সোফ পৰেছি তবে ঈশ্বৰকে নিন্দা কৰা হয়। তাই নিকন্তব আছি।

উক্ত কথোপকথন থেকে বোঝা যায় যে, সুফীবা ছিলেন—একদিকে বৈবাগী, অগ্ৰদিকে দবিত্ত। সুতৰাং সুফীদেব নিজেদেব কথাৰ প্ৰমাণিত হচ্ছে,—সংসাৰ-বিবাগী পশম-বস্ত্ৰ পৰিধানকাৰীবা ছিলেন সুফী।

কালক্ৰমে ইসলামেৰ মত ব্যবহাৰিক ধৰ্মেও এমন একটি মতবাদ গড়ে ওঠে যাৰ প্ৰধান নীতি সংসাৰ ত্যাগ না হলেও এই মতাবলম্বীদেব অনেকেই সংসাৰ বিবাগী ছিলেন। এই মতবাদকে বলা হয় তসাবুফ এবং মতাবলম্বীদেব বলা হয় সুফী।

অথচ ইসলামধৰ্মে সংসাৰ ত্যাগেৰ বিধান নেই। হজ্জবত মহম্মদ (সাঃ) সংসাৰ ত্যাগেৰ মনোভাবকে শুধু নিকুসাহই কৰেন নি সংসাৰত্যাগীৰ স্থান তিনি নিৰ্দেশিত কৰেছেন ইসলামী ভাৰুগোষ্ঠীৰ বাইৰে। ইসলামে বৈবাগ্য নেই। তবে কেন এমন একদিন এল যখন সংসাৰ ত্যাগ কৰে কিছু ব্যক্তিকে সুফী হতে হল ?

হজ্জবত নবী কৰিম (সাঃ)-এৰ পৰও কিছুদিন খেলাফতেৰ আদৰ্শ চলেছিল। সে আদৰ্শকে সমুন্নত ৰাখতে হজ্জবত ইমাম হোসেন কাববালায় শহীদ হলেন। এৰ পৰ খেলাফতেৰ নাম কৰে দামেশকে বংশ-ভিত্তিক শ্বৈবতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত হল। ইসলামী ধাৰা হাবিষে গেল গতানুগতিক সামন্ততান্ত্ৰিক শ্ৰোতে। উম্মিয়া

বাজবংশ, আব্বাসিয়া বাজবংশ সেলজুক বাজবংশ, উসমানিয়া-তুর্কী বাজবংশ, ফাতেমী খানদান, তৈমূবী খানদান, সাকাভী খানদান প্রভৃতি কত না বাজবংশেব উত্থান-পতনে আকীর্ণ হল মুসলমানেব ইতিহাস। আদর্শ বিবর্জিত হল, মানবতা পবিত্যক্ত হল, সাম্যেব গলাষ বসানো হল ছুবি, ভ্রাতৃত্ব একটা দুবাগত প্রতিক্ষনিতে কপান্তবিত হল, ত্রাষপবাষণতাৰ ক্ৰীণকৰ্ণ কমতাগৰ্ৱীৰ অট্টহাসিব দাপটে স্তম্ভিত ও নিৰ্বাক হয়ে বইল। মূল জীবনধাৰা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হেথাষ হোথাষ গড়ে উঠল অসংখ্য আশ্রম ও খান্কা, মৃত ব্যক্তিব কববেব উপৰ নিৰ্মিত হল বড় বড় ‘মাজ্জাব’ ও তাতে চল্ল গুহপহায় সাধন-ভজন। বাগদাদেব অভিজাত শ্ৰেণীৰ ভোগোন্মত্ততা বোমনগৰীব উচ্ছৃঙ্খল বিলাসেব সহোদবা হল, এক মুসলমান অমিত ঐশ্বৰ্যেব অধিকাৰী হল, অন্য মুসলমান উদব-পূৰ্ত্তিব জন্ত আশ্রয় নিল ভিক্ষাবৃত্তিব। তখনও শাহী মসজিদে আজান হাঁকছে ‘মুযাজ্জিন’, যুহুৰ্বেব জন্ত অবাৰিত হচ্ছে মসজিদী সাম্য এবং শ্বেবাচাবী সম্ৰাটদেবকে ‘খতীব’ ঘোষণা কবে চলেছে ‘খলিফাতুল মুসলিমীন’ বলে।

সাধাৰণ মানুহ দেখিলো এ সেই গতানুগতিকতা, সেই বিভেদমূলক সমাজ।—যাব মধ্যে অহংকাৰ ও হীনমন্ততাকে আইনেব অল্পশাসনে শৃঙ্খলিত কবে পাশাপাশি বাস কৰাব জন্ত বাধ্য কৰা হযেছে। কোথাষ শাস্তি কোথাষ সাম্য! বহুলুপ্তাহৰ সকল সামাজিক প্রচেষ্টা যেন একটা স্বপ্ন বলে প্রতীয়মান হল। সমাজে বিভেদকে পাকাপাকি কৰাব জন্ত যত্নেব বিবাম নেই শাসক-গোষ্ঠীৰ। উদাবতাৰ নামে আমদানী হতে থাকে কত না ইসলাম-বিবোধী মতবাদ। . . দিন যায, মানুহ বুঝে,—বাজতন্ত চিবহাৰী, গবীবেব দুঃখ চিবহাৰী, পাপ চিবহাৰী, তাৰ বিপবীত পুণ্যও চিবহাৰী। . . . হুতবাং আব ভয় নেই শ্বেবাচাবী শাসক ও সামন্ততান্ত্ৰিক সমাজেব। মানুহ এখন যত ইচ্ছা ইসলামেব চৰ্চা কৰুক—ধৰ্মে উদাব Laissez-faire-নীতি অবলম্বিত হোক। চলুক—শিয়া-সুন্নীৰ ‘মজহবী’-দ্বন্দ্ব; শবীযত ও মা’বেকতেব মধ্যে বিভেদ রচিত হোক, কেউ সংসাৰকে মাথা কিংবা দুঃখেব নিকেতন ভেবে বিভ্রন নক-কান্তাৰে প্রয়াণ কবে পবলোকেব জন্ত সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ ককক। স্থলতানেব প্রাসাদেব অহংকপ কবে তৈবী কৰা হোক সংসাৰত্যাগী ককিবেব সমাদি ও আস্তানা। শ্বেবাচাবী সম্ৰাট নগ্নপানে ফকিবেব দববাৰে আগমন কবে প্রয়াণ

কখন তিনি ধর্মভীক। বিলান্তি, বিলান্তি,—জীবন, মায়া-মবীচিকায়  
কপান্তবিত হয়ে সাধাবণ বোধ-বুদ্ধিব আঁওতায় বাইবে চলে যাক্।

হ'লও তাই। শবীযতেব অহুসাৰী মাহুয 'জেহাদে'ব কথা ভুলে শুধু  
নামাজ, বোজা, হজ ও জাকাত অহুশীলন কবতে লাগলেন। মা'বেফতেব  
অহুসাৰী মাহুয 'নফ্-সকুশী'তে ডুবে গিয়ে ভাবলেন জেহাদে আকববেব  
অহুশীলন হচ্ছে। স্বৈবাচাবী অলতান তাঁব ঐশ্বৰ্য-পিপাসা চবিতার্থ কবাব জল্প  
পাশ্ববৰ্তী অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে সেটাকে বল্লেন,—কুফবেব বিকছে  
জেহাদ।

অসাম্যেব উপব স্থাপিত বিভেদমূলক সমাজে লোভ, স্বার্থপবতা, ঈর্ষা,  
অসংযম প্রভৃতি যে-সব মনোভাব ব্যক্তি-চবিত্বেকে অধিকাৰ কবে, অক্ষীগণ  
স্বাভাবিকভাবেই সেগুলিকে ধর্মজীবন লাভেব পৰিপন্থী বলে দেখলেন এবং এই  
দেখাকে মাহুযেব অন্তবস্থিত বিকৃতি বলে নির্দেশ কবলেন। স্তবাস অক্ষীগণ্যাব  
পূৰ্বোক্ত বিকৃতি-সংহাবই হল সাধনাব পথে প্রথম কর্তব্য। সাধনাব দ্বিতীয়  
পৰ্যাবে জন্ম নিল ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রেম ও ব্রাহ্মস্ববোধ।

এইভাবে অক্ষীবা ইসলাম-সমর্ধিত ব্যক্তি-চবিত্বেব উপযোগী ত্যাগ-তিতিক্ষা,  
সংযম-সেবা ও খোদাপ্রেমেব প্রচাবক হন। বহু ঈশ্বববাদেব স্থানে  
একেশ্বববাদকে সংস্থাপিত কবা, সর্বমানবেব প্রতি মমত্ববোধ, সাম্যবোধ  
এবং ব্যক্তিগত শুদ্ধিব বাণী প্রচাব কবাব দাবিত্বও তাঁবাই গ্রহণ  
কবলেন। তাঁদেব চবিত্বেব মহত্ব ও পবিত্রতা, তাঁদেব দৃষ্টিব উদাবতা ও হৃদয়েব  
প্রেমার্জিত সাধাবণ মুসলিমেব ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবল। তাঁদেব  
ব্যক্তিত্বকে ঘিবে বচিত হল শ্রেষ ও প্রেষেব তেজস্তিলকীয় মাহাত্ম্য। এইবকম  
সামাজিক পবিপ্রেক্ষিতেই আবব ও মধ্যপ্রাচ্যেব দেশগুলিতে অক্ষীবাদেব উদ্ভব  
হয ও তাঁব জনপ্রিয়তা ক্রমে বেড়ে চলে। (অক্ষীবাদ ও আমাদেব সমাজ।<sup>১১</sup>)

অতঃপব দেখা যায় হজবত মহম্মদ (দঃ)-এব তিবোধানেব শতাব্দীকাল  
মনোহই মুসলমানগণ ধীবে ধীবে সংসাৰ ত্যাগেব ও সমাজ সম্পর্কে উদাসীনতার  
মনোভাবকে শুধু হজমই কবে নেয নি ববং তেমন মতবাদেব অহুসাৰীকে মহত্বেব  
দ্বাবা চিহ্নিতও কবেছে। এই সময়েব মধ্যে ইসলামেব হৃত আদর্শকে পুনরুদ্ধাব  
কবতে ইব্রাহিম, ইমাম মালিক প্রমুখ নির্ধাতিত হয়েছিলেন। হজবত  
বাবোজিদ বিস্তামী, হজরত বাবা অদহম শহীদ, হজবত শাহ জালাল এযমনি,

হজরত 'খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি, হজরত গৌবার্‌চাদ এবং আবো বহ পীর-দববেশ এদেশে ধর্মাদর্শ প্রচাৰ্‌বার্থে আগমন কবেন। তাঁরা জাতিব কথা সমাজেব কথা ভাবেন নি। যেখানে মান্নুষেব পতন হযেছে, মান্নুষেব করুণ বিলাপ ধ্বনিত হযেছে, তাঁরা সবকিছু বিস্মৃত হযে সেইসব মান্নুষকে আপনার ক'বে নিযেছেন,—তাদেব জন্ত প্রযোজনে অনেকে জীবন পর্যন্ত দান কবে শহীদ হযেছেন।

সুফীগণেব এদেশে আগমনেব ইতিহাসে দেখা যায়,—খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বহু আবব বণিক দলে দলে বাণিজ্যপোত ও নৌচালনা কবে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত কবতেন। এইভাবে তাদেব সঙ্গে এদেশেব বহু প্রাচীন সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

'বাজলাহী জেলাব পাহাড়পুবেব বৌদ্ধ-বিহাবেব ধ্বংসস্তম্ভে আবিষ্কৃত একটি প্রাচীন আববীয় মুদ্রা ( আক্সাসীয়া খলিফা হারুন-উর রসিদ এর রাজত্ব কালে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে আল মুহম্মদীয়া টাকশালে মুদ্রিত। ) থেকে তাব প্রমাণ পাওয়া যায়। ( সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ )।’

খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বন্দব আববদেব উপনিবেশে পবিণত হয়। হজরত সুলতান 'বায়োজিদ বিস্তারী সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ইসলাম ধর্ম প্রচাৰ্‌বার্থে চট্টগ্রামে এসে থাকবেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি চট্টগ্রামে ইসলাম ধর্ম বহু বিস্তৃতি লাভ কবে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে গাজী ইখতিয়ার-উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক প্রথমে বাজশক্তি নিয়ে গোড়-লক্ষণাবতী অধিকৃত হয়। পববর্তী সময়ে অনেক পীর দববেশ বঙ্গে আগমন কবেন। এই সময়ে সনাতনী বক্ষণশীল হিন্দুসমাজ কর্তৃক অল্পস্বত বর্ণাশ্রম প্রথাব অপপ্রযোগে উচ্চ-বর্ণেব লোকেব নিকট সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্ণেব লোকেবা সামাজিকভাবে নির্ধাতন ভোগ কবতে বাধ্য হতেন। তাঁরা ইসলামেব উদারতায আকৃষ্ট হয়ে মুসলিম হলেন।

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন,—হিন্দু সমাজেব বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার হাত থেকে নিস্তার লাভেব আশায ভাবতেব পতিতেবা দলে দলে সাম্যবাদী নবধর্ম গ্রহণ কবল। ভাবতেব জাতীয় বাজশক্তি ও তৎ প্রতিষ্ঠিত সমাজ তাদেব প্রতি কোনদিন শ্রায় বিচাৰ কবেনি; সেজন্তে এবা একবাৰ আশ্রয় কবে বৌদ্ধধর্মে,—আবাব মুসলমান বাজশক্তি একটা সাম্যবাদী সমাজ পদ্ধতিব হুবিধা

দেখানোৰ পৰ ছুটে চলে যায় সেই দিকে। সবচেয়ে আশ্চৰ্যেৰ বিষয় হল এই যে,—যে সব স্থানগুলোকে ব্রাহ্মণেৰা ব্রাহ্মণদেব দেশ আৰ বৌদ্ধ প্রধান দেশ বলে ‘ব্রাহ্মণ-বৰ্জিত’ স্থান হিসাবে ঘূণা কৰত, সে সব আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান প্রধান। (বাংলাৰ ইতিহাস)।

ডক্টৰ অববিন্দ পোদ্দাব লিখেছেন,—সামাজিক চিন্তাধাৰাৰ ক্ষেত্রে এই উদাৰতা এবং সমান অধিকাৰেৰ আদৰ্শই ইসলামেৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অবদান। (মানবধৰ্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ)।<sup>১৫</sup>

পীৰ দৰবেশদেব দৰগাহ ও আস্তানাৰ জাতিবৰ্ম নিৰ্বিণেৰে সকলেৰ প্ৰবেশ-অধিকাৰ থাকায় সেগুলি সৰাৰ পুণ্যতীৰ্থে পৰিণত হয়। পীৰ দৰবেশদেব সামান্য আস্তানাগুলি শাজেব নীৰস আলোচনা বা ধৰ্ম সংস্কাৰেৰ পৰিবৰ্তে প্ৰাণেৰ লীলা ও আত্মাৰ স্বাভাৱিক ক্ষুৰণে পূৰ্ণ ছিল। এই আস্তানাগুলি বিজিত ও বিজেতাৰ মিলনস্থল। (পূৰ্ব পাকিস্তানেৰ স্বকী সাধক)।<sup>১৬</sup>

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে হিন্দু ও মুসলিমেৰ মध्ये সমন্বয়েৰ চেষ্টাৰ সূত্ৰপাত হয় সমন্বয়েৰ অগ্রদূত তৎকালীন পীৰ-দৰবেশগণেৰ মাধ্যমে। তাঁদেৰ সে প্ৰচেষ্টাৰ লিখিত কোন নিদৰ্শন আজ নেই। তাঁৰা এদেশেৰ ভাষাকে আয়ত্ত কৰেছিলেৰ, এ দেশেৰ ভাবজগতেৰ সঙ্গে পৰিচিত হয়েছিলেৰ,—প্ৰাকৃতিক অবস্থাকে যেনে নিবেছিলেৰ,—নিৰ্বাতিত সাধাৰণ মানুহেৰ হৃৎথেৰ ভাগ নিয়ে সামগ্ৰিকভাবে মানবীয় কল্যাণকৰ পৰিস্থিতিৰ সঙ্গে মিতালি কৰেছিলেৰ। অপবপক্ষে তাঁৰা মানুহেৰ প্ৰতি সামাজিকভাবে অত্যাচাৰ, ব্যক্তিস্বাৰ্থগত শাসন-শোষণ প্ৰতিবাদেৰ জন্ত জীবনপণ সংগ্ৰাম কৰেছিলেৰ এবং শেষ পৰ্যন্ত এদেশেৰ আত্মাৰ সঙ্গে নিজেদেবকে একাত্ম কৰে দিবেছিলেৰ।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আবু বয়হান মোহাম্মদ ইবনে আহম্মদ আল-বেৰুনী সংস্কৃত ভাষা ও ভাবতবৰ্ষীৰ জ্ঞান জগতেৰ পৰিচয় লাভ কৰেৰ এবং “কিতাব-আত্ তহকীক-আল-হিন্দ” নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্ৰন্থ ৰচনা কৰেৰ। তিনি ইসলামি আদৰ্শভিত্তিক জ্ঞান-জগতেৰ দ্বাৰ ভাবতীয়দেৰ নিকট উন্নত কৰাৰ মাধ্যমে সমন্বয়েৰ সূত্ৰপাত লিখিত আকাৰে উপস্থাপিত কৰেৰ। সামগ্ৰিক কল্যাণকৰ সেই ইসলামী ভাবজগত তথা সংস্কৃতিৰ সাথে ভারতীয় কল্যাণকৰ ভাবজগত তথা সংস্কৃতিৰ সমন্বয় প্ৰবাহ অগ্ৰসৰ হয়ে চলতে থাকে। সম্ভবতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলানা আক্ৰাম খাঁ, হজরত মহম্মদ (সঃ)-এৰ

কথায় এসে 'সর্ব ধর্ম-সম্বন্ধকে তাঁর চবিত্ত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য' বলে বর্ণনা কবেছেন। (সাধক দ্বারা শিকোহ)।<sup>৩৩</sup>

বেজাউল কবির সাহেব লিখেছেন.—স্বাকী মতেব প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা সকল ধর্মের সহিত ঋণ খেতে পারে। (সাধক দ্বারা শিকোহ)<sup>৩৪</sup>

কিন্তু সংস্কৃতি সম্বন্ধের নামে যা ধর্ম অর্থাৎ বিশ্ব-কল্যাণ আদর্শ থেকে বিচ্যুত, ইসলামে তাব কোন মূল্য স্বীকৃত নয়।

পীর-দরবেশগণ এসেছিলেন ইসলাম ধর্মাদর্শ প্রচার করতে, এসেছিলেন ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শকে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করতে, ইসলাম ধর্ম-বৃত্ত বহির্ভূত কোন সংস্কৃতির সঙ্গে আপোষের মাধ্যমে সামগ্রিক কল্যাণাদর্শ থেকে সরে আসবার জন্ত নয়। কাবণ ইসলামি আদর্শে ধর্ম ও সংস্কৃতি পৃথক নয়। একটি পবিত্র জীবনাদর্শ প্রাপ্তি জন্ত অবিশ্রান্ত সংগ্রামই হল ইসলাম ধর্মের লক্ষ্য এবং সেই মানসিকতাই ইসলামী সংস্কৃতি। অতএব সংস্কৃতির যে-সব আচাৰ-ব্যবহার সামগ্রিকভাবে সমাজ কল্যাণের সহায়ক নয়,—ইসলামে তার অহুমোদন নেই।

বঙ্গে বক্ষগণীল হিন্দু সমাজে সংস্কৃতি নামক যে আচাৰ-ব্যবহার, (যাতে বর্ণাশ্রম প্রথাব অপপ্রয়োগ বশতঃ) স্থানীয় অগণ্য অন্ত্যজবর্গীয় লোকের জীবনে মানবতা-অবমাননাকারী ভাবাবহ হতাশা টেনে এনেছিল তাকে সজোবে আঘাত করতে গিয়ে পীর-দরবেশগণকে কঠোর সংগ্রাম এবং স্থান বিশেষে শহীদ হতে হয়েছিল। তাঁদের উচ্চাদর্শের নিকট আহুগত্য দিবে নির্ধারিত লক্ষ লক্ষ মাহুষ ইসলামের পতাকা তলে এলেন। কিন্তু বিরোধীদের মধ্যে সুবিধা-বাদীগণ উপায়ন্তব না দেখে সহাবস্থানের হস্ত প্রসারিত কবলেন। তৎকালীন সহাবস্থান নীতিব বিভ্রান্তি স্বয়োগ নিয়ে তাঁরা বিশ্ব-কল্যাণকর মানবতাদর্শ থেকে বহু দূরে সরে গেলেন, সংস্কৃতি সম্বন্ধের নামে বিচ্যুত জীবন দর্শনকে নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির মানসে এগিয়ে এলেন এবং সাধারণ মানুষকে সেদিকে প্রলুব্ধ করার জন্ত সচেষ্ট হলেন।

এ-বিষয়ে কয়েকটি কট বাস্তব বক্তব্য প্রকাশিত আছে। কেহ লিখেছেন, হিন্দু-মুসলিমের কুসংস্কারও মিলতে লাগল। ক্রমে গাজীমিয়া, পাঁচ পীব, পীব বদর, খাজা খিজিরের পূজা চলল। ডেবা গাজী খাঁর 'সখী সবব' তীর্থ হিন্দু-



মুসলমান-শিখৰ তীৰ্থস্থান । . . বাংলাদেশে সত্যপীৰ ও সত্যনাবায়ণ, হিন্দু মুসলমানৰ উপাস্য । ( ভাৰতীয় মধ্যযুগে সাধনাব ধাৰা ) । ৫০

তত্ত্বগতৰূপে দৃষ্ট হলে ইসলাম এতই অসহিষ্ণু ও হিন্দু ধৰ্ম এতই স্বতন্ত্ৰ ও গম্ভীৰ্বৰ্জনকাৰী যে এ দুয়ৰে সহাবস্থান অসম্ভব । কিন্তু বাস্তব অবস্থা যে কোন তথ্যৰ চেষ্টা শক্তিশালী ও অমোঘ, এবং এক শতকেৰ মध्येই বাংলা-দেশেৰ মুসলিম শাসকেবা উপলব্ধি কৰেছিলেন যে এদেশকে অধিকৃত বাখতে এবং দিল্লীৰ প্ৰভাপ অস্বীকাৰ কৰে স্বাধীনতা বজায় বাখতে গেলে স্থানীয়দেব বিৰোধীতে পৰিণত কৰা চলে না এবং সকল ছুস্থামীদেব পৰিবৰ্তন কৰাও তাঁদেব আৰম্ভেৰ মध्ये নহ । . . স্থানীয় ঐতিহ্যেৰ প্ৰাবল্য ও স্বাভাবিক পাৰিপাৰ্শ্বিক প্ৰভাব এতই শক্তিশালী যে, তাঁবা বহু স্থানেই সত্যপীৰেৰ পূজা প্ৰভৃতি হিন্দু-ভাবাদৰ্শ ও সৰ্ব-প্ৰাণবাদী মনোভাবকে আত্মস্থ কৰেছিল । . . যাই হোক, কঠোৰভাবে ব্যাখ্যাত নীতিতথ্যেৰ ভিত্তিতে স্থাপিত খ্ৰিষ্টান ধৰ্মেৰ মত ইসলামও বহুদিন হল এব উন্মেষ-কালাগত মতাদৰ্শ খেকে সৰে এসেছে । ( একশ ) । ১

ডঃ সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,—ধৰ্ম, আধ্যাত্মিক জগতেৰ, কিন্তু সংস্কৃতি পাৰ্থক্য জগতকে নিয়ে । মানবীৰ আচাৰ পদ্ধতি, শিক্ষা দীক্ষা, মানসিক উন্নতি, পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ প্ৰভাব এই সৰেৰ সময়য়ে এক অপূৰ্ব মনোভাবই হচ্ছে সংস্কৃতি । একথা সত্য যে ধৰ্মেৰ আদৰ্শ সংস্কৃতিৰ উপৰ প্ৰভাব বিস্তাৰ কৰে, কিন্তু তাই বলে ধৰ্ম ও সংস্কৃতি একই বস্তু নহ । সেই ক্ষুদ্ৰ বিভিন্ন ধৰ্মেৰ মध्ये সমন্বয় সাধন যতই কঠিন হউক না কেন বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ সমন্বয় সাধন কঠিন তো নহ-ই, বৰং যুগে যুগে প্ৰত্যেক দেশেই তা হয়ে আসছে । পৃথিবীৰ কোন শক্তি এ সমন্বয়েৰ গতি বোপ কবতে পাববে না, সমন্বয়েৰ কাজ অনন্তকালব্যাপী চলতে থাকবে, এতে কাৰো কোন বাধা টিকবে না । ( সাবক দ্বাৰা শিকোহ : ভূমিকা ) । ৩৩

সাধাবণভাবেই আমবা অনুভব কৰি সংস্কাৰ খেকে সংস্কৃতি শব্দটিৰ উৎপত্তি । সংস্কাৰ বশতঃ যিনি যে কাজ কৰেন, বা যা চিন্তা কৰেন, বা যে আচাৰ-ব্যবহাৰ ক বন,—তা তাঁৰ সংস্কৃতি । যে সংস্কাৰ কোন জাতিৰ আচাৰ-ব্যবহাৰ ও চিন্তা-ভাবনাৰ পৰিচায়ক তা সেই জাতিৰ সংস্কৃতিৰও পৰিচায়ক । সংস্কৃতিৰ পৰিবি যে কতখানি বিস্তৃত সে প্ৰসঙ্গে সাহিত্যিক গোপাল হালদাৰ লিখেছেন :

সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান (Sciences)' ও সমস্ত সৃষ্টি-সম্পদ (Arts)—অর্থাৎ আমবা যা জেনেছি (প্রকৃতির নিয়ম, নীতি প্রভৃতি), যা কবেছি (যন্ত্রশিল্প, সামাজিক বীতি-নীতি, 'আচাব-অলুঠান, মানসিক প্রবাস, চিন্তা-ভাবনা, নৃত্য-গীত, চিত্র-কাব্য প্রভৃতি)। আর্ট বা শিল্প এই সংস্কৃতিরই একটি এলাকা। শিল্প বলতে বোঝায় বাস্তব সৃষ্টি আব মানস-সৃষ্টি দুই-ই, কাবণ দুই-ই সৃষ্টি। (বাঙালী সংস্কৃতির রূপ)। ১২

সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা থাকুক, পীত-দববেশগণের আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশের সংস্কৃতির কি পবিচয় আমবা পাই! আমবা পাই,—পীত-দববেশ অর্থাৎ সূক্ষ্ম মতাবলম্বী সাধক ও ধর্মপ্রচারকগণের প্রচাৰিত আদর্শভিত্তিক ভাবনা এবং তৎজাত সংস্কার থেকে উৎপন্ন কর্মধারা অঙ্গসবণ করাব মানসিক অবস্থা। বঙ্গে ইসলাম আগমনের পূর্বে হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে তা মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করেছে। একেই বলা হল হিন্দু-মুসলিমের মিশ্র-সংস্কৃতি বা পীত-সংস্কৃতি। এই পীত-সংস্কৃতি উৎপত্তির পশ্চাতে জিম্মখীন প্রভাব পবিলক্ষিত হয়। যথা—ধর্মপ্রচারকগণের উপাচাব ও সংস্কারমুক্ত মনোভাব, এদেশের প্রকৃতি (Natural environment) এবং সংস্কার বা culture. পীত সংস্কৃতির নিম্নলিখিত সাধাবণ বৈশিষ্ট্যগুলি থেকেও তা প্রমাণিত হতে পাবে,—

ক) মুসলিমগণ পীতের আশ্রাব শান্তি কামনা কবে জিয়াবত কবেন। হিন্দুগণ পীতের প্রতি ভক্তি নিবেদন কবতে নানাবিধ অর্থ্য প্রদান কবেন।

খ) জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল ভক্ত পীতের দবগাহ, অর্থ্যৎ সমাধিস্থানে বা নজবগাহ, অর্থ্যৎ কল্লিত দরগাহে হাজত, মানত ও শিরনি প্রদান করেন।

গ) মুসলিম আদর্শে দবগাহে কোবান পাঠ হব, কিন্তু নামাজ অলুঠান হয় না। হিন্দু আদর্শে লুট প্রদত্ত হব, সন্তান কামনায বা বোগ নিবায়ন কামনায দবগাহে হুট বাঁবা হব, ফুল প্রদত্ত হব এবং ভক্তগণ কর্তৃক শান্তি-বাণি গৃহীত হব। বোদ্ধ আদর্শে অনেক জাবগায় জীব হত্যা না কবে পীতের স্নবণে গরু, মূবগী প্রভৃতি বনে নিষে গিবে হাজত-স্বরূপ মুক্ত কবে দেওয়া হয়।

ঘ) পীতগণের সূত্যা-বার্ষিকীতে হিন্দু-মুসলিম জনসাধাবণ দবগাহ বা নজবগাহে সাড়সবে মেলা অলুঠান উদ্ঘাপন কবেন। দবগাহের সেবায়ত্তগণ অতিথি সংকার কবেন।

ঙ) হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ পীবের অলৌকিক কীর্তি-কথা-ভিত্তিক কাব্য, নাটক বা জীবন-চরিত্র বচনা কবেছেন। এই সকল কাব্য, নাটকাদি বচনা, পঠন-পাঠন এবং শ্রবণের মাধ্যমে তাঁরা আনন্দলাভ করার সাথে ধর্মোন্নয়ন কবেছেন বলে মনে করেন।

এ সবকে ভিত্তি করে পীব-সংস্কৃতি জনসাধারণের মধ্যে প্রচাৰিত হতে থাকে।



## পীর-সাহিত্য

সুফী মতাবলম্বী ইসলাম ধর্মপ্রচাবক পীরগণকে কেন্দ্র করে যে বাংলা জীবনী সাহিত্য গড়ে উঠেছে, সংক্ষেপে তাই পীর-সাহিত্য ।

বাংলা পীর-সাহিত্য, ‘মঙ্গল’ জাতীয় সাহিত্য । মঙ্গল এই জন্যই বলা হয়েছে, পীরভক্ত হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের সংস্কার এই যে, পীরের জীবন কাহিনী ও তাঁর অলৌকিক শক্তিকথা পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে শ্রোতা বা পাঠকের পুণ্য অর্জন হয়, যাব কলস্বরূপ তাঁদের জীবনে মঙ্গল বা কল্যাণ হয়ে থাকে ।

আবার ‘বিজয়’ অর্থে ‘মঙ্গল’ শব্দটি গ্রহণ করলেও বলা যায় যে, ইসলাম ধর্মপ্রচাবক পীরের বিজয় অভিযানকে নিয়েই পীর-সাহিত্য গড়ে ওঠায় তা মঙ্গল সাহিত্য বটে ।

এখানে পীর-সাহিত্য বলা হল, কাব্য, এই সাহিত্যধারার, পীর-কাব্য পীর-নাটক, পীর সম্বন্ধে গড়ে বচিত জীবন-কথা ও পীর লোক-কথা পৃথক পৃথক ভাবে স্থান পেয়েছে । অতএব পীর-সাহিত্য, যা হিতেব সহিত বর্তমান, তাকে সাহিত্য পদবাচ্য করলে সাহিত্যে, মঙ্গল বা কল্যাণের কথা আপনা আপনিই এসে পড়ে । সুতরাং পীর-সাহিত্যকে আর আলাদাভাবে পীর মঙ্গল সাহিত্য বলে উল্লেখ করার তেমন আবশ্যকতা এখানে নেই ।

পীর-সাহিত্যকে প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত করা হল । যথা—১ । পীর-কাব্য, ২ । পীর জীবনী গল্প বচনা, ৩ । পীর নাটক ও ৪ । পীর লোক-কথা ।

বাংলা পীর-সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে কিছু কিছু বক্তব্য আছে, যাতে এ-দেশের সমাজ ব্যবস্থায় ঐনৈতিক চিত্র, ইতিহাসের অঙ্গ হিসাবে এসে পড়েছে । ইসলামী মূল আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে এ-দেশের কিছু কিছু মুসলিমের পক্ষে অগ্রগামী হওয়ার চিত্রও তাতে রয়েছে । অবশ্য তাদের কোনো প্রবাহ আজো রুদ্ধ হয়নি । সাহিত্যরূপ সমাজ-দর্পণে তাব প্রতিফলন হওয়াই স্বাভাবিক । তাই বাংলা পীর-সাহিত্য, হিন্দু আদর্শের ওপর ইসলামী আদর্শের

প্রভাব বিস্তার ও ধীবে ধীবে তা সংমিশ্রিত হওয়াব একটা তথ্যনির্ভর ধাবা-  
বাহিক সাহিত্য-ইতিহাস বটে। হিন্দু আদর্শ থেকে ইসলামী আদর্শে উত্তরণেব  
প্রচেষ্টাব মধ্য ঠিক এই কাবণেই অনৈক্যমিক চিত্র সঞ্চিত কিছু ইতিহাস  
তাতে থাকতে পাবে। এই প্রসঙ্গে এ দেশে ইসলামী বেনেসাঁসের অগ্রদূত  
সাপ্তাহিক মুখপত্র ‘মিজান’-এব (১৫ই জুন ১৯৭৫) সম্পাদকীয় অংশেব  
বক্তব্য লক্ষ্যীয়,—

“এ-দেশেব মুসলমানবা প্রধানতঃ হিন্দুদেব বংশধর। তাঁদেব পূর্ব-  
পুরুষবা এককালে হিন্দুই ছিলেন, তাই মুসলমানদেব মধ্যে আজো অনেক  
হিন্দু আচার-আচরণেব প্রভাব লক্ষ্য কবা যায়। এসব কাজ অনেক ক্ষেত্রেই  
তাঁবা স্মৃতসাবে কবেন না। সত্যি কথা বলতে কি, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভাব  
কপাস্তবিত্ত হয়ে তাঁদেব ধর্মীয় চেতনা’ব মধ্যে আত্মগোপন কবে বয়েছে,  
অথচ সে সম্পর্কে তাঁবা অসচেতন। তাই শরীয়তেব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সীমা নিয়ে  
চুলচেবা বিশ্লেষণ এখানে বড় কথা নয়,— বড় কথা হচ্ছে মুসলমান’দেব সচেতন  
মুসলমান হওয়া ও তাঁব কৃত কার্যাবলী’ব বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবগত হওয়া।”

## পীৰ-সাহিত্যৰ মূল্য

যে কোন সাহিত্য, তাৰ সাহিত্য গুণ যত লঘুই হোক, তবু তা সাহিত্য হিসাবে কিছু না কিছু মূল্যবান বটে। কোন বচনা সাহিত্য হ'যে উঠেছে কিনা তাৰ মানদণ্ড নিৰ্ণয়ে নানা মনীষীৰ নানা মত। সাধাৰণ ভাবে অনেকে সাহিত্যেৰ মূল্য তাৰ বস বিচাৰেৰ মাধ্যমে নিৰ্ধাৰণ কৰেন। অৱশ্য বস বিচাৰ সহজসাধ্য নহ। এক জনেৰ কাছে যে বচনা সুন্দৰ বলে অনুভূত হ'বে, অৱজনেৰ কাছে তা ততখানি সুন্দৰ বা আদৰ্শ সুন্দৰ নাও হ'তে পাৰে। একেবাবে অজ পল্লীগ্রামেৰ নগেন মাহাতো বড় ছোৰ হুৰ কৰে পাঁচালী পড়তে পাৰে, এৰং পড়ে সে বসাস্থাদন কৰে আনন্দ অনুভব কৰে কিন্তু তাৰ পক্ষে ববীজনাথেৰ বক্ত কবৰী'ৰ বস গ্ৰহণ কৰা সম্ভব নহ। আবাৰ কলকাতাৰ অমুক সাহিত্য সংঘেৰ সম্পাদক অধ্যাপক শ্ৰীঅমুক, 'উৰ্বশী' কবিতাৰ বস-মাধুৰ্য অনুভব কৰে তাৰ তাৰিফ কৰতে পাৰেন, কিন্তু তাঁৰ পক্ষে 'পীৰ গোবাটাঁদ' পাঁচালীৰ বসাস্থাদনে কিছু মাজ তৃপ্তি না পাওযা স্বাভাবিক।

সাহিত্য তা যত প্ৰসাদগুণ সম্পন্ন হোক, কালেৰ অমোঘ গতিতে তাৰ মূল্যমানেৰ তাৰতম্য হ'তে বাধ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্ৰে গুৰুত্ব বা বসমাজা-বোধ কম হ'যে থাকে। কাৰণ সমাজ বিবৰ্তনশীল বলে যে সমাজ-ব্যবস্থাৰ চিত্ৰ তাতে প্ৰতিফলিত হয়, তা অৱ কোন সমাজ ব্যবস্থাৰ মানুহেৰ কাছে ততখানি দৃষ্টিগ্ৰাহী হ'ব না। তাছাড়া যে সাহিত্য কোনো নিৰ্দিষ্ট স্থানকেন্দ্ৰিক কাহিনী নিয়ে বচিত, তাকে অৱ স্থানেৰ লোক সেই পৰিবেশ সম্বন্ধে ওষাকিবহাল না হওযাৰ সামগ্ৰিকভাবে অনুধাবন ও বস গ্ৰহণ কৰতে পাৰে না। তাই বলে সেই স্থানেৰ এৰং সেই কালেৰ সাহিত্য মূল্যহীন নহ।

সাহিত্যেৰ অৱতম প্ৰধান চৰিত্ৰ-বৈশিষ্ট্য হ'ছে যে তা সমাজ-দৰ্পণ বা সমাজ-চিত্ৰ। কোন স্থান ও কালেৰ সমাজ জীৱনে যে উত্থান-পতন, যে দ্বন্দ্ব-সন্ধি ঘটে, যে হাসি-কান্না দেখা দেয়, যে প্ৰেম বিবহ যে আনন্দ-বেদনা জাগে, যে ইতিহাস সৃষ্টি হয়, তাৰ স্থায়ী দৰ্পণ হল তখনকাৰ সেই স্থানৰ সাহিত্য। অতএব সেই সমাজ ব্যবস্থাৰ অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, বাৰ্জনৈতিক, শৈল্পিক, দাৰ্শনিক অবস্থা প্ৰভৃতিৰ একমাজ পৰিচায়ক হল তাৰ সাহিত্য। অতএব পীৰ-সাহিত্যেৰ বসমূল্য কাৰো কাছে যত কম থাক, সমাজ-চিত্ৰ হিসাবে তাৰ সাহিত্য মূল্য কোন দিন অপাংক্তেয় হ'তে পাববে না।

## পীর-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমি

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে ভাবতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচাৰকগণের আগমন ঘটতে থাকে। সুফী পীর-দরবেশগণ সেই সময় থেকে এ-দেশে জনসাধাবণের মনের উপর প্রভাব বিস্তার কবতে থাকেন। তখনও বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন 'চর্য্যাম্‌চর্য্যাবিশিষ্ট্য'-এর পদগুলি বচিত হয় নি।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ হল স্বর্ণযুগ। এই যুগেই বাংলা কাব্য সাহিত্যের নানাদিকে চরম উৎকর্ষ পবিলক্ষিত হয়। এ সময়ে দেবতা বা দেবতা স্থানীয় চবিজকে কেন্দ্র কবে প্রাশস্তিচ্ছাপক কাব্যের ব্যাপক প্রসার দেখা যায়, এবং দেব ধর্ম-ঠাকুর, দেবী মনসা, দেবী চণ্ডী, ঠাকুর বামচন্দ্র, ঠাকুর কৃষ্ণচন্দ্র, পীর-দরবেশ প্রভৃতিকে নিয়ে পাঁচালী-কাব্য বচিত হতে থাকে।

দেব-দেবীকে নিয়ে বচিত পাঁচালী কাব্যধারা আধুনিক যুগে এসে প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেল,—কিন্তু পীর-দরবেশগণকে নিয়ে বচিত কাব্যধারা রুদ্ধ হল না। এমূল কাণ হ'ল, দেব-দেবী চবিজ ভিত্তিক সাহিত্য ধারার পাশে এই পীর দরবেশগণের মানবীয় জীবন-ভিত্তিক সাহিত্য ধারার উদ্ভব ও তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রসার এবং তৎকালের মানবতাবাদের ব্যাপক প্রভাব বিস্তার। পীর-দরবেশগণের চবিজ ভিত্তিক সাহিত্য ধারায় সম্পূর্ণভাবে মানবতাবাদ-আদর্শ হ'ল সোচ্চার,—যাব ফলে তাতে এল খববেগ। তাই বাংলা সাহিত্যের এই স্বর্ণযুগে খ্রীষ্টচতুর্দশদেব থেকে আবস্ত কবে তৎপৰবর্তীকালের আদর্শ মানব-জীবন ভিত্তিক সাহিত্য বচনার প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা দিল। এইভাবে বাংলা সাহিত্যে পীর-পীরানীগণের জীবন কথা,—কাব্যে, তা থেকে আধুনিক যুগে গড়ে বচিত হ'ল এবং শেষ পর্যন্ত নাটকের যুগে সে কাহিনী নাট্যরূপে নিয়ে অভিনীত হ'তে আবস্ত কবল।

ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বাঙালী নব-নাবীর সমাজ-চিত্র এই পীর-সাহিত্য মাধ্যমেই প্রথম লিখিত আকারে বাংলা ভাষার প্রকাশিত হওয়ার সূত্রপাত হতে থাকে। পীর পাঁচালী কাব্যসমূহ হল তৎকালীন বাঙালী মুসলমান সমাজের সংস্কৃতির একমাত্র পবিচায়ক। আধুনিক যুগে উপন্যাস ও গল্প সাহিত্য বা

জীবনী সাহিত্য বচিত হওয়াৰ পৰা থেকে পীৰ-পাঁচালী কাব্য প্রকাশেৰে প্রবাহ-বেগ কমতে থাকে। আজ কাহিনী-কাব্য সৃষ্টিৰ দিন অভিবাহিত হয়েছে। ঠিক অল্পকপভাবে পীৰ-পীবানীৰ জীবন চৰিত্ৰ কাহিনী কাব্যাকাৰে বচিত হওয়াৰ দিন অতীত হয়ে গেছে। পীৰ কাব্য-সাহিত্য তাই বাংলা সাহিত্যেৰ মধ্যযুগেৰ ইতিহাসে বাঙালী মুসলমানগণেৰ একমাত্র সমাজ-চিত্ৰ স্বৰূপ হয়ে বহল, এবং সেই কাৰণেই এৰ ঐতিহাসিক মূল্য অপবিসীম।

মধ্যযুগ অৰ্থাৎ তুৰ্কী-সুলতান কৰ্তৃক বন্ধে আধিপত্য বিস্তাবেৰ সময় থেকে হিন্দু-সংস্কৃতি, মুসলিম সংস্কৃতিৰ সাথে মিশে যেতে আবশ্য কৰে,—যাৰ শেষ পৰিণতিতে হিন্দু-মুসলিমেৰ বাঙালী সংস্কৃতি আজ একটা অখণ্ড বাঙালী সংস্কৃতিকৰূপে গড়ে উঠেছে। যে যে ভিত্তিতে এই মিশ্ৰণ হয়েছ তে প্ৰধানতঃ,—

১। মুসলিম বাজশক্তি বন্ধে আধিপত্য বিস্তাৰ লাভ কৰলে তাৰ প্ৰভাব থেকে হিন্দুগণ মুক্ত থাকতে পাবেন নি, সহাবস্থান নীতি অনুসৃত হয়েছিল।

২। চিশতিয়া ও সুহ্ৰাবদ্দীয়া তবীকাৰ স্ফীৰণও অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। তাঁৰা প্ৰাথমিক যুগে ভাৰতবৰ্ষে আগমন কৰেন। হিন্দু অদ্বৈতবাদেৰ সঙ্গে উক্ত তবীকাৰেৰ স্ফী সাধকগণেৰ মতাদৰ্শেৰ সঙ্গে মাদ্ৰাস থাকাব ফলে তাঁদেৰ মতবাদ এদেশে স্থায়ী আসন কৰে নিতে পেবেছিল। আৰাব, হজৰত আবদুল কাদেৰ জিলানী প্ৰবৰ্তিত কাদেবীয়া তবীকা ও হজৰত বাহাউদ্দীন নক্শবন্দ প্ৰবৰ্তিত নক্শবন্দীয়া তবীকাৰ দ্বৈতবাদ বা স্ৰষ্টা ও সৃষ্টিৰ পাৰ্থক্য স্বীকাৰ কৰা হয়।<sup>১১</sup> হিন্দু দ্বৈতবাদ তাঁদেৰ অহুকূলে যাওয়ায় কাদেবীয়া ও নক্শবন্দীয়া মতবাদও এদেশে প্ৰতিষ্ঠিত হয়। সুতৰাং পীৰগণ প্ৰভাবিত হিন্দু মুসলিম নব-নাবীৰ মধ্যে এক সমন্বয়ভাব গড়ে ওঠে। ফলে পীৰ-সংস্কৃতি হিন্দু ও মুসলিমেৰ মিশ্ৰ সংস্কৃতিৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হয়।

৩। স্ফী মতবাদ-আধ্বিত মানবতাবাদেৰ আদৰ্শ, বাঙালী হিন্দুৰ মনন শক্তিতে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰেছিল।

৪। হিন্দু থেকে ধৰ্মান্তৰিত ব্যক্তিগণ, জয়গত ভাবে প্ৰাপ্ত হিন্দু সংস্কাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ত্যাগ কৰতে সক্ষম হন নি।

৫। গুৰু-শিষ্য সম্পৰ্কিত মানসিকতাৰ আচ্ছন্ন স্থানীয় সামাজিক



আবহাওয়ায়, পীবগণকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা কবাব দুর্বলতা। তৎকালীন সাধারণ মুসলিমের পক্ষে ত্যাগ কবা সহজ ছিল না।

পীব-পীবানীগণের ব্যাপক প্রভাব ভাগীরথী নদীর দক্ষিণ প্রান্তের পূর্ব অঞ্চলে যেকপ পড়েছিল, সমগ্র বঙ্গেব আব কোথাও সেকপ পড়েনি। এ-বিষয়ে উক্ত বঙ্গুমার সেনের বক্তব্য অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—চব্বিশ পবগণাব পূর্ব ভাগ ও প্রাক্তন যশোহর জেলার পশ্চিম ভাগ—এই অঞ্চল অনেক দিন হতেই পীব প্রভাবিত। বড় খাঁ গাজী ও গোবার্চাদ পীব উভয়েব পীঠস্থান আছে এই অঞ্চলে। এখনও যাবা পীবেব গান গেয়ে কলিকাতায় ভিক্ষা কবে তাবা পূর্ব চব্বিশ পবগণাব লোক। ঊনবিংশ শতাব্দেব মাঝেব দিকে এই সব অঞ্চলে পীবেব ছড়াগান কেমন ধবণেব ছিল, সে পবিচয় দীনবন্ধু মিত্রের ‘জামাই বারিক’ নাটকেব তৃতীয় অঙ্কে সন্ন্যাসি প্যাবডি হতে পাওয়া যায়। এ প্যাবডিতে পীবেব গানেব স্বচ্ছ, আসল কাঠামো ঠিক আছে। যেমন,—

ধূয়া : মানিকপীব, ভবপাবে যাবাব লা,  
জয়নাল ফকিবি নেলে, ফেনি খালে না।

আবস্ত : আল্লা আল্লা বল বে ভাই নবি কব সাব,  
মাজা ছুলিয়ে চলে যাবা ভবনদী পাব।

শেষ : যাঁডেব মাখায শিং দিযেছে, মানষিব মাখায কেশ  
আল্লা আল্লা বল বে ভাই পালা কল্লাম শেষ।

( বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস )।<sup>১১</sup>

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেব মধ্যেই পীব কাব্য বচিত হতে শুরু কবে। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে সত্যপীব কাব্য বচিত হয়েছে। বাংলা পীব-সাহিত্যেব অবির্ভাব কাল্পনিক পীব কাব্য দিযে। সত্যপীবই সেই কাল্পনিক পীব। সত্যপীব হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনকারী দূতস্বরূপ।

তাছাড়া হিন্দুব অনেক দেব-দেবী, হিন্দু—মুসলিমের পীব-পীবানী হিসাবে সাহিত্যে আগমন কবেছে। হিন্দু ও ওলাই চণ্ডী পীব সাহিত্যে ইষেছে ওলাবিবি। অমরুপ ভাবে বনদেবী থেকে বনবিবি, মৎস্যেশ্বরনাথ ও মসনদ-আলি থেকে মছন্দলী, উদ্ধাব দেবী থেকে উদ্ধাব বিবি, বাসুদেবী থেকে বাসু বিবি প্রভৃতি। ( পুথিব ফসল )।<sup>১২</sup>

ঐতিহাসিক পীৰগণেৰ জীবনীভিত্তিক কাব্য, গল্প-বচনা আৰু নাটক ক্ৰমান্বয়ে এসেছে। লোককথা আগে ছিল, এখনও আছে।

খুব সম্ভবতঃ কাল্পনিক পীবেৰ সৰ্ববৃহৎ কাব্য, কবি কৃষ্ণহৰি দাসেৰ 'বড় সত্যপীৰ'ও সম্ভাব্যতী কল্পাৰ পুঁথি। এই কাব্যেৰ ৰচনাকাল ঊনবিংশ শতাব্দীৰ প্ৰাৰম্ভিকাল। মনে হয় এটিই সত্যপীৰেৰ সৰ্বাধুনিক পাচালী-কাব্য। ঐতিহাসিক পীৰ জীবনীভিত্তিক 'সৰ্ববৃহৎ' এবং 'সৰ্বাধুনিক' পাচালী কাব্য 'পীৰ একদিল শাহ কাব্য'। এই কাব্যেৰ ৰচনা কাল অষ্টাদশ শতাব্দীৰ শেষাৰ্ধ অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীৰ শেষাৰ্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰথমার্ধেৰ মধ্যে।

পীৰ জীবনী গল্প সাহিত্য আত্মমানিক বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰথমার্ধেৰ বচিত হতে আৰম্ভ কৰে। মনিৰ-উদ্দীন ইউজুফ সাহেবেৰ 'হজ্জত ফাতেমা' নামক গ্ৰন্থ বাংলা ১৩৭৩ সালেৰ পয়লা বৈশাখে প্ৰকাশিত হয়। ইতিপূৰ্বে এই শ্ৰেণীৰ আবে গ্ৰন্থ প্ৰকাশিত হৈছিল।

পীৰ নাটক আত্মমানিক ঊনবিংশ শতাব্দীৰ শেষে বা বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰথম দশকেৰ মধ্যে বচিত হতে আৰম্ভ কৰে। নাট্যকাৰ সত্যীশচন্দ্ৰ চৌধুৰী মহাশয়েৰ 'বনবিবি' নাটকেৰ ৰচনাকাল ১৯১০ খৃষ্টাব্দ।

পীৰ লোককথাগুলি, যা বড়পীৰ সাহেবেৰ জীবনী-গল্প সাহিত্যে অলৌকিক কীৰ্ত্তি-কলাপ দীৰ্ঘক অংশে প্ৰকাশিত হৈছে, তা বঙ্গদেশেৰ সমাজ-ভিত্তিক নহ। বঙ্গদেশেৰ সমাজভিত্তিক পীৰ লোককথা খুব সম্ভবতঃ আবদুল আজীজ আল আমীন সাহেব বচিত 'ধন্ত জীবনেৰ পুণ্য কাহিনী' নামক গ্ৰন্থেৰ বাংলা ১৩৬২ সালেৰ পয়লা ফাল্গুন তাৰিখে সৰ্বপ্ৰথম প্ৰকাশিত হয়।

পীবেৰ পাচালী-কাব্য আজো বহু বাঙালীৰ ঘৰে পঠিত হয়। সত্যপীৰেৰ পাচালী, সত্যপীৰেৰ শিবনি প্ৰদান ব্ৰত পালন উপলক্ষে পঠিত হয়।

প্ৰতি বৎসৰ পীবেৰ দৰগাহে 'মেলা' উপলক্ষে লোক-গায়কগণ ঢোলক হাবমনিয়ম থলুৱা প্ৰভৃতি সহযোগে পীবেৰ গান পৰিবেশন কৰে থাকেন।

পীবেৰ জীবনী-গল্প সাহিত্য আজো গ্ৰাম বাংলাৰ সাধাৰণ মানুহৰ ভক্তিভবে পঠি-ববন।

পীৰ নাটক আজো বাংলাৰ বহুগ্ৰামে খুব উৎসাহ সহকাৰে অভিনীত হয়। সাধাৰণ দৰ্শকেৰ সমবেত হওন। এবং সেই অভিনয় দেখে স্বতঃস্ফূৰ্ত্ত অভিপ্ৰকাশ

কৰা তাৰ জনপ্ৰিয়তাৰ দৃষ্টান্ত। আমি জানি ১৯৭১ খৃষ্টাব্দেৰ জাহ্নুয়াৰী মাহে চৰ্দ্ধিশ পৰাগৰাৰ হাসনাবাদ খানাব অন্তৰ্গত ভবানীপুৰে 'বনবিবি'। ধোনা হুখেৰ পালা, নাটক সাফল্যেৰ সঙ্গ্ৰে অভিনীত হযেছে।

পীৰ-লোককথা এবং পীৰপ্ৰবাদ বিশেষভাবে পল্লী অঞ্চলে আজো বহুল প্ৰচলিত।

সাম্প্ৰতিককালে প্ৰকাশিত কথেকথানি গীৰ-সাহিত্যেৰ নাম ও তাদেৰ প্ৰকাশকাল উল্লেখ-কৰা হল,—

১। শৰুবাচাৰ্ঘ ও ব্ৰাহ্মেশ্বৰ বিবচিত সত্যনাৰায়ণেৰ পাঁচালী : সম্পাদনাৰ কৃষ্ণচয়ণ পণ্ডিত। সম্পাদনাকাল—বাংলা ১৩৭৫ সালেৰ আশ্বিন মাস।

২। হজ্জবত পাজী সৈয়দ মোবাবক আলি সাহ, সাহেবেৰ জীৱন চৰিতাখ্যান : গোঁবমোহন সেন : দ্বিতীয় সংস্কৰণ, বাংলা ১৩৬৮ সাল।

৩। ফুৰফুৰা শৰীফেৰ ইতিহাস ও আদৰ্শ জীবনী : মোহাম্মদ গোলাম ইবাহিন : বাংলা ১৩৭৩ সাল ( দ্বিতীয় সংস্কৰণ )।

৪। হজ্জবত ফাতেমা : মনিবউদ্দীন ইউসুফ : বাংলা ১৩৭৩ সাল।

৫। মেয়েদেৰ ব্ৰতকথা ( সত্যনাৰায়ণ ব্ৰত ) : সম্পাদনাৰ পণ্ডিত গোপালচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য : আহুমান ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ।

৬। খাজা মদনুদ্দীন চিশ্ৰুতি : মওলানা আব্দুল ওযাহীদ আল্কাসেমী : দ্বিতীয় সংস্কৰণ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ।

৭। হজ্জবত বড়পীবেৰ জীবনী : মৌলবী আজহাৰ আলী : দ্বিতীয় সংস্কৰণ আয়োদশ মুদ্ৰন, বাংলা ১৩৭৪ সাল।

৮। বাঁশেৰ কেলা ( ঐতিহাসিক নাটক ) : প্ৰসাদকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য : আহুমানিক ১৯৬০-৬৫ খৃষ্টাব্দ।

৯। হজ্জবত একদিল সাহেব জীবনী : কাজী সাংদেক উল্লাহ : ১৯৭১ খৃষ্টাব্দেৰ পয়লা জাহ্নুয়াৰী।

১০। তিতুমীৰ ( নাটক : শ্ৰীজামাকান্ত দাস : ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দেৰ অক্টোবৰ মাস।

১১। হজ্জবত বড় পীবেৰ জীবনী : কাজী আশবাক আলী : চতুৰ্থ সংস্কৰণ, আহুমানিক ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ। ইত্যাদি।

## পীর মজল-কাব্য

পীর কাব্যো ‘মজল’ শব্দটির অর্থ ‘কল্যাণ’ ৰূপে গৃহীত হয়েছে। মনসার গান এক মজলবাবে গায়ক-গায়িকাগণ আবদ্ধ কৰে পৱেৰ মজলবাবে সমাপ্ত কৰতেন বলে তাকে ‘মজলকাব্য’ নামে অনেকে অভিহিত কৰেন। পীর মজল-কাব্য সে অৰ্থে মজল-কাব্য নয়। পীবেৰ মাহাত্ম্য-কথা আলোচনা কৰলে বা পাঠ কৰলে বা শ্রবণ কৰলে, পাঠক ও শ্রোতা উভয়েৰ মজল হয় বা পুণ্য সঞ্চয় হয়—এমন বিশ্বাস সাধাৰণ মানুহেৰ মনে অনুপ্ৰেৰণাব সঞ্চাব কৰে, এবং সেই অৰ্থে পীর-কাব্য, ‘মজল-কাব্য’-শ্ৰেণীভুক্ত।

পীর-মজল-সাহিত্য ধৰ্ম-বিষয়ক আখ্যান-সাহিত্য,—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে ধৰ্ম ইসলাম ধৰ্ম। সাম্য, মৈত্ৰী, সংহতি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বেৰ আদৰ্শে প্ৰতিষ্ঠিত বলে তাকে ‘বিশ্বজনীন’ এই বিশেষণে বিশেষিত কৰা হয়। ইসলাম যেহেতু বিশ্বজনীন, সেই হেতু এই ধৰ্ম এবং ধৰ্মাদৰ্শ ভিত্তিক সাহিত্য সাম্প্ৰদায়িক হতে পাৰে না। তবে সংস্কৃতি যে কাৰণে কোনো ধৰ্মেৰ কঠোৰ বীতি-নীতিৰ নিৰ্ধৃত অনুসৰণ কৰে না,—ঠিক সেই কাৰণেই পীর মজল-কাব্যে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ ধৰ্মাশ্ৰিত সংস্কৃতিৰ সমন্বয় সন্নিবিষ্ট হবৈছে। ঠিক সেই কাৰণেই পীর মজল সাহিত্যকে সাম্প্ৰদায়িক—একপ্ৰকাৰে কোন বিশেষ অভিধাৰ বিচাৰ কৰা যাবে না।

পীর যে একজন অসাধাৰণ পুৰুষ, তা বিশেষ ভাবে উল্লেখিত হয়েছে ‘পীর একদিল শাহ’ কাব্যেৰ নিম্নলিখিত বক্তব্যেৰ মধ্যে,—

আল্লাব দববাবে বিবি কৰে মোনাজাত,  
কবুল হইল সিয়া খোন্দাব দবগানে।  
আল্লাব হজুবে আবদ্ধ কবিল যখন,  
কাঁপিতে লাগিল তবে আল্লাব আসন।  
এলাহি বহিল তবে জীববিলেব ভবে,  
আমাৰ আবণ কাঁপে কিসেব খাত্তেবে।

—(প্ৰতিলিপিৰ প্ৰথম পাতা, তৃতীয় পৃষ্ঠা)

জীবন জ্ঞানালো যে ‘খানা-গিনা’ ত্যাগ ক’বে আশক হুবি নায়ী এক মহিলা পুত্র কামনায় ‘মোনাভাত’ ক’বে। হে এলাহি। আপনি আপনার দববাবেব এক লাখ আশী হাজ্জাব ‘ওলি’ব একজনকে আশক হুবিব পুত্ররূপে প্রেরণ ক’বে তাব সাধনাব সকলতা দান ককন। এলাহি তাতে সম্মত হলেন,—

পয়গম্বব বলে বাবা একদিল খন্দকাব,

আল্লাব হুকুম হইল জনম লইবাব।

জনম লইতে বাও একদিল গুণমনি,

কাফের তুডিয়া লও আলেমেব সিবনী। (১১৪)

লক্ষণীয় যে, পীৰ একদিল শাহ আসছেন এলাহিব দরবার থেকে, কিন্তু এখানে তাঁকে বেশীক্ষণ থাকতে হবে না,—

পয়গম্বব কহেন তবে একদিলেব ঠাই,

অবশ্য যাইতে হবে কিছু চিন্তা নাই।

যাহ বাছা একদিল জননীব উদবে,

আড়াই বোজ বাদে আইস খোদাব দববাবে। (১১৫)

অর্থাৎ এলাহি-প্রেরিত ব্যক্তি, মহান পুরুষরূপে মর্তে আগমন কবতঃ কারো মনেব গভীর দুঃখ নিবসন কবছেন এবং অসাধারণ হিসাবে অন্তবে স্থানলাভ কবছেন।

এই ধরণেব কাহিনী হিন্দু ধর্মান্বিত মঙ্গলকাব্যেও দৃষ্ট হয়।

## পীর মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

দেব-দেবী চবিজ-কেন্দ্রিক মঙ্গল কাব্যেব শ্রায় পীর মঙ্গলকাব্যে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি নিম্নরূপ,—

- ১। পাঁচালী কাব্যসমূহ দ্বিপদী বা ত্রিপদী ছন্দে বচিত।
- ২। কবির আত্ম পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে।
- ৩। কাব্যেব মন্যে কয়েক স্থলে ভণিতা থাকে।
- ৪। আল্লাহ্, বন্দনা বা হামদো-নাযাত এই সব কাব্যেব অঙ্গ।
- ৫। মূলতঃ ধর্মভিত্তিক কাব্য।
- ৬। দেব-দেবী-মাহাত্ম্যবৎ পীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।
- ৭। কাল্পনিক পীর-কাব্যংশে মানবরূপে দেবতাব লীলা দৃষ্ট হয়।
- ৮। কাহিনী কাল্পনিক (কাল্পনিক পীর-কাব্যংশে)।
- ৯। দেবে-মানবে বা দেবে-দেবে সংঘর্ষ নয়, মানবে-মানবে বা মানবে-মানবরূপী বাঙ্সেব যুদ্ধ বর্ণনা। এ সংঘর্ষ ব্যষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির বা সমষ্টির সঙ্গে সমষ্টির বা শ্রেণীব সঙ্গে শ্রেণীব হলেও মূলতঃ তা একটি আদর্শেব সঙ্গে অস্ত্র আদর্শেব সংঘর্ষ।
- ১০। লৌকিক এবং অলৌকিক শক্তি পরিচায়ক কাহিনী।
- ১১। কাব্যসমূহ একক বা দলবদ্ধভাবে গাইবাব উপযুক্ত।
- ১২। কয়েকটি পীর কাব্যে দেব-দেবীর শ্রায় পীরেব স্বর্গ থেকে মর্তে আগমন ঘটেছে। কৃষ্ণহরি দাস, আশক মহম্মদ প্রমুখের পীর-কাব্য এব উদাহরণ।
- ১৩। ছদ্মবেশীর ছলনা-বর্ণনা, যা সত্যপীর কাব্যে লক্ষণীয়।
- ১৪। নব ও নারীর চবিজ অঙ্কিত হয়েছে।
- ১৫। পশু নদী, নৌকা প্রভৃতির বহুতব নাম বিবরণ আছে।

দেব-দেবী মঙ্গল-কাব্যেব বৈশিষ্ট্য থেকে পীর মঙ্গল-কাব্যেব অনেক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। সেগুলির সাধারণ কয়েকটি নিম্নরূপ,—

১। দেব বা দেবী স্বয়ং নবরূপে মানব কল্যাণার্থে মর্তে আগমন কবেন — কিন্তু পীর বা পীবানী কখনই আল্লাহ্-নন, আল্লাহ্-তা'লাব বা অন্য মাত্র। তাঁরা আল্লাহের আজ্ঞায় কল্যাণকর কাজ কবেন।

২। দেব-দেবী, মানব মানবীকূপে লীলা নয়,—মানবেবই যথার্থ মানবোচিত ক্রিয়াকলাপ পীব বা পীবানীগণের চবিজে দৃষ্ট হয়।

৩। পীরের আগমন ব্যক্তি-পূজা প্রতিষ্ঠাব জন্ত নয়—একমাত্র আল্লাহ-মাহাত্ম্য প্রকাশ কবণের জন্ত ও জনসাধাবণের মঙ্গল বা কল্যাণ প্রতিষ্ঠাব সংগ্রাম করা'ব জন্ত।

৪। ঐতিহাসিক পীবকাব্যে পীরের স্বর্গ থেকে আগমনের কল্পনা 'পীব একদিল শাহু' কাব্য ব্যতীত দৃষ্ট হয় না।

৫। দেবতা মাহুশের স্তরে অবনমিত হয়েছেন,—কিন্তু পীর কোনদিন আল্লাহ নন,—তাঁর অবনমনের কোন প্রশ্ন নেই। তিনি আল্লাহ্-তা'লাব দরবারেও পীব, মহত্ত্ব সমাজের নিকটও তাই।

৬। দেব-দেবী কেন্দ্রিক মঙ্গল-কাব্য কবির স্বকপোল-কল্পিত, কিন্তু পীরমঙ্গল কাব্য ( কাল্পনিক পীব ব্যতীত ) বাস্তব ঘটনা-ভিত্তিক।

৭। দেব-দেবী কাব্যে মানবমহিমা, দেব-দেবী মহিমা'য় উন্নীত করা হয়েছে, কিন্তু পীর-কাব্যে পীব-মাহাত্ম্য প্রকাশ কার্যতঃ আল্লাহ্ মাহাত্ম্যের প্রকাশ ব্যতীত আব কিছু নয়।

৮। স্বর্গ থেকে দেব-দেবীগণের মর্তে আগমন তাঁদের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে; পীবগণ আল্লাহকে সর্বশক্তিমান-জ্ঞানে মানবোচিত কর্তব্য পালনের দ্রুত উদ্বাপন-হেতু অগ্রসর হয়েছেন।

৯। দেব-দেবী চেয়েছেন নিজেদের জন্ত মানবের পূজা পেতে,—পীব চেয়েছেন মানবগণকে আল্লাহ-অভিমুখী কবতে।

১০। দেব-দেবী মঙ্গলাদর্শে ভক্তগণ, দেব-দেবীর নামে কল্পিত স্থানে ঘট স্থাপন কবতঃ পূজা কবেন বা গীত-স্তোত্র পবিবেশন কবেন,—এমন কি কোন কোন স্থলে মূর্তিও স্থাপন কবে পূজা কবা হয়,—কিন্তু পীব মঙ্গল আদর্শে ( কেবলমাত্র কাল্পনিক পীর-পীবানী ব্যতীত ) দরগাহে পূজার প্রচলন নেই। দরগাহে পীবের আত্মার শাস্তির উদ্দেশ্যে 'জিবাবত' কবাব মাধ্যমে আল্লাহ তা'লাব নিকট 'মোনাজাত' করা হয় মাত্র।

পীবমঙ্গল কাব্যে আৰো যে সব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলির কয়েকটি নিম্নরূপ,—

১১। গ্রন্থ উৎপত্তির কাবণ বর্ণিত হয়নি।

১২। বাবোষাবী বর্ণনা নেই।

১৩। চৌতিশা স্তব নেই।

১৪। নারীর পতিনিন্দা নেই।

১৫। স্বর্গাবোহণ বর্ণনা নেই।

১৬। কোন কোন কাব্যে, যেমন পীব গোবাটার কাব্যে, নামেযাত্র নারী-চবিজ স্থান পেয়েছে।

১৭। অধিকাংশ কাব্য আকারে খুব ছোট।

১৮। কাব্য হিসাবে সমাজের উচ্চ শিক্ষিত লোকের নিকট এতদমন মূল্যবান নয়,—কিন্তু গ্রামের পবিষ্ঠতম অংশের নিবাসীর সাধাবণ মাহুঘের নিকট খুবই মূল্যবান।

১৯। বাঙালী মুসলিম সমাজের চিত্র এতে সর্বপ্রথম অঙ্কিত হতে আরম্ভ করেছে।

২০। কোথাও হস্তরস পবিবেশনের প্রচেষ্টা নেই।

২১। আরবী-ফারসী শব্দের বহুল অহুপ্রবেশ হয়েছে।

২২। প্রায় সমস্ত কাব্যে সেমেটিক রীতিতে পৃষ্ঠাগুলি দক্ষিণ-দিক থেকে বাম দিকে লাজানো।

২৩। প্রায় সমস্ত কাব্যের প্রথম পংক্তির শেষে দুই পাড়ি এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে তাবকা চিহ্ন।

২৪। কোন কোন কাব্যে কবির ভণিতায় বৈষ্ণব স্থলভ বিনয় দৃষ্ট হয় যথা,—

হীন খোদা নেওযাজ কহে আমি গুনাগাব,

না জানি কি পরকালে হইবে আমাব।

২৫। কোন কোন কাব্যে সংস্কৃতের প্রভাবজাত রূপ-বর্ণনা দৃষ্ট হয়। যথা,—

ছু আঁখে কাজল অতি দেখিতে উত্তম,

চলন খঞ্জন পাখি পাইবে শবম।

(পীর একদিল কাব্য)



পীর মঙ্গল কাব্যে বাঙালী, বিশেষতঃ মুসলিম বাঙালী—সমগ্র বাংলায় যাবা সংখ্যায় গরিষ্ঠতম, তাঁদের সামাজিক, বাস্তবনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা তথা সমাজ-মানসের প্রতিকলন হয়েছে। অথচ কেউ কেউ ধর্ম মঙ্গল কাব্যকে পশ্চিম বাংলার জাতীয় কাব্য বলে অভিহিত করেছেন।

ধর্ম মঙ্গল কাব্যকে যদি পশ্চিম বঙ্গের জাতীয় কাব্য বলতেই হয়, তবে তাকে হিন্দু-বাঙালীর জাতীয় কাব্য বলা যেতে পারে। মুসলিম বাঙালীর নিকট ধর্মমঙ্গল কাব্য জাতীয় কাব্য বলে স্বীকৃতিলাভ কবছে না। এবং বাংলা পীর-কাব্যকে সেই অর্থে বাঙালার জাতীয় কাব্য বলাই শ্রেয়ঃ। কারণ,—

১। বাংলা পীর কাব্যে বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলিমের সমাজের চিত্র প্রতিকলিত হয়েছে। সত্যপীর কাব্য, পীর গোরচাঁদ কাব্য, পীর একদিল্‌শাহ কাব্য, প্রভৃতি ব্রষ্টব্য।

২। বাংলা পীর-কাব্য, হিন্দু ও মুসলিম কবিব সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাহিত্য সম্ভাররূপে বাঙালী জনসাধারণের কাছে এসেছে। কবি ফয়জুল্লাহ, আরিফ, আশক মহম্মদ প্রমুখ থেকে কবি কৃষ্ণহরি দাস, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, রায়গুণাকর ভাবতচন্দ্র প্রমুখ পর্যন্ত প্রায় একশত কবির সে ঐতিহাসিক সৃষ্টি এর উজ্জল দৃষ্টান্ত।

৩। পীর কাব্য, হিন্দু-মুসলিমের সংমিশ্রণে উৎপন্ন পীর-সংস্কৃতিভিত্তিক মানসিক ক্ষেত্রের ফসল। হিন্দু ও মুসলিম ভক্তগণ পীরের দ্ববগাহে হাজত-মানত-শিরনি প্রদান করেন।

মনসামঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে মনসাব প্রতি কতিপয় মুসলিমের শ্রদ্ধাপ্রদর্শন বিষয়ক যে কথা বলা হত,—মুসলিমদের মধ্যে সে মানসিকতা আজ বিরল। লৌকিক দেবী হিসাবে মনসাব ‘খানে’ হিন্দুগণ কর্তৃক আয়োজিত পূজা-অর্চনানে বহুকাল পূর্বে কিছু মুসলিম-বমণী পূর্বপুরুষের সংস্কার বশতঃ চাল-পয়সাদি দিতেন কিন্তু তা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে বলা যায়।

এই প্রসঙ্গে অবশ্যই বলা যায় যে পীরগণ ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সেই পীরগণের জীবনী যে কাব্যে স্থান পেয়েছে, বিশেষভাবে তাকে বাংলার জাতীয় ঐতিহাসিক কাব্য বলা যায় এবং তা বাংলার প্রথম জাতীয় ঐতিহাসিক মঙ্গলকাব্য।

## পীর জীবনী গদ্য সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

পীর জীবনী গদ্য সাহিত্যেব নিম্নলিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়, —

১। ইসলাম ধর্ম প্রচারক পীরগণেব মহান্ কীর্তিকলাপ-পূর্ণ কাহিনী।

২। ধর্মীয় সংস্কার বশতঃ কোন কোন গ্রন্থে অধিকমাত্রায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। নব-নাবীব প্রণয়-হৃচক কোন কাহিনী বা তার অংশ বিশেষ এই সব গ্রন্থে নেই।

৪। কোন কোন গ্রন্থে বক্তাবাদসহ আরবী এবং ফারসী কবিতাংশ পবিবেশিত হয়েছে।

৫। প্রতি পীরেব নামেব সঙ্গে সম্মান-হৃচক শব্দ প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে।

৬। জীবনচরিত কাহিনী; যাতে আল্‌ম্বদিক কোন অতিবিস্তৃত কাহিনী সংযুক্ত হয়নি।

৭। জীবনী বর্ণনা কবতে গিয়ে গ্রন্থকাবগণ রস-বচনা সৃষ্টির চেষ্টা কবেননি।

৮। পীরগণেব অলৌকিক শক্তি পবিচায়ক ক্রিয়া-কলাপে অধিকাংশ স্থান পূর্ণ।

৯। অধিকাংশ গ্রন্থে পীরগণেব বংশ পবিচয় প্রদত্ত হয়েছে।

১০। কোন কোন গ্রন্থে পীর সাহেবেব প্রতি ‘মোনাজাত’ কবা হয়েছে। তাদের কোনটি বাংলা ভাষায়, কোনটি বা আরবী-ফারসী ভাষায় লিখিত।

অন্তান্ত বৈশিষ্ট্যের কথাও গ্রন্থালোচনা প্রসঙ্গে যথাস্থানে বলা হয়েছে।

## পীর-নাট্য সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

পীর নাট্য সাহিত্যের নিম্নলিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়,—

১। প্রতি পীর নাটকে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বীর চবির্ভুত স্থান পেয়েছে।

২। পীর-নাটকে আল্লাহ-মাহাত্ম্য-কথা প্রকাশের কোন উদ্ভোগ দৃষ্ট হয় না।

৩। নারী-পুরুষের প্রণয় বা দুইটি পরস্পর বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব দিয়ে নাট্যরস জমিয়ে তুললেও মূলতঃ পীর বা পীরানীর মাহাত্ম্য-কথাই বিবৃত হয়েছে।

৪। পীর-নাটকেব করেকখানি গীতিনাট্য, যা যাজ্ঞাগানের আসবে উপস্থাপিত করার উপযোগী।

অস্তিত্ব বৈশিষ্ট্যের কথাও নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে।

---

## পীর লোকসাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

পীর লোক-সাহিত্যে পীর লোককথা ও পীর প্রবাদেব নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়,—

ক) পীর লোক-কথা :

১। আল্লাব শক্তিতে বলীয়ান হষে পীরগণ যে সব অলৌকিক শক্তির পবিচয় দিয়েছেন গল্পাকাবে, লোকমুখে প্রচলিত সেই কথাগুলিই পীর-লোক-কথা।

২। ভক্তগণ যদি পীরেব নিকট প্রার্থনা ক'বে ইচ্ছিত ফল লাভ কবেন,— লোকমুখে প্রচলিত সেগুলিও পীর-লোক-কথা।

৩। পীর লোককথাগুলিব অধিকাংশ নাতি-দীর্ঘ।

৪। কিছু কিছু পীর লোককথা ভোজবাজাব বাহু বিজাব অল্পরূপ বলে অল্পদূত হয়।

৫। পীর লোককথাগুলি প্রশংস-মূলক নয়। কোনটি বীর রসাত্মক, কোনটি ভয় মিশ্রিত, কোনটি বা ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল। তবে সর্বত্র তা পীরেব অলৌকিক শক্তি পরিচায়ক।

অনেকেব মতে পীরলোককথাব অলৌকিকবাদেব কোন মূল্য ইসলামী আদর্শে স্বীকৃত নয। অনেকেব মতে অলৌকিক কীর্তিকলাপ অস্বীকার্য নয। পয়গমবেব পরিচয় প্রসঙ্গে মোহাম্মদ কেবামত আলি লিখেছেন,— প্রয়োজন বিশেষে পয়গমবগণ খোদাব তবক থেকে মো'জেজা বা অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হন। হজবত মহম্মদ (দঃ) প্রয়োজন বিশেষে খোদাব তরফ থেকে মো'জেজা প্রাপ্ত হয়েছিলেন,—যেমন তাঁব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব শেষ বিন্দু 'সিদরা'তুল মুস্তাহা' ভ্রমণ। ইসলামী ইতিহাসে এই ঘটনাই 'মে'রাজ নামে অভিহিত, যা একবাত্রেব অল্প অবসবেই সংঘটিত হয়েছিল। কিনিমতা কর্তৃক তাঁর সিনাচাক বা বকু বিদাবণ, তাঁর অঙ্গুলি সংকেতে আকাশের

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওযা,—তাঁৰ বিশ্ববন্দিত পবিত্ৰ কোবানেৰ মত বিশ্বয়কৰ  
ঐশীগ্রহ প্ৰাপ্তি,—ইত্যাদি। (মিজান : বিশ্বনবী সংখ্যা : ১২৭৫)।

মোহাম্মদ (দঃ) সত্যিই মে'বাজে গিবেছিলেন আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে।  
তিনি প্ৰকৃত নবী ছিলেন। কাবণ আমবা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী, তাঁৰ অঙ্গুলি  
ইশাৰায় চাঁদে বয়েছে দুইভাগেৰ জোড়া লাগানো প্ৰকট দাগ।

(কোবান প্ৰচাব, ২৪ বৰ্ষ, ৭ম সংখ্যা, মে-১৯৭২)।

পাশ্চাত্যেৰ বিখ্যাত মনোবী Bos Worth Smith তাঁৰ Life of  
Mohammad গ্ৰন্থে লিখেছেন,—It is the only miracle claimed  
by 'Mohammad', his standing miracle he called it and a  
miracle indeed it is. (মিজান : বিশ্বনবী সংখ্যা : ১২৭৫)

খ) পীৰ প্ৰবাদ :

১। সাধাৰণভাবে পীবেৰ স্বৰ্ণেৰ ব্যবহৃত প্ৰবাদবাক্য,—

ক) বিলেব গৰু, বদবেৰ শিবনি।

—অৰ্থাৎ বেওয়াবিশ। অথবা ব্যক্তিগত নয়, সৰ্বসাধাৰণেৰ জিনিস।

খ) মবলো তবু হবি, ঠাকুববব বল না।

—অৰ্থাৎ হবি হিন্দু ধৰ্মাবলম্বী—সে, মুসলিম পীৰ ঠাকুববব সাহেবেৰ মহেশ্বৰ  
স্বীকৃতি দিল না। সে জিদ কবে মুতুও শ্ৰেয়ঃ মনে কবল।

২। স্পষ্টভাবে পীবগণেৰ মাহাত্ম্য-প্ৰকাশক প্ৰবাদবাক্য,—

ক) পীৰ না পয়গম্বব।

—অৰ্থাৎ পীবেৰ কাৰ্ধাবলী অথবা পয়গম্ববেৰ কাৰ্ধাবলী। আৰাব  
বিজ্ঞপাৰ্থে,—তুমি পীৰও নও পয়গম্ববও নও।

খ) তুফানে গড়ে বলে 'পীৰ বদব বদব।'

—অৰ্থাৎ বিপদে গড়ে, বিপদ হতে বক্ষ। পাণ্ডৱৰ জন্ত জলবাশিব ওপৰ  
প্ৰভাব বিস্তাৰকাৰী পীৰ বদবকে স্বৰ্ণ কৰা।

গ) বদর বদর গাজী

মুখে সদা বলে মাঝি।

(—ঈশ্বৰচক্ৰ গুপ্ত।)

ঘ) পাখৰে পূজিলে পাঁচে, সেও পীৰ হ'ব পড়ে।

(—হতোম প্যাঁচাব নক্সা।)

—অৰ্থাৎ পাঁচ জনে পূজিলে পাখৰ, সেও পীৰ হ'ব পড়ে। এখানে  
“দশচক্রে ভগবান ভূত” এই প্ৰবাদেৰ প্ৰভাব পড়েছে।

ঙ) গোলী খা ভালগা।

—শহীদ তিতুমীৰেৰ মতন প্ৰবল মানসিক আবেগপূৰ্ণ যোদ্ধা যিনি ‘গুলী’  
খেদে ফেলাৰ স্পৰ্দ্ধা প্ৰকাশ কৰেন।

চ) হিঁদুৰ নীৰ, মুসলমানেৰ পীৰ।

(—শ্ৰীশ্ৰীবামকৃষ্ণ কথাযুত।)

ছ) পীৰেৰ কাছে মামদোবাজি।

জ) পীৰেৰ সঙ্গে মুখ বাকানো।

ঝ) মবতে বসে পীৰেৰ দিকে পা।

ঞ) আবেৰ সঙ্গে যেমন-তেমন

পীৰেৰ সঙ্গে মন্তবীকৰণ।

৩। পৰোক্ষভাবে পীৰগণেৰ মাহাত্ম্য-প্ৰকাশক প্ৰবাদ,—

(ক) মান্লে পীৰ ববাবব

না মান্লে ক্ৰীৰ ববাবব।

- অৰ্থাৎ শুদ্ধ ভক্তি থাক্লে ক্ৰীৰ বা শিবনি প্ৰাপ্তিটি বড় কথা নহ, —কিন্তু  
ভণ্ডেৰ কাছে ক্ৰীৰটাই লক্ষ্য।

(খ) যে শবীবে দয়া নেই সেও কখনো শবীৰ,

মুদিলে বাব আসান নেই সেও কখনো পীৰ।

৪। পীৰেৰ অলৌকিক শক্তি পৰিচায়ক প্ৰবাদ বাক্য,—

(ক) গাজীৰ কুড়ুল।

(—সাংস্কৃতিকী : সুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়।)

—অৰ্থাৎ ত্ৰিধনুৰ অবস্থা।

খ) হাঁদ খাঁৰ মসজিদ।

—অৰ্থাৎ কোন কাহ্নে হাত দিবে এমন পৰ্দানে আসা, বা আৰ কোন মতেই  
শেষ কৰা সম্ভব হ'ব না।

৫। বিবার্টছ বা মাত্রাধিক্য বোঝাতে ব্যবহৃত্ত প্রবাদ,—

(ক) গাজীব পট ।

(খ) গাজীব গীত ।

—অর্থাৎ এমন গান আবস্ত কবল, তা যেন আব শেষ হতে চায় না ।

(গ) হেই বনবন্ ঘোবে লাঠি তিতুমীদেব হাতে

ফট্ ফট্ ফট্ গুলী চলে বাঁশেব কেজা ফতে ।

(—সিৰাজ সাই : দেবেন নাথ ।)

(ঘ) শালা, যেন তিতুমীবেব লাঠি ।

(ঙ) এ্যানাগুলী ব্যানাব যা

যেদিক পাবিস, সে দিক যা ।

নিলাম নাম একদিল পীব

চল্ গুলী হমাইপুব ॥

—অর্থাৎ ‘ভাং-গুলী খেলায়’, একদিল পীব কর্তৃক ‘ভাং’-এব সাহায্যে ‘গুলী’-কে এক গ্রাম থেকে দূবের আব এক গ্রামে নিক্ষেপ করণ ।

৬। পীরেব প্রতি অবজ্ঞাসূচক ভাব-প্রকাশক প্রবাদ,—

(ক) ফিকিবে ধবেছি বগ

পীবকে দেব লাউ এব ডগ ।

(খ) বন-মুবগী দিয়ে পীবের ধার শোধ ।

(গ) বাজাবে আশুন লাগলে পীবের ঘবও মানে না ।

(ঘ) তোমাব পীব, শিরনি খেয়েছে ।

(ঙ) সরষে খেতে পড্

গুলী খেযে মব ।

মুকি আব আল্লা

বল্তি দেলে না ॥

(—নহীদ তিতুমীব সম্পর্ক প্রবাদ ।)

[ মুকি = মুখে, বল্তি = বল্তে, দেলে = দিলে । ]

(চ) নিষেধ কবি তোবে হবি

যাসনে তুই দবগা বাড়ি ।

—অর্থাৎ নিষিদ্ধ স্থানে যাবে না, নিষিদ্ধ কাজ কব্বে না ।

ছ) আজ বেহুড়ের হাট

দাড়ি কান্ডে দিবে কাট । [ বেহুড়ে=বাহুড়িয়া ]

—শহীদ তিতুমীর সম্পর্কে প্রবাদ ।

জ) চেয়ে খেকো পীর ।

৭। পীরকে নিয়ে অনৈক্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ-জ্ঞাপক প্রবাদ :-

ক) পীরের শিরনি হারাম ।

অর্থাৎ পীরকে পূজাকপ শিরনি প্রদান করা এবং সে শিরনি গ্রহণ করা মুসলিমের নিকট বে-শর। অর্থাৎ অনৈক্যমূলক কাজ বলে গণ্য ।

খ) পীর বরাবর নেড়ে

সোনার খুরে এঁড়ে

ঘবেব পাশে গৌড়ে

যে বিশ্বাস করে

সে ভেড়ের ভেড়ে ।

—অর্থাৎ পীরের মূল্য তাঁদের কাছে যারা নেড়ে—অর্থাৎ মুক্তি-মস্তক বোদ্ধ থেকে মুসলমান হয়েছেন। যারা পীর পূজার বিশ্বাস করেন তাঁরা মুখ—যেমন এঁড়ে গরুর সোনার খুর হয় বলে বিশ্বাস করা ।

অন্য ব্যাখ্যা ;—নীচ শ্রেণীর মুসলমান যদি পীরের নাম নিয়েও শপথ করে, তথাপি তাকে বিশ্বাস নেই ; আর এঁড়ে গরুর খুর যদি সোনা দিয়েও বাঁধানো হয় তথাপি তাকে বিশ্বাস নেই । এদের উভয়ের কাছে যেতে নেই । ( সুবল মিত্রের অভিধান ১৯৭১ খৃঃ ) ।

বলা বাহুল্য, নানা জনে এক একটি প্রবাদের নানা রকম ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং তা অস্বাভাবিকও নয় ।

পীরগণের অলৌকিক শক্তি দেখে বা শুনে সাধারণ লোক বিশ্বাস বোধ করেছেন এবং সেইগুলিই পরবর্তীকালে সাধারণের মাঝে গল্পের আকারে প্রচারিত হয়েছে । সেই সব গল্পের অধিকাংশ মানব সম্পর্কীয় । অবশ্য পশু-পক্ষী সম্পর্কিত কিছু গল্পও আছে । সে গল্পগুলি মানব সম্পর্কীয় গল্পের স্থান



আনন্দদায়ক। লক্ষ্য করলে আবে অনুভব করা যায় যে;—এই সব অলৌকিক কার্যাবলী-সমগ্রিত গল্পগুলি মূলতঃ ইসলামের মহত্ব প্রচারে সহায়ক হয়েছে। মতান্তরে এই গল্প-সমষ্টি বা লোককথা কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষকে বাস্তব জগত থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। নিবন্ধ সাধারণ মানুষের কাছে, সচরাচর যা ঘটতে দেখা যায় না, এমন ঘটনা বিশ্বাসের উদ্রেক করবে এটাই সম্ভব। বিশ্বাসের ঘটনা গল্প-প্রবণ মানুষের কাছে থেকে রস পেয়ে আরো বিশ্বাসকর হয়ে পড়ে। তখন তার মধ্যকার বস্তুটুকু বাস্তবতাই ছিল তা কর্পূরের মতন অদৃশ্য হয়ে যায় এবং এক এক জনের মনে এক এক বকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অবশ্য একথাও সত্য যে কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী লোক পীরের মহানুভব কর্ম-কর্মতার দৃষ্টান্ত নিজেদের সুবিধা মতন ক'বে প্রকাশ করে। পীরের প্রতি ভক্তি আকর্ষণ করার এ একটা মন্ত কোশল। পীর স্বার্থ বা ছিলেন তা যদি রঙের আড়ালে চাপা পড়ে তবে তা সেই পীরের নিকট মৃত্যুর সমতুল। মানুষ তাঁর বাস্তব কর্মধারাকে বস্তুখানি জীবনের সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হবে তত তার স্বাধীন মূল্য বাড়বে; আর বস্তু তার আবাস্তব বা সাজানো কথা নিয়ে কানুস উভানোর উৎসাহ নেবে, ততই তা দিনে দিনে দ্রুত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

মুখ থেকে মুখান্তরে প্রবাদগুলি কিরছে একেবারে অবিকৃত অবস্থায় বলা চলে। বাংলাভাষী জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই সেই সব প্রবাদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার করে থাকেন—প্রবাদগুলি সেদিক দিয়ে লোককথাগুলি অপেক্ষা ভালো।

---

# বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা

প্রথম ভাগ

[ ঐতিহাসিক পীর ]



## প্রথম পরিচ্ছেদ

### আদম পীর

১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বাগদাদ ধ্বংসের পৰ থেকে ভাবতে সুফী প্রভাবের প্রোত প্রবাহগতিতে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। অবশ্য বাগদাদ ধ্বংসের পূর্বেও এ দেশে তার প্রভাব একেবারেই ছিল না তা নয়,—তবে তার গতি ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। যদিও খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীকে ভারতে সুফী-প্রভাবের যুগ বলা হব তবু বাগদাদ ধ্বংসের পূর্ব যুগে মাত্র কয়েকজন সুফী-সাধক এদেশে প্রবেশ কবেছিলেন। আদম পীর তাঁদের মধ্যকার একজন।

আদম পীর ব্যতীত আরো যারা এদেশে এসেছিলেন বলে জানা যায় তাঁদের মধ্যে শাহ্ মুলতান ক্রমী, খাজা মইনুদ্দীন চিশ্তী, মখদুম শেখ জালালুদ্দীন তবরেকজী প্রমুখ খুবই প্রসিদ্ধ। এঁদের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া আজ মুকঠিন। আদম পীর সম্বন্ধেও তাই সবিশেষ তথ্য তেমন পাওয়া যায় না।

হজরত পীর আদমকে কেহ বলেন আদম পীর, কেহ বলেন বাবা আদম শহীদ। কবে তাঁর জন্ম, কোন নির্দিষ্ট তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন, তাঁর পিতৃকুল বা মাতৃকুলে কারা ছিলেন,—এ সব বিবরণ আজো অজ্ঞাত।

আদম পীর এ দেশে বিশেষতঃ ঢাকা জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের চেষ্টা কর্বেছিলেন। ঢাকা অঞ্চলে আরও বহু সুফী-সাধক ইসলাম প্রচারের জন্য জীবন গণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ জনের নাম জানা গেছে। উক্ত চল্লিশ জন ধর্ম-প্রচারকের মধ্যে সর্ব প্রাচীন ছিলেন মুঙ্গীগঞ্জের অন্তর্গত রামগাল নামক স্থানের পীর হজ্ববত আদম শহীদ। এতদ্ অঞ্চলে নিজ জান-মাল কোঁরবান করে যারা ইসলামের আদর্শ প্রচার কবে অবিস্মরণীয় হয়েছেন আদম পীর সম্ভবতঃ তাঁদের শিবোমনি। ১৬১

বলা বাহুল্য, আদম পীর যখন এ দেশে ইসলাম ধর্ম-প্রচার কৰ্বেছিলেন, তখন ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণের লোক ছিলেন শাসন-দণ্ড নিয়ে। সুতরাং তখন

ইসলামি মিশনের পক্ষে ধর্ম-প্রচার কবতে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদীগণের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে হইবেছিল।

তুর্ক বিজয়ের পব এই শাসকগণ গেল শাসিতের পর্যায়ে। এতদিন স্থানীয় লৌকিক দেব-দেবী ও তাদের কাহিনী শাসক ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্গের দৃষ্টিতে অবজ্ঞের ছিল। ৪৩ বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তাই মনে হয় আদম পীবই সর্বপ্রথম শহীদ এবং এই জগতেই বুঝি তিনি আদম শহীদ রূপেও প্রসিদ্ধ।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-১১৭৯ খৃঃ) পীব আদম শহীদ সদলবলে ঢাকা জেলাব বামপাল নামক স্থানের নিকটবর্তী আবহুল্লাপুৰ গ্রামে ইসলাম ধর্ম প্রচার কবতে আগমন কবেন। কথিত আছে যে, গো-কোষবানীর অপরাধে নির্ধাতিত জনৈক মুসলিম হজ্জ যাত্রীর মুখে তার নির্ধাতনের কাহিনী শুনে তিনি পাঁচ হাজার অনুচরসহ মক্কা হতে এদেশ অভিমুখে অভিযান কবেন এবং বঙ্গে এসে উপস্থিত হন। রাজা বল্লাল সেনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বাবা আদম, শহীদ হন। পবে রাজাও ভাগ্য-বিভন্ন্যর সপরিবারে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিবে আত্মহত্যা কবেন।

শহীদ আদম পীবের দবগাহ-সংলগ্ন প্রাচীন মসজিদটি বাবা আদমের মসজিদ নামে পবিচিত। মসজিদটির গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে জানা যায় যে উক্ত মসজিদ ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফুর কর্তৃক নির্মিত হয়। গোপাল ভট্ট কর্তৃক বল্লাল চবিতের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ১১৭৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে শহীদ হন। আনন্দ ভট্ট তাঁর বচনায় আদমের সহিত বল্লালের যুদ্ধ কাহিনী বর্ণন কবেছেন। (সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ)। ৬১

বিজয়পুর্বের ইতিহাসে বলি হযেছে যে মক্কাব শেষ পীব বাবা আদম বঙ্গে এসে চতুর্দশ শতাব্দীতে ধর্মীয় ব্যাপার নিবে বল্লাল সেনের সঙ্গে যুদ্ধে শহীদ হন। ৪৮

বগুড়া জেলার ওলী দববেশদের মধ্যে বাবা আদম বিশেষ প্রসিদ্ধ। বল্লাল সেনের রাজত্বকালে, তিনি কষেকজন শিষ্যসহ উদ্ভববঙ্গে এসে শান্তাহাব থেকে কিছুদূরে একটি আস্তানা প্রতিষ্ঠা কবেন এবং ঐ অঞ্চলের পানির অভাব দূর কববাব জন্য একটি প্রকাণ্ড পুকুর খননের ব্যবস্থা করেন। তাঁর নাম অনুসাবে সেই পুকুরটির নাম হয় 'আদম দীঘি।' কথিত আছে যে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি স্থানীয় হিন্দু রাজ-কর্মচারী

ও সৈন্তদলের দ্বারা উৎপীড়িত হন। তাব ফলে অবশেষে তাদের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণে বাধ্য হন। ঢাকা, জেলাব বিবরণে বর্ণিত খ্যাতনাগা পীর বাবা আদম শহীদ ও আদম দীঘির পীব বাবা আদম অভিন্ন কিনা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে সময়ের হিসাবে উভয়ে একই ব্যক্তি হওয়া সম্ভব। (সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ)।<sup>৩১</sup>

চক্ৰিশ পরগণা জেলাব বাবাসত মহকুমার অন্তর্গত আদম পীরের নামে একটি দরগাহ আছে। এতদ্ অঞ্চলে তিনি আদম ককির বলে সমধিক প্রসিদ্ধ। বহেবা গ্রামের এই আদম ককির সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বামপাল বা বগুড়ার পীব আদমের নামে কল্পিত কোন নজরগাহও সম্ভবতঃ এটি নয়। বহেবা গ্রামের আদম ককিরের দরগাহের বর্তমান (১৯৬৯ খৃঃ) সেবায়েত মহম্মদ ইয়াহিয়া শাহজী বলেন,—

শেখ চাঁদ নাম যাব  
আদম কবজন্দ তার  
বহেরাতে আদমের ঘর  
বহেবা গ্রাম আনোয়ারপুর  
বহেরা নামেতে বালাই দূর।

অর্থাৎ শেখ চাঁদের ‘ত্র ‘আদম’ আনোয়ারপুর পরগণার বহেরা নামক গ্রামে বসতি করেন। তাঁর নাম স্মরণ করলে ‘আদম-বিপদ’ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

চক্ৰিশ পরগণা জেলার বসিহাটের অন্তর্গত বাজুড়িয়া থানাধীন আখার মানিক নামক গ্রামে পীব হজরত শাহ চাঁদের দরগাহ আছে। বহেরা গ্রামের আদম পীরের পিতা শেখ চাঁদ এবং আখার মানিকের পীর শাহ চাঁদ, শুধু ‘চাঁদ’ এই নামগত মিল ছাড়া আর কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না যাতে তাঁরা একই ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হতে পাবেন।

পীর হজরত আদম বাজীর দরগাহের বর্তমান (১৯৭০ খৃঃ) সেবায়েত মহম্মদ ইয়াহিয়া শাহজী (৬০) বলেন যে তিনি শুনে এসেছেন, আদম পীর ছিলেন তাঁদের বংশের বহু পূর্বব এক মহাপুরুষ। তাঁরা বংশ পরম্পরায় এই দরগাহে প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি দিয়ে “জিবাবং” অর্থ্যাৎ পীবের আখ্যায় শান্তির জন্ত আরাহ তাল, ন নিকট ‘মোনাজাত’ করে আসছেন।

আদম পীবেব ভক্তবৃন্দ তাঁর সমাধির উপর একটি হৃদয়স্থ স্মৃতি-চিহ্ন নির্মাণ কবেছেন। সেটি প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির মধ্যে অবস্থিত। তাঁব প্রতি শ্রদ্ধায কৃষ্ণচন্দ্র রাই বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ধবলী মোহন বাই বেশ কিছু জমি পীবোত্তর দিবেছিলেন। (Bengal Settlement Record) ১১। পীরের ভক্তগণ উক্ত দবগাহের পাশে একটি মসজিদও নির্মাণ করেছেন। হিন্দু-মুসলিম ভক্ত জনসাধারণ সেই দবগাহে হাজত-মানত-শিরনি দিয়ে থাকেন। পূর্বে প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে পীবের উরস উপলক্ষ্যে চাব দিনের মেলা হত। তাতে গড়ে প্রতিদিন প্রায় চাব-পাঁচ শত লোকের সমাগম হত।

এতদ্ অবলে আদম পীরের অশৌকিক কীর্তিকলাপ-সম্পর্কিত নিম্নলিখিত কয়েকটি লোক-কথা প্রচলিত আছে,—

## ১। ফণার ছায়া—

গোচারণ ভূমি। নিকটেই এক বিশাল অশ্বখ গাছ। গাছের নীচে মানিক পীবের থান। আদম পীব ছিলেন গো-পালক। তিনি গোচারণ-ভূমির মধ্যস্থ এইখানে মাঝে মাঝে বসতেন,—বিশ্রাম নিতেন।

একবার গ্রীষ্মকালে তিনি এই অশ্বখ গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে নিতে গাটনিজ্রায় অভিভূত হন। ছুপূর গড়িয়ে এল বিকেল। গাছের ছায়া সবে গেল পূর্বে। আদম ফকিরের মুখে এসে পড়ল রোদ।

সেই গাছের ডালে ছিল বিশালকাষ এক বিষধ সাপ। সে দেখল পীব আদমের নিজ্রায় ব্যাঘাত হয়। সাপটি তৎক্ষণাৎ তাঁর বিশাল ফণা বিস্তার করে সূর্যের রোদকে আড়াল করল। পীরের আর সূর্যের ব্যাঘাত হল না। বোধ সম্পূর্ণরূপে পীরের মুখের উপর থেকে সবে গেলে সাপটিও ধীরে ধীরে স্থানান্তরে চলে গেল।

## ২। উটন ডাঙ্গা—

বহেবা গ্রামের একপ্রান্তে কিছু অধিবাসীর একটি পাড়া ছিল। সেখানকার অধিবাসীরা একবার আদম পীবের প্রতি কিছু অবমাননাকর ব্যবহার কবেছিল। এ কাণ্ডে পীর সাহেব নাকি তাদেরকে সেস্থান ত্যাগ কবে অন্ত্র যেতে বলেন। সেই পাড়ার অধিবাসীগণ পীবের সে আদেশ অমান্য

কবে। ফলে কষেকদিনেব মধ্যে সেখানে ব্যাপক মহামারী দেখা দেয। বহু লোকের তাতে মৃত্যু হয়। অবশিষ্ট লোক ভয়ে সেখান থেকে বাস উঠিয়ে অত্যাচার চলে যায়। বসতি উঠে যাবাব জন্ত ঐ স্থানটিকে লোকে উটনডাঙ্গা বলে অভিহিত কবে।

### ৩। আশ্বমের নিষ্ক্রিয়তা—

বহেবা গ্রাম ও তৎ-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্মৃষ্ণ-সেলাই-কাডের ব্যাপক প্রচলন আছে। একদিন বহেরা গ্রামেব কতিপয় স্মৃচী-শিল্পী একত্রে বসে শিল্প কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে দৈবজ্ঞমে একজনর চাদরে আগুন লেগে যায়। সে আগুন নাকি ‘কল্কেব’ আগুন। তাদেব পাশে ছিল সেলাই কব্বার জন্ত কাপডের বাশি। আগুন তৎক্ষণাৎ সেই সব কাপড়ে ছড়িয়ে পড়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান সকলে। কেউ কেউ জ্বাসে পীব আদমের নাম স্মরণ কব্বতে থাকেন এবং সকলে আগুন নিভিয়ে ফেলেন। পরে তাঁরা বিস্মিত হয়ে দেখেন যে পীবের নাম মহিমায় উজ্জ্ব ব্যক্তির চাদবেব একস্থানে সামান্য পুড়ে গেছে,—কিন্তু সেলাই করার জন্ত স্তপীকৃত মূল্যবান কাপডগুলির কোন ক্ষতি হয়নি।



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### আবালসিদ্ধি পীর

পীর হজরত আবালসিদ্ধি রাজী ইসলাম ধর্ম প্রচাৰার্থে পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজীর নেতৃত্বাধীন কাফেলা বা ধর্ম প্রচারক দলের সঙ্গে সঙ্গে আগমন করেন। (পীর গোরাচাঁদ)। ২২

আবালসিদ্ধি পীরের জন্ম মৃত্যু, বংশ পবিত্র বা অন্তকোন বিবরণ জানা যায় না। মৃত্যুর তাবিখ পৌষ-সংক্রান্তি বলে নির্ণীত, কারণ ঐ দিনে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে পীৰ-ভক্ত সেবাবেতগণ কর্তৃক ‘উব্‌স’ উৎসব পালিত হয়।

চব্বিশ পরগণা জেলাব বাবাসত মহকুমার অন্তর্গত হাবড়া থানাধীন মণ্ডলপাড়া নামক গ্রামে আবালসিদ্ধি পীরের ‘মাজার’ শরীফ আছে। ২৩ বাংলাদেশের খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমাধীন বৈকারী নামক গ্রামও তাঁর নামে একটি ‘নজবগাহ’ আছে।

মণ্ডল পাড়ায় অবস্থিত দরগাহেব বর্তমান (১২৭০ খ্রিঃ) সেবায়ত আব্দুল ওয়াহাব প্রমুখ। তাঁরা প্রতি সন্ধ্যায় পীরের দরগাহে ধূপ ও বাতি প্রদান করে ‘জিয়ারত’ করেন। ইতিপূর্বে মহম্মদ মেচের আলি মোল্লা এই দরগাহে নিয়মিত ভাবে ‘জিয়ারত’ করতেন। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময় ‘উব্‌স’ উপলক্ষ্যে সেখানে একদিনের ‘মেলা’ হয়। সেদিনের মেলায় পাঁচ-ছয় শতাধিক লোকের সমাবেশ হয় এবং হিন্দু ও মুসলিম বহু ভক্ত পীর আবালসিদ্ধির দরগাহ, হজাত-মানড-শিরনি দিয়ে থাকেন।

আবালসিদ্ধির দরগাহটি ইটের তৈরী। শ্রোতস্বতী বা স্টী নদীর (যাকে অনেক স্থলবেধা নদীও বলেন) তীরে প্রাচীন একটি বটগাছের নীচে মনোরম পল্লী পরিবেশে উক্ত দরগাহটি অবস্থিত। দরগাহ-গৃহস্থ ‘মাজার’ স্থানটি একটি ছোট চিপিব মতন উঁচু। বাসবিহাবী ধব ও অগাছ আবালসিদ্ধি পীরের নামে জমি পীরোত্তর দান করেন। ২৪

দরগাহেব গায়ে জানালাব শিক কাঠিতে ঝুলন্ত ইট সহজেই সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। অল্পসন্ধান কবে জানা যায় যে নিঃসন্তানা বধূগণ সন্তান কামনা করে ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ ঐ ইট দৃষ্টিতে বেঁধে জানালায় গায়ে ঝুলিবে বেখেছেন। অনেকে নাকি বোগ নিবায়ন প্রার্থনা কবে ঐরূপভাবে ইট ঝুলিবে গেছেন। তাঁরা ঈঙ্গিত কন পেনে সামর্থ্যানুযায়ী দরগাহে এসে প্রতিক্রান্ত হাজত, মানত বা শিবনি প্রদান করার পর সেই ঝুলন্ত ইট খুলে দেন।

বাংলাদেশান্তর্গত সাতজীরার বৈকানী গ্রামের মহম্মদ আছাদুর রহমান সাহেব বলেন,—বাবু অহঙ্কলচন্দ্র সবদাব সেখানকাব দরগাহটি (বাবু মহেঞ্জ সরদারের বাড়ীর সীমানাব মধ্যে) নির্মাণ করে দেন। সেখানে পূর্বে ধূপ বাতি দিবে জিয়ারত কবা হত।

কবি মহম্মদ এবাদোদালা লিখেছেন,—

ছোন্দলেব সহ গোবা চলিতে চলিতে,

একদল পীব সঙ্গে দেখা হল পথে।

ছালাম আলেক কবি সকলে তখন,

বসিলেক একসাথে হয়ে নষ্ট মন।

গোবাই জিজ্ঞাসা কবে সকলেব তবে,

কোথায় চলেছ ভাই কহ দেখি যোবে।

দাবাক থা বলে আমি বাইব জিবেদি,

আবাল কহিল আমি থাকিব সিসিগি।

উপবোক্ত ‘সিসিগি’ নামক স্থানটি কোথায় অবস্থিত তা নির্ণয় করা যায় নি। বাবাসত মহবুবাব আমতাক্সা খানাবীন ‘শিবশিনি’ নামক একটি গ্রাম আছে। এ গ্রামটি বগলপাড়া নামক গ্রাম থেকে প্রায় ৩/৫ দিলো-মিটার দূরে অবস্থিত। অনেকের অমুমান যে বগলপাড়া এককালে শিবশিনি অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল।

বালাঙার পীর হজবত গোবাচাদ রাজী \* গ্রহে আছে যে ‘সিসিগি’ নামক গ্রামে হজবত আবদুল্লাহ রাজী আস্তানা স্থাপন কবে ইসলাম ধর্ম প্রচার কবেছিলেন। সিসিগি নামের উৎস,—‘হজবত আবদুল্লাহ রাজী’।

ইহাব পবিত্র বওজা ‘শির্বিলী’ নামক স্থানে। ইহাব সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোন বিশেষ পুঁথি কেতাব আমি সংগ্রহ কবিতে পাবি নাই।” (বালাগাব পীব হজবত গোবাটাঁদ বাজী)। ••

সিদ্ধিকী সাহেবেব গ্রন্থে পীব গোবাটাঁদেব সাথী যে একুশজন পীব ইসলাম ধর্ম প্রচাৰার্থে এদেশে এসেছিলেন বলে উল্লেখ আছে,—তাদের মধ্যে কাবো নাম আবালসিদ্ধি নয়।

আবালসিদ্ধি পীব সম্পর্কিত লোককথা :—

## ১। অনাচারের ফল—

একবার মণ্ডলপাড়াব আবালসিদ্ধি পীবেব দরগাহে ‘উরুস’-এব সময় ‘মেলা’ উপলক্ষ্যে প্রচুর জন-সমাবেশ হয়েছিল। দূর থেকে ভক্তগণ এসেছেন মেলায়। তাঁরা অবশু মেলাব আগেব দিনই এসে হাজির হয়েছেন। কিছু লোক এসেছেন যাঁরা পীবেব প্রতি ষথায়থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন না কবে উদ্ধত্বল ভাবে চলাফেরা করছেন। এতে সেধানকাব লোকদেব ওপর পীবেব কোপ-দৃষ্টি পড়ে।

পবদিন দেখা গেল সেধানকাব বেশ কিছু লোক কলেবা মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদেরকে নিয়ে অন্ত লোকজনেরা সমূহ বিপদ গণলেন। আগত যাত্রীগণ তো হায় হায় কবতে লাগলেন।

অবিলম্বে কিছু ভক্ত গিমে হাজির হলেন পীবেব দরগাহে এবং পীরের নিকট আত্মসমর্পণ কবে ‘ধর্মা’ দিলেন। সকলে সংযতভাবে পবিত্র আচরণ কবতে লাগলেন। তাঁরা মানত ও শিরনি দিলেন সেখানে। তাবপর থেকে মহামারীর প্রকোপ প্রশমিত হল।

## ২। অবহেলার প্রতিফল—

মণ্ডল পাড়াবই এক যুবক। তাব নাম মহম্মদ হুসুদীন। সে মেলায় এসেছিল বেড়াতে। পীবেব প্রতি তার ভক্তির লেশমাত্র নেই। সে তায়াশা দেখতেই এসেছিল মাত্র।

দরগাহেব সামনে আছে একটি বট গাছ। গাছটি প্রাচীন বটে। বেশ কয়েকটি ‘বোয়া’ বা ‘ঝুরি’ ঝুলছে তার ডাল থেকে। হুসুদীন একটা ছুরি

কিনেছিল মেলায়। সে তাৰ ছুবিৰ ধাব পৰীক্ষা কৰাব জন্তু এই বটেব একটা ছোট ব্লুবি কাটতে উত্তত হল। কে একজন তাকে নিষেধ কবল,—কেটো না কেটো না ব্লুবি, ও যে আবাল সিদ্ধি পীৰেব বটগাছ।

হুৰুদীন সে নিষেধেব কোন গুৰুত্ব দিল না। উচ্ছ্বলভাৱে মেলায় ঘূৰতে ঘূৰতে সে সেই বটগাছেব একটা ব্লুবি কেটে দিল। অনেকে শঙ্কিত হলেন এ ঘটনা দেখে।

মেলা শেষ হৰে গেল। আবো কিছুদিন গেল কেটে। অকস্মাৎ একদিন সেই যুবক এক কাঠিন পীডায় আক্ৰান্ত হল। সবাই বলল, পীৰকে অবমাননা কৰাব এই হল উপযুক্ত ফল। হুৰুদীন ভীত হল না। সে গেল নানা প্ৰকাৰেব চিকিৎসকেব কাছে। শেষ পৰ্যন্ত বোগ আব নিৰাময় হয় না। সবাই জানল তাৰ কুৰ্মেব প্ৰতিফলেব কথা। এবাব সে গেল দমে। একজন এসে বললে, বাঁচতে যদি চাও, শীগগীৰ যাও আবালসিদ্ধি পীৰেব দবগাহে। পীৰেব কাছে আত্মসমৰ্পণ কৰ, শিৱনি দাও।

যুবক হুৰুদীন তা-ই কবল। তাৰপৰ থেকে সে আবোগ্য-লাভ কৰতে-  
আবস্ত কৰল এবং স্বস্থ হৰে উঠল।

পীৰেব দবগাহেব বটগাছেব সে ব্লুবিৰ কাটা অপৰ বুলন্ত অংশটি আঁজো  
( ১৯৭০ খৃঃ ) দেখতে পাওৱা যায়।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### একদিল শাহ্

পীব হজরত একদিল শাহ্ বাজীৰ পূবা নাম পীব হজরত আহমদ উল্লাহ রাজী। জনসাধারণ তাঁকে ‘একদিল শাহ্’ খেতাবে ভূষিত করেছেন।

সাহিব-দিল্ শব্দটি অপভ্রংশে সাহ্-ইব্দিল>সাহ্-এবদিল এবং তা থেকে সাহ্-একদিল শব্দে রূপান্তরিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। একদিলের শব্দগত অর্থ এক বা অদ্বিতীয় হৃদয়। অর্থাৎ তিনি শ্রেষ্ঠ হৃদয়ের অধিকারী। পরবর্তীকালে সাহ্ শব্দটি হযত উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে।

“Sahib-dil (clear thoughted stoic) which is often used to mean a Sufi : Lit. master of one's heart or passions” (AKBARNAMA) >

পীর হজরত একদিল শাহ্ বাজী এদেশে পীব হজরত গোবাটাঁদ রাজীৰ সহিত ইসলাম ধর্ম প্রচাৰ কৰতে আসেন। তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার আনোয়ারাবপুৰ নামক পরগণায় ধর্ম প্রচাৰেৰ ভাব প্রাপ্ত হন। তাঁর মোর্শেদ তাঁকে ‘একদিল শাহ্’ এই খেতাব দিয়ে ছিলেন কিনা জানা যায় না।

একদিল শাহেব জন্ম কোথায় তাৰ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তাঁর জন্ম তারিখ জানা যায় না।

গোঁড়ে হাব্-শী সুলতানদেব বাজস্বেৰ শেষ সময়ে কিংবা সুলতান হোসেন শাহেব রাজস্বেৰ প্রথম দিকে এই দাববেশ ইসলাম ধর্ম প্রচাৰার্থে বাবাসতে গমন করেন বলে অহমান কবা হয়। (পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামেব আলো) ২০।

কবি আশক মহম্মদ সাহেব তাঁৰ ‘পীব একদিল শাহ্’ নামক পাঁচালী কাব্যে লিখেছেন :

মেবা জন্মস্থান জান সাহানা নগৰ,  
বাগের যে নাম সাহানির সদাগর।



করেন। তাঁর অসাধারণ সরলতার স্বয়োগ নিয়ে কিছু স্বার্থাশ্রয়। লোক চাঁদ-  
খাঁর উক্ত মসজিদ নির্মাণে বাধা সৃষ্টি কবেছিল বলে তাঁদের ধারণা।

চব্বিশ পবগণা জেলাব বাবাসত মহকুমার অন্তর্গত আনোয়ারপুর পবগণাব  
কাজীপাড়া নামক গ্রামে গাঁব হজবত একদিল শাহ বাজীব পবিত্র মাজার  
শরীফ আছে। এখানে প্রতি বছর পৌষমংত্রান্তির পূর্ব বার্ত্রে উবস  
উৎসবের সূত্রপাত হয় এবং সাধাবণতঃ আট দিন ধরে তা চলে। উবসের  
সূত্রপাতেই দবগাহের সম্মুখে এক সু-উচ্চ মিনারের শীর্ষভাগে বসে বাত্কাবগণ  
নহবৎ বাজাতে থাকেন। প্রভাতকালীন নহবতের স্ফুটন ধ্বনি পার্শ্ববর্তী  
জনসাধারণকে জাগরিত ও সচকিত কবে তোলে। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও  
উবস উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্মব্যস্ত থাকেন। দূব-  
দূবাস্ত হতে ফকির-দয়বেশ, মানিক গাঁবের গায়কদল এসে জমায়েত হতে  
থাকেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকের বাড়ীতে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন  
আগমন করেন,—পাড়ার পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মনে আনন্দের সাদা  
পড়ে যায়।

গাঁব হজবত একদিল শাহ বাজীব বগ্জা শরীফ ইটের তৈরী একটি  
সুদৃশ্য সৌধ। সৌধের গায়ে কাককার্খচিত। দবগাহের চাবপাশে প্রাচীর।  
সামনের চত্বরে শালিখ পাখীর কবব ও কটি বকুল গাছ স্থানটিকে  
রমণীয় কবে বেখেছে। দবগাহের পশ্চাৎ-দিক দিবে স্তবর্ণবেথা অপভ্রংশে  
সুট্টা নদীর কচ্ছ প্রবাহ-বেথা বিস্তমান।

উবস উৎসব আবন্তের সময় দবগাহ-সৌধকে সাধাবণভাবে স্ফুজিত  
করা হয়। দবগাহের বহু পুৰাতন সাধাবণ লঠন, বাডলঠন প্রভৃতি পবিকাৰ  
পবিস্ফুর কবে ব্যবহার-উপযোগী কবাব পব বাবান্দায় কুনিয়ে দেওয়া হয়।  
রাজা বামমোহন বাবের পুত্র বমাপ্রসাদ বায় তৎ-পুত্র প্যাবীমোহন বাবের  
পোস্তপুত্র ধবণী মোহন বায় স্ববং প্রথমেই দবগাহে খুব প্রাতঃকালে এসে  
শিবনি (দুই হাড়ি বাতাসা ও বিবগুণী) প্রদান কবতেন। তাঁর পবলোক-  
গমনের পব বামমোহন বাবের শেবেস্তাব তবফ থেকে আজ্ঞা উক্তরূপ  
শিবনি প্রদান অল্পষ্টান উদ্ঘাপিত হয়। বর্তমানে (১৯৭০ খৃঃ) ৮শ্বেজমোহন  
তেওয়ারীব পুত্র শ্রীভূদেবচন্দ্র তেওয়ারী (আত্মমানিক ববস ৭০) স্বয়ং শিবনি  
দেন। পূর্বে শিবনির সংগে সমপরিমাণ ‘চেরাগী’ অর্থাৎ নজরানা দেওয়া

হত এবং শিবনি-প্রদানকাৰী তাঁব প্রদত্ত দ্রব্যেব অৰ্থেক প্রসাদবশে পেতেন। শ্রীভূদেব তেওয়ারী বক্তব্যে একথা জানা যায়।

লক্ষণীয় যে দবগাহে প্রথমেই হিন্দুগণ কর্তৃক শিবনি প্রদত্ত হয়। এ বিষয়ে একটি প্রবাদ আছে।

দবগাহের বর্তমান (১৯৬৯ খৃঃ) খাদিমদাব আলহাজ্ ফকিব আহমদ, কাজী আজিজাব বহমান প্রমুখ বলেন যে বাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায ও তাঁব পরবর্তী কোন ব্যক্তি, একদিল শাহেব প্রতি উক্তিব নিদর্শন-স্বরূপ নয় শত উনত্রিশ বিঘা পাঁচ কাঠা জমি পৌরোস্তব দিবেছিলেন। বায় সেবেস্তাব কর্মী শ্রীভূদেবচন্দ্র তেওয়ারী বলেন যে পৌরোস্তব প্রদত্ত হয়েছিল বাজা বামমোহন রাযেব সেবেস্তা থেকে। উক্ত খাদিমদাবগণ আবো বলেন যে, উল্লিখিত জমিব মধ্যে উত্তবহাট মৌজায় একশত দুই বিঘা পনরো কাঠা জমির একস্থানে এই দবগাহ-গৃহটি অবস্থিত।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে গীর হজবত একদিল শাহ্ বাজীর উক্ত দবগাহের নির্ধাবিত সেবাবেত বা খাদিমদাব আগমন কবতঃ দবগাহ-গৃহ ও তৎ-সংলগ্ন প্রাঙ্গন স্বহস্তে পবিত্রাব-পরিচ্ছন্ন করেন। প্রাতঃকালে তিনি ‘অজু’ করার পব গীরেব মাজাব অর্থাৎ সমাধিতে ধূপ-ধূনা প্রদান কবেন এবং সন্ধ্যাকালে ধূপ-ধূনাব সাথে বাতিও জ্বলে দেন। বাতি বলতে মোমবাতি নয়,—তা সবষের তেলের প্রদীপ। এই সব দেবাব পব তিনি কোবান শবীফ থেকে অংশ বিশেষ পাঠ করেন এবং গীবেব আত্মাব শান্তির জন্তু আল্লাহ্ তা’লাব নিকট প্রার্থনা জানান।

তিনি দবগাহ-গৃহ থেকে বাইবে এসে অতিথিশালায় কোন অতিথি আছেন কিনা অহুসন্ধান কবেন। যদি কাউকে দেখতে না পান তবে তখনকাব মতন তাঁব কর্তব্য সম্পন্ন হয়। যদি দবগাহ-পাদমূলে অতিথিব সন্ধান পাওয়া যায় তবে তিনি সেই অতিথিব আহাব ও প্রযোজনে থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। পূর্বে এখানে গড়ে প্রায় শতাধিক অতিথির সংকার কবতে হত, বর্তমানে (১৯৭০ খৃঃ) প্রতিদিন গড়ে দশ-বারো জন অতিথিব সংকার কবা হয়ে থাকে। পূর্বে পৌরোস্তব স্থানের আয ও ভক্তদের দেওয়া অর্থাদি থেকে সে ব্যয়-নির্বাহ সহজসাধ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে আর তা সহজসাধ্য নেই।



। প্রতি শুক্রবারে বহু হিন্দু-মুসলিম নব নাবী পীতের দরগাহে হাজত, মানত বা শিবনি দিতে আসেন। তাতে এমন জনসমাবেশ হয় যাকে ছোট্ট একটি মেলাও বলা যায়।

বার্ষিক উবসের সময় যে মেলা বসে তা এতদ্ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ মেলা। প্রায় দশ-বারোদিন ধরে এই মেলা চলে। প্রাতঃকাল থেকে হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ ফুল ও তবসহ নজরানা, হাজত, মানত, শিবনি প্রভৃতি নিয়ে দরগাহে আসেন এবং ভাবপ্রাপ্ত খাদিমদাবের হাতে তা অর্পণ করেন। ঐ সব প্রদানের পর খাদিমদাবের কাছ থেকে তাঁরা পীরের শাস্তিবারি ও প্রসাদ পান। ফুলের মালা বা ফুলের গোছা পীরের বওজাব ওপর সাজিয়ে দেওয়া হয়। অনেক ভক্ত পীরের লুট দিখে থাকেন। ‘পীরের লুট’ হিন্দুর ঠিক ‘হরির লুটের’ মতন।

দরগাহে প্রবেশ পথের ধারে ধারে শিরনির ডালা বিক্রেতাগণ বসে থাকেন, এই ডালায় সাধারণতঃ থাকে বাতাসাদি মিষ্ট দ্রব্য ও ফুল। আর থাকে অসংখ্য ফকির, বিভিন্ন পোষাকের, বিভিন্ন বয়সের। ভক্তগণ শিরনি, হাজত বা মানত দেবার পর ফেরার মুখে কিছু কিছু খরবাত কবে দান। খাদিমদাব-গণের সংখ্যাও বেশী। পীরোত্তর সম্পত্তির অংশীদারগণের নামের এক বিরাট তালিকা আছে। সেই তালিকা-অনুযায়ী তাঁদেরকে পব পর ঠোঙায় কবে প্রসাদ এবং আপন আপন পায়ে শাস্তিবারি দেওয়া হয়। তাঁরা সাবিত্তভাবে তা গ্রহণ করেন। দক্ষিণ-প্রাপ্ত অর্থেরও তাঁরা অংশ পেয়ে থাকেন।

দরগাহে সামনের চত্বরে গায়কের পাঁচ-ছয়টি দল ঢোলক, হারমনিয়ম ও জুডি সহযোগে পীতমাহাত্ম্য শূচক গানের মাধ্যমে স্থানটির পবিত্রতা জম-জমাট কবে তোলেন। তাঁদের এক একটি মূল গানের থাকেন। মূল গানের পোষাক ফকিরি পোষাক। তিনি চামর ছলিষে সকলকে ‘দোবা’ জানিয়ে, বিশেষ করে শিশুগণকে হাতে নিয়ে বিভিন্ন নৃত্য ভঙ্গিমায় গানের মাধ্যমে, তাদের মঙ্গল কামনা করেন। ভক্তগণ তাতেও যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করেন এবং ঐ সব গায়কগণকে পয়সা দান করেন।

মেলায় সার্কাস থেকে ভাজাব দোকান, শাক সজ্জিব দোকান, মনোহারী দোকান প্রভৃতি অসংখ্য বিক্রেতা পশাব সাজিষে বসেন। এই মেলায় প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হয়ে থাকে। দুবের বার্তাগণ স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে গরু

গাডিতে কবে আসেন এবং মেলার আশ-পাশে স্থবিধামতন স্থানে থেকে মেলায় ভ্রমণ করেন। তাঁরা সেখানে চতুই ভাতি কবে খান।

পীর একদিল শাহেব নামে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এক মাইল দীর্ঘ একটি বাস্তা, সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতির নামকরণ হয়েছে।

কাজীপাড়ার পীর হজবত একদিল শাহ বাজীব দরগাহগৃহ ব্যতীত নিম্ন-লিখিত স্থানে তাঁর নামাঙ্কিত নজবগাহ রয়েছে। তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হল,—

## ১। বারাগত —

কলিকাতা-বশোহর পাকা সড়কেব ধাবে বাবাসত শহবেব প্রায় কেন্দ্রস্থলে পীর একদিল শাহেব নামে একটি নজবগাহ আছে। এটি একটি পাকা গৃহ। প্রচলিত ধারণা এই যে পীর একদিল শাহ কাজীপাড়ায় যাওয়ার পথে এখানে কিছু অণেব জন্ত অবস্থান কবেছিলেন। সেই সময় থেকে এই স্থানটি ভক্তগণের নিকট একটি পবিত্র স্থান হয়ে ওঠে এবং লোকে ধূপ-বাতি দিতে থাকেন।

এই নজবগাহেব সেবাযেতব নাম ডাঃ বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। ইনি একজন খ্যাত নামা এলোপ্যাথ চিকিৎসক। তাঁরা নিজেবা বা তাঁদের নিযুক্ত লোক নিয়মিতভাবে প্রতি সন্ধ্যায় পীরেব স্থানে ধূপ-বাতি দিয়ে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করেন। অবশ্য এখানে বাৎসরিক উবস্ বা বিশেষ অনুষ্ঠান বা মেলা হয় না। এখানে কোন কোন ভক্ত দুধ, বাতাসা, ফল ইত্যাদি অর্পণ করে থাকেন। ডাঃ বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যাহেব নিজের কথায়,—

‘জনসাধারণেব অনেকে এখানে মানসিক কবে যান। কেউ বা অসুস্থ বিষ্মখেব জন্ত সন্ধ্যায় দরগাহে জল বেখে খান এবং পবদিন সকালে নিয়ে গিয়ে রোগীকে দেন। স্তনা যায়, তাতে নাকি তাঁদের উপকাবও হয়।’

বসন্তবাবু নিজের উৎসাহে এবং ভক্তিভে পীরেব নামে উক্ত পাকা নজবগাহ গৃহটি নির্মাণ কবিযেছিলেন। বহুকাল পূর্বে কে বা কাবা ঐস্থানে ভক্তিঅর্ঘ্য অর্পণ কবতেন তা জানা যায় না। তখন ঐস্থানে একটি ছোট মাটির টিপি মাত্র ছিল। এই নজবগাহটির আশ-পাশে কোন মসলমান বসতি নেই। দানত, দুগ ফল প্রভৃতি প্রদানতঃ হিন্দু ভক্তগণই এখানে দিবে থাকেন। নজবগাহটি প্রায় এককাঠা ভূমি উপব অদ্বিত।

## ২। ঘোলা-কাজীপাড়া--

বাবাসত-বসিবহাট সড়কের ধারে কাজীপাড়া গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত হাটখোলাটি ঘোলাব হাট-খোলা নামে খ্যাত। এই হাটখোলায় একস্থানে স্টী নদীতীরে পীর একদিল শাহের একটি নজবগাহ আছে। নজবগাহটি ইটেব তৈবী। স্থানীয় জনসাধারণ এখানে ধূপ-বাতি দেন। জমির পরিমাণ কয়েক শতক মাত্র। এক সাধারণ বাখাল বালকের বেশে একদিন দুপুরে পীব একদিল শাহকে নাকি এই স্থানে খেলা কবতে দেখা গিয়েছিল। সেই ক্ষুদ্র এই এখানে নজবগাহ তৈবী হয়। অবশ্য এখানে কোন মেলা হয় না।

## ৩। কাটারাইট--

বাবাসত মহকুমার অন্তর্গত এই স্থানটি বাবাসত-বসিবহাট সড়কের ধারে অবস্থিত। সাধারণে ঐ স্থানটিকে দবগাহ বাড়ী বলেও অভিহিত করেন। এখানে প্রায় দশ শতক জমির উপর একটি ইটেব স্তম্ভ দেখতে পাওয়া যাবে,—তাব ওপর রয়েছে একটা অশ্ব গাছ। এই স্থানটিই পীর হজরত একদিল শাহ-বাজীর নজবগাহ। পূর্বে এলাহ আলি এবং জোনাব আলি নামক দুই ব্যক্তি এখানকার সেবাসেত ছিলেন। হাজী আনোয়ার আলী, মোহাম্মদ বদরুদ্দিন প্রমুখ এই নজবগাহের মূল তত্ত্বাবধায়ক। বর্তমানে মোহাম্মদ মনসুর আলি শাহের প্রত্যহ এখানে ধূপ-বাতি দিয়ে থাকেন। প্রতি বৎসর দোসরা কাস্তুন তাবিখের অপরাহ্নে এখানে প্রায় হাজার লোকের সমাবেশে একটি মেলা বসে। সে সময়ও ভক্তগণ হাজত-মানত-শিবনি দিয়ে পীবের প্রতি প্রদান নিবেদন করেন। মেলা শেষে কোন কোন বছরে যাত্রাগানও হবে থাকে।

## ৪। বাহু--

বাবাসত থানার অন্তর্গত বাহু একটি বর্ধিমুগ্রাম। মধ্যমগ্রাম-খড়িবেড়িয়া সড়কের ধারে প্রায় দুই শতক জমির উপর ইটেব তৈবী এই নজবগাহটি প্রাচীর দিবে সুবক্ষিত। প্রাচীরের মধ্যস্থ স্থানটিতে কিছু ফুলগাছ সাজানো। সর্বসাধারণ এখানে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি প্রদান করেন। বসন্তরঞ্জন মোদক মহাশয় নজবগাহটিকে পাকা কবে দিবেছিলেন। আশী বৎসর বয়সের স্থানীয় বৃদ্ধ শ্রীমাগনচন্দ্র মোদক মহাশয় জানালেন যে, পার্শ্ববর্তী

‘কাঠোব’ নামক গ্রামের মোহাম্মদ জমায়েত আলি ‘কান’ নামক এক ব্যক্তি এই নজবগাহের সেবাবেত ছিলেন। তার বংশের এক খোঁড়া ব্যক্তি গীব একদিল শাহের জীবন কথা স্মর-সহযোগে গেয়ে গেয়ে বেড়াতেন।

এই নজরগাহে ভক্তগণ হাজত-মানত-শিবনি ছাড়া ফল, ফুল, দুধ প্রভৃতিও দিখে থাকেন। এখানে শিবলিঙ্গের স্রাব একটি বস্ত্র আছে, আর আছে পোড়ামাটির একটি পুতুল। পুতুলটি ঘোড়ার আকৃতি বিশিষ্ট।

## ৫। বালিপুর—

বালিপুর-বজ্রবজিয়া হল বারাসত থানাব অন্তর্গত একটি মৌজা। গীর একদিল শাহেব নামে গ্রাম এক বিঘা জমির উপর এই নজরগাহটি অবস্থিত। ইটেব গাঁথুনিব উপর অশ্বখ গাছেব দ্বারা স্থানটি চিহ্নিত। এখানে প্রতি বৎসব দোলরা ফাস্তুন তাবিখে মেলা বসে। গ্রাম হাজার লোকেব সমাবেশ হয়। মেলা চলে গ্রাম পনরো দিন ধরে। সেবাবেতের নাম মোহাম্মদ হাজেব মণ্ডল (৮০)। এঁরা বংশ পরম্পরায় এখানকার সেবাবেত। হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ মোবগ বা খাসি হাজত দেন। তাছাড়া শিবনি ও মানত প্রদত্ত হয়। মেলায় পীবেব গান হয়, যাত্রাও হয়। সম্প্রতি কিছু লোক জুয়া খেলা ও টপ্পা-খেউড গানেব আমদানী করে এখানকার পবিত্রতা নষ্ট করছে বলে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হিন্দু-মুসলমান ভক্তগণ পীরেব নাম করে নিজেদের মঙ্গল আশায় তেল-পানি গ্রহণ করেন। এখানে ধূপ-বাতিও দেওয়া হবে থাকে।

## ৬। রঘুবীরপুর—

বারাসত থানাব অন্তর্গত এই গ্রামে সদর রাস্তাব ধাবে অবস্থিত নজবগাহটি ইট দিখে গাঁথা। এই গ্রামেব মাসচটক পবিবাব পীবেব স্থানটিব তত্ত্বাবধায়ক। শ্রীনবেন্দ্রনাথ কর্ণকাব মহাশয় এখানকার সেবাবেত। তিনি নিয়মিতভাবে নজবগাহে ধূপ-বাতি প্রদান করেন। জমির পরিমাণ গ্রাম এক কাঠা। এখানে কোন মেলা বসে না। বট অশ্বখ গাছেব নীচে অবস্থিত এই স্থানটি বেশ মনোবন।

## ৭। জাফরপুর—

বাবাসত মহকুমার অন্তর্গত জাফরপুরগ্রামে একটি নজবগাহ আছে। স্থানটির পবিমাণ প্রায় এক বিঘা। এখানে কোন গৃহ বা স্থতিস্তুত নেই। অথচ সেই সাদা ভূমিতে চাষ হয় না, শুধু গরু-বাছুবাদি বিচরণ করতে দেখা যায়। এখানে একটি বিশাল অশ্বখ গাছ ছিল। গাছটি বিক্রী কবে দেওয়া হয়েছে—এবং সেই অর্থ দ্বারা স্থানীয় মসজিদেব সংস্কার সাধন করা হয়েছে। এখানে ধূপ-বাতি দেওয়া হয় না অর্থাৎ দেবাব বীতি নেই। ঈদের সময় জনসাধারণ এখানে নামাজ পড়েন। পীৰ সাহেব কোন এক সময় এখানে উপাসনা করেছিলেন বলে কথিত।

## ৮। গোপালপুর—

বাবাসত মহকুমার অন্তর্গত এই গ্রামে একটি মাটির টিপি আছে। টিপিটা পীর একদিল শাহের নামে চিহ্নিত। ডাংগুলি ক্রীড়াবত রাখাল বেশী পীর একদিল শাহের হাতের গুলি নাকি এখানে এসে পড়েছিল বলে প্রবাদ আছে। এখানে ধূপ-বাতি দেওয়া হয় না, মেলাও বসে না,—কেহ কেহ মানিত দিয়ে থাকেন। জনসাধারণই এখানকার সেবায়ত্ত।

## ৯। আবদেলপুর—

বাবাসত মহকুমার অন্তর্গত এই গ্রামে দুই-তিন কাঠা স্থান জুড়ে একটি মাটির টিপি পীৰ একদিল শাহেব নামে চিহ্নিত। এখানেও ক্রীড়াবত রাখাল পীর একদিল শাহেব হাতের 'গুলি' এসে পড়েছিল বলে কথিত। এখানে ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয় না, কোন মেলা বসে না। ঈদ উৎসবের সময় ভক্তগণ আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে জীব সমর্পণ করেন এবং পরে সকলে মিলে তা বাঁটোয়ারা করে গ্রহণ করেন। উক্ত টিপিটা প্রায় আট-দশ হাত উঁচু। জনসাধারণই এই স্থান দেখা-শুনা করেন।

## ১০। পাটুলী—

বাবাসতের অন্তর্গত পাটুলীগ্রামে দুই বিঘা পীৰোত্তর জাফরগাব উপর দশ-বারো হাত উঁচু একটি মাটির টিপি আছে। সেখানকার বট ও অশ্বখ গাছেব ছায়ায়, আম ও বাঁশবাগানে ঘেবা স্থানটি কুহেলিকা-আচ্ছন্ন।

বট-অশ্বখ গাছে সহস্র সহস্র বাতুড ঝুলছে,—তাদের কাকলীতে অঞ্চলটি পূর্ণ সমাবোহে আবিষ্ট। এখানে ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয় না। তবে প্রতি বৎসর কাজীপাড়াব দরগাহে অনুষ্ঠিত উৎসবের সময় অর্থাৎ মাঘ মাসে এখানে গ্রামের বাখালগণের মধ্যে বনভোজনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই নজবগাহের সেবাস্থতগণের নাম যথাক্রমে শেখ নেসাব আলী, বিলায়েত আলি, শ্রীশনীতুঘণ ঘোষ ও বাঁকাউল্লা বিশ্বাস। এখানে পীরপুত্র নামে একটি পুকুর আছে। এখানে বাখাল বালকগণের বাৎসরিক বনভোজন উৎসবের সময় প্রায় পাঁচ-ছয় শত লোকেব সমাগম হয়। তাতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই অংশ গ্রহণ করেন। তাছাড়া বাৎসরিক উৎসবের সময় 'মিলাত' দেওয়া হয়, কোবান থেকে অংশ বিশেষ পাঠ করা হয়।

### ১১। হুমাইপুর—

পীর একদিল শাহের নামে বারাসত মহকুমার হুমাইপুবে একটি স্থতি চিহ্ন ছিল বলে শোনা যায়। পাটুলি গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধের নিকট জানা যায় যে হুমাইপুব গ্রামের সাধারণ কবর স্থানের পূর্বদিকে পীর একদিল শাহের নামে একটি স্থতিচিহ্ন ছিল। সেটাও ছোট একটি মাটির টিপি বিশেষ এবং পীরশাহের হাতের ডাং-গুলির একটি গুলি এইখানে এসে পড়েছিল। একথা সকলে ভুলে গেছেন বলে তাঁর অভিমত। সে টিপিটাও কালক্রমে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ক্রীড়াবত পীর একদিল শাহের হাতের 'গুলি' এখানে এসে পড়েছিল বলে একটি শ্লোক প্রবাদরূপে আজো ব্যবহৃত হয়।

### ১২। গোবরা—

বাংলা সবকাবেব ১২৫০ খৃষ্টাব্দের গেজেটে উল্লেখ আছে যে পীর একদিল শাহের নামে এই গ্রামে ছয়দিনের মেলা বসত। মেলাটি হত ক্ষেত্রাবী মাসে, তাতে গড়ে তিনশত লোকেব সমাবেশ হত।

### ১৩। ধলা—

বারাসত মহকুমার অন্তর্গত ধলা গ্রামে পীর একদিল শাহের নামে একটি মেলা হত বলে বাংলা সবকাবেব ১২৫০ খৃষ্টাব্দের গেজেটে লিপিবদ্ধ আছে। তাতে আবো নির্দিষ্ট আছে যে সেখানে প্রতি বৎসর মার্চ মাসে চার দিনের মেলায় তিন শতাবিক লোকেব সমাবেশ হত। সবেজমিনে ভদন্ত কবে জানা যায় যে, উপবোক্ত তথ্য স্বার্থ নন।

## পীর একদিল শাহ্ কাব্য

পীর হজ্জবত একদিল শাহ্ বাজীৰ নামে এ পৰ্বত্ত একখানি মাজ্জ কাব্য-  
গ্রন্থেব সন্ধীন পাণ্ডয়া গেছে। কাব্য খানির নামপৃষ্ঠা না থাকায় “পীর একদিল  
শাহ্ কাব্য” — এইকপ নামকৰণ কৰে নিতে হল।

পীর একদিল শাহ্ কাব্যেব বচৰিতা কবি আশক মহম্মদ ওবদে হেলু  
মিয়া। তাঁৰ বসতি ছিল হবিপুৰ নামক গ্রামে। ভণিতায় তিনি  
বলেছেন,—

আশক মোহাম্মদ কহে জোনাবে সবায় ॥

হবিপুৰ গ্রাম বিচে বসত যাহার ৷

অনেক হবিপুৰ নামক গ্রামেৰ কোন হবিপুৰে তাঁৰ বসতি ছিল তা জানা  
দুঃসাধ্য। কবির আৰ কোন পৰিচয় বিশেষতঃ বংশ পৰিচয়, জন্ম-সাল বা  
তাৰিখ প্রভৃতি জানা যায় না। তবে ভণিতাৰ তাঁৰ ভক্তি প্রণতঃ কবি হৃদয়েৰ  
স্বম্পষ্ট পৰিচয় পাণ্ডয়া যায়। যথা, —

আসক মহাম্মদ বলে একদিলেব পায় ॥

লেহু ভাই আল্লাব নাম দেলেতে সদায় \* ( ২১৫ )

কিংবা আশক মহাম্মদ কহে একদিলেব পায় ॥

আল্লা নবী বল সবে দিন বয়ে যায় ৷ ( ২১৬ )

পীর হজ্জবত একদিল শাহেব জীবনী সম্বলিত এই পাচালী কাব্যখানি  
সুঃস্থ। কাব্যখানি মুদ্রিত। আকৃতি ৭২" X ৪২"। গ্রন্থখানি এখন খুব  
সম্ভবতঃ একেবাবেই হুস্তাপ্য। আমি বাবাসতেব কাজীপাড়া গ্রামেব জনাব  
বাহাব আলী সাহেবেব নিকট থেকে কাজী আজিজাব বহমান সাহেবেব  
সহায়তায় উক্ত ছাপা পুথিখানি আবিষ্কাৰ কৰি। জনাব বাহাব আলী সাহেব  
পুস্তকখানি-হস্তান্তৰিত কৰতে বাজী না হওয়ায় আমি তাৰ নকল কৰিয়ে  
ৰেখেছি। তাৰ নাম পৃষ্ঠা নেই, সেই বৈশ কয়েকটি পৃষ্ঠা। প্রথম দিকের

তেরো পৃষ্ঠা পর্যন্ত নেই এবং শেষের দিকে একশত ছাব্বিশ পৃষ্ঠার পর খণ্ডিত।  
হেমটীক রীতিতে শব্দ সমূহ এবং সেমটীক বীতিতে পৃষ্ঠাগুলি সজ্জিত।  
কাব্যখানি নিম্নলিখিত পালায় বিভক্ত :—

১. জন্ম পালা,
২. শিক্ষা লাভ পালা,
৩. ডাকিনীৰ পালা,
৪. কাঞ্চন নগরের পালা,
৫. মুর্শিদেব পালা,
৬. হবিগীর পালা,
৭. ছুটীর পালা,
৮. বড়ুরাৰ বিড়ম্বনার পালা,

এব পৰ খণ্ডিত বলে আবো পালা ছিল বিনা জানা যায় না। এতে  
কয়েকটি ধূয়া আছে,— প্রতি অল্পচ্ছেদে আছে শিবোনামা। ভণিতার নমুনা  
এইরূপ,—

বিশেষ কাতব হৈল একদিলেব সাব ॥

বচে পুথি কবিকার একদিলেব পায় \* ( ১১২ )

অথবা,

আল্লা নবীর নাম এবে বল সর্বজন ॥

একদিলেব জন্মপালা হৈল সমাপন \* ' ১১২ )

প্রতি পালার আবেস্তে ‘পালা আবস্ত’ এবং শেষে ‘পালা শেষ’ এইরূপ  
লিখিত আছে। প্রথম পংক্তির শেষে দুই দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে  
একটি তারকাৰ চিহ্ন আছে। একই শব্দ দুইবার না লিখে কবি একটি শব্দের  
পৰ ‘২’ লিখেছেন। কাব্যটি দ্বিপদী ও ত্রিপদী ছন্দে বচিত।

প্রতি অল্পচ্ছেদের আবেস্তে ‘ধেদার্থে পয়াব’ ও ‘করুণার্থে পয়াব’ ইত্যাদি  
লিখিত আছে।

‘গীৰ একদিল শাহ্’ পাঠালী কাব্যখানি বাংলা মুসলমানী ভাষায়  
লিখিত। এতে ইংরেজী শব্দ দৃষ্ট হয় না। তবে প্রচুর আরবী, ফারসী, হিন্দী  
প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।



আববী, ফারসী ও হিন্দী শব্দের নমুনা,—

আববী :—খাতেবে, জগাব, তলব প্রভৃতি ।

ফারসী :—এষাদ, বগযানা বেহস প্রভৃতি ।

হিন্দী :—ডালিয়া, বিচে, উতাবে প্রভৃতি ।

সমগ্র কাব্যখানি বারাসত-বসিবহাটের আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত । উক্ত অঞ্চলে ব্যবহৃত বিশেষ কয়েকটি শব্দ এইরূপ :—

সাতে অর্থাৎ সাথে বা সঙ্গে

আন্তে অর্থ আনুতে বা আনিতে

লোগে অর্থ শোকে বা হুঃখে

লিয়া অর্থ নিয়ে বা লইয়া ইত্যাদি ।

বলা বাহুল্য, উক্তরূপ শব্দ সমূহ নিবন্ধব সাধারণ গ্রামবাসীই ব্যবহাব করে থাকেন ;—এ ধারা এখনও অব্যাহত আছে । এ কাব্যের আরো কয়েকটি ভাষা-বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ,—

১. অনেক স্থলে পদান্তে সমাপিকা বা অসমাপিকা জিয়া ব্যবহৃত হয়েছে;

২. বহু স্থানে বর্ণাশুদ্ধি আছে,

৩. প্রধানতঃ সাধুভাষা এবং কিছু কিছু চলতি ভাষা ব্যবহাব কবা হয়েছে,

৪. পাটানী-সুরে একাকী বা সঙ্গনে গাইবাব উপযোগী,

৫. সাধারণ ভাবে চৌদ্দ অক্ষব-বৃত্ত, কোথাও কোথাও পনেবোটি অক্ষবও ব্যবহৃত হয়েছে ।

ভাষাব নমুনা এইরূপ :—

... .. ছাড়ি যাও মোবে ॥

আস্তাব দোহাই লাগে তোমাব উপবে \*

এমত শুনিবা খিদা নিবিল উদবে ॥

একিন কবিয়া সাধন কবিতে লাগিল + ( ১১১ )

সংক্ষিপ্ত কাহিনী—

সাহানা নগরের সঙ্গাগব সাহানীব । তাঁব বিস্তবান সংসাব পুত্র-অভাবে বিবাদময় । ভদীব পত্নী আশক ছবি, পুত্র লাভের আশায় আহাব নিদ্রা ত্যাগ

কবতঃ আল্লাহ্ তালাব নামে কঠোব সাধনায নিযুক্ত। একে একে বাব বঁছব অতিক্রান্ত হল,—তিনি অচেতন হয়ে শয্যাশায়ী হলে খোদার আসন নতে উঠল। আল্লাহ্ তা'লা তৎক্ষণাৎ জিববিলকে ডাকিবে হুত্বান্ত জেনে নিলেন এবং এক লাখ আশী হাজ্জাব গীবেব মধ্য থেকে গীব একদিল শাহ্কে মানব জনম নিয়ে আশক হুবিব গর্ভে অধিষ্ঠিত হতে নির্দেশ দিলেন। এতে গীব একদিল শাহ্বেব আপত্তি ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আড়াই দিন পৰে তাঁকে কিবিয়ে আনাব আখাস দিলে একদিল শাহ্ তাতে সম্মত হলেন।

আল্লাব নির্দেশ মত 'হুলাল' নামক ফুলেব কপ ধবে একটি পাট্বেব মণ্যে থেকে 'সান' নামক নদীব জলে একদিল শাহ্ ভাসতে লাগলেন। বাত্রে স্বপ্নে তিনি আশক হুবিকে দর্শন দিলেন। প্রাতঃকালে সান নদীব ঘাটে এসে আশক হুবি সেই ভাসমান ফুলেব পাত্ৰ দেখে আনন্দিত চিন্তে সেটা ধরলেন এবং ফুলেব ভ্রাণ নিলেন। তাতেই তাঁব গর্ভ-সঞ্চাব হল। সাহানীব এ সংবাদ শুনে খুবই খুশী হলেন।

গর্ভবতী আশক হুবিব দশ মাস দশ অবস্থাব মধ্য দিবে অতিবাহিত হ'ল। বখা সময়ে তিনি পুত্র-সন্তান প্রসব কবলেন। সাহানীব মিঞা আনন্দেব আতিশয্যে 'দাই'কে দক্ষিণা-স্বকপ হাজ্জাব টাকাব ধলি দান কবলেন। আশক-হুরিও আনন্দে তাকে নিজেব গলাব হার, মাণিকেব ছড়া, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি দান কবলেন। সাহানীব ধনভাণ্ডাব থেকে লক্ষ টাকা নিয়ে ককির-বৈকবকে দিলেন। বিয়াল্লিশ বাজনা বেজে উঠল। তিনি লক্ষ টাকাব শিবনি দিলেন মসজিদে এবং বললেন,—

“এবে সে জানিহু মুই পুত্র বড ধন।”

সকলে দানে পবিতুষ্ট হয়ে সাহানীবেব পুত্র একদিল শাহ্কে আন্তরিক আশীর্বাদ কবে প্রস্থান কবল।

আনন্দ-লহরীর মধ্য দিবে একে একে আড়াই বোজ পূর্ণ হ'তে চলল। প্রতিশ্রুতিমত একদিল শাহ্কে কিবিয়ে আনাব জন্ত আল্লাহ্ তা'লা এবার খণ্ডযাজ্জ অর্থাৎ তাঁব দূতকে আদেশ দিলেন।

খণ্ডযাজ্জেব গাষে বিচিত্র পোষাক। তাঁব পাষে খড়ম, হাতে সোনার 'আশাবাড়ি'। ফকিব বেণে তিনি সাহানীবেব বাড়ী এসে একদিল শাহ্কে

দেখতে চাইলেন। আড়াই দিনের শিশুকে ঘরেব বাইবে আনতে সাহানীব স্বীকৃত নন। তাতে খওয়াজ বাগাধিত হষে সাহানীরকে নানারূপ ভীতি প্রদর্শন করতে শেষ পর্যন্ত সাহানীর তাঁব পুত্রকে ফকির সাহেবের নিকট আনয়ন কবলেন।

সকলের অলক্ষ্যে আল্লাহর নির্দেশ বিষয়ে খওয়াজ ও একদিল শাহের মধ্যে কথোপকথন হল। খওয়াজ, সাহানীবের সঙ্গে ছলনা করে পীর-সহ অকস্মাৎ অদৃশ হষে গেলেন এবং একদিল শাহকে আল্লাহর দ্বাবাবে উপস্থিত কবলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বললেন : - একদিলকে মোল্লা আতাব বাড়ীতে নিয়ে যাও। সেখানে একদিল শাহ্ কোরান পাঠ নিক্। খওয়াজ তৎক্ষণাৎ পীরকে সঙ্গে নিয়ে মোল্লা আতাব নিকট গেলেন এবং আল্লাহর দ্বাবামানের কথা আতা সাহেবকে জানালেন। আতা সাহেব ও তদীয় পত্নী, পুলকিত হৃদয়ে পীরকে অভ্যর্থনা জানালেন।

আতা সাহেবের নিঃসন্তান পত্নীব বক্ষে দুহু সঞ্চারিত হল। দুহু পোষ্য একদিল সেই দুখ পান কবে বর্ধিত হতে লাগলেন। আল্লাহর নির্দেশ মত সেখানে তিনি কোরান পাঠ নিলেন।

এদিকে ফকির-রূপী খওয়াজকে অকস্মাৎ অদৃশ হতে দেখে সাহানীবের মাথায় বেন বজ্রাঘাত হল। তিনি চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। হুঃসংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে সকলে হাহাকার কবতে লাগল। আশক ছরি পাগলিনীব জ্বর বাড়ীর মধ্যে ভুমূল কাণ্ড আরম্ভ কবলেন। সাহানীব মাটিতে মাথা কুটলেন, চাদর ছিঁড়ে কোপিন পরলেন, দুর্গন্ধ কাঁথা ছিঁড়ে গলায় বাঁধলেন, সারা অঙ্গে চুন-কালি মেখে হাডের পুটুলি ও কালো হাঁড়ি হাতে নিয়ে পুত্রের সন্ধানে পথে পথে এগিয়ে চললেন। তিনি বহু স্থান ঘুরে অবশেষে এলেন সমুদ্রশালী কাঞ্চনা-নগরে।

কাঞ্চনা নগরের রাজা ছত্রজিতেব একমাত্র কন্যা ডাকিনী হলেন সেই রাজ্যের প্রচালিকা। তিনি পবমা সুন্দরী। তিনি একাগ্রমনে কোরান পাঠ করেন। তাঁর রাজ্যের বাজকর্ষ কেবল নাবী কর্মী দ্বারা সম্পাদিত হয়। সেই স্থানকে তাই লোকে বলে 'জীমা পাটন'।

ডাকিনী ইতিপূর্বে সাহানীবের স্বপ্নে দেখে তাঁর প্রতি অল্পরক্তা হয়েছিলেন। তিনি মনে মনে নিজেকে সাহানীবের প্রতি সমর্পণ কবে বিবাহের আকাঙ্ক্ষায়

প্রতীক্ষা কবছিলেন। সাহানীবের আগমন-বার্তা শুনে তিনি খুশী হয়ে ‘নর্জুম’ অর্থাৎ গণৎকাবকে ডেকে পাঠালেন।

গণৎকাব গণনা কবে জানালেন যে ইনিই ডাকিনীই ইঙ্গিত সেই সাহানীর। ডাকিনী জিজ্ঞাসা কবলেন,—সাহানীব তো পুত্রশোকে পাগল প্রায়, তাঁকে কবায়ত্ত কবাব কৌশল কি। গণৎকাব ডাকিনীকে সখিগণ-পবিত্রতা এবং বহ্নাভবণে বিভূষিতা হয়ে সাহানীবকে ভুলাতে পবামর্শ দিলেন। ডাকিনী সেই পবামর্শ অমুযায়ী একাগ্র প্রচেষ্টায় সবলকাম হলেন। সাহানীবের সঙ্গে তাঁব বিবাহ হল। সাহানীব কান্দনগরের রাজা বলে বিবোধিত হলেন। রাজদম্পতিব মহানুষ্ঠে দিন কাটতে লাগল।

এদিকে পুত্রহাবা জননী আশক হুবিব হুঃখে তদীয় সখিষব রূপি ও জিবা এবং সমগ্র প্রকৃতি যেন কাঁদতে লাগল। বিবির কন্দন শুনে গাভীব গর্ভেব বাহুব নড়ে উঠল, বৃক্ষেব পাতা ঝবল, পাষণ গলে গেল, বৃক্ষ-লতা এমনকি পশু-পাখী কাঁদল। আশক হুবি বললেন,—

“মবিব মরিব জিবা মবিব নিশ্চয়।”

তিনি আত্মহত্যার জন্ত খরশ্রোতা “সান” নদীতে ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু সে নদীব পানি শুকিয়ে গেল। এগিয়ে গেলেন বিষব সাপেব মুখে, কিন্তু সাপ তাঁকে দংশন না করে চলে গেল। গভীর জঙ্গলেব দাবায়িতে ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু আগুন নিভে ‘পানি’ হয়ে গেল। হিংস্র বাঘের মুখে এগিয়ে গেলেন তিনি, কিন্তু বাঘ বরং এসে তাঁকে ‘সালাম’ জানিয়ে প্রস্থান করল। অনাহাব, অনিশ্রা ও অত্যধিক ভ্রমণে যখন তাঁব মৃত্যুদশা উপস্থিত হল তখন খোদাব আসন আবার টলল। আল্লাহ্ তা’লা ঘটনা জানতে পেবে খণ্ডযাজকে ডাকিয়ে আনালেন। তিনি পীব একদিলকে অবিলম্বে সাহানা নগবে ফিরিয়ে আনতে খণ্ডযাজকে আদেশ দিলেন। খণ্ডযাজ সেই আদেশ অমুযায়ী যোদ্ধা আতার ঘর থেকে একদিলকে এনে তাঁব মাতা আশক হুবিব নিকট হাজির করলেন।

আশক হুবি প্রথমে পুত্র একদিলকে চিনতে পারলেন না। পরে পরিচয় পেয়ে তিনি ক্ষোভে, অভিমানে ব্যথিত হয়ে বললেন,—

একধার দুখ মাযেব শুধা নাহি বায ॥

শত শত মসজিদ দিলে সমান না হয় \* ( ১৮৭ )

পীর একদিল মনে ব্যথা পেয়ে গলবস্ত্র হয়ে মাথের কাছে কমা চাইলেন এবং পা জড়িয়ে ধবে কাঁদতে লাগলেন। মা এবাব পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন, চারিদিকে নেমে এল আনন্দের জোয়ার! আশক ছুরি আপনার হাতে 'খানা' তৈরী করে পুত্রকে খাওবালেন এবং পবে মাতা-পুত্র একত্রে শয়ন কবলেন। একদিল শাহ্ পরম আদবে মাতাব গলা জড়িয়ে ধবে গভীর স্নেহে নিদ্রাভিত্ত হয়ে পড়লেন।

প্রভাতে কোকিলের ডাকে পীরেব ঘুম ভেঙে গেল। বাজে স্বপ্নে পিতাকে দেখা অবধি তাঁর মন বিষন্ন হয়ে আছে। মাতার নিকট তিনি পিতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে আশক ছুরি আত্মপূর্বিক সমস্ত বেদনাপূর্ণ ঘটনার কথা বিবৃত করলেন। পীর তৎক্ষণাৎ ধ্যানে বসে পিতাব বর্তমান অবস্থান ও অবস্থা জেনে নিলেন এবং তাঁকে কিরিয়ে আনবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

একদিল বললেন :—আমি পিতাকে কিরিয়ে আনতে যাব। মাতা প্রথমে পুত্রকে কাছ-ছাড়া করতে রাজী হন নি কিন্তু পবে অহুমতি দিলেন।

পীর একদিল গঙ্গাতীরে এসে গগন মণ্ডল, গঙ্গাদাস এবং আরো অনেককে ডেকে নৌকা আনতে বললেন। তাঁর আদেশে অহুসারে মধুকর, চন্দ্রসেন প্রভৃতি সাতখানি নৌকা যাত্রাব জন্ত প্রস্তুত করা হল। মাতার আশীর্বাদ নিয়ে তিনি একজন ফকিরের বেণে যাত্রা কবলেন। আশক ছুরি অনেক দুঃখে অনেক বেদনায় পুত্রকে বিদায় দিলেন।

নৌবহব ভেসে চলল,—লসমানপুরি, কাকুরাই, টুঙ্গিপুৰ প্রভৃতি কত নগর কত জনপদ পার হয়ে এসে উপস্থিত হল কাঞ্চনা নগরে। মাঝি-মাল্লারা ডাকায় নেমে রন্ধন-উপচার সংগ্রহে ব্যাপৃত হল। তাঁদের আগমনে কাঞ্চনা নগরের চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। দলে দলে লোক এসে হাজির হল তাঁদেরকে দেখবার জন্ত। সকলে দেখল,—

পূর্ণিমার চন্দ্র জিনে একদিল বরণ ॥

ববির কিরণ নহে তাহাব সমান \*

একদিল গলে বস্ত্র দিয়ে জোড় হাতে পিতাব সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।  
- সাহানীব প্রথমে পুত্রকে চিনতে পাবলেন না। পরে সমস্ত বিবরণ শুনে তিনি দ্রবীভূত হলেন এবং আনন্দাতিশয্যে কেঁদে ফেললেন। পিতা-পুত্রের মিলন হল।

পিতা-পুত্র একাসনে আহাবে বসলেন। একদিল অহুবোধ জানালেন পিতাকে দেখে ফিবে বাবাব জন্ত। পিতা তাতে সন্তত হলেন এবং পুত্রকে সঙ্গে কবে ডাকিনী'ব নিকট গেলেন।

ডাকিনী ছিলেন বাজদরবাবে। তিনি একদিলেব পবিচষ পেযে চমৎকৃত হলেন এবং তাঁদের প্রস্তাব শুনে বললেন,—

তুমি তো জান না স্বামী নাবীর গোসাই ॥

স্বামী বিনা নাবীদেব কোন লক্ষ্য নাই \*

অবশেষে ডাকিনী পীতাম্ববী শাড়ী পবে, অস্ত্রান্ত অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে স্বামী ও সতিন পুত্রের অহুগামিনী হলেন। সতিন সম্পর্কে উৎকর্ষা ছিল ডাকিনী'ব। একদিল তার নিবসন কবলেন। ডাকিনী নৌকায় আরোহণ কবে পুত্রকে কোলে নিষে বসলেন। নৌবহব বঙ্গনদী, গোবা নদী, বেলপুর, সপ্টরাজ প্রভৃতি পশ্চাতে কেলে এসে উপস্থিত হল গন্তব্যস্থলে।

আশক হুবি অবীর আগ্রহে একদিলের প্রত্যাগমনেব পথ পানে চেয়ে রোমন করছিলেন। দু'থেকে একদিলকে আসূতে দেখে তাঁর দেহে যেন নতুন প্রাণেব সঞ্চার হল। পীর এবাব মাতাব নিকট এসে পিতা ও সতিন ডাকিনী'ব আগমন বার্তা জানালেন। সতিনকে আনুবাব জন্ত যদি অভিযোগ করেন তাই পূর্বেই তিনি মাতাকে জানালেন,—

গুণাগার হব তবে আল্লার দববাবে \*

আশক হুবি জানালেন, তুমি কিবেছ তা-ই আমার ষথেষ্ট। তোমাব পিতাকে যিনি সধত্বে বেখেছিলেন তিনি আমার ভগিনী, তিনিও আমার প্রাণাধিক।

আশক হুবি ও ডাকিনী দুই ভাগিনী'ব স্ত্রাষ পবস্পর পবস্পরের নিকট আদান-প্রদান কবলেন।

পুত্রের আবেদনে মাতা আশক হুবি বিনা আগুনে খানা প্রস্তুত কবলেন। আশক হুবি,—

কোলে কবি ডাকিনী'ব ধোওবাইল হাত ॥

দুই বহিন একাস্তরে বসে খায় ভাত -

তাবপর তাঁরা সকলে নিজ নিজ কক্ষে নিজার উদ্দেশ্যে গমন কবলেন।

বাত্রে স্বপ্নে আল্লাহ্‌ তালার নির্দেশ হল পীর একদিল চট্টগ্রামে গিয়ে মুর্শিদেব সেবায় নিযুক্ত হোক। প্রভাতে নিজাভঙ্গ হলে একদিল চট্টগ্রামে যাবার উদ্যোগ কবলেন। এতখবর রটে গেল দ্রুত গতিতে। চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে এল। আশক ছবি পবেব বাত্মিতে একদিলকে পাহাৰা দিবে আটকে রাখতে চাইলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিত্ৰাভিত্ত হযে পডায পীব গৃহত্যাগ করে চট্টগ্রাম অভিমুখে বাত্ৰা করলেন।

চট্টগ্রামে এসে পীর একদিল শাহ্‌ দেখেন যে বদর পীব, বাখাল বালক রূপে অত্ৰান্ত রাখালদের সঙ্গে খেলা কবছেন। রাখাল বালক বলে তাঁকে একদিল শাহ্‌ উপহাস করায় বদরপীব অকস্মাৎ অদৃশ হযে গেলেন। একদিল শাহ্‌ অনেক অত্ৰুসন্ধান করেও বদরপীবকে দেখতে পেলেন না। তিনি সন্ধ্যা নামক এক ব্যক্তির বাড়ীৰ নিকট কবর নিষেছেন বলে জানতে পাবলেন। সাথে সাথে একদিল গেলেন সন্ধ্যার বাড়ী এবং সন্ধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে বদর পীবের সেই কবরে গেলেন। সেখানে বদর পীরের সাক্ষাত পাওয়ার জন্য অনেক বোদন করলেন কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না। কবর খুঁড়ে দেখেন পীরের দেহ গলিত শবে পরিণত হযেছে। সিন্ধুকে সেই গলিত দেহকে ভরে নিষে মাখায করে পীর একদিল ভ্রমণ করতে লাগলেন। অনাহাবে অনিদ্ৰায় একদিল মরণোন্মুখ হলেন। অবশেষে তিনি মরবার জন্য আশুনে বাঁপ দিলেন, কিন্তু হায। আশুন ফুল হযে গেল।

এবার বদরপীর সদয হলেন। তিনি একদিলকে দর্শন দিলেন। সমস্ত বিবরণ শুনে তিনি একদিল শাহ্‌কে মুবিদ করে নিলেন এবং দীক্ষা দিলেন ;—

ফকিরেব বত হদ বদর কাছে ছিল ॥

সকলি একদিল তরে সা বদর দিল \* ( ১১৪৪ )

গুরু শিষ্যে একত্রে ছযমাস থাকার পর একদিল শাহ্‌ গুরুব আশীর্বাদ নিয়ে বিদায় হলেন।

পীর একদিল শাহ্‌ চলার পথে এসে হাজির হলেন এক গভীর অরণ্যে। সেখানে এক হবিণী তার আড়াই দিবসের ছুটি শিশু সন্তানকে নিষে বাস কবছিল। পিপাসার্ত হয়ে হবিণী জন পান কবতে কালিন্দী নদীতে গেলে,

রাজা নছিরাম সেখানে শিকাবে এসে স্বধোগমতন হবিগীকে বন্দী কবেছিলেন। হবিগীর শিশুদ্বয় মাকে দীর্ঘক্ষণ না দেখে কেঁদে আকুল হল। এমন সময় তারা দেখতে পেল পীর একদিল শাহকে। তাবা কেঁদে গিয়ে পডল পীরের পায়ে। পীর তাদের মাকে উদ্ধার করে দেবার কথা দিলেন। সেজন্তে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজবাটী-অভিমুখে রওনা হ্লেন।

ব্রাহ্মণ বাজা নছিরাম অতি দুর্দান্ত প্রকৃতিব লোক। তিনি মুসলমানের মুখ দর্শন করেন না। একদিল শাহ্ বাজবাটীতে এসে জিগীর ছাড়তে নছিরাম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্লেন। পীবকে বন্দী করাব জন্ত তিনি কোটালকে আদেশ দিলেন। বল্লেন, পবদিন কাছাবীতে এনে তাঁকে হত্যা কবা হবে।

কোটাল গিয়ে পীরকে বন্দী কবে আন্ল এবং তাঁকে হাতে কড়া, পায়ে বেড়ী, গলায় জিঞ্জিৰ ও বুকে পাষাণ চাপা দিযে বন্দীশালায় সেই হরিগীব বয়ে আবদ্ধ করে বাখল। কিন্তু পীর একদিল আল্লাব কুপায় বন্ধন মুক্ত হয়ে নিজ দেহ-জ্যোতিতে কাবাগার আলোকিত করে অবস্থান কবতে লাগলেন।

পরদিন ষথাসময়ে বাজসভা বস্ল। রাজার আদেশে ফকিরকে 'আন্তে কারাগারে গিয়ে কোটাল, পীরেব'সে অপকণ কণ দেখে মুর্ছিত হয়ে পড়ল। সংবাদ শুনে রাজা নিজে গেলেন কারাগারে। রাজাও সে দৃশ্ত দেখে তো অবাক। তিনি ব্রাসে জোড় হস্তে বল্লেন,—

ক্ষমা কব অপবাধ কবিয়াছি ভাবি \*

পীর সদয় হলেন এবং রাজাকে অনেক বিষয়ে উপদেশ দিয়ে হরিগীর মুক্তি চাইলেন। রাজা প্রথমে তাতে স্বীকৃত হলেন না। পবে হবিগীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিবিষে দেবার প্রতিশ্রুতিতে বাজা তাকে মুক্ত করে দিলেন। নির্দিষ্ট সময় পাব হতে না হতে দেখা গেল, হরিগী তাব শিশু সন্তানগণকে দুখ খাইয়ে ষথাসময়ে ফিরে এসেছে। রাজা তখন গভীব ভাবে পীর একদিল শাহের মহত্বের পরিচয় পেলেন। তিনি কেঁদে এসে পডলেন পীরের পায়েব ওপর। পীর তখন নছিবামকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। নছিবামের মুসলমানী নাম হল দিন মামুদ।

দিন মামুদ লক্ষ টাকা খবচ কবে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে দিলেন, আঠারোটি খাসি কোরবানি কবে পীরেব নামে শিবনি দিলেন, এবং শিরনি



আহা! রেব পব গীত শব্দ কবলে বাজা নিজ হাতে তাঁকে চামবেব সাহায্যে বাতাস দিতে লাগলেন।

রাত্রি প্রভাত হল। গীত গাত্রোত্থান কবলেন। নামাজ সমাপ্ত কবে বাজা তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। এবাব গীত একদিল, বাজাব কাছে বিদায় চাইলেন। রাজা বললেন, —এ বাজ্য আপনাব,—আপনি এখানে থাকুন। রাজাব অন্তর্বোধ রক্ষা না করে তিনি বললেন,

ভেরা বাজ্যে নাহি প্রযোজন ॥

পৃথিবী জুড়িব। রাজ্য দিছে নিরাশন \*

রাজা দিন মামুদের বাজত্ব থেকে বিদায় নিয়ে সাদা মাছিব রূপ ধবে একদিল গীত উড়ে এসে উপস্থিত হলেন আনোয়াবপুর পবগণায়।

আনোয়াবপুর পবগণায় এসে গীত একদিল শাহ্ এক বালক-ফকিবেব কণ ধাবণ করলেন। এখানকাব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করল। আনোয়াব-পুরেব অধিকর্তাব নাম ‘মন্দির’ বাব। ধনধান্তে পূর্ণ তাঁব রাজত্বে জুখ বিনা কেউ দুঃখ জানে না। ভিক্ষুক দেখলে তাকে কেউ ভিক্ষা দেয় না পরন্তু লাঠি নিয়ে তাড়িয়ে-দেয়। গীত একদিল শাহ্ ভিক্ষাব ছলে লোক চবিত্ত জানতে চাইলেন। কোথাও তিনি ভিক্ষা না পেয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত হবে পথি-মধ্যে রাখাল-গণকে জিজ্ঞাসা করলেন,

‘বল এথা আছে কি মোমিন মুসলমান \*’

বাখাল বালকগণ তাঁকে সেখানকাব ছুটি মণ্ডলেব বাড়ীতে বাবাব পরামর্শ দিল। তারা ছুটি মণ্ডলেব গুণবতী পত্নী ‘সম্পতি’ নামী মহিলাব অতিথি-পরায়ণতা ও ধর্মপ্রাণতাব কথাও বলল।

বেলা তখন দুই প্রহর, ছুটি মণ্ডল গেছেন বাজদবাবাবে। এমন সময় গীত একদিল, ছুটি মণ্ডলেব বাড়ীতে উপস্থিত হবে ‘সম্পতি’ব নিকট নিজের ক্ষুধাব কথা জানালেন। নিঃসন্তান সম্পতিব নাবীজদয বেদনায় ব্যাকুল হল। সম্পতি জানতে চাইলেন সেই রাখাল বালকেব গরিচব। বালক জানালেন যে তাঁব কেউ নেই। কোন মুসলমান তাঁকে বাখালরূপে রাখলে তিনি সেখানে থাকবেন। পুনর্বায় তিনি তাঁব ক্ষুধার কথা জানাতে সম্পতি সহানুভূতিতে মনে মনে কেঁদে

ফেললেন। সম্পতি তৎক্ষণাৎ তাঁকে ‘অজু’ কবাব ‘পানি’ দিলেন এবং বিশ্রাম কবতে বলে খানা প্রস্তুত কবতে গেলেন।

পীর একদিল সেখানে অবস্থান না কবে অন্তর্যমিকে এগিষে চললেন। তিনি পথি-মধ্যকার এক শুক্ক কদমতলাষ এসে থামলেন এবং সেখানে বসে আল্লাহতালার প্রতি প্রার্থনা কবতে লাগলেন।

‘সম্পতি’ কীর প্রস্তুত কবে ফকির বালকের সন্ধানে এসে দেখেন যে বালক সেখানে নেই। অনেক অনুসন্ধানেও তাঁকে পাওয়া গেল না। এমন সময় ছুটি মণ্ডল বাজ-দববাব থেকে এলেন ফিবে। তিনিও বিষয়টি অবগত হলেন। শুনেই তিনি ব্যথিত হলেন। সে বাতে ছুটি মণ্ডল কিছু অতিথি সংকাব কবলেন এবং আপনাব শয্যা ত্যাগ কবে ভূমাসনে বাজি যাপন কবলেন। সম্পতিও অভুক্ত অবস্থায় কান্দতে কান্দতে অঁচল বিছিয়ে মাটিতে শয়ন কবলেন।

সে বাতে স্বপ্নে পীর ও সম্পতিব মধ্য একবার সাক্ষাতকাব হল।

পবদিন দেখা গেল বাজ-দববাবে হিসাবেব খাতায় ছুটি খাঁব নামে বাইশ হাজাব টাকা বকেয়া বযেছে। তা দেখে ছুটি খাঁব প্রতি দীর্ঘ-পবায়ণ জনৈক ব্রাহ্মণ দেওয়ান, সেবেস্তাব কাগজ-পত্র লুকিষে ফেললেন। এদিকে পীর একদিল শাহেব ইচ্ছায় ছুটি খাঁব বিরুদ্ধে প্রজাগণেব মধ্যো অসন্তোষ দেখা দিল। প্রজাগণ এসে ছুটি খাঁব বিরুদ্ধে বাজদববাবে নালিশ কবে গেল। তাঁব অপরাধ এই যে তাঁবই বড ভাই বড় মণ্ডল নাকি তাদেবকে খুব অত্যাচার কবেছে।

রাজা, ছুটি খাঁব সমস্ত কাজ খুব সন্তুষ্ট। তা ছাড়া তিনি নানা কারণে ছুটি খাঁব নিকট রতজ্জ। তাই তিনি নিবপবাধ ছুটি খাঁব উপব কঠোব হতে পাবছেন না। তাতে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হযে দববাব ত্যাগ করল। বাজা অগত্যা প্রজাগণেব সহষ্টি বিধানেব জন্ত ছুটি খাঁকে বেঁধে আনতে কালু কোটালকে আদেশ দিলেন। কালু কোটাল সে আদেশ পালন কবতে ছুটি খাঁব বাডী গেল। তাকে দেখে সকলে বিশ্বযে হতবাক হযে গেল। পূর্ব দিনে বাইশ হাজাব টাকা জমা নিখে দেওয়াব পবে কি ভাবে বকেয়া পডতে পাবে তা ছুটি খাঁ ভেবেই পেলেন না।

কালু কোটালের সাথে হাত বাঁধা অবস্থায় ছুটি খাঁ চলেছেন বাজ দরবারে। গ্রামবাসীগণ বলতে লাগল,—আনোবাবপুবে তো ছুটি খাঁব কোন শত্রু

নেই,—তবে তাঁর আজ এ দশা কেন? গ্রামের বসন্তীগণ বড়ু খাঁর অসদাচরণ শ্রবণ করে বলল,—বড়ুয়ার যদি এমন দশা হত তবে বড়ই ভাল হত।

রাজ দরবারে বন্দী অবস্থায় বাওয়ার পথে ছুটি খাঁ একটি শুক কদম বৃক্ষের তলে এক বাখাল বালককে দেখতে পেলেন। পিতৃ-স্বলভ বাৎসল্যে ছুটি খাঁ তাব কাছে গেলেন এবং তাব পবিচয় নিবে জানতে পাবলেন যে সে বালক কোনও মুসলমান পবিবাবে মেহনত প্রদানের পরিবর্তে থাকতে চায়। ছুটি খাঁ তৎক্ষণাৎ সেই বালককে গ্রহণ কবতে সম্মত হলেন।

বালক এবার ছুটি খাঁর বন্ধন দশাব কথা জানতে চাইলো। ছুটি খাঁ তাঁর বন্ধন দশাব আত্মপূর্বিক ঘটনা বালককে বললেন। সব শুনে বালক জানালো যে তিনি যদি গীত একদিল শাহের নামে শিরনি দিতে প্রতিশ্রুত হন তবে অবশ্যই তাঁর মুক্তি আসান হবে। ছুটি খাঁ তা কবতে প্রতিশ্রুত হয়ে রাজ দরবারে গেলেন।

পীরের অলৌকিক ক্ষমতায় রাজ-দরবারের খাতায় লেখা বকেয়া উত্তল হয়ে গেল। খাতার বকেয়া উত্তল দেখে রাজা তো অবাক। লজ্জায় তিনি মাথা হেঁট কবলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিজের মাথার পাগড়ী খুলে ছুটি খাঁর মাথায় পবিষে আলিঙ্গন কবলেন।

ছুটি খাঁ হঠাৎ মনে রাজ দরবার থেকে কিবে এলেন সেই বালক যেখানে ছিল সেখানে। কিন্তু কি আশ্চর্য! সে শুক কদম বৃক্ষ গেল কোথায়! তাঁর পরিবর্তে সেখানে সতেজ ডালপালায় স্ত্রশোভিত কদম বৃক্ষ এলো কি কবে! সাত বৎসরের বালকই বা এই মুহূর্তে কিরূপে বাবে! বছরের কিণোব হলো! তিনি আকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন।

দয়ালু গীত এবার নিজেই ধব! দিলেন এবং পুনর্বার সাত বৎসরের বালকের রূপ ধবে ছুটি খাঁর বাড়ী গেলেন। এব পবণ গীত নানাকপ পবীক্ষার দ্বারা ছুটি খাঁর ভক্তিব বিপুলতা যাঁচাই করতে চাইলেন।

ছুটি খাঁর ভাই বড়ু খাঁর বড় আশা,—নিঃসন্তান ছুটি দম্পতির মৃত্যুর পর সমস্ত ধন সম্পদ সে একাই ভোগ করবে। পোস্তপুত্র বাখাল বালকের উপস্থিতে সেই আশা-ভ্রমের আশঙ্কা বড়ু খাঁ হিংস্র হয়ে উঠল। তাই সে গরু চবাঁচাব অজুহাতে বনের মধ্যে লাঠির ঘাবে অথবা অন্ধরূপে নিজেপ ক'বে বালক গীতকে হত্যা কবতে মনস্থ করল।

অন্তর্ধামী পীর এ সবই জানতে পাবলেন। তিনি পবদিন গো-পাল নিয়ে মাঠে চরাবাব জন্তু চলেছেন। পথে অনেক বাপাল বালকেব সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তাদের সঙ্গে তিনি উখ্‌ডা নামক বনে এলেন। সেখানে গো-পাল ছেড়ে তিনি বাখাল বালকগণের মাঝে ক্রীড়ায় রত হলেন। সকলে একদিল শাহের নিকট বাব বাব পবাজিত হল। মনে মনে তাবা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁব সাথে আব খেলতে রাজী হল না। একজন রাখাল বিক্রপের স্ববে মন্তব্য করল : একদিলেব নিশ্চয় ভোজ বাজাব হাঙ্ক-বিজা জানা আছে। বিক্রপের জবাব দিতে একদিল শাহ্ অনেক বিচিত্র বাঘের সমাবেশ করলেন। সেইসব বাঘের নাম,—খালদৌডা, হালিষা, নিহালা প্রভৃতি। রাখালগণ ভয়ে এবার পীবেব কাছে আত্ম-সমর্পণ কবল। পীব তাদেরকে কষেকটি বাঘ-তামাশাও দেখালেন।

এইসব ঘটনার কথা বড়ু খাঁব কানে গেল। সে ক্রুদ্ধ হলো এবং পীরের সাথে কিছু অসদ্‌ আচরণ কবল। পীর সেদিকে দ্রক্ষেপ করলেন না। বরং তিনি নানা প্রকাবে ছুটি খাঁ ও তদীয় পত্নী সম্প্রতিব বিশুদ্ধ ভক্তিব পবীক্ষা কবে খুসী হলেন।

পীব একবাব গো-পাল নিয়ে গেলেন কদমতলিব বনে। সেখানে তাদের চরাতে চবাতে দেখতে পেলেন ফসলে পবিপূর্ণ এক ধান-খেত। ধান-খেতেব মালিকেব নাম কুডব শাহ্। তিনি দক্ষিণ আনোয়ারপুরে বাস করেন। সেই জমিব মালিক কুডব শাহ্‌কে দেখবার জন্তু তিনি এক কৌশল অবলম্বন কবলেন। পীব সেই ধানগাছ গক দিয়ে খাওয়ালেন।

ফসল ক্ষতিব সংবাদ গেল কুডব শাহের কাছে। কুডব শাহ্ নিজে এসে একদিল শাহকে তিরস্কার করলেন। একদিল শাহ্ বিনীতভাবে জানালেন যে তাঁব অত্যায হযেছে, তাঁকে ক্ষমা করা হোক। কুডব শাহ্ বড়ুয়াব বিডম্বনার কথা শ্রবণ কবে একদিলকে লাঠি ছাবা মাৰতে গেলেন। একদিল দৃঢ়তায় তাবও প্রতিবাদ কবলেন। তখন কুডব শাহ্ লাঙল কাঁধে নিয়ে রাজ দরবারে অভিযোগ পেশ কবলেন।

বাজা ক্রুদ্ধ হয়ে একদিলেব পালক ছুটি খাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ কবলেন। ছুটি খাঁ বুঝলেন,—এটি পীরেরই লীলা।

গীত একদিল এসব ধ্যানযোগে জেনে অদৃশ্যভাবে চলে গেলেন লক্ষ্মী দেবীর নিকট। লক্ষ্মী দেবী তাঁকে সাদবে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর আগমনের কাণ্ড জানতে চাইলেন। ধান খেতেব ঘটনাটি বলে এ ব্যাপারে গীত চাইলেন লক্ষ্মীর সাহায্য। লক্ষ্মী সানন্দে তাঁকে সাহায্য কবতে চাইলেন। বিলম্ব না করে রথ-যোগে উভয়ে গেলেন ইন্দ্রের কাছে। ইন্দ্র তাঁদের অভীক্ষা জানতে পেবে সেই জমিতে বাবি বর্ষণ কবলেন।

গীতের দোষাব আৰ লক্ষ্মীৰ ববেতে ॥

যেমন আছিল ধান হইল সেই মতে ৷

পবদিন বাজ দিবাবে বাদী-বিবাদী উপস্থিত হল। গীত একদিল শাহ ও উপস্থিত হলেন। ফসলের ক্ষতি হয়নি বলে একদিল শাহ দুট অভিমত প্রকাশ কবলে বাজা তা সবেজমিনে তদন্ত করাৰ জন্ত চাঁদ খাঁ, মনোহর খাঁ, শুকদেব ও নবহবি নামক চাব ব্যক্তিকে পাঠালেন।

তদন্তকারীগণ এসে দেখলেন যে শস্তের কোন ক্ষতি হয় নি। বাজদিবাবে কিবে তাঁরা যথার্থ বিবরণ দিলেন। সকলে তো হতবাক। বাজা তখন একদিল শাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবলেন এবং ছুটি খাঁ পাষেব বেড়ী কুড়র শাহের পাষে পরাতে আদেশ দিলেন। ছুটি খাঁ, একদিল শাহকে কোলে নিয়ে, বাজ-প্রদত্ত ঘোড়ায চড়ে গৃহে কিবে এলেন। পথিমধ্যে বড়ু তাঁকে কটু কথা বললে ছুটি খাঁ বড়ুকে জুতা দিয়ে প্রহাৰ কবলেন।

জুতাব প্রহাৰ পেযে জোৰে বড়ু চলে গেল বস্তব বাড়ী। পবদিন সে গেল রাজদিবাবে ছুটি খাঁ বিক্কে নাশি কবতে। বাজা পূর্বেই বড়ুর কুকীর্তির কথা শুনেছিলেন। বাজা তখন মহাপাত্রকে ডাকিয়ে বড়ু ও ছুটিব সম্পত্তিভাগাভাগিৰ ব্যবস্থা কবে দিলেন। ভাগ বাঁটোযাবাৰ জন্ত সমস্ত মাল-পত্র ঘবেব বাইবে আনা হল। (পুঁথি এখানেই থগিত হয়েছে)।

গীত হজবত একদিল শাহ বাজীব চবিত্তকেন্দ্রিক এই স্রব্হং পাচালী কাব্যের আবস্তে বিশেষতঃ জগন্নাথ আল্লাহ-সাহায্য প্রচাবিত হয়েছে। শিক্ষালাভ পালাও আল্লাহ্-সাহায্য-জাপক। ডাকিনীৰ পালাৰ বাজকতা ডাকিনীৰ কথা, কাঞ্চন নগবেব পালাৰ সাহানীৰ ও ডাকিনীৰ প্রণয় কথা,

মুবাশিদেব পালায় বদব পীবেব মাহাশ্বা-কথা, হবিগীৰ পালায় ও ছুটি'ব পালায় ইসলাম এবং একদিল শাহেব মাহাশ্বা-কথা লিখিত হযেছে। এ সবেব ওপবে বস বিচাবে কাব্যখানি বাৎসল্য বসেব উজ্জল দৃষ্টান্ত।

জন্মপালায় পুত্ৰেব জন্তু আল্লাহ তালাব নিকট আশক হুবিব যে আকুল প্রার্থনা তা প্রত্যেক সন্তানকামী মাতাব মৰ্মকথা। পুত্ৰ-বিহনে তাঁব জীবনই বুখা,—পুত্ৰ বিহনে ধনবান সাহানী'ব সদাগবেব সংসার নিদাক্ষণ বিষাদাচ্ছন্ন। পুত্ৰহাবা ও স্বামীহারা আশক হুবিব বাব বছবেব সাধনায যে দশা হযেছিল তার বিববণ কৃষ্ণ-বিরহিনী শ্রীবাধাব দশ দশাব কথা শ্রবণ কবিষে দেয। এই পালায় চণ্ডীমঙ্গল বা ধৰ্মমঙ্গল কাব্যাদর্শে দেব-শিশু'ব মৰ্তে আগমনেব জ্ঞায আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে পী'ব একদিল শাহেব মৰ্তে জন্ম গ্রহণ বুভাস্ত বযেছে। এই পালা আবে শ্রবণ কবিষে দেয গৰ্ভবতী নাবী'ব দশমাসেব দশ অবস্থার কথা। নাবীগণের পবিষেয যে সব গহনাব বিববণ এই কাহিনীতে দেওয়া হযেছে সেগুলি উল্লেখযোগ্য। যথা,—গলাব হাব, স্তবর্ণেব মালা, কানেব জন্তু স্তবর্ণেব কলি, স্তবর্ণেব চাদব, মাণিকের ছড়া, ব্লুমকা, তোড়া, হাসলি, মাদলি, বাজুবন্ধ, পাসলী, অঙ্গুরীয়, কোমবেব বহলতা, স্তবর্ণেব কহন, সিঁতাপাটি, শাড়ী, সিন্দূব, কাজল প্রভৃতি। এই অংশে অলঙ্কার-বহুল দুটি পংক্তি এইকপ,—

চন্দনেব বিন্দু দিল সিন্দূবেব কোলে॥

চন্দ্রমা উদয যেন গগন মণ্ডলে - (১১৭)

শিকলাভ পালায় দেখা যায় আল্লাহ্ তা'লা আপন-মাহাশ্বা বিবৃত কবছেন,—

এলাহি বলেন খোণাজ শোন মেবা ঠাই॥

ত্রিভুবনেব লক্ষ্য আমি আমাব লক্ষ্য নাই \*

কে বুঝিতে পাবে খোণাজ আমার চবিত্র॥

মহুশ্র মবে মহুশ্র কান্দে সে হয পবিত্র \*

দয়া মায়া থাকিত যদি মেবা শবীবেতে॥

হুনিযাব কাববাব পাবি কি বানাতে \*

দয়া হইতে যদি আমি জ্বি'বাই নযান॥

ধান খান হইয়া পড়ে জমিন আছমান \* (১২০, ২১)

মাতা-পিতার সঙ্গে পুত্রের বিচ্ছেদের দর্শন যে মর্মবিদারক অবস্থা সৃষ্টি হয় সেই ককণ চিত্র এখানে প্রকৃষ্টরূপে অঙ্কিত হয়েছে। পীবেব সে কি হৃদয় বিদারী বেদনা তাঁর মাতা-পিতার জন্য। তাঁর হৃৎথে বাধ ও বাঘিনী পর্যন্ত কাঁদল। পিতা সাহানীবের অবস্থা বস্তুতঃ পাগলের প্রায়। তিনি চোখ বন্ধ করে কাঁদছেন,—চোখ দিয়ে অবিলম্বে ঝরে পড়বে অশ্রুধারা। চাদব ছিঁড়ে তিনি কোঁপিন পবেছেন, গলায় বেঁধেছেন ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাঁথা, সারা অঙ্গে চুণ-কালি, হাতে হাডের গাটবী আব ভাঙা কালো হাঁড়ি। কবিব এই চিত্রাঙ্কন বাস্তবতাসম্মত।

ডাকিনীর পালায় কেবলমাত্র নারী পবিচালিত বাজছে বর্ণনা প্রদান কবির বিশেষ কল্পনা শক্তির পবিচায়ক। এই পর্বে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় ঘটনা এই যে—উক্ত বাজ্যের হিন্দু নামধারী বাজা ছত্রজিতের কন্যা ডাকিনীর

কোবাণ-কেতার বিনে অন্তে নাহি মন।

পাঁচ ওস্ত নামাজ পড়ে খোদাব কাবণ \* (১৪৮)

অথচ ডাকিনী ব্রাহ্মণের গণনাষ বিশ্বাসী। আবো আশ্চর্য ঘটনা এই যে তিনি পূর্বাভেই মুসলমান ধর্মীয় এক ব্যক্তিকে আপনাব পতিরূপে গ্রহণ করেছেন। কোন ধর্মীয় সংস্কার তাঁর মনকে এই অভীক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। সাহানীবের জ্বী-পুত্র আছে একথা জেনেও তিনি বিচলিত হলেন না। বরং সাহানীবকে বাজ-সিংহাসনে বসালেন এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। গ্রন্থখানি বাংসল্য রসের ভিত্তিতে রচিত হিন্দু-মুসলমানের তৎকালীন ঐক্যবদ্ধ জীবনের কাব্য। কবি হয়ত সে সময় যেমন ছিল তেমন স্বাভাবিক ভাবেই দেখিয়েছেন। হিন্দুব সহিত মুসলমানের বিবাহ এবং হিন্দুব ধর্মাস্তব গ্রহণের ঘটনা—যেন যা ঘটেছে তা ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটেছে। সে জন্ত সামাজিক বিবোধিতাব কোন স্থান সেখানে ছিল না। যে সকল সংস্কার আজ-কালকাল দিনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি কবে থাকে তাব কোন দৃষ্টান্ত এই কাহিনীতে পাওয়া যায় না। কাবণ বোধ কবি, কবির ইচ্ছা—বিবোধ অপেক্ষা মিলনকে বড় কবে দেখানো। অথবা আজকাল মত সামান্য কাবণে সেকালে বিরোধ হত না। এই কাব্য তাব অন্ততম প্রমাণ বলে মনে হয়।

একদিল শাহেব মাতা বিবি আশক হুবি পুত্ৰশোকে বিহ্বল, অচেতন। পুত্ৰেব বিবহে আশক হুবি যখন মবণোমুখ তখন আল্লাব আসন কম্পিত হল। আল্লাহ্ তা'লা ডেকে পাঠালেন খওসাজকে। তাঁব নির্দেশ একদিলকে ফিবিযে দাও তাব মাযেব কোলে।

একদিল শাহ্ এতদিনে মোল্লা আতা'ব ঘবে সন্তানবৎ শিক্ষা-লাভে ব্যাপ্ত ছিলেন। আল্লাহ্'ব নির্দেশে খওসাজ তৎক্ষণাৎ গেলেন আতা'ব কাছে এবং সেখান থেকে একদিলকে ফিবিযে এনে পৌঁছে দিলেন আশক হুবিব নিকট। আশক হুবি অব্যর্থ মৃত্যুব হাত থেকে বক্ষা পেলেন।

পী'ব একদিল শাহ্ কাব্যেব কাঞ্চনা নগবেব পালায় মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল বা বায় মঙ্গল কাব্যেব স্তায সমুজ্জ যাত্ৰা এবং বিভিন্ন নামেব জল-যানেব বিবৰণ প্রদত্ত হযেছে। আবে প্রদত্ত হযেছে জল যানেব নাম। যথা,—মধুকব, চন্দ্রসেন, খালিযা প্রভৃতি। প্রদত্ত হযেছে গ্রামেব নাম। যথা,—লসমানপুৰি, কাকুড়াই, টুঙ্গিপুৰ, গাজিপুৰ, ঝাউডান্ধা ইত্যাদি।

মাতা-পুত্ৰেব সম্পর্ক বিশেষতঃ সংমা ডাকিনী এবং সতিন পুত্ৰ একদিলেব মধ্যকার স্ময়ধুব ব্যবহার যেন যশোদাব সঙ্গে শ্ৰীকৃষ্ণেব সম্পর্ক ও ব্যবহাবেব সমতুল। এখানে হুই সতিনেব যে মিলন-চিত্ৰ তাও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মনসা মঙ্গল কাব্যে বর্ণিত বেহলা কর্তৃক লোহাব কড়াই সিদ্ধ করার অল্পকণ চিত্ৰও কাহিনীতে আছে। একস্থানে আছে,—

বিছমিল্লা বলিযা বিবি চুলা ফুকে দিল।

বেগব অগনিতে খানা তৈয়াব হইল ॥ (১।১৩০)

মু'বশিদেব পালাব ঘটনা'ব সঙ্গে পী'ব গোবাটা'দ কাব্যে বর্ণিত ঘটনা'র সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। মোর্শেদ পী'ব শাহ্ জালালেব নিকট কঠিন পবীক্ষা দিবা'ব প'ব পী'র গোবাটা'দ যেমন আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, গুরু-ভক্তিব কঠোরত'ব পবীক্ষা'ব মধ্য দিযে তবেই পী'ব একদিল শাহ্ তাঁ'ব গুরু পী'ব বদবেব নিকট দীক্ষা লাভে সমর্থ হযেছিলেন।

এই কাব্যে পী'ব বদবেব উক্তিতে কিছু তত্ত্ব কথা এবং গাহুযেব জন্ম বহুস্তে'র কথা সংক্ষেপে স্থান পেযেছে।



হবিগীর পালায় কবি প্রধানতঃ ইসলাম মাহাত্ম্য প্রচার কৰেছেন। ইসলামের ব্যাখ্যাৰ ত্রাশ্বণ বাজা নছিবাম (লক্ষীবাম ?) বিমুখ হৰে মুসলমান হয়েছেন। হবিগী ও তাৰ শাবকদ্বয়ক নিষে যে কাহিনী গড়ে উঠেছে তাতেও বাংলা-বসেব বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মাতৃ বিচ্ছেদ হেতু গীত একদিল শাহেব জীবনে যে কৰুণ ঘটনাৰ অবতারণা হয়েছ, এখানেও ঠিক তাই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এই পালায় গীতের এক বিশেষ অলৌকিক শক্তির পৰিচয় পাওয়া যায় যে বনেব পশুও তাঁৰ আদেশ পালন কৰছে।

গীত একদিল শাহ কাব্যে ছুটির পালা সম্ভবতঃ এই কাব্যের বৃহত্তম পালা। এই পালায় যে কাহিনী গীত একদিলকে নিষে গড়ে উঠেছে তাতেও বৰ্ষেছে বাংলা-বসেব কল্পমাৰ। এই পালাটি নানা কাৰণে বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত। কাৰণগুলির কয়েকটি এইরূপ,—

১। গীত একদিল শাহেব চবিত্ত রাখাল-বেগী শ্রীকৃষ্ণের চবিত্তের সঙ্গে মিলে। শ্রীকৃষ্ণের মত তিনিও বাখাল বালকগণের সঙ্গে মাঠে মাঠে গো-পালন কৰেছিলেন।

২। কালীয় দমন ও গিবি গোবর্ধন ধারণের ত্রাশ্ব অলৌকিক কীর্তিৰ সঙ্গে একদিল শাহ কৰ্তৃক ব্যাঘ্র দমন, গো-পাল কৰ্তৃক তছকপ কৰা ধান-জমিতে ফসলের পূৰ্বাবস্থা কিবিয়ে আনা এবং অল্পকপ আরো ঘটনা তুলনীয়।

৩। যশোদাৰ সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সম্পর্ক ছিল, সম্পত্তি নানী বয়গীৰ সহিত গীত একদিল শাহেব অল্পকপ মাতৃ সম্পর্ক ছিল।

৪। শ্রীকৃষ্ণ যে ভূমিকা নিষে বাজা কংসের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন, প্রায় তদল্পকপ ভূমিকা নিষে একদিল শাহ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন বড়ু মণ্ডলের সঙ্গে।

৫। নিঃসন্তানা যশোদা এবং নিঃসন্তানা সম্পত্তিও। যশোদাৰ ত্রাশ্ব মাতৃ স্বৰূপা 'সম্পত্তি' তাঁৰ গোত্ৰপুত্র একদিল শাহকে কৃষ্ণের ত্রাশ্ব সন্তান-বাংসাল্যে পালন কৰেছেন।

৬। গীত একদিল শাহ যে ভূমিকা নিষে আনোয়ারপুৰে নিজেই জাহির কৰেছেন তা উল্লেখযোগ্য জনহিতকৰ কাৰ্যের সংগে তেমন যুক্ত নয়। কয়েকটি মাত্র বৃজবগীৰ গল্প যা নিবন্ধৰ এবং অল্পমত জনসাধাৰণের আলাপের বিষয় বস্তু হতে পারে মাত্র।

৭। কাহিনী এমন ভাবে কল্পিত হয়েছে যাতে একদিল শাহ্ যেন লক্ষ্মী-দেবী বা দেববান্ধ ইন্দ্র সদৃশ দেবতায় পর্যবসিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তালার সঙ্গে গীবেব যে সম্পর্ক তাব সত্যতাকে বিকৃত করা হয়েছে। এসব ইসলামী আদর্শের ঘোবতব বিবোধী।

৮। রাজা মন্দিব (মহেন্দ্র ?) বাঘেব দববারে হিন্দু মুসলমান সকল দেওয়ান আপন আপন কর্তব্য পালনে নিযোজিত। সেখানে কোনদিন কোন ধর্মীয় বিবোধ হয়েছে এমন উদাহরণ এ কাব্যে নেই। স্ববিচারক হিসাবে ও গুণীব সমবদাব হিসাবে বাজা মহেন্দ্র হিন্দু মুসলমান সকলের নিকট প্রাণংসা পেয়েছেন।

৯। ছুটি মণ্ডলেব জ্ঞায মধ্যবিত্ত পবিবারেব এমন নিখুঁত চিত্র বিরল। বিশেষতঃ মুসলমান পবিবাবেব চিত্র বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম একথা বলা অহুচিত হবে না। বিষয় সম্পত্তি নিষে যে বিবোধ সমাজ ব্যবস্থায় আছে তাও এই অংশে বিবৃত হয়েছে।

১০। রাজ-দববাবেব বিববণে পাওযা দায় বাজকার্য পবিচালনাব তৎকালীন চিত্র। বাজা তাঁব দেওয়ানদিগকে যথাযোগ্য সমীহ কবতেন। তিনি এতখানি উদার ছিলেন যে বাজমুহূট বিশেষ কাবণে সামান্ত দেওয়ানেরব মন্তকে পবিযে দিতেও ইতঃস্তত কবতেন না। তিনি দুষ্টেব দমন কবতেন জ্ঞায বিচারেব ভিত্তিতে।

১১। বৈষ্ণব পদাবলীব সঙ্গে এই কাব্যের ভাবগত ছাড়া কাব্যগত

কিছু কিছু মিলও জুপ্পষ্ট। পদাবলীতে আছে,—

আমাব শপতি লাগে, না ধাইও খেছুর আগে

পবাণেব পবাণ নীলমনি,

গীব একদিল শাহ্ কাব্যে আছে,—

আজি বাছা দূব বনে যেও নাবে ॥

নিকটে নিকটে বহ আমাব অলিবে - ( ধূযা: ২৮৪ )

আর একটি ধূযা লক্ষণীব,—

আজি ছুটাব ভাগ্যে ছুটা মিলাবে বে ॥

আবে কালো আরে কালো টাঁদ রে - ( ২১:১৬ )

১২। বাঘমল কাব্যেও প্রতিচ্ছবি দেখা যায় বিভিন্ন বাঘের নামের বর্ণনায়। কালু-গাজী ও চম্পাবতী কাহিনীতেও অল্পরূপ বাঘের নাম ও তাদের বিচিত্র চরিত্রের পৰিচয় দৃষ্ট হয়। কয়েকটি বাঘের নাম,—

খালদৌড়, হালিষা, নিহালা, ভউড়িয়া, কালামুখা, কুহুৰুখা, চউরিয়া, বিহুবাঘ, কালুকা' ভাডুকা, নাগেশ্ববি প্রভৃতি। এই সমস্ত বাঘের চবিজ বর্ণনার নমুনা এইরূপ,—

আব এক বাঘ এল কপালে তাব চিত ।

কেড়ে খাষ কোলেন্ন ছেলে বসে গাষ গীত \* (২১৬৮)

তাব পাছে আসে বাঘ খেতেব আলো শোষ ।

এছা কিল মারে যেন বোবে ধাত্ত রোষ + (২১৬৮)

সব বাঘের প্রধান হল খালদৌড়া। খালদৌড়া নামটি হয়ত মূদ্রন প্রমাণে খানদৌড়ার স্থান অধিকার করেছে। বাঘমল এবং কালু-গাজী ও চম্পাবতী কাব্যেও “খালদৌড়াব” নাম পাওয়া যায়।

১৩। ত্রীকুক্ষকে আমবা দেখু চবাবাব কালে কদমতলে বাঈ বাজাতে শুনি কিন্তু গীত একদিল শাহকে দেখি তিনি কদমের তলায় অভ্যস্ত বাখাল বালক-গণের সঙ্গে ডাং-গুলী খেলা কব্বছেন।

১৪। ইসলাম ধর্মমাহাত্ম্য প্রচাৰেব কোন প্রচেষ্টা এই অংশে গীত একদিল শাহ কবেছেন এমন নিদর্শন নেই। কোন হিন্দুর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ নেই। এখানে সংঘর্ষ দেখা গেছে অসদাচরণকাবীর সঙ্গে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বা সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান এই কাব্যে নেই।

কবি বাহু প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। ঘটনার বিবরণ দিতে গিষে কিছু কিছু বর্ণনা অনিবার্হভাবে এসে পড়েছে। একটি ঘটনার ছেদেব পৰ আব একটি ঘটনাব আবন্তে দেখা যায় সেই ঘটনাব সময় নির্দেশক নিম্নলিখিত পংক্তিটি বেশ কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে,—

ব্রাজি পোহাইয়া গেল কুকিলে কবে বাও ॥ (২১৭৭, ২১৭৭, ২১৬৩, ২১৮৪, ২১৯১, ২১২২০)

ম্যাবিস্ত বাদালী বধুব নাবীম্বলভ ব্যবহাব ও জননীৰ স্নেহময়ী রূপ স্মরণ হয়ে ফুটে উঠেছে এই কাব্যে,—

সাড়িব আঁচলে বিবি মোছাইল পাও ॥  
 সোনা মুখে চুষ দিবা কোলে নিল মাও \*  
 গীব কোলে লিখা বিবি বসিলেন ঘারে ॥  
 মায়েবে কান্দিতে দেখে পুছিলেন তাবে \* (২।১০৪)

ডাকিনীব পালাব মধ্যে একস্থানে আছে,—  
 কোলে বসি একদিল ধুবে নিল হাত ॥  
 মায়ে পুজ্জ একন্তবে বসি ধায় ভাত \* (১।৮২)

বা, ছু হস্তে মায়েব গলা একদিল ধবিয়া ॥  
 স্মখে নিজা ধায় গীব কপের বিনদিয়া \* (১।৮৩)

কবি আশক মোহাম্মদ কাহিনী পবিবেশনে ষত্থানি ব্যগ্র, কাব্যরস বা  
 বর্ণনায কবিত্বশক্তি পবিচয় দিতে তত্থানি সচেষ্ট নন। তবু দুই একটি স্থানে  
 বর্ণনা চমৎকারিত্বকে অস্বীকার কবা যায় না,—

উপনীত হইল গীব রাজ দববারেতে ॥  
 আকাশেব চন্দ্র যেন নামিল ভূমেতে \*  
 পূর্ণিমায চন্দ্র জিনে একদিল বরণ ॥  
 ববিব কিবণ নহে তাহাব মতন \*  
 কাল মেয়েব আড যেন বিজলিব ছটা ॥  
 কাঁচা সোনা জলে যেন সা-নিয়ের বেটা \*

এই অংশে সংস্কৃত প্রভাবজাত রূপ বর্ণনা লক্ষণীয়। যথা :—

ছু আঁখে কাজল অতি দেখিতে উত্তম ॥  
 চলন খঞ্জন পাখি পাইবে শবম \*  
 হাতে পদ পায় পদ কপালে রতন জলে ॥  
 গীবকে দেখিয়া প্রজা ধন্ত ধন্ত বলে \* (১।১০২)

সমগ্র কাহিনী ব্যতীত কয়েকস্থলে বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে পদ এবং শব্দগত  
 মিল পবিলক্ষিত হয়,—

বৈষ্ণব পদাবলীব যেমন—

মবিব মবিব সখি নিশ্চয় মবিব,  
 কান্থ হেন গুণ নিধি কাবে দিষে যাব।

তেমনি,—মরিব মবিব জিবা মবিব নিশ্চয় ॥

কেমনে বহিব ঘবে মোব ঘব নয় - ( ১১৬২ )

আব একস্থানে বিচাপতিব পদেব স্পষ্ট ছায়া দৃষ্ট হব,—

তুমি তো জাননা স্বামী নাবীব গোসাই ॥

স্বামী বিনে নাবীদেব কোন লক্ষ্য নাই -

শীতের ওজন স্বামী গিবিষেব বাও ॥

অসমেব কাণ্ডাবী স্বামী সোতাবেব নাও - ( ১১১৮ )

একদিল পীবেব অলৌকিক শক্তিতে প্রভাবান্বিত প্রকৃতির স্বাধীন জীব হবিণী। সেই হবিণী যেমন উক্ত পীবেব অল্পগত, অল্পকপ আল্পগত্যেব ঘটনা হলায়ুধ লিখিত ( সংস্কৃত হবকে ) ‘সেক শুভোদয়া’ কাব্যে পাওয়া যায়। সেখানে আছে ‘যে সেকেব আদেশে সারস তার আহাৰ্য্য একটি গচি মাছকে মুখ থেকে ত্যাগ করেছে।

বস বিচারে কাব্যখানিকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ গর্ভবারিণী আশঙ্ক হুরিব জীবনপণ সাধনাব ধন পীব একদিল শাহ্, শেষবারেব মতন যে বিদায় নিষেছেন সেখানে কাব্যখানি বিষোগান্ত হযেছে। দ্বিতীয় অংশে মাতা “সম্পত্তি”ব সঙ্গে যে গভীর স্নেহ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা শেষ পর্বন্ত অটুট বযেছে,—কোন কাবণে সেখানে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেনি, স্ত্রতবাং কাহিনী এখানে মিলনান্ত।

আনওয়ারপুরে পীব একদিল শাহেব যে লীলাব বিবরণ এই কাব্যে লিখিত হযেছে তার সঙ্গে ১২১৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা সবকাবের গেজেটে এল্. এন্. এস্. ওমালী কর্তৃক লিখিত বিবরণেব কাহিনীব সঙ্গে মূলতঃ কিছু কিছু মিল আছে বটে কিন্তু ডাকিনীব পালা, কাক্ষন নগরেব পালা, মোর্শেদেব পালা ও হরিণীর পালাব মতন কোন গল্পাংশ সেখানে নেই। বলা বাহুল্য ১৮২২ খৃষ্টাব্দে মিহিব পত্রিকার ( মার্চ সংখ্যাব ) পুৰাতত্ত্ব বিভাগে লিখিত গল্পেব সঙ্গে উপরাস্তরূপ মিল বা গবগিল আছে।

পীব একদিল শাহ কাব্যে তিন শ্রেণীব চরিত্র দৃষ্ট হব। যথা,—দেব চরিত্র মানব চরিত্র ও পশু চরিত্র।

এই কাব্যে দেখা যায় হিন্দুব দেব-দেবী বখাক্রমে ইন্দ্র ও লক্ষ্মী, পীব একদিল শাহের সাহায্যার্থে এগিবে এসেছেন। একদিল শাহ কেন যে আল্লাহ্, তাঁলার

নিকট সাহায্য প্রার্থনা কবেননি তা বুঝা দুঃখ। এটি কবির সবলতা না দুর্বলতা তা বিচার্য। সবলতা এই জ্ঞাত যে, আল্লাহ্ তালাব করমানে পীর একদিল শাহ্ লীলা প্রকাশ করিতে এসেছেন অথচ সাহায্যের প্রয়োজনে আল্লাহ্ তালাকে বিশ্বস্ত হয়েছেন। দুর্বলতা এই জ্ঞাতই যে, সাহায্য গ্রহণ হিন্দু মুসলমান বিচারেব অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় না। যে সামাজিক বাস্তবতার পৰিপ্ৰেক্ষিতে এই কাব্য বচনা তাতে ইল্ল ও লক্ষ্মীর নিকট সাহায্য চাওবার মধ্যে সঙ্গ্র পীর কাব্য বচনার মূল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

বাঘেব মুখে কথা, হবিণীর সঙ্গে পীর একদিল শাহের কথোপকথন এই কাব্যের অন্ততম বৈশিষ্ট্য। বাঘদেব দলপতি খালদৌডাব উত্তরে —

কেমু বলে ছোট দেখে তুচ্ছ কর নাই ॥  
 ভেড়া ছাগল বিন। আমি অত্ৰ নাহি খাই -  
 বাছুব কুকুর আমি খাই একচিত্তে ॥  
 ছেলে খেতে পাবি পোষাতিব কোল হইতে -  
 আমা চাইয়া চোব নাহি খাল দৌড়া ডাই ॥  
 দশ-বিশেব মধ্যে গিয়া ভেলকি লাগাই ( ২১০ )  
 কার বাপেব শক্তি নাই মোকে বন্দি করে ॥  
 সঙ্ক্যাকাল হইলে আমি কিবি ঘবে ঘবে ।  
 কার্য ধৰ্মে বুঝিব কাহাব কত বল ॥  
 শুনিয়া হাসিয়া উঠে বাঘ যে সকল - ( ২১১ )

এক এক পালায় এক একটি কহিনী গড়ে ওঠাব দৃষ্টান্ত কৃষ্ণহরি দাস বিরচিত বড় সত্যপীর ও সঙ্ক্যাবতী কত্তাব পুথি কাব্যে পাওয়া যায়। কৃষ্ণহরি দাস বর্ণিত সত্যপীরের স্ত্রাব একদিল শাহ্ ও মর্তে কর্ম সম্পাদনে আগমন কবেনছেন।

পীর হজবত একদিল শাহ বাজীর নামে বিচিত এই কাব্যখানি বর্তমানে একেবাবেই দুঃখ্য। বাবাসন্তের কার্জীপাডান বাহাব আলী সাহেবের নিকট যে কাব্যখানি আছে তাব অবস্থা খণ্ডিত। তাব মধ্যে বাবাব বচনাকাল বা কবির কাব্যকাল বা আব কোন কালেব উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্ত্রহর্য কাব্যেব বচনাকাল সঠিভাবে নির্ণয় কবা কঠিন। কবির মতে এই কাব্যের বচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর ১৭০৮ বা ১৭১০ খ্রিস্টাব্দ।

লক্ষণীয় যে আবদুল কবির সাহেব তাঁর পুঁথি পবিচিতি গ্রন্থে ‘একদিন’ (একদিন নয়) বলে উল্লেখ করেছেন। এটি তাঁর ক্রটি, নাকি মুদ্রাকবের ক্রটি, নাকি আদৌ ক্রটি নয় তা অসুমান সাপেক্ষ মাত্র। খুব সম্ভবতঃ এটি মুদ্রাকবের প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

বালাগুর পীর হজরত গোবর্চান বাজী, শহীদ ভিত্তুনীর প্রভৃতি তথ্যবহুল গ্রন্থের প্রণেতা আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে, একদিন শাহ কাব্য নামে একখানি কাব্য ১২৪১ সালে বংপুর জেলার শিতল গাড়ী নিবাসী আশক মোহাম্মদ রচনা করেন। [বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ পত্রিকা।] ২৩ অতঃপর আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্যে এই কাব্যের রচনাকাল ১৮৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দ। এই কালকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব দেওয়া যায় না। কাব্য কবি আশক মোহাম্মদের বসতি অস্তিত্ব এই কাব্যের রচয়িতা শিতলগাড়ী গ্রামে ছিল না। কবি নিজে তাঁর কাব্যের ভণিতায় লিখেছেন,—

আশক মহাম্মদ কহে জোনাবে সবার ॥

হরিপুর গ্রাম বিচে বসত যাহার \* ( ১১৩২ )

এখন হরিপুর বলতে যে কোন্ হরিপুর বুঝায় তাব হৃদিশ পাওয়া যায় না, কাব্য একাধিক হরিপুর আছে বলে জানা যায়। তবে বাবাসত মহত্ম্যর অন্তর্গত বাবাসত থানাবীন হরিপুরকে আমাদের বিতর্কিত হরিপুর বলে মনে হয়। কারণ,—

১। বায় মঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যের প্রণায় আশক মোহাম্মদের পীর একদিন শাহ কাব্যে স্পষ্ট। বায় মঙ্গল কাব্যের রচয়িতা ইফরায় দাসের বাড়ী ছিল নিমতা গ্রামে এবং মনসা বিজয় কাব্যের রচয়িতা বিপ্রদাস পিপলাই-এর বাস ছিল ছোট জাঙলিবা গ্রামে। এই হরিপুর গ্রাম উক্ত নিমতা ও ছোট জাঙলিবা গ্রামদ্বয়ের মধ্যস্থলে অতি নিকটে অবস্থিত।

২। হরিপুর গ্রামের আদি বাসিন্দা বিনোদ মণ্ডল। বহুদিন আগে যশোহর থেকে তিনি এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বংশের বর্তমান বণোজোষ্ঠ মোহাম্মদ আজিজার বহমান সাহেব জানানেন যে বহুদিন পূর্বে তাঁদের পবিবারে মধুমিঞা নামে একজন গুণী ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবতঃ মধুমিঞা আমাদের আলোচ্য আশক মহাম্মদ

ওবফে হেলু মিঞা একই ব্যক্তি। কাবণ, ‘হালু কাবসী’ শব্দের অর্থ ধ্বংস; আবাব হালু অস্ত্র অর্থে মিষ্ট দ্রব্য বিশেষ। মধু ও হালু এই জুড়ে সমার্থক। মধু মিঞা সম্ভবতঃ তাঁব ডাক নাম ছিল। ঐ ডাক নামেব পবিবর্তে তিনি ‘হেলু’ এই নাম গ্রহণ কবে থাকতে পাবেন। হযত তাঁব মুসলমানী মূল নাম ছিল আশক মহাম্মদ। বলা বাহুল্য, কবি একস্থানে লিখেছেন,—

বটে আশক মহাম্মদ একদিলের পাষ ॥

ওবফেতে হেলু মিষা জানিবে সবায় ( ১১১২ )

৩। হরিপুত্র গ্রামের সমগ্র অধিবাসী মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত বিনোদ মণ্ডলের বংশধর। মাত্র কয়েক বৎসব পূর্বে এক হিন্দু পবিবাব এখানে এসে বাস কবতে আরম্ভ কবেন। যা হোক, মধু মিঞা হিন্দু বংশ সত্ত্বত পরিবারেব সন্তান বলে তিনি হিন্দু সংস্কাব থেকে মুক্ত হতে পাবেননি,—যাব ফলে তাঁব কাব্যে প্রধানতঃ কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য মনসা-মাহাত্ম্য ও চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রভাবিত মনোভাবের খুব স্পষ্ট ছায়াপাত হবেছে।

৪। কাব্যেব ভাষা বারাসত অঞ্চলের এবং এই কাব্যে ব্যবহৃত বহু শব্দ এতদ্ স্থানেব আঞ্চলিক শব্দ।

“বডখাঁ গাজী” নামক আর একখানি পুথির বচয়িতার নাম সৈয়দ হালু মিয়া বলে জানা যায়। তাঁব উক্ত পুথিব রচনা কাল অষ্টাদশ শতাব্দী। [পুথি পরিচিতি।] ২৩ পীর একদিল শাহ কাব্য বচয়িতা আশক মহাম্মদ ওবফে হেলু মিষা এবং বড খাঁ গাজী গ্রন্থ বচয়িতা হালু মিষা যদি একই ব্যক্তি হন তবে এই কাব্যের বচনা কাল অষ্টাদশ শতাব্দী হতে পাবে।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম কেবীব “কথোপকথন” সর্ব প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক। অতএব ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলা ভাষায় ইংরেজী শব্দের অল্পপ্রবেশ ঘটে। আশক মোহাম্মদ বিরচিত পীর একদিল শাহ্ কাব্যে ইংবেজী শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। তাছাড়া অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী আধিপত্য প্রসারের মুখে আববী, ফাবসী প্রভৃতি শব্দের ব্যবহাব কমে আসতে থাকে। এই কাব্যে আববী, ফাবসী শব্দের স্ফুটব ব্যবহার দেখে মনে হয় কাব্যখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর মবোই রচিত হবেছিল।

১৮২২ খৃষ্টাব্দেব মার্চ মাসে ‘মিহিব’ নামক পত্রিকা পুনাতেব বিভাগে একদিল শাহের বে কাহিনী প্রকাশিত হবেছিল, [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ



পাঠাগারে পত্রিকাখানি প্রাপ্তব্য ] তাব সঙ্গে পীব একদিল শাহ্ কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর মূলগত মিল থাকলেও কিছু বিশেষ বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সর্ব-প্রথম দৃষ্ট হয় যে দুইটি কাহিনীর ভাষাব মন্যে দৃষ্টব্য ব্যবধান। ১৮২২ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের ভাষাব সাথে নিয়লিখিত ভাষার তুলনা লক্ষণীয়,—

ক) এক সময়ে সাহ নিল নামক এক রাজা বাস করিতেন, তিনি আশেক লুবি নামক একজন দ্বীলোকের পানি গ্রহণ কবেন, কিন্তু তাঁহাব অপুত্রক ছিলেন। (মিহিব পত্রিকা)।\*

খ) আলাব দোহাই লাগে তোনাব উপবে,

এমত শুনিয়া খিদা নিবিল উদবে।

একিন কবিয়া সাধন করিতে লাগিল,

কপি-জিবে ডাকি বাত কবিত্তে লাগিল।

(পীব একদিল শাহ্ কাব্য : আশক মহম্মদ)।

আববী-কারসী প্রভৃতি শব্দ ধর্মীয় সংস্কারের প্রেরণায় ব্যবহৃত হইবে। এই কাব্য কবি কর্তৃক যথাবীতি লিখিত। গাজী সাহেবের গীতের জায়গায় কেবল মুখের গান শুনে উহা লিখিত নয়। তা ছাড়া ভাষাব যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ কবেছি তা থেকে অনুমান করা সম্ভব যে, এই কাব্য ১৮২২ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্বে রচিত।

অতএব আবদুল কবির সাহিত্য বিশারদ ও আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে এই কাব্য রচিত হইছিল বলা হইবে তা যুক্তি নির্ভর নয়। এই প্রসঙ্গে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য,—

১। ‘বড় খাঁ গাজী’ নামক গ্রন্থ প্রণেতা হালু মিয়া ও ‘পীব একদিল শাহ্ কাব্য’ রচয়িতা হেলু মিয়া যে পৃথক ব্যক্তি বা একই ব্যক্তি নন এমন কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং উক্ত দুই নামধারী কবি যদি একই ব্যক্তি হন তবে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী আশক মহম্মদ ওরফে হেলু মিয়া রচিত এই কাব্যের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

২। এই কাব্যে যখন কোন ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হয়নি এবং অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে আববী-ফাবসী শব্দের ব্যবহাবেব ষাথষ্ট প্রবণতা ছিল তখন আববী-ফাবসী শব্দ বহুল এই -কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীৰ মণ্যে বচিত হযেছিল বলে মনে কবা স্বাভাবিক।

৩। অষ্টাদশ শতাব্দীৰ শেষভাগে খৃষ্টান মিশনাবীগণ খৃষ্ট-ধৰ্ম প্রসাবেব জগ্ৰা যে ব্যাপক প্রচেষ্টাব সূত্ৰপাত কবেছিল তাকে ঠেকিষে রাখাব জগ্ৰা ইসলামি কঠোৰ বীতি-নীতিৰ ক্ষেত্ৰে কিছু উদাবতা এনে, হিন্দু-মুসলমানেব মণ্যে সমন্বয় সাধনে সাহায্যকাবী ভাবধাবায় আল্লাহ্-মাহাদ্ব্য ও শ্রীকৃষ্ণেব গৌষ্ঠ লীলাৰ গ্ৰায লীলাবহুল কাহিনীৰ অবতাবণা কবা কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয।

সুতৰাং উপবোক্ত কাবণ ত্ৰযেব ভিত্তিতে বলা যায় যে, এই কাব্যখানি অষ্টাদশ শতাব্দীৰ মণ্যেই লিপিত হযেছিল কিন্তু মুত্ৰাযন্ত্ৰেব বহুল প্রসারেব অভাবেব দকণ বিলম্বে সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীৰ প্রথম দশক থেকে পঞ্চদশ শতকেব মণ্যে মুদ্রিত আকাবে প্রকাশিত হযে থকাবে।

পীব হজবত একদিল শাহ্ বাজী যে কোন সমযে জগ্ৰা গ্রহণ কৰেছিলেন বা কোন সমযে দেহত্যাগ কৰেছিলেন বা কোন সমযে আনোয়ারপুৰ পবগণায় অবস্থিতি কৰেছিলেন তাব প্রমাণযোগ্য কোন নথিপত্ৰ পাণ্ডয়া যায় না। আবদুল গফ্ফর সিদ্দিকী সাহেব তাঁর ‘বালান্তাব পীব হজবত গোবান্টাব বাজী’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে পীব একদিল শাহ্ বাজী এতদ্-অঞ্চলে ইসলাম ধৰ্ম প্রচাবার্থে পীব হজবত গোবান্টাব বাজীৰ সঙ্গে আগমন কৰেছিলেন। পীব হজবত গোবান্টাব বাজীৰ কাল ত্ৰযোদশ শতাব্দীৰ শেষভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীৰ প্রথমার্ধ বা শেষার্ধ পৰ্যন্ত বলে অহুমান কবা হযেছে। সেই সূত্ৰে পীব হজবত একদিল শাহ্ বাজীৰ কাল আহুমানিক ত্ৰযোদশ শতাব্দীৰ শেষ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পৰ্যন্ত। আনণ্ডাবপুৰে তাঁব অবস্থিতি কাল চতুর্দশ শতাব্দীৰ মণ্যে বলেই অহুমান কবা সমীচীন।

পীব হজবত একদিল শাহ্ বাজীৰ অলৌকিক কীৰ্তিকলাপ বিষয়ক অনেক লোককথা প্রচলিত আছে। এইসব লোককথাকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত কবা হল। ষথা,—পুস্তকে মুদ্রিত লোককথা, আব সংকলিত (যাব কিছু কিছু অত্ৰ প্রকাশিত) লোক কথা। পুস্তক আকাবে

প্রকাশিত লোককথাগুলির অধিকাংশই আবদুল আজীজ আল আমীন সাহেব রচিত “ধন্য জীবনের গুণ্য কাহিনী” নামক পুস্তকে আছে। তাদের সংখ্যা ও শিরোনামা নিম্নরূপ,—

- ১। ছোট মিঞার আলম
- ২। রাখাল বেগ
- ৩। শত্রুহীন জমিতে শত্রুর সমাবেশ
- ৪। ডোবে জাহাজ ওড়ে শালিখ
- ৫। আত্র হতে বস্ত্রধারা
- ৬। রামমোহন বাঘের বংশধর
- ৭। বাইশ শত বাহাদুর বিঘা জমি
- ৮। অবিখ্যাতী চোবের অভিনব সাজা
- ৯। পবিত্র পুষ্কবিগী
- ১০। অন্ধ পেল চোখের আলো
- ১১। বসন্তবাবু বদান্ততা
- ১২। রওজাপাকের তত্ত্বাবধানে।

আমার নিজস্ব সংকলিত কয়েকটি লোককথা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করা হল—তাব মাঝে গীতের অলৌকিক কীর্তিকলাপ আজো জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচারিত।

## ১। ছড়ির সাহায্যে গঙ্গা পার

গীত হজরত একদিল শাহ্ সর্বঙ্গের জন্ত কবির একটি ছোট ছড়ি ব্যবহার করতেন। এটিকে বলা হত তাঁর ‘আশাবাড়ি’। এই ছড়ি বা আশাবাড়ির সাহায্যে তিনি অলৌকিক শক্তির পবিচয় দিতেন। তিনি আনোয়ারপুর পবগণার আসাব পথে গঙ্গানদী পার হওয়ার সময় এই ছড়ির সাহায্য নিয়েছিলেন। তিনি নাকি তাঁর হাতের ছড়ি বা আশাবাড়িটি গঙ্গানদীর উপর আড়াআড়ি ফেলে দেন। ঐ আশাবাড়িটি নৌকার কাজ করে,—অর্থাৎ সেই ছড়ির উপর চড়ে নাকি তিনি অনায়াসে গঙ্গা নদী পার হয়ে আসেন।

## ২। বেড়ু বাঁশের বাড়ি

পীর হজরত একদিল শাহ্ হাতে যে বাঁশের ছড়ি ব্যবহার করতেন সেটা ছিল বেড়ু নামক এক বিশেষ জাতের বাঁশের ছড়ি। জামগীরপ্রাপ্ত আনওয়ার-পুর পরগণা অভিমুখে তিনি এই ছড়ি হাতে নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। অবশেষে তিনি আনোয়ারপুর পরগণায় এসে উপস্থিত হন। তিনি তাঁর নির্দেশিত দেশে এসেছেন জেনে তাকে চিহ্নিত করার জন্য হস্তস্থিত সেই বেড়ু বাঁশের কঞ্চির ছড়িটি মাটিতে দৃঢ় ভাবে পুঁতে দেন। সেই ছড়ি থেকে বংশ বিস্তৃত হয়, এবং ঘন বাঁশবনে পরিণত হয়। পীরের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ সেই বেড়ু বাঁশের ঝাডের বাঁশ কেউ কাটত না। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছু সৈনিক ঐ বাঁশঝাডের কাছে তাবু ফেলেছিল। তাবা অবহেলায় বাঁশ ঝাডটির প্রভূত ক্ষতি সাধন করে এবং পীরের কথা প্রসঙ্গে তাবা তাঁর প্রতি অশোভন উক্তি করে। যে সৈনিক বাঁশঝাডের ক্ষতি করেছিল তাকে বিষাক্ত সর্পে দংশন করে যাতে অবিলম্বে তাব মৃত্যু হয়। বলা বাহুল্য, বাবাসত মহকুমা শাসকের বাংলোর পশ্চাদ্দেশে যশোহর বোডের ধারে সে বেড়ু বাঁশের বংশ-অবশেষটুকু এখনও (১৯৭০ খৃঃ) দৃষ্ট হয়।

## ৩। চাঁদ খাঁর মসজিদ

বাবাসত খানাব অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণপুর মৌজায় বাস করতেন আনওয়ারপুরের সুপ্রসিদ্ধ শাসক চাঁদ খাঁ। পীর একদিল শাহ্ একদিন যুবকের বেশে চাঁদ খাঁর বাড়ীতে গিয়ে ক্ষুধা নিরন্তরিত্তি জন্য কিছু আহাৰ্য্য ভিক্ষা করলেন। চাঁদ খাঁর লাতা নূব খাঁ, তাঁকে সবলকায় যুবক দেখে ভিক্ষা দিতে অস্বীকৃত হন। নূব খাঁ বললেন “তুমি তো যথেষ্ট সামর্থ্যবান যুবক। শ্রমেব বদলে অর্থোপার্জন করে তুমি অভাব মোচন কর না কেন?”

একদিল শাহ্ নিবস্তব বইলেন। নূব খাঁ পুনরায় বললেন, “আমাদের মসজিদ তৈরী হচ্ছে তুমি ওখানে গিয়ে কাজ কর, নিশ্চয়ই তুমি পারিশ্রমিক পাবে, তখন তোমাকে আর ভিক্ষা করতে হবে না।”

পীর সাহেব তাতে অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি মসজিদের কাছে যোগদান করলেন, কিন্তু তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতে সংকল্প নিলেন। তিনি একখানি বিশাল এবং ভারী পাথর মসজিদের উপর এমন কৌশলে স্থাপন করলেন যে তাব উপর আর একখানি ইটও স্থাপন করা

যায নি। অর্থাৎ মসজিদেব কাজ অসম্পূর্ণ রবে গেল। তাই কখন কোন অসম্পূর্ণ কাজেব তুলনা দিতে হলে লোকে বলেন, “চাঁদ খাঁর মসজিদ।”

## ৪। বাঘ ও বক কথা

পীব একদিল শাহ্ কাজীপাড়াব থাকা কালে ছুটি খাঁ ও তদীয় পত্নী সম্পত্তির পীরভক্তি পরীক্ষা কবাব জন্ত একদিল এক কৌশল অবলম্বন করলেন।

গরব পাল নিবে তিনি মাঠ চবাতে গিবেছিলেন। ঐ পালে ছিল সাত শত গরু। তিনি জিগীব ছেড়ে সেই সাত শত গরুকে সাতশত বকে কপাস্তবিত করে শূন্তে উড়িবে দিলেন। বকগুলি গিমে বসল বড়, নগুনের বাড়ীর আশ-পাশেব গাছে।

পীব ধুলাবালি মেখে কাঁদতে কাঁদতে সন্ধ্যাব বাড়ী কিবে এলেন। বোদনের কাবণ জিজ্ঞাসা কবলেন সম্পত্তি। পীব জানালেন যে খেলা কবতে কবতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লে গরুগুলি কোথায চলে গেছে, তিনি আর তাহেব খুঁজে পাচ্ছেন না। বাজদববাব থোক ছুটি খাঁও এসে সে বিববণ শুনলেন। তাব উত্তরে একদিল শাহ্কে ভক্তিভাবে স্বামী-স্ত্রী বললেন, -

ঘর ছাব গরু যাক তাব নাহি দায়।

আমরা বিকিবেছি তোমাবই যে পাব \*

কিন্তু বড়ু নগুন অঙ্ক হয়ে ছুটি খাঁকেও তিবস্বাব কবতে লাগল। ছুটি তীব্রভাবে বড়ুকে ভৎসনা করে বিদায় দিলেন।

বাজি গভীব হতে লাগল। সকলে আহাব সেবে নিজামখ হল। বাজি আবো গভীব হলে পীব ঘবেব বাইবে এসে কদমতলায দাঁড়াতে সেই সমস্ত বক মাটিতে নেমে এল। এবাব পীব হুঙ্কার ছাড়লেন,—বকগুলি তখন বাঘে কপাস্তরিত হল এবং একে একে গোয়ালে প্রবেশ কবল। পবদিন পীরেব এই বুজবগী দেখে বাড়ীর সকলে বিস্ময়ে হতবাক হলেন।

## ৫। মাদোয়ারী ভজলোকদ্বয়ের বাছড় শিকার

বাবাসত থানাব অন্তর্গত পাটুলী নামক গ্রামে পীব একদিল শাহেব নামে একটি স্থিতস্থান আছ। সেখানকাব বটগাছে এবং বাঁশঝাড়ে অসংখ্য বাছড় বাস কবে। একদিল শাহেব প্রতি ভক্তিব নিদর্শন স্বরূপ সে বাছড় কেউ হতা কবে না।

একবার এক মাড়োঘাবী ভদ্রলোকের অনৈক সন্তান কি এক কঠিন বোগে আক্রান্ত হয়। কোন ডাক্তার বা কবিবাজ তাকে নিবায়ন করতে সক্ষম হননি। ভদ্রলোক আকুল হয়ে কোন ভবসা না পেয়ে হতাশায় ভেঙে পড়লেন। এমত অবস্থায় একবারে তিনি স্বপ্নযোগে একটি ঔষধ পান। সেই ঔষধের অল্পপান হল বাহুডেব মাংস। তবে সে বাহুড যে-কোন স্থানের বাহুড হলে চলবে না,— পাটুলী বটগাছেব বাহুডই হওয়া চাই। তবেই তাঁর দস্তানের জীবন বক্ষা হতে পারে।

ভদ্রলোক একদিন পাটুলী গ্রামে বন্দুক হাতে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন বাহুড শিকারের জন্য। এই স্থানের বাহুড শিকার স্থানীয় লোকের সংস্কার বিবোধী কাজ। এ হেন গর্হিত কাজ থেকে বিবত থাকার জন্য স্থানীয় লোক এগিয়ে এসে তাঁকে নিষেধ কবলেন। মহাবাহুড়ী সেই ভদ্রলোককে অনেক ভেবে-চিন্তে অবশেষে পীব একদিল শাহ্‌র প্রতি প্রতি জানিয়ে তাঁদেরকে বললেন,—“আমার পুত্রের জীবন বক্ষার জন্য আমি স্বপ্নে এই আদেশ পেয়েছি। সুতরাং এতে কোন অপবাদ নেই।”

তিনি পুনর্বার পীব একদিল শাহ্‌র প্রতি অসীম ভক্তি প্রকাশ কবলেন। পবে বাহুড শিকারের উত্তোগ কবতে জনসাধারণ তাঁকে পুনর্বার বললেন,—“এ বাহুড মাংসে আপনাব সমুদ্র ক্ষতি হবে।”

ভদ্রলোক তাতেও বিচলিত হলেন না। বাব বাব পীব একদিল শাহ্‌কে প্রজ্ঞা জানিয়ে বন্দুক চালনা করে ছুটি বাহুড শিকার কবলেন। অবশ্য বাহুড শিকারের পব মিষ্টার সংগ্রহ করে তিনি পীরের নামে লুট দিলেন এবং স্বগৃহে ফিবে গেলেন।

পবে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, ভদ্রলোকের কোন ক্ষতি হইনি, বরং বাহুডের মাংস অল্পপান হিসাবে ব্যবহার করায় তাঁর সন্তান সম্পূর্ণ নিবায়ন হইয়েছিল।

অনেকে মনে করেন যে, এতে কিছু অলৌকিকত্ব নেই। কারণ প্রাণী বা উদ্ভিদাদি সাহায্যে বোগ প্রতিষেধক ঔষধ প্রস্তুত করা হইবে। বাহুডও কোন কোন বোগমুক্তির জন্য ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়ে থাকে।

৬। ভুতের কবলে ভুতের ওবা।

উপবোক্ত পাটুলী গ্রামের মধ্যে অবস্থিত পীব একদিল শাহ্‌র স্মৃতি-স্থানের পাশে এক বিশাল জলাভূমি আছে। সেই জলাশয় এবং তার ওপারে নাকি

বয়েছে ভূত প্রেতের এক ঘাঁটি। বাজ্রে তো দুবে থাক্, নির্জন দুপূবেও কেউ বড় একটা সেখানে ঘাব না।

একদা অঞ্চলের বিখ্যাত ওঝার নাম কসিমুদ্দিন। ভূত-প্রেত নাকি তাঁর হুকুমে ওঠে-বসে—তাঁর বান্ধা। গভীর বাজ্রে নাকি তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করেন। প্রেতেরা তাঁর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা করে, কথাও বলে।

একবার মাছের মবশুমে তিনি সেই জলাভূমিতে মাছ ধবতে গিয়েছিলেন। বাত তখন সুগভীর,—সাথী তাঁর পুত্র আজগাব। অবশ্য আজগাব খুবই সাহসী এবং বলবানও।

জাল ফেলছে তো ফেলছে, একটিও মাছ পড়ছে না তাতে। কসিমুদ্দিন বুঝেছে যে মেছোভূত তাঁকে বিবর্ত্ত করছে। তিনি ধমক দিলেন সেই মেছো ভূতকে,—কিন্তু কোন ফল হল না। পুত্র আজগাব সিঁপ্ত হবে জালের স্নধ্যকার একটি মাছকে তীব্রগতিতে লাঠির আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে সেই মৎস্তাকৃতি ভূত বেদনায এক বিকট আওয়াজ করে এবং সে সেস্থান ত্যাগ করে জলাশয়ের ওপারে চলে যায়। সেখান থেকে তার সাথী অসংখ্য ভূত-প্রেতকে সঙ্গে নিয়ে আলেয়ার মতন হয়ে বণংদেহি ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসতে থাকে।

সে বাজ্রে কি যেন এক অব্যক্ত দুর্বলতা কসিমুদ্দিন সাহেবের সমস্ত দেহ-মন অসাড় করে দেয়। তিনি ভয় পেয়ে বান এবং পুত্র আজগাবকে বলেন,—“আজ ভাব খুবই খাবাপ। চল আমরা একদিল শাহের দরগাহে আশ্রয় নিই।”

তাঁরা আর বিলম্ব না করে দ্রুত পীবেব উক্ত পবিত্র স্থতিস্থানে এসে আশ্রয় নেন এবং একদিল শাহের নাম স্মরণ করতে থাকেন।

সেই ভূতের দল তাঁদেরকে নাকি ভাড়া করে এগিয়ে এসেছিল বটে কিন্তু পীবেব স্থানে প্রবেশ করতে পাবেনি। দূর থেকে খোনা খোনা শব্দে নাকি বলেছিল,—“দরগাহ না উঠলে তোদের আজকে কাদাব পুতে বাগ্‌তাম।”

ভাব হয়ে গৈলে বাপ-বেটা বাড়ীতে কিবে সকলকে এই ঘটনার কথা বলে।

অনেকে মনে করেন যে, মাঠের ওপারের অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক ও কসিমুদ্দিন গ্রন্থের মাছ ধরার স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব হওয়াটা স্বাভাবিক। এঙ্গেত্রে এক পক্ষ পশ্চাদ্দাপসরণ করে আশ্রয় নিল পীব একদিল শাহের নজরগাহে। পীব সাহেব তাঁর কাজের দ্বারা হিন্দু মুসলিমের নিকট এতপানি প্রদেয়

হায়েছিলেন যে বিপক্ষীয় ব্যক্তিগণ চড়াও হবে পীবেব নজবগাহে প্রবেশ এবং আক্রমণ কবেনি।

#### ৭। পীৱেৱ নামে ৱাখাল-ভোজ

উক্ত পাটুলিগ্রামেব বাখাল বালকবা প্রতি বছৰ কাজীপাডাব মেলাৱ প্ৰথম দিনে পাটুলীগ্রামেব উক্ত পীৱ-স্থতিস্থানে চড়ুইভাতি কবে থাকে। প্ৰবাদ যে, ৱাখাল-ৰূপে পীৱ একদিন শাহ্ পীৱ-স্থতিস্থানে নাকি অগ্ৰাগ্ৰ বাখাল-বালকদেৱ সঙ্গে চড়ুইভাতি কব্বতেন।

উক্ত গ্রামেব বাখাল বালকগণ দলবদ্ধভাবে বাডী বাডী ঘূৰে চড়ুইভাতিৰ উপকৰণ সংগ্ৰহ কব্বত। একবাব দেশে খুবই অভাব-অনটন দেখা দিলে গ্রামবাসীগণ তাৰদেবকে কোন প্ৰকাৰে সহায়তা কবেনি। পীৱেব স্থতি বক্ষায় প্ৰচলিত প্ৰথা ৱহিত হওযাব আশঙ্কাৰ দুখে তাবা দিশাহাবা হায়ে দলবদ্ধভাবে বাবাসত মহকুমা শাসকেব আদালত-সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং প্লোগান দিযে শাসক মহোদযেব দৃষ্টি আকৰ্ষণ কবে। শাসক মহোদয়, (কথিত যে তাঁকে সকলে অমৃত লাল বাবু বলে জানতেন) তাৰদেব কথা অবধান কবেন এবং অবিলম্বে সেই গ্রামেব মাতব্বব-স্থানীয় কহেকজন অধিবাসীকে ডেকে পাঠান। শাসক মহোদয় তাঁৰদেবকে বুঝিযে বলেন যে জীবন বক্ষাব জন্ত যতটুকু আহাৰ্য তাঁবা গ্ৰহণ কবেন তা পীৱেব নামে উৎসৰ্গ কব্বতঃ যদি চড়ুইভাতি কবা হয় তবে তাতে এদেব পদগোবব বুদ্ধি পাবে এবং স্বকুমাৰমতি বালকগণও পৰিতৃপ্ত ও আনন্দিত হবে। অন্তৰে তাঁবা যেন চিবাচৰিত প্ৰথাব লজ্জন না করেন।

এৱপব থেকে এই গ্রামে বাখাল ভোজপ্ৰথা আজিও (১৯৭১) প্ৰচলিত আছে।

#### ৮। মহিম ৱায়েৱ ৱাখাল

বাবাসতেব মহিম বায়, তাঁব গবব পাল বক্ষণাবেক্ষণেব জন্ত একজন বাখাল বেখেছেন। এই ৱাখালই যে ছত্ৰবেশী পীৱ একদিন শাহ্ তা কান্ৰো জানা ছিল না।

গৰুগুলিব বসবাসেব উপযুক্ত গোযালঘৰ না নিৰ্মাণ কবে দেওয়াম বা নানাভাবে তাৰদেব অমত্ৰ কবাম বাখাল পীৱ একদিন শাহ্ অসন্তুষ্ট হায়ে প্ৰতিবাদ



কবেন। ফলে উভয়ের মধ্যে বচসাব সূত্রপাত হয়। বচসাব শেষ পৰিণতিতে মহিম বায় গীর্ষ সাহেবকে প্রহার কবতে উদ্ধত হন। মহিম বায় তাঁকে নাগালের মধ্যে পান নি,—কাষণ গীর্ষ নাকি সামনেব সাতবাদেব পুকুরেব জলেব উপর দিয়ে খড়ম পাষে দ্রুত পাব হসে যান।

পরে রাজে গীর্ষ একদিল শাহ্ স্বপ্নে মহিম বায়েব 'নিকট' আপনাব পবিচয় দান কবেন।

এই ঘটনা প্রচাৰিত হওয়াব পর বায়-ষ্টেটেব লোকদেব মধ্যে চাঞ্চল্যোব সৃষ্টি হয়। পরবর্তী কালে বাজা বায় মোহন বায়েব ষ্টেট থেকে গীরের স্বৰ্ণে বহু গীর্ষোত্তর জমি প্রদত্ত হসেছিল।

## ৯। পাথর ভালে পুকুর জলে

শ্রীকৃষ্ণপুৰেব জমিদার চাঁদ খাঁব অসম্পূর্ণ মসজিদে স্থাপিত বিশাল এবং নিদারুণ ভাবী পাথর কালজমে ভেঙে পড়ে মাটিতে এবং পাশেব পুকুরে গড়িয়ে আসে। গীর্ষ একদিল শাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট এই পাথরটি-নাকি সচল ছিল। পাথরটি নাকি পুরেব জলে ভেসে বেড়াত। সাধারণ-মানুষ তাকে কখনো এ ঘাটে কখনও ওঘাটে দেখতে পেত। অথচ কোন লোক সে পাথরকে ধবতে পাবত না। কোন বয়সীর অশোচ আচরণে পাথরটিব চলা ফেলা কল্পাব সেই অলৌকিক শক্তি নষ্ট হসে গেছে। কালজমে সে পাথর দ্বিখণ্ডিত হসে যায়। কোন ব্যক্তি সেই পাথরকে নাকি তাঁব কটিদেশেব উপরে উত্তোলন কবতে পারেন নি। পুকুরেব জল অনেকখানি শুকিয়ে গেলে, চৈত্র-বৈশাখ মাসে একখানি পাথর আজিও পুকুরেব মধ্যে দৃষ্ট হয়।

## ১০। 'আশ্চর্য বীশের খুঁটি

গীর্ষ একদিল শাহেব যে বওয়ী সোধ এখন বসেছে প্রথম অবস্থায় তা ছিল একটি খড়ো ঘব মাত্র। গীর্ষ সাহেব এই ঘবেই অবস্থান কবতেন। এটিই তাঁব 'মাদিন্দুনি'। সেই খড়ো ঘরখানি মাঝে মাঝে 'অন্ততঃ প্রতি বৎসবে একবার কবে মেরামত কবতে হত'। 'একবার মেরামতিব চালেব বো এবং খুঁটি বদল কবাব সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল।

ঘবের মিস্ত্রি অর্থাৎ ঘবামি মাপসহ বো বা খুঁটি কেটে নিলেন। অস্ত্রান্ত কাজ সেবে পবে সেই মাপ ঠিক আছে কিনা যাচাই কবতে গিয়ে তিনি দেখতে

পেলেন যে সেই বাঁশখণ্ড নির্দিষ্ট মাপ অপেক্ষা বড় কিংবা ছোট হইবে গেছে। তিনি বিশ্বযে বিভ্রান্ত হইবে পীর, একদিল শাহেব শ্রবণ নিলেন। - পরে তিনি সেই বাঁশখণ্ড চালে লাগাতে গিয়ে দেখলেন যে তা ঠিক মাপসই হয়েছে। এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন তিনটি খুঁটি বহুদিন যাবত উক্ত দরগাহ স্থানে নাকি জীবিত অবস্থায় অর্থাৎ কাঁচা ছিল। - সাধারণ লোকে তা বহুদিন প্রত্যক্ষ করবেছেন। - কয়েক বৎসর পূর্বে, জনৈক বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি অশৌচ অবস্থায় ছুঁয়ে ফেলায় বাঁশ খণ্ড তিনটি শুকিয়ে যেতে থাকে। - বর্তমানে ( ১৯৭১ ) বাঁশ তিনটিব মাত্র দুটি আছে এবং তা দরগাহের সেরাযেতগণ পীবেব অলৌকিক কীর্তির নিদর্শন স্বরূপ একপাশে সমুদ্রে রেখেছেন।

### ১১। বসন্ত বাবুর বদাত্তা

বাবাসতেব অন্ততম স্বনামধন্য এলোপ্যাথু চিকিৎসক ডাঃ বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি আনুমানিক জিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে একদিল শাহের নজরগাহেব একপাশে তাঁর বসন্তবাটা নির্মাণ করাচ্ছিলেন। বাজমিজিদেব যিনি প্রধান ছিলেন, তাঁর নাম উজিব আলি। - মিজি সেদিন উক্ত-বাড়ীর ছাদ ঢালাই করছিলেন। - সে রাত্রিতে প্রায় বাবোটা-একটা - পর্বন্ত, দারুণ উদ্দীপনার মধ্য দিবে কাজ চলতে থাকে। - ফলে পীবেব একদিল শাহেব নজরগাহে প্রতিদিনকার মত ধূপ-বাতি দিতে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশ্বত হইয়ে যান। -

জ্যোৎস্না-প্রাবৃত গভীর, বাজি। - চাবিদিক নিস্তব্ধ। - উজিব আলী পেটে ঈষৎ বেদনা অনুভব করলেন। - তিনি আর-যুমাতে, পাবলেন না। - উঠে বসে কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁকে পাশখানায় যেতে হল। - দূর থেকে তিনি দেখলেন, সাদা আলখাল্লা পরিহিত দীর্ঘকায় এক ফকির নজরগাহেব সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। - কোঁতুহলী হইয়ে তিনি আবো নজরগাহের দেয়ালেন, - সেই ফকিরেব গায়েব বং ফবসা, মুখভবা সাদা গোফ-দাড়ি। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে অহুচ্চ স্ববে বলছেন, - “এখানে আজ এরা ধূপ-বাতি দিতে নিশ্চয়ই ভুলে গেছে। বোধহয় কাজে খুবই ব্যস্ত ছিল।”

- - কিছু খেমে তিনি আরো বললেন - “যাক, তাতে আব কি হয়েছে।”

- এর-পবই তিনি মাথা নীচু করে সেই এক-দরজাব নজরগাহেব মধ্যে প্রবেশ করলেন। - উজির আলি যেন হঠাৎ সন্ধি ফিবে গেলেন। তিনি সেই

দববেশকে দেখুৱাব জন্তু দ্ৰুত সেখানে গেলেন এবং ঘবেৰ মৰ্যে তাঁকে অহুসদ্ধান কবলেন, কিন্তু তিনি দেখলেন ঘৰটি জনমানব শূন্য। তিনি তৎক্ষণাৎ বাইৰে এদিক-সেদিক অহুসদ্ধান কবলেন, কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে না পেৰে বিশ্বম্বে হতবাক হৰে গেলেন।

মিজী উজিৰ আলী অবিলম্বে সাধী মিজিদেব ডেকে তুললেন। তাৰে প্ৰত্যেককৈ প্ৰশ্ন কৰে জানলেন যে সেদিন কেউই সেই নজৰগাহে ধূপ-বাতি দেয়নি। উজিৰ আলী সাহেব তখনই সেখানে ধূপ-বাতি দেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰেন।

পৰদিন সকালে উজিৰ আলী সাহেব ঘটনাটি সকলেৰ নিকট বিবৃত কৰেন। ডাঃ বসন্তকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ও তা অবগত হন। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় তাঁৰ বসন্তবাটি নিৰ্মাণেৰ সাধে সাধে কাঁচা গৃহটি পাকা গৃহে ৰূপান্তৰিত কৰেন। তিনি সেই সাধে উক্ত নজৰগাহে নিযমিত ভাবে ধূপ-বাতি দিৱাৰ বন্দোবস্ত কৰেন। সে বীতি আজো (১৯৭১) প্ৰচলিত আছে।

## ১২। কে এই দৱবেশ

উপবোক্ত ডাঃ বসন্তকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়েৰ পুত্ৰ শ্ৰীমান কনককুমাৰ চট্টোপাধ্যায় একদিন সন্ধ্যায় দোতলাৰ ঘৰে বসে পাঠ অভ্যাস কৰছিলেন। কখন তাঁৰ তদ্ভাৱাৰ এসেছিল তা তিনি জানেন না। হঠাৎ তদ্ভাৱা টুটে গেলে সামনে দেখতে পান নজৰগাহেৰ ছাদেৰ উপৰ বসে আছেন সাদা আলখালা পৰা দীৰ্ঘকাষ এক ফকিৰ। তিনি ভয় পেৰে চীংকাৰ কৰে ওঠেন। চীংকাৰ শুনে সেখানে ছুটে আসেন তাঁৰ মা অৰ্থাৎ ডাঃ বসন্তকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়েৰ পত্নী। ঘটনাটি তিনি মাতাৰ কাছে বলেন। ততক্ষণে সে মূৰ্তিটি অদৃশ্য হৰে যায়। শ্ৰীমান কনকেৰ মা শুধু বললেন,—“এই ফকিৰ বৈশদাবী দববেশই হলেন পীৰ একদিল শাহ্।”

## ১৩। একদিল শাহেৰ আঁইট

পীৰ একদিল শাহ্ বাখাল বেণে আনোৱাৰপুৰ পৰগণাৰ বিভিন্ন মাঠে গৰু চৰাতেন। বৰ্ষাৰ দিনে গৰু নিৰে তিনি খুব দুৰবৰ্তী মাঠে যেনে না। কাজীপাড়াৰ দক্ষিণ প্ৰান্তে বৰ্তমান বাবাসত সদৰ হাসপাতালেৰ নিকটেৰ মাঠে বৰ্ষাৰ দিনগুলি কাটাতেন। তিনি গৰুগুলি মাঠে ছেড়ে দিনে ভগিৰ আইলেৰ উপৰে উৰু কৰা টিপিৰ উপৰ বসে থাকুতেন। এখানে বসতেন,

কাবণ মাঠভরা থাক্ত প্যাচপেচে কাদা। মক্কী রাখাল বালকগণ এই সব উর্চ স্থানকে পীর একদিল শাহেব স্বপ্নে যথেষ্ট সমীহ কবত। এই উর্চ টিগিগুলি স্থানীয় পবিত্রায়ায 'আইট' বলে পবিত্রিত। উক্ত মাঠে এখনও বেঁগব টিগি পবিত্রিকিত হয় তা কালক্রমে "একদিল শাহেব আইট" নামে প্রসিদ্ধি লাভ কবেছে। শুনা যায়, কোন কোন ভক্ত নাকি এই আইটে মানত বা শিবনি দিবে থাকেন।

### ১৪। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী একদিল শাহ

১২৬৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের যে দাঙ্গা বেধেছিল তা বাবাসভেব কিছু কিছু অকলেও ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি দুর্বৃত্তবা সেই বিবাক্ত হওঁয়া কাজীপাড়াতেও প্রসারিত কবতে নাকি চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাৎখে সে আশা ফলবতী হয়নি।

কাজীপাড়াও তৎসংলগ্ন গ্রাম সিত্তি, বড়া প্রভৃতি গ্রামের হিন্দু-মুসলমানগণ শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা এমত বিপদেব সময় কি কববেন তা বেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। হিন্দুবা মনে মনে বল্লেন,—“পীর বাবা একদিল শাহ্ আছেন, আমাদেব ভয় কিসেব।” মুসলমানবা কেহ কেহ বল্লেন—“পীর একদিল শাহেব দোয়াব আমাদেব এখানে কোন দুর্বৃত্ত কিছুই কবতে পাববে না।” হিন্দু-মুসলমান সকলে মিলে আত্মবক্ষার্থে প্রস্তুত হলেন।

সেই রাত্রি ছিল খুবই আশঙ্কাপূর্ণ। জ্যোৎস্নান্নাবিত বাজে দুর্বৃত্তবা নাকি মারাম্মক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে কাজীপাড়াব ভিতবে প্রবেশেব উত্তোপ কবেছিল। তাঁরা হাসপাতালেব উত্তর-পূর্ব নিকেব মাঠেব মধ্যদিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। কাজীপাড়াব সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁরা অল্পভব কবে, বেন বহুলোক কাজীপাড়াব সীমাবেখা ববাবব বীবদর্পে ঘোবা ফেরা কবছে। কিম্বৎপবে তাঁরা দেখতে শেল মায়া আলখাল্লা পবিহিত দীর্ঘকাষ বোদ্ধপুরুষের এক বিরাট বাহিনী সদর্পে মার্চ কবে ঘোবা ফেরা কবছে। তাঁরা আবা স্তনতে পায় বাইকেলেব গুলীব কষেকটি আওয়াজ। এই পবিস্থিতিতে তাঁরা ডম পেয়ে সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করে।

পবে কাজীপাড়াব হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ উপবোক্ত ঘটনার কথা লোক মুখে জেনে বুঝতে পাবেন যে এটি পীর একদিল শাহেব অর্ন্তে কিং শক্তিবই পবিত্র মাত্র।

## ১৫। পীরের পায়রা হত্যার জের

পীর একদিল শাহেব দরগাহে বহু পায়রা বাস কবে। অনেক ভক্ত প্রতিদিন, বহু অভাব-অনটন সত্ত্বেও পায়রাদেব আহাবের জন্ত ধান বা গম দিয়ে থাকেন। পায়রাগুলি একদিল শাহেব পায়রা বলে খ্যাত। পীরের পায়রা বলে কেউ তাদেবকে হত্যা কবে না।

একবার এক পায়রা-লোভী এবং অহঙ্কারী, পীরেব দরগাহ থেকে একটি পায়রা ধবে এবং সে সেটিকে হত্যা কবে বারান্দা কবাব জন্ত প্রস্তুত হয়। প্রথমে সে উনানের কড়াই তেলেব পাক মেবে নেব। পবে সেই তেলে উক্ত পায়রাব মাংস অর্পণ কবা মাত্র কড়াই দাউ দাউ কবে আগুন জলে ওঠে। সে আগুন আয়ত্তেব বাইবে চলে গিবে আশ-পাশেব সমস্ত খেডেব চালের ঘরগুলি জলে ওঠে। অতি অল্পক্ষণেব মধ্যে সমস্ত ঘব ছাই হয়ে মাটিতে মিশে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পীরেব খেডেব চালের দরগাহ গৃহটিই এদের মধ্যে থেকেও বক্ষ পায়।

## ১৬। পীরের জবাব গ্রহণের ফল

(ক) বাবাসত মহকুমাব জাফবপুর গ্রামে অবস্থিত পীর একদিল শাহের নজরগাহেব জমিতে একটি প্রকাণ্ড অশ্বখ গাছ ছিল। একবার চৈত্রের ঋতুে ঐ গাছ থেকে বহু শুকনো ডাল ভেঙ্গে পড়ে মাটিতে। একজন-মজুর সেই কাঠ সংগ্রহ করে বাড়ীতে নিষে যায়। রাজে সে উক্ত কাঠের অর্ধেক পরিমাণ কাঠ জালিষে খানা প্রস্তুত করে। আহাবাদি সম্পন্ন করে রাজে নিদ্রাকালে ঐ ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে যে যেন কে একজন বাগদীব মেঘে তাকে বলছে,—“পীরেব অশ্বখ গাছেব ডাল জালিষে তুমি মহা অপবাদ কবেছ। বাকী কাঠ কিষে না দিলে তোমার ভীষণ ক্ষতি হবে।”

এই-কথা শোনা মাত্র তার নিদ্রাভঙ্গ হল। কোন প্রকারে অনিদ্রায় রাজি প্রভাত হলে উক্ত ব্যক্তি বাকী কাঠেব বোঝাটি লেই অশ্বখতলায় ফিরিয়ে বেবে এসেছিল।

খ) জাফবপুর গ্রামেব পাশেব গ্রামের নাম কিলিশপুর। উক্ত গ্রামের অধিবাসী মোহাম্মদ মকবুল হোসেন একবার অল্পবয়সে একটি গর্হিত কাজ কবেছিলেন। পীরেব ঐ কাঠ নিলে ক্ষতি হতে পারে একথা তিনি বিশ্বাস

কবতেন না। তিনি একবার গর্বভাবে ঐ গাছেব শুকনো কাঠ নিয়ে বাড়ী যান,—ইচ্ছা ঐ কাঠ তিনি জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার কববেন। কয়েক ব্যক্তি ঐ কাঠ নিয়ে যেতে মকবুল সাহেবকে নিষেধ কবেছিলেন, কিন্তু তিনি কারো কথা গ্রাহ্য কবেন নি।

মকবুল সাহেব যেদিন, বিকেলে, সেই কাঠ, নিয়ে গিষেছিলেন। তাব পরদিন ভোরে দেখা গেল কাঠের বোঝাটি পীবেব সেই অশ্বখ গাছের নীচে পড়ে আছে। লোকে তাকে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি। মকবুল সাহেব, নাকি বলেছিলেন যে কে যেন সারা রাত্রি ধবে তাঁকে ভয় দেখিষেছিল। তাই, তিনি সেই বাত্রেই, কাঠ বখাস্থানে, ফেরৎ দিয়ে, তবেই-নিশ্চিন্ত্যএবং নির্ভয় হন।

গ) পঞ্চাশ বছরও অতিক্রান্ত হয় নি,—গোলাম রব্বানী নামক স্থানীয় এক ব্যক্তি পীবেব নামে পতিত কয়েক কাঠা জমিতে চাষ কবতে মনস্থ করে। পাশের লোকে তাকে নিষেধ কবেছিলেন,—কিন্তু সে কারো বাধা মানি নি। সে সকলকে অগ্রাহ্য কবে কয়েকটি নারকেলের চাষ রোপণ করেছিল। এব কিছুদিনের মধ্যে সে ক্ষম-কাশ রোগে ব্যারাজ্জভাবে আক্রান্ত হয়। ভব পেয়ে সে ঐ জমি থেকে নারকেল চারাগুলি তুলে ফেলে। তবুও সে রোগমুক্ত হতে পাবেনি। সেই ক্ষম-কাশ রোগেই তাব জীবনবাযু বহির্গত হযেছিল।

ঘ) জাকরপুবেব ঐ নজরগাহ স্থানে একটি বহু পুবাতিন বাবলা গাছ ছিল। দূর থেকে গাছটিকে একটা মোটা কালো লোহাব পাকানো স্প্রিং-এব মতন দেখাতো। কালক্রমে গাছটি শুকিষে মরে বায। এক ব্যক্তি ঐ বাবলা গাছেব গোড়ায় এক ভাড় কপার টাকা পায। সে গোপনে ঐ সমস্ত টাকা পেয়ে ধনী-লোক হযে ওঠে। হঠাৎ আকুল-ফুলে, কলাগাছ হওয়ার সাধারণে কিছু বিস্ময় বোধ কবল, কিন্তু সে রহস্ত বৌদীন-গোপন-রইল না।

সে ব্যক্তি অল্পদিনের মধ্যেই কি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় এবং নিজের অপরাধের কথা বুঝতে পেবে পীবেব শরণাপন্ন হয, কিন্তু পীর তাকে মৃত্যুর মাধ্যমে মুক্তি দিয়ে ক্ষমা করেছিলেন।

## ১৭। ডাংগুলি-এয়ানা মারা

বাখাল বেশদারী গীত একদিল শাহ্ তাঁব সদী বাখাল বালকগণের সংগে ডাং-গুলি খেলতেন। “ডাং” হল ক্রিকেট খেলায় ব্যবহৃত ব্যাটের ন্যায় ব্যবহার্য এক থেকে দেড় হাত লম্বা লাঠি বিশেষ। “গুলি” হল ক্রিকেটের ব্যাটের সঙ্গে খেলবার উপযোগী বলের সদৃশ মাজ চাব-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা শক্ত দণ্ড বিশেষ। গীত একদিল শাহ্ ডাং-গুলি খেলার সময় তাঁর ডাং-এর সাহায্যে এই গুলি-কে আঘাত কবে বহু দূবে নিক্ষেপ করতেন। কখন কখন তিনি সেই ‘গুলি’ পাঁচ-ছয় মাইল দূর পর্যন্ত নিক্ষেপ করতে পাবতেন। প্রবাদ, পীর একবার জাকবপুব অঞ্চলে খেলা করবার সময় তিনটি গুলি এমন জোরে নিক্ষেপ করেছিলেন যে সেই তিনটি গুলি যথাক্রমে আবদেলপুর, পাটুলী ও হুমাইপুর গ্রামে এসে পড়েছিল। বলা বাহুল্য, উক্ত তিন গ্রামের যে যে স্থানে ‘গুলি’ পড়েছিল সেই সেই স্থানে স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ উঁচু মাটির টিপি বয়েছে। কেবল হুমাইপুর গ্রামের মাটির টিপিটি নাকি কয়েক বৎসর পূর্বে কে বা কারা বিনষ্ট করে ফেলেছে। ডাংগুলি খেলার সময়ে ডাং-এর সাহায্যে ‘গুলি’কে আঘাত করে সজোরে দূবে নিক্ষেপ কবাকে স্থানীয় পবিভাষায় বলে ‘এয়ানা-মাবা’। ‘এই এয়ানা মাবাকে লক্ষ্য কবে এই অঞ্চলে যে প্রবাদ আছে সেটি এইরূপ,—

এয়ানাগুলি ব্যানায় যা

যেদিক পাবিস সেদিক যা,

নিলাম নাম একদিল গীত

চলল গুলি হুমাইপুর।

পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত আব একখানি গ্রন্থ ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের পয়লা জাহ্নমারী তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তকের রচয়িতা কাজীপাড়া নিবাসী কাজী সাদেক উল্লাহ্। তিনি তাঁর পুস্তিকায ভূমিকা ও কিছু নিজ বক্তব্যের সাথে নিম্নলিখিত শিবোনামাক্তিত গল্প স্থান দিবেছেন,—

১। বাখাল গিরি

২। চাষী বিন্দু

৩। জাহাজ ডুব

৪। বারাসাতের বুকে

- ৫। জীবিত বাঁশেব কাহিনী
- ৬। পবিত্র পুকুরেব কাহিনী
- ৭। চোবেব সাজা
- ৮। বাজা বামমোহন বাষেব পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক জমিদান
- ৯। প্রাণ পেল ধড়ে
- ১০। সজাগ দৃষ্টি

তাঁর পুস্তিকাব কয়েকটি গল্প আব্দুল আজীজ আল্ আমোন সাহেবেব “ধন্ত জীবনের পুণ্য কাহিনী” নামক পুস্তকে বিবৃত গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত বলে মনে হয়। “বাবাসতেব বুক্” শীর্ষক গল্পে তিনি যা পবিবেশন করেছেন তার সঙ্গে এবং ‘বন্ত জীবনের পুণ্য কাহিনী’ পুস্তকে পবিবেশিত “বসন্ত বাবুর বদান্ততা” শীর্ষক গল্পেব সঙ্গে বসন্ত বাবু একমত নন বলে তিনি নিজে যে কাহিনী আমাকে শুনিযেছিলেন তা স্থানীয় কিছু কিছু লোকেব কাছ থেকে মিলিয়ে নিয়ে আমি এই পুস্তকেব পূর্বেই পবিবেশন কবেছি।

---



## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

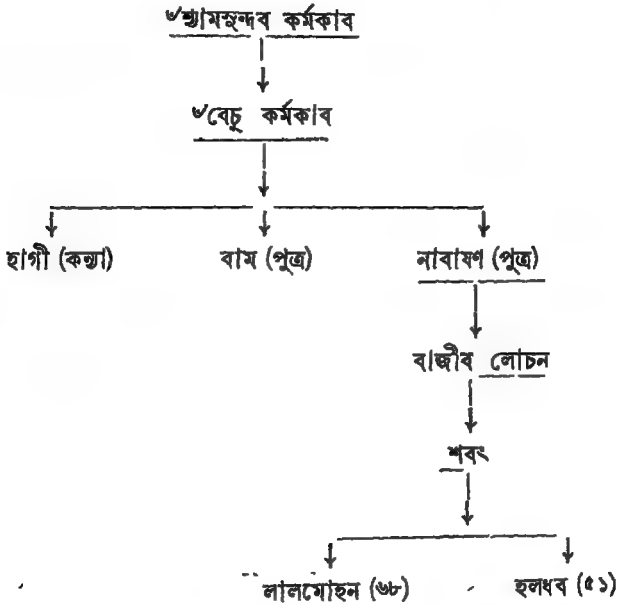
### কান্ত দেওয়ান

পীর কান্ত দেওয়ান বাজী বাবাসত মহকুমার আমডান্দা থানাধীন আদহাটা নামক গ্রামের জাগ্রত পীর। এতদ্ অঞ্চলে তিনি দেওয়ানজী নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি কোথাকার লোক তা জানা যায় না। আদহাটা গ্রামের পরলোকগত বেচু কর্মকারের বাড়ীতে তিনি একজন সাধারণ ফকিরের বেশে আগমন করেন। বংশ পরম্পরায় উক্ত কর্মকারের 'সন্তান-সন্ততিগণ' শুনে 'অসিছেন' যে ফকির 'বেশে' দেওয়ানজী 'যখন' আদহাটা গ্রামে 'আলেন' তখন 'তাঁর' বয়স 'ছিল' প্রায় 'পঞ্চাশ' বছর। 'বেচু' কর্মকার উক্ত ফকিরকে বাড়ীর দহলিজে থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। 'বেচু' কর্মকারের কোন সন্তান-সন্ততি না থাকায় মনের দুঃখে দিন কাটাচ্ছেন জেনে দেওয়ানজী তাঁকে সন্তান লাভের আশ্বাস দেন। কয়েক বছরের মধ্যে বেচু কর্মকারের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। বেচু কর্মকারের কন্যা, দেওয়ানজীর খুবই স্নেহেব পাত্রী ছিল। দেওয়ানজী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরতেন সেই কন্যাটিকে নিয়ে। তিনি গ্রামের সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীর রোগ-পীড়ায় ওষুধ-পত্র দিতেন।

হিন্দুর বাড়ীতে মুসলমান পীর থাকায় গ্রামের জনৈক ব্যক্তি বেচু কর্মকারকে আপত্তিকর কথা বলেন। তাতে তাঁর নাকি শান্তি পেতে হয়েছিল। ফলে দেওয়ানজী পরে গ্রামের এক মুসলিমের বাড়ীতে গিয়ে থাকতেন। পাশের গ্রাম উলুডাঙ্গাতেও তাঁর আস্তানা ছিল।

পীর কান্ত দেওয়ান, ভক্ত বেচু কর্মকারের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তেলপড়ার জন্ম দুর্লভ এক মন্ত্র দান করেছিলেন। সেই মন্ত্রপূত তেল কেউ ভক্তি-ভরে গ্রহণ করলে তার নানাবিধ রোগ নিরাময় হব বলে লোকের বিশ্বাস। বিশেষতঃ বিবিধ প্রকার ক্ষত এই মন্ত্রপূত তেলের ব্যবহারে আরোগ্য হয় বলে শোনা যায়।

দেওয়ানজী এতদ্ অঞ্চলে আত্মমানিক দেড়শত বৎসব পূর্বে আগমন কবেছিলেন। পবলোকগত বেচু কর্মকাবের নিম্নলিখিত বংশ তালিকা থেকে এইরূপ অত্মমান কবা যায়।



দেওয়ানজী আদহাটা গ্রামের মুনশী বদরুদ্দীন সাহেবের পূর্বতন কোন এক পুরুষের সময়ে দেহত্যাগ করেন। মুনশী সাহেবের বাড়ীর পাশেই দেওয়ানজীকে সমাধিস্থ করা হয়। সে দরগাহ গৃহটি আজো বিদ্যমান।

পীর কান্ত দেওয়ানের বওজাব উপর তাঁর ভক্তগণ একটি পাকা দরগাহ গৃহ নির্মাণ কবেছেন। মুনশী বদরুদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তি দেওয়ানজীর দরগাহের সেবাযেত। প্রতিদিন বওজা শবীকে ধূপ-বাতি দিখে তাঁরা জিযাবত করেন। জনসাধারণ পীরের নামে দরগাহে শিরনি, হাজত ও মানত প্রদান করেন। প্রতি বৎসর এগাবোই মাঘ তাবিখে পীরের নামে বিশেষ উরস অহুটান উদ্ঘোষিত হয়। তিনদিন ধবে উবস চলে। এ উপলক্ষ্যে মেলা বসে। তাঁর নামে প্রদত্ত পীরোস্তব জমির পবিমাণ প্রায় দুই বিঘা। কর্মকাব পরিবারের ভরফ থেকে বিশেষ শিরনি বা পূজার সামগ্রী উরসের সময় পীরের দরগাহে

প্ৰেৰিত হয়। হিন্দু-মুসলিম সকল ভক্ত তাঁকে অপবিসীম শ্ৰদ্ধা কৰেন। তাঁৰা হাজত, মানত এবং শিবনি দিষে থাকেন।

গীৰ হজৰত কান্ত দেওবান বাজীৰ আলৌকিক কীৰ্ত্তি-কলাপ সম্পৰ্কিত কিছু লোক-কথা। এতদ্ অঞ্চলে প্ৰচলিত আছে। তাদেব দু'একটি এখানে উল্লেখ কৰা গেল।

### ১। দেওবানজীৰ উদ্বারতা

জৰ্নৈক ব্যক্তি একদিন বেচু কৰ্মকাৰকে বলল,—“হিন্দু হযে নিজেৰ বাজীতে মুসলমান বেখেছে এমন অত্মায় বৰদাস্ত কৰা যাবে না। তোমাকে একঘৰে কৰা হৰে।”

কিছুদিন যেতে না যেতে সেই ব্যক্তিৰ কি একটা বোগে অকস্মাৎ মৃত্যু হল।

মৃত দেহেৰ উপৰ সাদা কাপড় বিছিয়ে ঢেকে দেওয়া হযেছে, খাশানে নিষে যাওবাব উদ্যোগ হছে। এমন সময় দেওবানজী কাঁচা কৰ্ণিব একটা ছড়ি হাতে নিষে ঘূৰতে ঘূৰতে সেখানে এসে হাজিব হলেন। তিনি সেই ঘটনাটি জানলেন। বললেন—“ও বাঁচবে।”

এই বলে তিনি হাতেৰ ছড়ি দিষে কান্ধনেৰ উপৰ স্পৰ্শ কবলেন। পৰে তিনি স্থানীয় কোন ব্যক্তিকে বেশ কিছু তেঁতুল-গোলা খাওয়াতে বললেন। তাঁৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী যথাবীতি ব্যবস্থা নেওয়া হলে দেখা গেল কিছুক্ষণেৰ মধ্যে সেই ব্যক্তিৰ জীবন সঞ্চাব হযেছে। এই ভাবে সে ব্যক্তি ধীৰে ধীৰে জীবন ফিৰে পেৰে স্বস্থ হযে উঠল।

### ২। সান্ন গাদান্ন গঙ্গা দৰ্শন

বেচুৰ্মকাৰেব জীব একবাব খুব ইচ্ছা হল যে তিনি গঙ্গা দৰ্শনে যাবেন। সেবাব ছিল চুড়ানণিৰ যোগ। বাত্ৰি প্ৰভাত হলেই সে যোগ লাগবে। অথচ গঙ্গা এ-গ্ৰাম থেকে বেশ দূৰে প্ৰবাহিত। সব গোছ গাছ কৰে এত অল্পক্ষণে গঙ্গা দৰ্শনে যাওয়া সম্ভব নহ। বেচু কৰ্মকাৰেব জী খুব বিমৰ্ষ হযে পডলেন।

প্ৰাতে দহলিজে বসে দেওবানজী সে মানসিক ব্যথাৰ কথা শুনলেন। কিছুক্ষণ পৰে তিনি বেচু কৰ্মকাৰেব জীকে ডেকে পাঠালেন। গঙ্গা দৰ্শনেচ্ছ

সেই মহিলা এলেন বাড়ীর বাইরে। দেওয়ানজী উঠানেব পাশেব সাব ফেলা গর্তেব দিকে আঁতুল দিযে দেখিযে বললেন,—“ওই দেখো গন্ধা।”

সত্য সত্যই সেদিকে তাকিযে বেচু কর্মকাবের স্ত্রী দেখতে পেলেন প্রবাহিতা গন্ধা, দেখতে পেলেন গন্ধাদেবীর মূর্তি। আবো দেখতে পেলেন বহু পুণ্যার্থীব অবগাহন-দৃশ্য। তিনি বললেন, “আমাব জীবন সার্থক হযেছে।”

#### ৩। কবরের লোক বাণাঘাটের পথে পথে

আদহাটা গ্রামেব পার্শ্ববর্তী গ্রামেব নাম খড়ুর। এই গ্রামের বাসিন্দা ভদ্রলোকটিব কাজ-কাবাব বাণাঘাটে। প্রতিদিন তিনি খড়ুব থেকে বঙনা হযে আদহাটা গ্রামেব মুনশী সাহেবেব বাড়ীব পাশ দিযে বাণাঘাটে যাতায়াত কবেন। ফকিব দেওয়ানজীব সাথে মাঝে মাঝে তাঁব দেখা সাক্ষাৎ হত।

বেশ কিছুদিন বাড়ীতে থাকাব পব সেদিন তিনি কার্যব্যপদেশে এগেছেন বাণাঘাটে। হঠাৎ দেওয়ানজীব সঙ্গে দেখা। দেওয়ানজী একটা ছোট ছেলের হাত ধবে বাস্তা দিযে চলেছেন। তিনি ফকিব সাহেবেব কুশাল জিজ্ঞাসা কবলেন। ফকিব দেওয়ান দুঃখেব সঙ্গে বলবেন,—“ওবা আমায় বিদায় দিযেছে।”

ভদ্রলোক কিছু ব্যস্তিত হযে বাণাঘাট থেকে ফিবলেন সেদিন।

পথিমধ্যে আদহাটা গ্রামে এসে মুনশী সাহেবেব বাড়ীব উঠানে দাঁডিযে তিনি ফকিব দেওয়ানজীব সাথে সাক্ষাত হওয়া ও তাঁব দুঃখেব কথা বললেন প্রতিবেশী কয়েক জনেব কাছে। প্রতিবেশীবা বললেন—“সে কি কথা! দেওয়ানজী তো বেশ কিছুদিন হ’ল ‘এস্তেকাল’ কবেছেন। শুধু তাই নয়,—কিছুদিন হল মুনশী-বাড়ীব একটা ছোট ছেলে জলে ডুবে মাঝা গেছে।”

ভদ্রলোক লাফিযে উঠে বললেন,—“হ্যা ঠিক। আমি তো দেওয়ানজী আব এই বাড়ীর সেই চেনা ছেলোটিকেই দেখলাম।”

উপস্থিত প্রতিবেশীগণ বলাবলি কবতে লাগলেন,—“এ কি কবে সম্ভব!”

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### কালু গীৱ

কালু নামক একব্যক্তি গীৱ মোবাৱক বডখী গাজীৰ সহচৰ ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই বসিবহাট মহকুমাৰ হাসনাবাদ থানাৰ অন্তৰ্গত কালুতলা গ্রামেৰ নজবগাহ-স্থানেৰ সেৱাষেতগণেৰ নিকট কালু দেওয়ান নামেই পৰিচিত।

তিনি কালুগাজী। তিনি বডখী গাজীৰ সগোদৰ ভাই নন। বডখী গাজীৰ সঙ্গে তাঁৰ সঠিক বংশগত সম্পৰ্ক খুঁজে পাবা যায় না। তাঁৰ জন্ম, মৃত্যুৰ তাৰিখও কিছু পাবা যায় না। কোথাৰ তিনি জন্মগ্ৰহণ কৰেছিলেন বা কোথাৰ তাঁৰ মৃত্যু হৰেছিল তাও অজ্ঞাত।

কালু দেওয়ানেৰ ভক্তগণ তাঁৰ স্মৃতিৰ উদ্দেশে উক্ত কালুতলা গ্রামে গ্ৰাম একবিঘা জমি পতিত ৰেখেছেন। সেখানে মাটিৰ ছোট একটা টিপির পাশে বহু পুৰাতন কয়েকটি বাবুলা গাছ আছে। ভক্তগণ সেখানে ধূপ বাতি প্ৰদান কৰেন। উক্ত নজবগাহ-স্থানেৰ বৰ্তমান (১৯৭০) সেৱাষেত মহম্মদ হাজেৰ গাজী। উক্ত গ্রামেৰ শ্ৰীঅমল্যচৰণ দাস প্ৰমুখ বাৎসৰিক মেলাৰ তত্ত্বাবধান কৰেন। 'প্ৰতি বৎসৰ পৌষ সংক্ৰান্তিতে' একদিনেৰ 'বিশেষ উৎসব' পালিত হয়। এই উৎসব বা মেলাৰ দুবদুৱান্ত থেকে 'হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ' আগমন কৰেন। সেই মেলাৰ জমায়েত জনসংখ্যা প্ৰায় দু'হাজাৰ। ভক্তগণ সেখানে হাজিত, মানত ও শিৱনি দিবে থাকেন। কোন কোন অঞ্চলেৰ লোক কালু দেওয়ানেৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰে তাতে ভক্তি অৰ্পণ কৰেন। তাঁৰ 'থানে' দুপ, বাতাসা, ফল প্ৰভৃতি ও প্ৰদত্ত হয়।

কালু দেওয়ানকে কেন্দ্ৰ কৰে কোন সাহিত্য ৰচিত হৈছে বুলে শোনা যায় না। কালু-গাজী-চম্পাবতী নাটকে কালু নামটি প্ৰথমেই লিখিত হলেও তাতে গাজীৰ চৰিত্ৰই প্ৰাধান্য লাভ কৰেছে। সে আলোচনা গাজী সাহেবেৰ আলোচনাৰ মধ্যে কৰা হৈছে। কালু-গাজী মঙ্গলে বডখী মোস্ত,

বাঘ মঙ্গলে তিনি দক্ষিণ বাঘেব মিজ, কুম্বীৰ দেবতা, গাজী মঙ্গলে তা না হলেও জলেব সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য নহ।

গীৰ মোবাবক বডখা গাজী একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে সম্পর্কেই হোক কালু যে তাঁর জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন এটিও স্বাভাবিক। তবুও কালু নামক লোকটির সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

আঠাবো ডাটির অধিপতি দক্ষিণ রাঘেব বন্ধু হিসাবে দেখা যায় কালু নামক এক ব্যক্তিকে। দক্ষিণ রাঘের নিকট তিনি কালু রাঘ। একদিকে কালুগাজী যেমন বডখা গাজীর ভাই বলে কথিত, অল্পদিকে কালুবাঘ আবার দক্ষিণ বাঘেব ভাই বলেও কথিত। অর্থাৎ অল্পমান কবা চলে যে ‘কালু’ নাম ধারী যে কোন এক ব্যক্তি ঐতিহাসিক নাযকেব পরামর্শদাতা, সহচর, বন্ধু বা জ্যেষ্ঠ সহোদরেব ভূমিকা নিয়ে আপন কর্তব্য সম্পাদন করতেন।

সম্ভবতঃ পৰবর্তী কালে দুই ভরকের দুই সহচর বা দুই কালু, কোথাও মিশ্রভাবে, কোথাও বা এককভাবে জনগণেব সম্মুখে প্রতিভাত হন। তাই মূর্তিৰ বর্ণনায দেখতে পাওয়া যায়,—

“কালুবাঘের মূর্তি অতি স্নন্দর ও বীরোচিত। মাথায় পাগড়ী বা উক্কীষ, বাবরী চুল, রং ফর্সা বা হলুদে, কানে কুণ্ডল, কপালে তিলক, চোখ দুটি বড় বড়, নাক টিকলো, গৌফ জোড়া কান পর্যন্ত বিস্তৃত ও চওড়া, দাড়ি নেই। পোষাক পেরাণিক সময় দেখতাব মত দুই হাতে টাঙ্গি ও ঢাল, কোমরবন্ধে নানা রকম অস্ত্র-শস্ত্র ঝুলানো, পিঠে তীর থলুক। বাহন ঘোড়ক, কোন কোন ক্ষেত্রে বাঘ বা কুম্বীৰ। আবার অস্ত্র ক্ষেত্রে ভিন্ন মূর্তিতেও দেখা যায়। অবশ্য তা উক্ত দুই জেলাৰ (চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর) মুসলমান প্রধান অঞ্চলেই। ঐকপ স্থানে কালু রাঘ, বডখা গাজীৰ ভাই বা সহচর রূপে হাজত সেলাম আদায় কবেন। তখন তাঁব বং হয কালো, গালে হুর দাড়ি দেখা যায়, নামও বদলে রাঘ, কালু বায় হন মগব গীৰ “কালু গাজী।”

“আবাব কোন কোন জেলায কালু রাঘকে ধর্ম ঠাকুরেব সাথে নিশ্চিত হতেও দেখা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তিনি আদি যুগেব বাঘকে ত্যাগ করেন না।”৩৮

কালু সম্পর্কে আরো কয়েকটি বক্তব্য লক্ষ্যীয়,—

১। দক্ষিণ রায়ের ভাই বা বন্ধু ছিলেন কালু বাঘ। এই কালু রায়ের সঙ্গে গাজীৰ সহচর কালুর কোন সম্পর্ক নেই।<sup>৫৩</sup>

২। কেউ বলেছেন দক্ষিণ রাঘ ও কালু বাঘ অভিন্ন ব্যক্তি। [ঢাকা বিভূষা, ভলিউ-৩, নং-৩, পৃষ্ঠা ১৪৮]

৩। রাঘ মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণ বাঘ নিজে কালু রাঘ কর্তৃক হিজলীতে প্রেরিত হইতেন। [বিশ্বকোষ, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮২]

অতএব বুঝা যায় যে কালুগাজী এবং কালু বাঘ একই ব্যক্তি নন। আবাব কালুগাজী ও কালু দেওয়ানের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানা যায় না। কালুতলা গ্রামাঞ্চলের কারো কাবো ধারণা যে—কালু, বড়খাঁ গাজী ও চম্পাবতী যখন সাতক্ষীরার লাবঙ্গা গ্রামাঞ্চলে আসেন তার অতি অল্প-কাল মধ্যে চম্পাবতী হতে কালু ও গাজী বিচ্ছিন্ন হন। সাধক ফকিরের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বড়খাঁ গাজী, চম্পাবতী-প্রেমে নিমগ্ন হওয়ায় কালু কিছুদিন তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন। সেই সময়ের কোনো একদিন কালু এই গ্রামের উক্ত স্থানে এসে অবস্থান করেছিলেন বলে অনেকের অভিমত।

কালু দেওয়ান সম্পর্কিত একটি মাত্র লোক-কথা কালুতলা অঞ্চলে প্রচলিত আছে। লোক কথাটি এইরূপ,—

### ১। বাঘ ও সাপের প্রেম নিবেদন

কালুতলা গ্রামের নজবগাহ বা দরগাহ স্থানে যে টিপি আছে সেখানে গজীব বাজে এক অলৌকিক ঘটনা নাকি অনেকে ঘটতে দেখেছেন। শুনা যায়, কালু দেওয়ানের নিজস্ব একটি বাঘ ও একটি সাপ ছিল। বাঘটি বিবর্ত কাষ। সে মাঝে মাঝে বাজে এই দরগাহে এসে সেলাম জানাত এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে যেত। আব সাপটিও ছিল বিশাল কাষ। তাব মাথায ছিল বেশ বড় একটি মানিক। কোন কোন দিন সেই বাঘ বা সাপ পথ চলতি লোকের সামনে পড়েছে বটে, কিন্তু সে নাকি কোন দিন কাবো ক্ষতি কবেনি।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী

গীর হজ্জবত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর জন্মস্থান শিসস্থান সীমান্তের অন্তর্গত চিশ্‌ত নামক অঞ্চলের সনজব গ্রামে। তিনি আববের সুবিখ্যাত কোবেশ বংশ-সম্ভূত হজ্জবত আলী রাজীব বংশধর। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ হজ্জবত খাজা গিয়াসুদ্দীন আহম্মদ সনজবী এবং মাতার নাম সৈয়দা উম্মল্ ওয়াবা। তাঁর জন্ম ৫৩৭ হিজরী (১১৪৩ খৃষ্টাব্দ) মতান্তরে ৫৩০ হিজরীর ১৫ই বজ্জব সোমবার।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী ছিলেন হাসেন ও হোসেন বংশের তাপস চুড়ামণি। অনেকের মতে তিনি চিশ্‌তিয়া তরিকার সূরী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। ভারত-ভূমিতে তিনি ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। আজীবন তিনি এদেশেই থাকেন এবং আজমীর নামক সহবে ৬৩২ হিজরী, (মতান্তরে ৬২৭ হিজরীর) ৬ই বজ্জব তারিখে দেহত্যাগ করেন। আবার প্রবাদ যে, ৭২৭ হিজরীর ৭ই বজ্জব তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর জীবনীর বিস্তৃত বিবরণ চুস্তাখা।

শুধু আজমীরে নয়, দেশের সর্বত্র খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর প্রতি ভক্তগণ কর্তৃক শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়। তাঁর নামে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হয়েছে, বচিত হযেছে কিছু গ্রন্থ। ভক্ত সাধারণ উক্ত সব কর্মকে পবিত্র কর্ম বলে মনে করেন। তাঁর নামে নজরগাহ সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না।

খাজা সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নামে কোন কোন ক্ষেত্রে অর্ধেন্দ্রামিক ক্রিয়াকলাপ অহুষ্ঠিত হয়ে থাকে বলে অনেকে মনে করেন। মিজান নামক পত্রিকা ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে লিখেছেন,—“এখন খাজা সাহেবের নামে একদল লোক গ্রামে-গঞ্জে হাঁড়ি পূজার প্রচলন করেছে। একটা হাঁড়ির গায়ে মালা ইত্যাদি দিবে তাকে খাজা সাহেবের হাঁড়ি



হিসাবে হাজির করা হয়। সেই হাড়িতে পয়সা দিলে তাকে খাজা সাহেবের বাক্সে দেওয়ার কথা বলা হয়। এসব সবাসবি বেদান্ত কাজ, পুণ্যের নয় পাপের কাজ, নেকীর নয় গোনার কাজ।”

## ১। খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তীর জীবনী

উক্ত গ্রন্থের লেখক মৌলভী আজহার আলী সাহেবের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর পুস্তকের নিবেদনাংশে যে ঠিকানা লিখেছেন তা এইরূপ—সাকিন-খলিসানি, পোঃ—বাগীবন, হাওড়া।

মৌলভী আজহার আলী রচিত পুস্তকখানি মুদ্রিত এবং সাধারণ ভাবে বিধানে। মোট পৃষ্ঠা একশত চুয়াল্লিশ। নাম পৃষ্ঠা, সূচীপত্র আছে। উৎসর্গ, নিবেদন ও আভাষ শিবোনামায় সংস্করণ সম্পর্কীয় বক্তব্য বেখেছেন। জীবনী অংশে পনেরোটি পবিচ্ছেদ রয়েছে। সর্ব মোট বিয়াল্লিশটি শিবোনামায় খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তীর জীবনী লিখিত হয়েছে। পুস্তকের শেষাংশে সম্বন্ধনা শিরোনামায় পীবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন জ্ঞাপক কবিতা সন্নিবেশিত আছে।

প্রাঞ্চল সাধু ভাষায় লিখিত এই পুস্তক সহজ-বোধ্য এবং আববী, ফরাসী প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার বাহুল্য বর্জিত। অত্র পুস্তকে সাধারণতঃ ধর্মীয় ভাব-প্রবণ শব্দ প্রয়োগের প্রবণতা অধিক দেখা যায় যা এই পুস্তকে অপেক্ষাকৃত কম। গল্প-ছলে বলাব মতন করে লিখিত হওয়ায় পুস্তকখানি সুখ-পাঠ্য। সম্মানীয় ব্যক্তির নামের শেষে ধর্মীয় বীতি অনুযায়ী সম্মান-সূচক শব্দ লিখিত থাকায় কাহিনী পাঠে কোন বাধা সৃষ্টি হয় না। কাহিনীকে আকর্ষণীয় করার জন্য লেখক কোন কোন স্থানে কথোপকথনের ভূমিমায বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক পবিচ্ছেদের শেষে ক্ষুদ্র চিত্র প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য চিত্রগুলি অঙ্কচিসম্মত বা কোন মূর্তির চিত্র নয়। তা ছাড়া দুই-তিনটি নসব-নামা বা বংশ ধারার পবিচয় আছে।

এই গ্রন্থে বর্ণিত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তীর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা এইরূপ,—

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী বাল্যকালে শান্ত-শিষ্ট ছিলেন। তাঁর পিতার তেমন কোন বিষয়-সম্পত্তি ছিল না। বাল্যকালেই তিনি ধর্মে এবং কর্মে বদ্ধবান হয়েছিলেন। কিশোর বয়সে তাঁর পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। অতি অল্প বয়সেই তিনি

সময়ের ব্যবধানের মধ্যেই তাঁর মাতৃ বিয়োগও ঘটে। পৈত্রিক স্মৃতি তিন পেরেছিলেন আকুবের ক্ষুদ্র একটি বাগান এবং ময়দা পিষাব একটি চাকী। কিশোর খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী মাতা-পিতৃহীন হয়ে অসীম দুঃখ-সাগরে পতিত হন।

মারফতী বিভায়া পাবদর্শী ইব্রাহিম কুন্দজী ছদ্মবেশে পাগলের রূপ ধরে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন সাধু কুন্দজীকে দেখে আনন্দিত চিত্তে তিনি বাগান থেকে আকুব সংগ্রহ কবে এনে তাঁকে আহাব করতেন। বালকের অতিথি পরায়ণ সবল হৃদয়ের পবিত্র পেয়ে কুন্দজীও তাঁকে একটি ফল চিবিয়ে আহাব করতে দিলেন। ভক্তি ভাবে সেই ফল ভক্ষণ করার পর তাঁর হৃদয়ে বৈবাগ্যভাব জাগ্রিত হল। তিনি ছনিয়ার কুহকজাল ছিন্ন করে সমবন্দ হয়ে বোখাবার যান এবং হজবত হেসামুদ্দীন বোখারীর নিকট ধর্ম-শাস্ত্রজ্ঞান লাভ কবে জ্ঞানৈর্ধর্ম্যেব অধিকারী হন। হজবত সাহেব ৫৬০ হিজরীতে নেশাপুরের অন্তর্গত হাক্কন নামক গ্রামে হজবত খাজা ওসমান হাক্কণীর নিকট মুরিদ হন বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন স্থানে পবিত্রমণ করত জ্ঞানৈর্ধর্ম্য আরো বৃদ্ধি করেন এবং মারফতী বিভায়া শ্রেষ্ঠ লাভ করেন। পবিত্রমণকালে তিনি ধামের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হজবত খাজা নিজাম উদ্দীন কিব্বিয়া, হজবত আব্দুল কাদের জিলানী অর্থাৎ হজবত বড় গীর সাহেব প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি হজবত গিবেছিলেন হজবত ওসমান হাক্কণীর সঙ্গে। তাবপব তিনি পীব ওসমান হাক্কণীর সঙ্গে মদিনায় গেলেন। তিনি আবো গেলেন উশ নগরে। সেখানে খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী তাঁর নিকট মুরিদ হন। হজবত কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীই তাঁর প্রথম মুবিদ। তিনি বলেন,— ‘আমার বা আমার খলিফার হাতে ধারা মুরিদ হবেন, তাঁরা বেহেস্তে না যাওয়া পর্যন্ত আমি বেহেস্তের দ্বারে পা রাখব না।

মদিনা থেকে খাজা সাহেব হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্ম প্রচার কবা। তিনি সজ্জা সহব থেকে গজনি এবং পবে লাহোরে আসেন। সেখান থেকে চল্লিশ জন দরবেশ সমভিব্যাহারে দিল্লীতে উপনীত হন।

দিল্লীৰ সিংহাসনে তখন আসীন ছিলেন পৃথ্বী ৰায়। তিনি মুসলমান বিৰোধী। খাজা সাহেবেৰ আগমন বার্তা অবগত হয়ে পৃথ্বী ৰায় এক গুপ্ত-ঘাতককে পাঠালেন খাজা সাহেবকে হত্যা করতে। ঘাতক দিল্লীতে এল। তার দুৰভিসন্ধি দিব্য চক্ষুতে জানতে পেবে খাজা সাহেব তাকে শাস্তি দিতে উত্তত হলেন। ভীত হয়ে ঘাতকটি ক্ষমা প্রার্থনা কবল। খাজা সাহেব তাকে ক্ষমা কবলেন। সে তখন ইসলাম ধৰ্ম দীক্ষিত হল। খাজা সাহেব এবাৰ নিজে ৫৬১ হিজরীৰ সাতই মহব্বম তাবিখে আজমীয়ে উপনীত হলেন।

খাজা সাহেব আজমীবেৰ আনা-সাগৰেৰ তীৰে একটি আশ্রম নিৰ্মাণ কৰে বসবাস কৰতে থাকেন। আনা-সাগৰেৰ তীৰবৰ্তী মন্দিৰ সমূহেৰ ব্রাহ্মণ-পুৰোহিতগণ সেই মুসলিম ফকিবগণেৰ “আল্লাহো আকবৰ” ধ্বনি শুনে বিস্ময় হয়ে ৰাজা পৃথ্বী ৰায়েৰ নিকট অভিযোগ কবেন।

ফকিবগণকে বিতাড়িত কৰতে পৃথ্বীৰায় পাঠালেন সৈন্ত। সৈন্তগণ আক্রমণ কৰতে উত্তত হলে খাজা সাহেব মস্তপুতঃ ধূলি নিক্ষেপ কৰে তাৰেৰে বিপৰ্যন্ত কৰলেন। ৰাজা এ সংবাদ অবগত হয়ে শ্ৰীমন্ত মোহাম্মদ বাঘদেওকে তাঁৰ বোগবল এৰু তত্ত্ব-মন্ত্ৰ শক্তিৰ দ্বাৰা ফকিবগণকে বিতাড়িত কৰতে বুললেন। বাঘদেও তৎক্ষণাত্ গেলেন খাজা সাহেবেৰ নিকট কিন্তু তিনি খাজা সাহেবেৰ তীক্ষ্ণদৃষ্টিৰ সম্মুখে হিৰ থাকতে পাবলেন না। দিব্যজ্ঞান লাভ কৰে তিনি ইসলামধৰ্ম গ্ৰহণ কবলেন এবং মোহাম্মদ সাদী নামে পৰিচিত হলেন। এ-সংবাদ জেনে ৰাজা পৃথ্বীৰায় বড়ই হুচিচুতায় পতিত হলেন।

একদিন এক ফকিব এক পুকুৰেৰ পানিতে ওজু কৰতে গেলেন। ধানীৰ হিন্দুগণ কিছুতেই সেখানে ওজু কৰতে দিলেন না। ঘটনা অবগত হয়ে খাজা সাহেব আপনায় অলৌকিক শক্তি বলে আনা-সাগৰসহ সমস্ত জলাগৰেৰ জল একটি ক্ষুদ্র পাत्रে এনে বন্দী কবলেন। নগববাসীগণ জলাভাবে মৰণাপন্ন হয়ে খাজা সাহেবেৰ শবণ নিল। দয়া পববশ হয়ে তিনি পূৰ্ণাবস্থা কিৰিৰে আনলেন। আজমীবেৰ অবিবাসীগণ ইসলাম ধৰ্মে দীক্ষিত হলেন। মন্দিৰেৰ স্থলে গড়ে উঠল মসজিদ।

পৃথ্বীৰায় সমস্ত অবগত হয়ে পরামৰ্শ সভাৰ আয়োজন কবলেন। স্থির হল ঐন্দ্রজালিক খাজা সাহেবেৰ নোকাবিলা ঐন্দ্রজালিক অজয় পালেৰ দ্বাৰা কৰতে হবে। তৎপূৰ্বে ৰাজা নিজে যুদ্ধ কৰে পৰিস্থিতি বুঝবেন। ৰাজা

সাত বাব যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হতে গিষে সাত বাবই অন্ধ হযে গেলেন। অগত্যা অজয় পালকে পাঠানো হল। অজয় পাল বিষধব সাপ এবং পরে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ কবে খাজা সাহেবকে পৰ্যুদন্ত কবতে গিষে ব্যর্থ হযে পলায়ন কবতে উদ্যত হলেন। কিন্তু অজয় পাল পলায়ন কবতে পাবলেন না, খাজা সাহেব কর্তৃক ধৃত ও প্রহৃত হলেন। শেষ পর্য্যন্ত নানাভাবে খাজা সাহেবের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেযে তিনিও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন। তখন তাঁর নাম হল আবদুল্লা বিয়াবানী।

পচিশ বছর পর খাজা সাহেব আহ্বান জানালেন পৃথ্বীরায়কে ইসলাম ধর্ম গ্রহণেব জন্ত। পৃথ্বীরায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবলেন। খাজা সাহেব এর প্রতিবিধান এবং হিন্দুস্তানে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের জন্ত আদ্বাহ তামালায় নিকট প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। তিনি রাজ-নিধনের অভিশাপ দিলেন।

আফগানিস্তানেব ঘোর এদেশের সুলতান গিযাহুদ্দিন ঘোরীর ভ্রাতা সাহাবুদ্দিন ঘোরী হিন্দুস্তান জযেব আশায় ৫৮৭ হিজবীতে এদেশে আগমন কবেন। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষে সাহাবুদ্দিন ঘোবী আহত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কবেন।

অল্প কিছুকাল পবে সাহাবুদ্দিন ঘোরী পুনবায অধিকতব সমব সম্ভাবে সজ্জিত হয়ে হিন্দুস্তান আক্রমণ কবলেন। এবাবেব ঘোবতব যুদ্ধে খাজা সাহেবের অভিশাপ অল্পযাযী পৃথ্বীরায় পবাজিত ও নিহত হলেন। দিল্লী ও আজমীবে মুসলিম রাজস্ব প্রতিষ্ঠিত হল। আজমীবে গিষে সাহাবুদ্দিন ঘোবী সাক্ষাৎ কবলেন খাজা সাহেবের সঙ্গে।

[এখানে খাজা সাহেবেব নয়টি আশ্চর্য্য কেবামত প্রদর্শনেব গল্প সরিবেশিত আছে। সেগুলির বিষয়বস্ত্ত নিম্নরূপ :—]

১। একদল অগ্নিপূজক খাজা সাহেবেব অলৌকিক শক্তিতে বিমুক্ত হযে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেন।

২। অর্থলোলুপ জনৈক ব্যক্তি খাজা সাহেবেব আশ্চর্য্য কেবামতে শান্তি প্রাপ্ত হয়।

৩। আক্রমণকাবী একদল দস্যু খাজা সাহেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিব সন্মুখে পীডাতে না পেবে ক্ষমা প্রার্থনা কবে এবং ইসলাম ধর্মগ্রহণ কবে।

৪। খাজা সাহেবের নির্দেশে গরুর বাছুর দুধ দান কবে।

৫। খাজা সাহেবকে আজমীরে বেথে বহুলোক মক্কার হজ কবতে গিয়ে সেখানে তাঁকে দেখে সকলে বিস্মিত হয়ে যান।

৬। জনৈক কুলটা রমণীও অসহৃদেস্ত খাজা সাহেবের আশ্রয় কেরামতের কাবণে সকল হতে পারেনি।

৭। বাগদাদের এক বদমায়ের ব্যক্তি খাজা সাহেবের সন্নিহানে অবস্থান করে সং পথে আসেন।

৮। অসহৃদেস্ত আগত জনৈক হিন্দু, খাজা সাহেবের নিকট এসে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যান।

৯। এক ব্যক্তি মুসলমানের ছদ্মবেশে খাজা সাহেবকে ছুবিকাষাতে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় এবং পবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

খাজা সাহেব সময় সময় ভাবোন্মত্ত হবে ‘ছামো’ অর্থাৎ আরবী ভাষায় রচিত খোদাতায়ালায় প্রশংসা-সূচক সঙ্গীত পাঠ কবতেন। একবার ‘ছামো’ পাঠ শুনে পৃথিবী আনন্দে নেচে উঠবার উপক্রম হলে হজরত বড় পীর সাহেব তাঁব হাতেব ছোট একটি লাঠিব প্রান্ত দাবা মাটি চেপে ধবে বাধেন। অগ্রথায় নাকি পৃথিবীতে মহাপ্রলয় কাণ্ড ঘটত।

হিন্দুস্থানের প্রায় সর্বত্র ইসলামের আদর্শ প্রচারিত হল। এমন সময় খাজা সাহেবকে অহুসান জানালেন তাঁব মোর্শেদ পীর হজরত ওসমান হারুণী। খোরাসান সীমান্তে গুরু-শিষ্যের সাক্ষাতকাব হল। পীর হারুণী শিষ্যকে আপনার মহাশয়, আশা, খেরকা, জুতা ও পাগড়ী দিয়ে খেলাকতি প্রদান করতঃ মক্কাব প্রত্যাবর্তন কবেন এবং সেখানেই ৬০৭ হিজরীতে দেহত্যাগ কবেন।

একবার জনৈক নিঃস্ব কৃষকের কান্তর অল্পরোখে খাজা সাহেব দ্বিমীতে উপনীত হন এবং সুলতান আল্‌তামাসকে বলে উক্ত কৃষকের জমি নিদ্র কর দেন।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীর বিবাহ না করা অগ্রায়। খাজা সাহেব একথা বুঝতে পেবে নব্বই বছর বয়সে দ্বাবগড়ের রাজকন্যাকে এবং পরে শিখ সৈন্যদ হোসেন মসাহাদীর কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নী উম্মেতুল্লাব গর্ভজাত দুই পুত্র ও এক কন্যা এবং দ্বিতীয়া পত্নী সৈবেদা আছমাহ্ বিবির গর্ভজাত তিন

পুত্র। খাজা সাহেব জী-পুত্র নিষে মাত্র সাত বছর সংসাব-ধর্ম পালন কবেছিলেন।

খাজা সাহেব, হজ্জবত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীকে ডেকে খেলাফতি দান করেন। পরে সাতানকসই বংসব বয়সে ৬৩২ হিজরীর ৬ই বজ্জব তাবিখে তিনি মানব লীলা সংবরণ করেন।

পবিত্র আজমীর শবীফে খাজা সাহেবেব নির্দেশিত স্থানে সমাবিগৃহ নির্মিত হয়। সম্রাট আকবরও আগ্রা থেকে আজমীর পর্যন্ত পদব্রজে যেতেন এবং খাজা সাহেবের মাজার শরীফে জিয়াবত করতেন। সেখানে প্রতি বংসব ৬ই থেকে ১১ই রজব পর্যন্ত খাজা সাহেবেব উরুস হয়। তাতে বহু দেশের লোক এসে যোগদান করেন।

মৌলভী আজহার আলীসাহেব প্রণীত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (জীবনী) গ্রন্থেব অনেক স্থানে যে যে গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগৃহীত হইবে তার উল্লেখ আছে। বধা—(১) আনিছেল আরওয়াহ, (২) খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (র:) “সওয়া নিয়ে” উমবী, (৩) তওয়ারীখ ফেরেস্তা, (৪) ছানাতুল (৫) শাব্বোল আউলিয়া (ইতিহাস), (৬) কাওয়াদল সালেকিন, (৭) আকসির নাম (ইতিহাস), (৮) দলিলুল আরফিন প্রভৃতি। লেখক সমগ্র কাহিনীটিকে পঞ্চদশ পবিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রতি পবিচ্ছেদ আবার দুই-তিনটি শিরোনামায় বিভক্ত কবে এক-একটি বিষয়েব বিবরণ দিয়েছেন। গ্রন্থেব একস্থানে দশটি উপদেশ বাক্য লিখিত আছে। কবেক স্থানে বয়েত প্রদত্ত হইবে। কোথাও কোথাও কি কি আচরণ ধর্মবিরুদ্ধ তাব আলোচনা রইবে।

গ্রন্থকার ‘হিন্দুস্তান’ নামকরণেব ব্যাখ্যা দিবেছেন। তাছাড়া তিনি হিন্দুস্তানেব আদিম বাজ্জবর্গেব যে বিবরণ দিবেছেন তা ঐতিহাসিকেব মতে নিখুঁত বলে তিনি তেয়াবিত ফেবেস্তা নামক প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। সেই দিক হতে এই গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীব হয়ত কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী জীবনী গ্রন্থের রচনাকাল নির্দিষ্ট করে কোথাও লিখিত নেই। একাদশ সংস্করণের তারিখ লিখিত নেই, শুধু সাল লিখিত আছে—সন ১৩৬৭ সাল (বাংলা)। গ্রন্থকার গ্রন্থখানিকে পীব মোর্শেদ হজরত

মোহাম্মদ আবু বকর সাহেবেব নামে উৎসর্গ করেছেন। “বদেব গোবব কেতু” বলে উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় ইনি ফুরফুরা শরীফের হজরত দাদাপীৰ। গ্রন্থকাব “নিবেদন”-অংশে লিখেছেন যে পুস্তকখানি মৌলভী মোহাম্মদ কোববান আলি সাহেব ‘আত্মপাক্ত’ সংস্কাব করেছেন। এই অংশে এই গ্রন্থের প্রকাশ কাল সন ১৩২৯ সাল বলে উল্লেখ আছে। তা থেকে বুঝা যায় যে গ্রন্থখানি ইংরেজী ১৯২২ সালের পূর্বেই বচিত হযেছিল। এতগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াব অল্পমান কবা যায় যে গ্রন্থখানি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন কবেছে।

## ২। খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তি

মওলানা অবদুল ওয়াহীদ ‘আল কাসেমী’ সাহেব “খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তি” নামক একখানি গ্রন্থ রচনা কবেছেন।

গ্রন্থখানির রচনাকাল ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ। এর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকাবের ঠিকানা : গ্রাম—কাঁথুড়িয়া, পোঃ—বড আলুন্দা, জেলা বীবভূম। ১২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থে খাজা সাহেবেব জীবনীসহ কিছু অতিবিস্তৃত অংশ তিনি প্রদান কবেছেন। এই অতিবিস্তৃত অংশের “তাবিজাত” অংশটি উল্লেখযোগ্য। বিপদ মুক্ত হওয়াব জন্ত, অভাব মুক্ত হওয়াব জন্ত, আহাবেব স্বচ্ছলতার জন্ত, নিখোজ ব্যক্তিব সন্ধান পাওয়াব জন্ত, বিদ্যাব প্রাচুর্যেব জন্ত প্রভৃতি শিবোনামায ৩৪টি তাবিজাত আববী হরফে লিখিত হযেছে। তাছাড়া কয়েকটি পত্রও এতে সন্নিবেশিত হযেছে। গ্রন্থকাব অল্প গ্রন্থের সমালোচনা কবেছেন। তাঁব প্রদত্ত তথ্যে জানা যায় খাজা সাহেবেব জন্মকাল ৫৩৭ হিজরী নহে, ৫৩০ হিজরী এবং মৃত্যুকাল ৬৩২ হিজরী নহে, ৭২৭ হিজরী। দ্বিতীয়া পত্নীব নাম আছমাহ নহ, বিবি ইসমাতুল্লাহ। দ্বিতীয়া পত্নীব গর্ভে তিন পুত্র নয়, মাত্র এক পুত্র জন্মগ্রহণ কবেন। উক্ত পুত্রের নাম জিরাউদ্দীন আবুল খায়েব নহে, সে নাম জিবাউদ্দীন আবু সায়ীদ। খাজা সাহেব প্রদত্ত ৪১টি উপদেশ বাণী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হযেছে। তাছাড়া এক স্থানে গ্রন্থকাব কেবামত বা অলৌকিক শক্তির অবাস্তবতা কবা উল্লেখ কবে লিখেছেন, “ইহা তাঁহাব কেবামত নহ, অপবাদ।”

এইরূপ আবেগ মতবিবোধ পবিদ্রষ্ট হয়। গ্রন্থকাব উক্ত সমস্ত তথ্য :—

১। মাসালেকুস সালেকীন, ২। সেয়ারুল আকতাব, ৩। সেয়ারুল আবেফিন, ৪। তাবজামা ফেবেস্তা প্রভৃতি প্রমাণ্য গ্রন্থ থেকে গ্রহণ কবে আপন বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ কবতে চেয়েছেন।

আবদুল আজিজ আল আমীন সাহেব তাঁর “খন্ড জীবনেব পুণ্য কাহিনী” নামক গ্রন্থে খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তীর আশ্চর্য কেরামতিব আঠারোটি গল্প সন্নিবেশিত কবেছেন। এই পুস্তকের প্রকাশকাল বাংলা ১৩৬২ সালের ১লা পৌষ।

আমীন সাহেবের গল্পগুলি বেশ সুখপাঠ্য। উক্ত সমস্ত পুস্তক সমূহে বাংলা লোকসাহিত্য সম্ভাবের উজ্জল নিদর্শন স্বরূপ অনেক কাহিনী লিখিত আছে।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী ঐতিহাসিক ব্যক্তি বটে, কিন্তু তাঁর জন্মকাল ও মৃত্যুকাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তাছাড়া চিশ্তিযা তরিকাব প্রতিষ্ঠাতা যে খাজা সাহেব সে বিষয়েও নানা মত দেখা যায়। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটির উল্লেখ করা হল।

মৌলভী আজহার আলি লিখেছেন খাজা সাহেবের জন্ম তারিখ ৫৩৭ হিজরী ১৪ই রজব সোমবার। (সেয়ারুল আকতাব, ১০১ পৃঃ)।

মোলানা আবদুল ওয়াহীদ আল কাসেমী লিখেছেন, খাজা সাহেবের জন্ম তারিখ ৫৩০ হিজরী ১৪ই রজব সোমবার। (খাজিনাতুন আফসিয়া, প্রথম খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা)।

ডঃ আব্দুল করিম সাহেব ১১৪২ খৃষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। (সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, পৃষ্ঠা-৩৬)।

শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ লিখেছেন, ১১৫৮ খৃষ্টাব্দ। (গৌড় কাহিনী, পৃষ্ঠা—৩৪৭)।

খাজা সাহেবের মৃত্যু তারিখ ৬৩২ হিজরীর ৬ই রজব, কারো মতে, ৭২৭ হিজরীর ৬ই বজব। (মাসালেকুস সালেকীন, ২য় খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা)। কারো মতে, ১২৩৬ খৃষ্টাব্দ। (সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ ডঃ আব্দুল কবীম) ৬১



মৌলভী আজহাব আলী'র মতে চিশ্‌তিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা খাজা মঈবদ্দীন চিশ্‌তী।

মওলানা আবদুল ওবাহীদ লিখেছেন যে আবু ইসহাক চিশ্‌তী এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। (সেয়াকুল আকতাব-১)।

কাবো মতে বন্দা নওয়াজ, কাবো মতে চিশ্‌তের খাজা আহমদ আবদাল। (সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ : ডঃ আব্দুল করিম),<sup>৩১</sup> চিশ্‌তিয়া তরিকায় সুফী মতবাদের প্রবর্তক।

## মপ্তম পৱিচ্ছেদ

### খায় বিবি

পীবানী হজবত ফাতেমাল যাদা জনসাধাৰণেৰ নিকট খায় বিবি নামে সমধিক পৰিচিত। তিনি ছিলেন প্ৰথম খলিফা হজবত আবু বকৰ সিদ্দিকীৰ অন্ততম বংশধৰ। চেঙ্গিস খাঁৰ ভাবত আক্ৰমণ-কালে তাঁৰ বংশেৰ কেউ ভাৰতে আগমন কৰেন এবং এদেশে বসতি স্থাপন কৰেন। খায়বিবিৰ জন্ম হয় দিল্লীতে, তখন সম্ৰাট আকবৰেৰ বাজত্ৰকাল।

বশোবাধিপতি প্ৰতাপাদিত্যকে দমনেৰ জন্ত সেনাপতি মানসিংহ প্ৰেৰিত হন। মানসিংহেৰ সহিত খায়বিবি বঙ্গে আগমন কৰেন এবং বসিৰহাট মহকুমাৰ বাহুড়িয়া থানাৰ খায়পুৰ গ্ৰামে অবস্থিতি কৰেন। উক্ত খায়পুৰ নিবাসী সাহিত্যিক ও গবেষক আশু ল গফুৰ সিদ্দিকী সাহেবেৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ জনাৰ মনজুৰ আলি সিদ্দিকী সাহেবেৰ এটনী বাগান লেনেৰ (কলিকাতা, শিবাৰদহ) বাসাল, ১২২৪ খৃষ্টাব্দে বাহুড়িয়া সাব-বেজিষ্টাৰী অফিসে বেজিষ্টীকৃত বিক্ৰম দলিলেৰ অহুলিপি বলে কথিত কৰেকটি পৃষ্ঠাৰ মধ্যে এই তথ্য আমি দেখতে পাই। উক্ত অহুলিপিব মধ্যে লিখিত নম্বৰ ২৪০ এবং ক্ৰমিক নংৰ ৫৫৪২। উক্ত অহুলিপিতে যা লিখিত আছে তাৰ কিমদংশ এইৰূপ :—

“খায়পুৰ গ্ৰামেৰ একমাত্ৰ জাগ্ৰত পীৰ শ্ৰীমন্তবদীয়া আবেদা ফাতেমাল যাদা গুৰ্কে আবেদা খায়বিবি পীৰ সাহেবানী ইহতেছেন, কংগজ পত্ৰাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত পীৰ সাহেবানী আমাৰ (আশু ল গফুৰ সিদ্দিকী) ও আপনাৰ উত্তবাধি সৰ্গেৰ এখনকাৰ প্ৰথম পুত্ৰ হজবৎ সাহজদী আমান সেখ সামাদাভুলা মহম্মদ মাসকুৰ কেবলাৰ সচোদৰা জ্যেষ্ঠ ভগিনী স্থানীয়া ও তাহাৰা উভয়ে শেৰ প্ৰেৰিত মহাপুৰুষ হজবত আমাবজুমান মোহাম্মদ মোস্তাফা মানে আমাৰ প্ৰথম উত্তবাধিকাৰী ও প্ৰথম খলিফা মহাদ্ৰা হজবত আবত্ৰল্লা দিন আদিন আন বকন সিদ্দিকী নাজী আলোহেৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ

অত্যাশ্র মহাত্মা হজবত আবদুস বহমান সিদ্দিকী রাজী আলায়হের বংশধর ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট থেকে গীর খাযবিবির নামে লাঞ্ছনাজ্ঞ পাওয়া যায়।”

খাযবিবি এখানেই দেহত্যাগ করেন। যেখানে তাঁকে সমাহিত করা হয় সেখানে পাকা-দবগাহ-গৃহ নির্মিত হয়েছে। তাঁর দবগাহেব সেবায়ত হিসাবে তাঁরই বংশধারা উক্ত গ্রামে আজো বর্তমান।

গীবানী খাযবিবির দরগাহে সেবায়তগণ কর্তৃক নিয়মিতভাবে ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয়। ভক্ত জনসাধারণ সেখানে হাজত মানত শিবনি দেন। গীরোত্তর হিসাবে প্রায় দুই বিঘা জমি পতিত আছে। তাঁর নাম মহিমায জন্ত গ্রামের নাম হযেছিল খাযগুব। স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম সকল ভক্তই তাঁর প্রতি সমধিক ভক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি ইসলাম মহাত্মা প্রচারের সহায়ক মানবদবদী ক্রিয়াকলাপের জন্ত আজো স্রবণীয় হয়ে আছেন। তিনি যে দ্বন্দ্বী মতাবলম্বী ছিলেন এবং সেই মতবাদ প্রচার কবেছিলেন এমন কোন প্রামাণ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### গোরাচাঁদ পীর

পীর হজরত শাহ্ সৈয়দ আব্বাস আলী রাজী ওবকে হজবত পীব গোরাচাঁদ রাজী আরবেব মক্কা নগরীতে ৬৯৩ হিজরীব ২১শে রমজান তারিখে জন্মগ্রহণ কবেন। মতান্তবে হিঃ ৬৬৪, খৃঃ ১২৬৫।২০ তাঁব পিতাব নাম হজরত কবিম্ উল্লাহ্ এবং মাতাব নাম বিবি মাযমুনা সিদ্দিকা। পিতার দিক থেকে হজবত আলী এবং মাতার দিক থেকে হজরত আবু বকব সিদ্দিকীব বক্ত তাঁব দেহে ছিল। তাঁর দীক্ষা গুরুব নাম পীর হজরত শাহ্ জালাল এযমনি। তিনি পীর শাহ্ জালালেব নিকট কাদেবিয়া তরীকার সূফী মতে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

পীর শাহ্ জালাল, হজবত শাহ্ সৈয়দ কবীর বাজীর আদেশে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচার কবতে আসেন। হজরত পীব গোরাচাঁদও সেই সঙ্গে এসেছিলেন। তিনি পীব শাহ্ জালাল এযমনির অনুমতি ক্রমে বঙ্গদেশেব চব্বিশ পবগণা জেলাব হাডোয়। খানাব অধীন বালাণ্ডা পবগণা অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারেব দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। পীব গোবাচাঁদ আবে। একুশ জন পীর জাতা সঙ্গে নিষে আত্মমানিক ১৩০২-১৩২২ খৃষ্টাব্দেব মধ্যে গোঁড়েব সুলতান শাহ্ মুহম্মদীন ফিবোজ শাহেব সময়ে বালাণ্ডা পবগণায় আগমন করেছিলেন। তিনি চিবকুমার ছিলেন।<sup>১০</sup>

পীর গোবাচাঁদ বাজী, দেউলা বা দেবালয়েব স্বাধীন হিন্দু বাজা চন্দ্রকেতুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কবতে সক্ষম হননি। তবে স্থানীয় বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবেন। বাজা চন্দ্রকেতু অভিষিক্ত হয়ে মপবিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিষে তিনি অগ্রসব হন। অবশেষে হাতিয়াগড় পরগণায় ভাবপ্রাপ্ত সেনাপতি অকানন্দ ও বকানন্দের সহিত যুদ্ধে পীব গোবাচাঁদ গুরুতব রূপে আহত হন এবং ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দেব ১২ই ফাস্তান তাবিখে মৃত্যু বরণ কবেন। মৃত্যুকালে তাঁব বয়স হয়েছিল আলী বৎসব।<sup>১১</sup>

কেহ বলেন কচিং হিন্দুর ঠাকুর সম্পূর্ণরূপে মুসলমান গীব হয়ে গেছেন কিন্তু নাম বদলাননি। যেমন বর্ধমান ও চব্বিশ পরগণা জেলার গীর গোরাচাঁদ।<sup>১২</sup> আবাব কেহ বলেন যে ভাসলিয়া গ্রামের গোরাচাঁদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে গীব গোবাচাঁদ নামে পরিচিত হন। (বেতাব জগৎ : ১৬-২৮ ক্ষেত্রাবী ১২৭০)। কেহ বলেন “পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সৈয়দ হুশেন শাহ গৌড়ের বাদশাহ হইলেন। গেরোগাজি বা গীর গোবাচাঁদ, হিজলী ব মুসলমান সেনাপতির পুত্র এই সময়ে বাইশ জন আউলিয়া অর্থাৎ দৈব-শক্তি সম্পন্ন ফকির, হিন্দু রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করিয়া সত্যধর্ম প্রচারার্থ বদ্ধপবিকর হইলেন।”<sup>১৩</sup> মুন্সী খোদা নেওয়াজের কাব্যে আছে—“ঘব তাব দিল্লীর সহবে।” কবি মোহাম্মদ এবাদোল্লাহর সহিত আব্দুল গফ্বর সিদ্দিকী সাহেবের অভিমতের মিল আছে।

“গোবাচাঁদেব মূর্তিও আছে, কিন্তু বিবল। গোবাচাঁদেব ঘোড়া মূর্তিই দেখা যায়, অকৃতি বেশ স্নন্দর ও বীরোচিত। পবিধানে চোগা-চাপকান, মাথায পাগড়ী, হাতে তলোয়ার বাহন ঘোড়া। ব্যান্ড-বাহন গোবাচাঁদেব মূর্তি বর্তমানে অতি বিবল। পূজা বা হাজোতেব কর্তা সব ক্ষেত্রেই মুসলমান ফকির।”<sup>১৪</sup>

চব্বিশ পরগণা জেলার বসিবহাট মহকুমার অন্তর্গত বালাঙা পরগণার হাড়োয়া নামক গ্রামে হজরত গীর গোবাচাঁদ সমাধিস্থ হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর পবিত্র মাজার শবীক বা দরগাহ স্থানে প্রতি বৎসর ১১ই ফাল্গুন হতে ১৩ই ফাল্গুন পর্যন্ত ওরস উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ নর নারী সমবেত হয়ে জিয়ারতাদি করে থাকেন। বহু আলেম, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, কবি, ভক্ত-সাধক সমবেত হয়ে বিভিন্ন ভাষায় ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওয়াজ, আউলিয়া বাজীর জীবনী সঙ্ক্রান্ত প্রবন্ধ পাঠ ও কবিতা আবৃত্তি করেন। সাধারণ শ্রোতার তা শ্রবণ করে, জ্ঞান লাভ কবে ধন্য ও কৃতার্থ হয়ে থাকেন। এবিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আব্দুল গফ্বর সিদ্দিকী সাহেবের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। গীব গোবাচাঁদেব শেষ খাদিমদার বা সেবায়ত ছিলেন মহাত্মা সেন দাবা মালিক। খাদিমদাবেব বংশধরগণ আজও (১৯৭১) বিজ্ঞান, কিংবা উক্ত দরগাহেব সেবা-ভার এখন জনসাধারণে গ্রস্ত হয়েছে।

পীব গোবাচাঁদের দরগাহে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ধূপ-বাতি দিবে জিয়ারত করা হয়। প্রায় প্রতিদিন কেহ না কেহ শিবনি, হাজত বা মানত দান করেন। মানতের মধ্যে দুধ, বাতাসা-জাতীয় মিষ্ট দ্রব্য, ফল প্রভৃতি প্রধান। প্রতি বৎসর ১২ই ফাঙ্কন তারিখের ওরস উপলক্ষে বিবিটি মেলা বসে। সেই মেলায় নানাকর বাজনা বাজে, কাণ্ডালি, তাবানা ও মানিক পীরের গান হয়, সার্কাস ও হাছু বসে, যাত্রা হয়। পীরের নামে এক হাজার পাঁচশত বিঘা জমি পীরোত্তর দান আছে। হাডোষায় তাঁব সমাধির উপর এক হুদুশ্চ অট্টালিকা নির্মিত আছে। গোঁডেব সুলতান আলাউদ্দীন শাহ পীর গোবাচাঁদের মাজারেব উপর এক সমাধি সৌধ নির্মাণ করে দেন।<sup>১\*</sup> অট্টালিকার পাশে আছে ফুলের বাগান। পাশেই বিজ্ঞানরী নদী প্রবহমান। স্থানটি অতি মনোরম। পীরের নামে প্রদত্ত ‘দুধ ও পানি’ ভক্ত জনসাধারণ পবন পবিত্রজ্ঞানে পুনর্বাধ শাস্তিবাবি রূপে গ্রহণ করেন।

ওরস ও মেলার সময় ‘সোন্দল’ বা শোভাযাত্রা বাহির হয়। সোন্দল শব্দের অর্থ এইরূপ :—“শোভাযাত্রা সহকায়ে ভক্তগণ পীরের উদ্দেশ্যে ঘেঘ উপহারদি নিয়ে দরগাহে উপস্থিত হন। সেই উপহারদি সমাধির উপবে খাদিমদারগণ কর্তৃক হুসজ্জিত করা হয়। উক্ত উপহারগুলি পবিত্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত করা পব উহাতে গোলাপ জল, আতর প্রভৃতি নিক্ষেপ করা হয়। যে শোভাযাত্রা এই পবিত্র কর্ম সম্পাদন কবে তাকে সোন্দল বলে।” এই সোন্দলে বা শোভাযাত্রায় নানাবিধ বাজনা বাজে এবং বাংলা ভাষায় ভক্তি-মূলক তারানা গীতও গাওয়া হয়। বারগোপপুরের কিছু ঘোষ ও কানাই ঘোষদিগের সময় থেকে প্রতিবেশী গ্রামের গোপনন্দন এবং অন্যান্য ব্যক্তিব্যক্তি ডারে ডারে গো-দুগ্ধ এনে দরগাহে সমবেত হন। সেই দুগ্ধই প্রথমে মাক্কারা বা সমাধির উপর ঢেলে দেওয়া হয়।

হজরত পীব গোবাচাঁদের স্মৃতির সন্মানে ভক্তগণ কোনও রাত্তার নামকরণ কবেছেন কিনা জানা যায় না।

তাছাড়া হাডোষায় উচ্চতর মাধ্যমিক বিভাগের তাঁব নামেব সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাঁব নামেই আছে গোবাচাঁদ পাঠাগার, গোবাচাঁদ ‘মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, গোবাচাঁদ চিকিৎসালয় ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠান। হাডোষায় হাটে ভক্তগণ পীরের প্রতি প্রণতি জানিয়ে বেচা-কেনাষ ব্যাপৃত হন। গ্রীষ্মশই দেখা যায়,

ক্রেতা বা বিক্রেতা নিজ নিজ কথার সত্যতা প্রমাণের জন্ত বলেন “গোবাটাঁদেব দিকি।” অনেকে দূর বাজার পূর্বে তাঁর নাম শ্রবণ করেন।

“কিছুকাল আগে পনের কুড়ি বছর পূর্বেও কলকাতাব কোন কোন পল্লীতে সন্ধ্যার সময় এক শ্রেণীর ফকিরদের দেখা যেত। তাদের পবিদানে থাকতো কালো বঙের আলখাল্লা, পাখজামা, মাখায় টুপী, গলায় ছোট বড় পুঁথির মালা। এক হাতে আশাদণ্ড বা ময়ূবপুচ্ছের চামব, অপর হাতে ধূমাবিত ধূনাচি। তারা হিন্দু মুসলমান সকলের বাড়ীতে দবজাব সাগনে এসে আবৃত্তি করত, “পীর গোবাটাঁদ মুস্তিল আসান।”৩৮

“ফকিররা অনেকে সময় সময় গোরাকাঁদেব গানও গাইত। পল্লীবাগানেরা সর্বপীর বন্দনাব অল্পকপ গান গেবে থাকেন।

গোবাটাঁদ একদিল বহিল অনেক দূব।  
গোরা গেল বালাগায একদিল আনাবপুর॥  
হেতেগড়ে যেতে গোরায মা দিষেছে বাধা।  
হেতেববে যায না গোরা আছে হারামজাদা॥  
মায়ের বাধা গোবাটাঁদ না শুনি'ল কানে।  
আকনেব সঙ্গে যুদ্ধ হইল হেনকালে॥  
আকানন্দ বাকানন্দ রাবনেব শালা।  
তার সঙ্গে যুদ্ধ হল আড়াই পক্ষ বেলা॥  
কি জানি আল্লাব মর্জি নসিরেব ফের।  
চেকেবানে গোরাকাঁদেব কাটা গেল ছেব।”৩৮

হাড়োয়া ব্যতীত বারাসত-বসিরহাটের বেশব স্থানে তাঁব নামে নজবগাহ বা স্থতিচিহ্ন আছে তাদের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হল,—

### ১। এয়াজপুর

এই গ্রামটি বারাসত মহকুমাব দেগঙ্গা থানাব অধীন। গ্রাম ছব বিধা জমিব মধ্যে পুকুর এবং একটি ইটেব তৈবী নজবগাহ আছে। বিশাল বটগাছে আচ্ছাদিত স্থানটি বেণ মনোরম। নজরগাহের গায়ের ফলকে লিখিত আছে—

“গীত গোবাচাঁদ সাহেবের ভূমাসন  
শাহ্ সূফী সৈয়দ আক্বাছ আলি  
ওরপে গীত গোবাচাঁদ সাহেব  
প্রায় ৬০০ শত বৎসব পূর্বে  
পদ্মা নদী পাব হইয়া এইখানে  
বসেন, এখানে তাঁহাব মাজার নহে।

এযাজপুর

ইতি—

১লা কার্তিক ১৩৬১

শেখ বদিয়াজ্জমা।”

এযাজপুরের নজরগাহেব বর্তমান (১২৭০) খাদিমদারগণেব অন্ততম শেখ আব্দুল ওতুদ (৭৭) জানালেন যে এই নজরগাহেব মোট নিফর জমি ছিল ১১০ বিঘা। কোন এক সময়ে ঐ জমিৰ খাজনা ধার্য হয এবং কালক্রমে বাকী খাজনার নিলাম হলে তা ডেকে নেন বসিরহাটেব জসীমদ্দিন কারিগর। সাতক্ষীরা পলাশপোলেব খাঁ চৌধুরীবা পবে ঐ জমি জসীমদ্দিনের কাছ থেকে কিনে নেন। খাঁ-চৌধুরীরাই পরবর্তীকালে ৬ বিঘা জমি পৌবের নামে নিফর দান করেন। এই নজরগাহেব বিশেষ কোন কোন সময়ে ধূপ বাতি প্রদত্ত হয়। প্রতি বছর ১২ই ফাল্গুন তাবিখে এখানে মিলাদ হয়। অতিথি ও ফকিরগণকে সেবা কবা হয়। এখানে নামাজ কবা হয় না। মহরমেব সময় নজরগাহেব সামনেব ময়দানে মেলা বসে। আব্দুল ওতুদ সাহেবেব উর্ধ্বতন মঠ পুরুষ মহম্মদ শুকুর উল্লাহ সাহেব বাতুড়িয়া থানার অন্তর্গত আধারমানিক নামক গ্রাম থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন কবেন এবং তদবধি তাঁরা বংশ পবম্পবায় এই নজরগাহেব খাদিমদার নিযুক্ত আছেন। কিভাবে মোহম্মদ শুকুব আলি সাহেব এখানে খাদিমদার নিযুক্ত হয়েছিলেন তা জানা যায় না।

## ২। ভাসলিয়া

বাবাসত মহম্মদ দেগঙ্গা থানাব অবীন ভাসলিয়া গ্রামে প্রায় ২৫ বিঘা জমিৰ একস্থানে একটি নজরগাহ আছে। তাব বর্তমান (১২৭০) সেবায়ত মোহাম্মদ আবদুস্ সুকুব (৮৫) প্রমুখ বলে জানা গেল। প্রতি বৎসব ১২ই ফাল্গুন তাবিখে ৬বস এবং একদিনের মেলা হয়। মেলাৰ প্রায় ৫৬ শত



ভক্তের সমাগম হয়। কেহ উল্লেখ কবেছেন যে ভাসলিয়াব গোবাচাঁদ বন্দো-পাধ্যায় মুসলমান হয়ে পীৰ গোবাচাঁদ হয়েছিলেন। তাব কোন সমর্থন এখানকার কোন সূত্র থেকে পাওয়া যায় না। এখানে প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি দিবে জিয়াবত কবা হয়। ওবসেব সময় কলিয়ুগা গ্রামেব ভক্ত গোপগণ ন্যূনপক্ষে একপোষা দুই এই নজবগাহে দেন বলে শোনা যায়। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে আবদুল সুকুব সাহেব একটি টিনেব ফলকে নিম্নলিখিত রূপ লিখে এই নজবগাহ-স্থানে বেখে দিবেছেন,—

“হে মুসলমানবৃন্দ প্রত্যেক গোবস্থানে পড়হো—

১। আচ্ছালামো আলাযকোম ফি আহালাল করুব ১ বাব

২। বিছমিল্লাহেব রাহমানের বাহিম ১০ বাব”

মীর সইয়ুব রহমান আবো জানালাল যে মীর আতিয়াব রহমান (পিতা মবছুম গোলাম বহমান) প্রায় ৩২ বৎসব পূর্বে নজবগাহটি পাকা কবতে চেষ্টা কবেছিলেন। এই প্রচেষ্টায় তিনি গোপগণের সহায়তা লাভ কবতে স্বপ্নে আদেশ পান, কিন্তু গোপগণ তেমন কোন সহায়তা না কবায় নজবগাহ পাকা কবার কাজ অর্ধসমাপ্ত বাখতে বাধ্য হন।

বহু ভক্ত এখানে শিরনি, হাজত ও মানত দিবে থাকেন।

### ৩। হাঙ্গিয়া

এই স্থানটি দেগঙ্গা খানাব অন্তর্গত এবং ভাসলিয়া গ্রামেব পাশেই তেঁতুলিয়া নামক গ্রামেব মধ্যে অবস্থিত। এখানকার পীবোস্তব জমিব পরিমাণ প্রায় বিশ বিঘা। এখানে ১২ই ফাস্তুনে ওবস ও একদিনেব মেলা বলে ও প্রায় ৪০০ লোকের সমাবেশ ঘটে। মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন প্রমুখ ব্যক্তি ইহাব সেবাসেত। এখানে ভক্তগণ ধূপ-বাতি দেন, শিবনি, হাজত ও মানত প্রদান কবেন।

### ৪। গাংধুলোট

দেগঙ্গা খানাব অন্তর্গত এই গ্রামেব প্রান্তে প্রবাহিত বিজ্ঞানরী নদীৰ তীববর্তী স্রুহং তেঁতুল গাছেব নীচে একটি নজবগাহ অবস্থিত। পুর্বানো দিনেব পাতলা ইটেব গাঁথনি। এখানে পীবোস্তব জমি ছিল প্রায় ৩২ বিঘা।

বর্তমানে (১৯৭০) তা'ব পবিমাণ প্রায় ১২ বিঘা। এখানে শিবনি, হাজত ও মানত প্রদত্ত হয়। এখানকার সেবায়িত মোহাম্মদ হাজেব শাহজী (৭০) প্রমুখ ব্যক্তি। এঁদের পূর্ব উপাধি ছিল 'সবদাব'। এখানে ১২ই এর পবিত্রের্তে ১৩ই ফাস্তুন তারিখে ওবস এবং একদিনেব মেলা হয়। মেলায় প্রায় ৫০০ লোকেব সমাবেশ হয়। অতিথি সেবার ব্যবস্থা এখানে আছে।

#### ৫। সাত হাতিয়া

দেগঙ্গা থানাধীন এই গ্রামেব নজবগাহটি প্রায় ১২ বিঘা জমিব একস্থানে অবস্থিত। গাঁও পুরুব নামে একটি পুরুব উক্ত স্থানটির অনেকখানি অংশ জুড়ে বেখেছে। একপাশে কববস্থান। নজবগাহটি কামিনী ফুলেব গাঁছ দ্বারা সজ্জিত। মোসাম্মেৎ সালেহা খাতুন (৫৫) এখানকার সেবায়িতগণেব অন্ততমা। প্রায় প্রতি শুক্রবাব ও শনিবাবে তাঁর ওপর গাঁবেব 'ভব' হয়। 'ভব' অর্থাৎ ব্যহুস্তান বিলুপ্ত হয়ে তিনি অলঙ্কিত নির্দেশ অল্পযায়ী কথা বলেন ও কাজ করেন। মোসাম্মেৎ সালেহা খাতুন ঐকপ 'ভব' হওয়ার পর গাঁবেব নিকট থেকে ঔষধ-পত্র পান বলে অনেকেব বিশ্বাস। ভক্তগণ সেই ঔষধ-পত্র ব্যবহাব কবে আবোগা লাভ কবেন বলে শোনা গেল। এতদঞ্চলেব লোক জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এখানে মানত কবেন, শিবনি এবং হাজত দিবে থাকেন। এখানে কোন মেলা হয় না।

#### ৬। গোসাইপুৰ

দেগঙ্গা থানাব অন্তর্গত গোসাইপুৰ গ্রাম। এই গ্রামে একটি নজবগাহ আছে। খাদিমদাব বংশেব জমিদার মুন্সী আমীর আলি সাহেব তাঁব সময় থেকে এই নজবগাহে ধূপ-বাতি দেওয়াব ব্যবস্থা কবেছিলেন। বর্তমান খাদিমদার হলেন দীন মহম্মদ তরক্কার। বর্তমানে (১৯৭০) এখানে ধূপ-বাতি জিয়াবৎ কবেন মোহাম্মদ বেলাবেৎ হোসেন (৮৫) প্রমুখ। তবে বিশেষ অহুষ্ঠান বা মেলা হয় না। একটি অল্পখ গাছেব নীচে এক কাঠা পরিমাণ জমিব উপর ইটের গাঁথনি আছে। একখানি ইটের পবিমাণ এইকপ :—১১" × ৫ ১/৪" × ২ ১/২"।

## ৭। গাঙ্গুলিয়া

এই গ্রামটি দেগঙ্গা খানাব অন্তর্গত। মাটিব দেওবাল ও টালীব ছাউনি সমন্বিত (এই নজবগাহেব) কল্পিত কবব স্থানটি একটি লাল কাপড়ে ঢাকা। ছাউনিব উপরিস্থিত টিনেব পাতে লেখা আছে :—“বিছমিল্লা হে বহমান লাযে লাহা ইল্লাল্লা, মহম্মদে রহুল্লাহ। গীব গোবাটাঁদ ছাহেবেব নজবগাহ। সন ১৩২৩ সাল ১লা জৈষ্ঠ মক্কলবাব।” টালীব ছাউনিব উপবে টিনেব ময়ূব মূর্তি আছে। গীবেব নামে প্রদত্ত জমিব পবিমাণ প্রায় আট বিঘা। এবই সীমানার মধ্যে সাধাবণেব কববস্থান নির্দিষ্ট হযেছে। প্রতি বৎসব ১৬ই ফাল্গুন তারিখে ওবস হয এবং পবে দুই দিনেব মেলা বসে। গড় জমায়েত হয় প্রায় এক হাজার জনের। ভক্তগণ যথাবীতি হাজত, মানত ও শিবনি প্রদান করেন। প্রতিদিন ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয়। খাদিমদাব মুন্সী ফকিবের বংশধবগণের কাছ থেকে কাজী জযনদ্দীন স্থানটি ক্রয় করেন। তাঁব বংশেব কাজী ওমব আলির মৃত্যুব পব আবুল আজিজ সেবক নিযুক্ত হযেছেন। মেলাব দিনে বাজনা বাজে, সোন্দল বা শোভাযাত্রা বাহির হয়।

## ৮। জুহাই

গ্রামটি দেগঙ্গা খানাব অন্তর্গত। বিশাল অশ্বখ গাছেব নীচে ইটের গাঁধুনি চিহ্নিত এই নজবগাহ প্রায় তিন বিঘা জমিব মধ্যে অবস্থিত। পূর্বে এই জমিব পবিমাণ ছিল প্রায় ৪।৫ বিঘা। পূর্ব সেবায়েতের নাম ছিল হবি মণ্ডল। জুহাই নিবাসী মোহাম্মদ সোলেমান দকাদাব (৭০) জানালেন যে বর্তমানে (১৯৭০) জনসাধাবণেব পক্ষে মোহাম্মদ নোকসেদ আলি মণ্ডল (৩৫) নজবগাহে ধূপ-বাতি দেন। প্রতি বছর ১৬ই মাঘ তারিখে ওবস ও একদিনের মেলায় বহু লোক-সমাগম হয়। কিছুকাল আগে মেলায় জুয়াখেলা নিয়ে গোলমালেব ফলে পুলিশী হস্তক্ষেপ ঘটে এবং মেলা অল্পাধীন বন্ধ হযে যায়, বার জন্ত জনসমাগম কমে গেছে।

## ৯। নারায়ণপুর

দেগঙ্গা খানাধীন এই গ্রামে গীব গোবাটাঁদেব নামে এপ্রিল মাসে গড়ে হাজার লোকেব সমাবেশে চাব দিনেব মেলা হত বলে বেঙ্গল গেজেট ১৯৫৩ গ্রন্থে লিখিত আছে। বর্তমানে তাব কোন নিদর্শন দৃষ্ট হয না।

## ১০। দোগাছিয়া

দেগঙ্গা খানাদীন এই গ্রামে পীৰ গোবাচাঁদেৰ নামে এপ্রিল মাসে গড়ে ১৫০ জন লোকেৰ সমাবেশে ৪ দিনেৰ মেলা হত বলে ১৯৫৩ ও ১৯৬১ সালেৰ বেঙ্গল গেজেটে (মেলা ও উৎসব বিবৰণী) লিখিত আছে। বৰ্তমানে (১৯৭০) তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

## ১১। জয়গ্রাম

১৯৫৩ সালেৰ বেঙ্গল গেজেট অনুসাবে বাহুড়িয়া থানার অন্তর্গত এই গ্রামে পীৰ গোবাচাঁদেৰ নামে যে মাসে গড়ে ২০০ লোকেৰ সমাবেশে পাঁচ দিনেৰ মেলা হত বলে প্রকাশ। ১৯৩১ সালেৰ সেটেলমেণ্ট রেকর্ড অনুযায়ী বাহুড়িয়া থানায় ঐ নামেৰ কোন গ্রামেৰ উল্লেখ পাওয়া যায় না।

## ১২। লেরপুর

১৯৩১ সালেৰ সেটেলমেণ্ট বেকর্ড অনুযায়ী হাবড়া থানার অন্তর্গত এই গ্রামেৰ নামেৰ উল্লেখ আছে। বর্তমানে অশোক নগরেৰ গ্রাম প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি বিশাল পুকুৰেৰ ধারে অবস্থিত একটি উঁচু টিলাৰ ওপৰ পীৰ গোবাচাঁদেৰ নামে যে নজরগাহটি আছে ঐটিই সেবপুৰেৰ ‘দবগা’ নামে খ্যাত। পীৰ বাবাব পুকুৰসহ এখানকার পীৰোত্তৰ জমিৰ পৰিমাণ প্রায় চল্লিশ বিঘা। প্রতি শুক্রবারে আবাল-সিক্তি গ্রামাঞ্চল থেকে এক মুসলমান মহিলা এখানে এসে ধূপ-বাতি দিয়ে জিয়ারত কৰে বান। বস্তুতঃ জনসাধারণই এখানকার সেবায়ত।

## ১৩। চন্দনহাটি

বাবাসত থানার অন্তর্গত এই গ্রামেৰ নজরগাহটি বর্তমানে (১৯৭০) প্রায় ৪ কাঠা জমিৰ উপৰ এবং বহু পুৰাতন এক তেঁতুল গাছেৰ নীচে অবস্থিত। এর ইটেৰ দেওয়াল এবং টিনেৰ চাল আছে। পূর্বে এখানে একদিনেৰ মেলা হত এবং তাতে প্রায় ৫০০ লোকেৰ আগমন ঘটত। বর্তমানে সেবায়ত মোহাম্মদ রোষাব মণ্ডল-৩৫) প্রতি শুক্রবার ধূপ-বাতি দিয়ে

জিয়াবত করেন। এই স্থান সম্পর্কীয় লোককথা পববর্তী অব্যাহে লিখিত হয়েছে।

### ১৪। কামদেবপুর

আমড়াঙ্গা থানার অন্তর্গত এখানকার নজরগাহটি এতদ্ অঞ্চলে খুবই প্রসিদ্ধ। পাকা নজরগাহ ১৭ কাঠা জমির উপর অবস্থিত। সেবাবেত শ্রীমূর্ত্যাকান্ত মাইতি (৫৪) বলেন যে, পূর্বে এখানে পীবেব নামে প্রায় ৮ শতক জমি পতিত ছিল। জমির পরিমাণ বাড়িয়েছেন সেবাবেত নিজে। তিনি এই নজরগাহকে মন্দির নামে অভিহিত করেন। এই কাবণেই এখানে শিবনি ও মানত প্রদত্ত হয় কিন্তু হাজত দিবাব নিয়ম নেই। প্রতি বৎসর ১৫ই ফাল্গুন তারিখে বিশেষ অঙ্কঠান এবং ঐ সাথে সাত দিনের মেলা বসে। বহু দূর দূরান্তের ভক্ত যাত্রীগণ এখানে সমবেত হন। তাঁদের জামাষেতের গড় সংখ্যা দৈনিক প্রায় তিন হাজার। সাধারণ গান-বাজনা ছাড়া বিভিন্ন স্থানের ফকিরগণ এলে মানিক পীরের গান করেন। নানাবিধ ব্যাধি থেকে নিবাময় লাভ কবা যায় বলে খ্যাত হওয়ায় প্রতিদিন বিশেষতঃ ছুটির দিন রবিবারে যাত্রীব ভীড় বেশী হয়। এখানে ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয়, বাতাসা লুট দেবার নিয়ম আছে। অসংখ্য অতিথি সংকাব কবা হয়। ভক্ত বোগীগণকে ঔষধ দেবার আগেব মুহূর্ত্তেব এক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয় বলে কথিত আছে। ঘটনাব বিবরণের মূল কথা এইরূপ,—

শ্রীমূর্ত্যাকান্ত মাইতি মহাশয় পবিত্রভাবে মন্দিরের মধ্যে আসনে আরাধনার নিমগ্ন হলে তাঁব ওপর পীর গোরাক্ষাদেব 'ভব' হয়। তখন ভক্তগণ তাঁব মুখ থেকে প্রস্রাব মাধ্যমে জ্ঞাতব্য বিষয় জ্ঞেনে নেন। ভক্ত রোগীর সেই সাথে নামমাত্র মূল্য দিয়ে ঔষধ গ্রহণ করেন। এই নজরগাহের ঔষধ ব্যবহার করে মস্তিষ্ক বিকৃতি থেকে আরোগ্য লাভ করে জর্নৈক ব্যক্তি যে প্রশস্তি গজ বচনা করেছেন তা নিম্নরূপ (প্রশস্তি পত্রটি দেওয়াল চিত্র হিসাবে মন্দিরে শোভা পাচ্ছে)—

### ৩গোরাটাঁদ পীর মাহাত্ম্য-কথা।

মহাতীর্থ বাবাসত কামদেবপুর।

তাহাতে বসতি নিত্য করেন ঠাকুর।

আধি-ব্যাধি লয়ে সবে ছুটে যাব যবে ।  
 ঠাকুব বলেন তাহা কিসে ভাল হবে ॥  
 জর্জবিত অস্থিসাব স্বীকায় দেহ ।  
 মুহুর্তে সজীব হয় পেষে তাঁব স্নেহ ॥  
 হতবুদ্ধি উদ্গাদেব ফিরে আসে জ্ঞান ।  
 সবে তাই কবে নিত্য ঠাকুবের ধ্যান ॥  
 মহাশক্তি কালিকায় করো মানসিক ।  
 ঠাকুব বলেন সবই হয়ে যাবে ঠিক ॥  
 ভক্তি তবে পূজ সবে কর গো প্রার্থনা ।  
 আপনি পুঁবিবে জেনো সকল কামনা ॥  
 প্রকৃত্তরে দেবতার যদি ডাকে সবে ।  
 অমনি শুনিবে কিসে ব্যাধিমুক্ত হবে ॥  
 জিতাপে তাপিত যারা এস নতশির ।  
 এখানে আছেন প্রভু গোরাট্টাদ গীর ॥  
 সেবাইত নিত্য তাঁব বাবাজী ককিব ।  
 সদা হান্তময় আব অতি নম্রবীৰ ॥  
 সকলি যেন তাঁব আপন সন্তান ।  
 ববান্ধব দেন তিনি দিবে মন-প্রাণ ॥  
 যাব যা অব্যর্থ সেই মহা মহোষব ।  
 অকাতবে দেন তিনি যুচাতে আপদ ॥  
 পার্বদ তাঁহাব যাবা তাঁবাও অভুল ।  
 সবাই মিলায় যেন আবুলেব কুল ॥  
 এসো তবে মুক্ত কবে বলি সবে ভাই ।  
 চবণে তোমাব গীত দাঁও মোব ঠাই ॥  
 জীবন কল্যাণে তুমি হবে আবির্ভূত ।  
 করেছ আপন হৃৎক নিত্য তিবোহিত ॥  
 ঈশ্বর আল্লাব তুমি পুণ্য অবতাব ।  
 বহিছ আপন শিবে মহাশক্তার ॥

অভীষ্ট পূবাও তুমি ওগো শক্তিমান ।  
 সমূহ বিপদ হতে করো পরিত্রাণ ॥  
 কৃপা করে সংশয়ের ঘুচাও সংশয় ।  
 দিকৃত জীবনে পুনঃ কব মধুগয় ॥  
 তোমাব মাহাত্ম্য বচি হেন সাধ্য নাই ।  
 চরণে তোমাব শুধু দাও মোর ঠাই ॥  
 বাণীতে তোমাব দাও অমৃতের স্বাদ ।  
 ক্ষুদ্রমতি আমাদের ঘুচাও প্রমাদ ॥  
 আশীর্বাদ কব যেন ভক্তি আসে প্রাণে ।  
 চিত্ত হয় মুখরিত তব জবগানে ॥

কৃপাধন

১৫ই ফাল্গুন ১৩৭০ সাল ।

সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এই নজরগাহ উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরূপ :— বন-জঙ্গলে আকীর্ণ এই স্থানে গৌবাচাঁদের একটি ‘থান’ ছিল। এই ‘থানে’ দীর্ঘবক্ত শূর্য্যকান্ত মাইতি মহাশয় প্রত্যহ ‘দুধ’ দিতেন। তখন তাঁর দুধের ব্যবসায় ছিল। মূলতঃ তিনি খুব গো-ভক্তও ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি এইস্থানে এসে ভক্তিতে তন্ময় হয়ে একাকী বসে থাকতেন। বাংলা ১৩৫৫।৫৬ সালে তিনি স্বপ্নাদেশ পান সেই স্থানে ভক্তি অর্থ নিবেদন করাব। সেই সময় থেকে তিনি ধূপ-বাতিসহ মিষ্টান্ন, দুধ, ফল ইত্যাদি দিতে আবস্ত করেন। ১৮৫৭ সালে তিনি এই স্থান ইঁট দিয়ে গাঁথেন। তাবপবে সেখানে স্তবঘা অট্টালিকা-মন্দির গড়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীগণও এখানে আসেন।

শ্রীশূর্য্যকান্ত মাইতি মহাশয় জানালেন যে এই ‘থানে’ ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ থেকে ভক্তগণ বোগ নিরাময়ের জন্য আসেন। বাঙ্গালাব ধাতনামা সাহিত্যিক তাবশরুব বন্দোপাধ্যায়ও একবার জাপানী কবেকজেন প্রতিনিধিকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। এই স্থানান্তলে গৌব গোবাচাঁদ সম্বন্ধীয় লোককথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে, ‘ভব’-প্রাপ্ত হলে

শ্রীমাইতি মহাশয় যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে ইংরেজী, হিন্দী, জার্মান প্রভৃতি যথোপযুক্ত ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিবে থাকেন।

#### ১৫। দেউলা

দেউলা বা দেবালয় বা দেউলিয়া গ্রামটি দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত। এটি বালগাণ্ডা পরগণার রাজা চন্দ্রকেতুব মন্দির-শোভিত গ্রাম। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এখান থেকেই গুপ্তযুগের নানা রকম নিদর্শন পাওয়া গেছে। রাজবাটী থেকে মন্দিরের দূরত্ব মাত্র এক কিলোমিটার হতে পারে। মন্দিরের গায়েই পীব গোবাচাঁদের একটি নজরগাহ আছে। নজরগাহটির পাকা ঘর-সংলগ্ন জমির পবিমাণ প্রায় ছয় কাঠা। তার সেবায়ত মোহাম্মদ কসিমুদ্দীন শাহজী প্রমুখ। নজরগাহটি প্রথম দর্শনে হিন্দু মন্দির বলে ভ্রম হতে পারে। সেবায়তগণ এখানে প্রতাহ ধূপ-বাতি দিবে জিয়ারত কবেন।

#### ১৬। লিংছ দরঙ্গা

বেড়া চাঁপার রাজা চন্দ্রকেতুব রাজবাটীর যে ধ্বংসাবশেষ আছে তাব দক্ষিণাংশে রাজপ্রাসাদের প্রাচীর সংলগ্ন উঁচু জায়গায় গোলাকৃতি একটি নজরগাহ আছে। এইখানে রাজার সংগে পীব গোবাচাঁদ আলোচনায় বসেছিলেন বলে প্রচলিত প্রবাদ। জমির পবিমাণ তিন কাঠা। জনসাধারণই এখানকার সেবায়ত।

#### ১৭। বেড়ু বাঁশতলা

বসিহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত লতাবাগান নামক গ্রামে এই স্থানটি অবস্থিত। এই স্থানে বেড়ু বাঁশের দুইটি বহু পুরাতন বাড় থাকায় ঐরূপ নামকরণ হয়েছে। জনসাধারণই এই নজরগাহের সেবায়ত। বাঁশী ফকির নামক এক ব্যক্তি পূর্বে এইখানে অবস্থান করতেন এবং নিয়মিত ধূপ-বাতি দিতেন। এখনও ভক্তগণ সেখানে মানতাদি দিবে থাকেন। এরই একপাশে অনতি দূরে বিখ্যাত লাল বা বাঙা মসজিদ এবং অপর দিকে পীব গোবাচাঁদের মূল দরগাহ অবস্থিত। স্থানটির জমির পবিমাণ প্রায় এক বিঘা।



## ১৮। ঘোড়ারশ

বসিরহাট থানাধীন ঘোড়াবাশ নামক স্থানে আত্মমানিক দুই বিঘা জমির মধ্যে গীব গোবাচাঁদেব নামে একটি নজবগাহ আছে। সেখানে একটি ফলক দৃষ্ট হয়। জনসাধারণ এই নজবগাহের সেবাযেত।

## ১৯। খড়ুর

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত এই গ্রামে প্রায় ১৫।১৬ বিঘা জমি পবিবাপ্ত এক বিশাল বট গাছেব নীচে গীব গোবাচাঁদেব একটি নজবগাহ অবস্থিত। ইটের গাঁথনিযুক্ত এই নজবগাহটি। এটি নির্মাণ কবে দিযেছিলেন মোহাম্মদ পঞ্চু সরদার। বর্তমান (১৯৭০) সেবাযেতের নাম মোহাম্মদ সরুউল্লাহ (৫০)। এখানে ভক্তগণ ধূপ-বাতি দেন, শিরনি, হাজত ও মানত দিযে থাকেন। উবসের দিন ১২ই ফাস্তন। অধুনা সেখানে বিশেষ অলুঠান হয় না।

## ২০। নেহালপুর

বসিরহাট থানার অন্তর্গত নেহালপুর গ্রামে গীব গোবাচাঁদেব নামে একটি নজবগাহ আছে। প্রতি বৎসব ১২ই ফাস্তন তাবিখে উবস উপলক্ষ্যে এই গ্রামের মহিষপুকুরের পাড়ে একদিনের মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আবলু হয়েছে। এই মেলায় প্রায় পাঁচ শতাধিক জনসমাবেশ হবে থাকে। ভক্তগণ এখানে ধূপ-বাতি, শিরনি ও হাজত-মানতাদি দিযে থাকেন। জনসাধারণ এই নাজবগাহেব সেবাযেত।

## ২১। বামনপুকুরিয়া

বামন পুকুরিয়া গ্রামটি মীনাখা থানার অন্তর্গত। এখানকার নজবগাহ স্থানে প্রতি বছর চৈত্র মাসে গীব গোবাচাঁদেব তিবোধান উপলক্ষ্যে দুই দিনের মেলা বসে। প্রায় ৫০০।৬০০ জন লোকের সমাবেশ হয়। মেলাটি দুই দিন স্থায়ী হয়। এই গ্রামে মাত্র একঘর মুসলমান পবিবাব বাস করেন। শোনা যায় জনৈক হিন্দু কর্তৃক এই নজবগাহ প্রতিষ্ঠিত হযেছিল। চৈত্র মাসে গীবেব

উভয় উপলক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী কুশাংবা নামক গ্রামের মুসলমানগণ ঐ গ্রামে এসে স্থানীয় হিন্দুগণের সহযোগিতায় উৎসবের আয়োজন ও উৎসব পবিচালনা করেন। অপরূপে উৎসবে যোগদানকারী মুসলমানগণ পীরের নজবগাহে জমায়েত হন এবং নানা বাস্তভাণ্ডসহ একটি শোভাযাত্রা করে গ্রাম পবিক্রমা করেন। শোভাযাত্রার পুর্বোভাগে জনৈক ককির রঙীন কাপড়ে ঢাকা ক্ষীবের গায়লা বহন করেন। এইভাবে গ্রাম-পবিক্রমা শেষে শোভাযাত্রাকারীরা দরগাহে ফিরে এলে ভক্তদেব মধ্য প্রসাদরূপে উক্ত ক্ষীব বিতরণ করা হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই গোবাচাঁদ পীরের নিকট নৈবেদ্য, ডালা ও অর্ধাদি মানত দিবে থাকেন। [ পশ্চিম বঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (৩য় খণ্ড) ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ ]

বাংলা ১৩৭২ সালের ১২ই ফাল্গুন তারিখে শালিপুর গ্রাম নিবাসী মোহাম্মদ নব্বিস মোল্লা যে প্রার্থনা কবিতা রচনা করেছিলেন তা এইরূপ,—

হজরত পীব মৈয়দ গোরাচাঁদ নাহেবের উরস শবীফ।

শুভ ছোন্দল।

আবাব এসেছে বে চিব বসন্ত

বাড়ই ফাল্গুন গোবাচাঁদ বাবাব

সমাধি মাঝার শবীফেব ডাক ॥

এস প্রেয় বুলবুল কবো নাকো ভুল

আব্বাস আলি ওবকে “গোবাচাঁদ” বলে

কঠ কাটিবে ডাক ॥

এস এস ইংবাজ এস খুষ্টান

এস হিন্দু মুসলমান ॥

এবই সৃষ্টিব শ্রেষ্ঠ আমবা,

পাক পবিজ হয সমান ॥

আজই এই দিনে বেহেস্ত স্বর্গ হতে

আসবে নেমে হাডোয়ায

মহান বীব গোবাচাঁদ পীর।

... তব আশীর্বাদের ধাবা স্থলব করে মন,  
আজই এই বার্গবপুবেব বন।

অতি মনোরম নীল গগনেব তাবা,  
তব সমাধি মন্দির ধবে আমবা পাগী অল্পতাপি,  
বাব সে ত'রে কোকিলেব কুহু কুহু স্বরে।

তব গোলাপ চাঁপা জবা বকুল মুকুল ঝরে।  
তোমাব দরশন আসে রক্তজা মোবাবক পাশে,  
এত তব স্তব্ধ বাতি ॥

গোলাম সেখ কালু আসি জালাব ধূপ-ধূনা  
আর মোমের বাতি।

ভক্তগণ বত তোমার প্রেম ভক্তিতে বত,  
তোমাব চরণ-ধূলি লইব অঙ্গে তুলি,  
যোগী, ঋষি, মুনি শোনাবে প্রতিধ্বনি  
পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে থাক,  
সমাধি মাঝার শরীরের ডাক ॥  
হাডোয়া শবীক ॥

উপরোক্ত কবিতাটি বাংলা ১৩৭৬ সালের বাবোই ফাস্তন তাবিখে পুনঃ  
প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ১৩৭৮ সালের ১২ই ফাস্তন তাবিখে মোসাম্মেৎ  
হান্নু হেনা নামী একজন মহিলা এইরূপ একটি কবিতা বচনা কবেছিলেন—

হজরত পীর সৈয়দ গোরাচাঁদ সাহেবের উরসু মোবারক।  
শুভ ছোন্দল।

শীতের কঠোরতা তুলে বসন্তেব মহুবা তুলে  
ফুলে ফুলে গাহিছে ভ্রমর গুণ-গুণ,  
এলোরে বসন্ত প্রেম ডালি হাতে নিষে  
পুষ্প ভরা বারুই ফাস্তন।  
কুঞ্জ মাঝারে থাকি গাহিছে বুল বুল  
পাখী কবো নাকো তুল,

আকাস আলি শুধু গোবাতাঁদ নম  
 ওষে আসমানী এক ফুল।  
 শুনিয়া মধুব তান লইয়া ক্ষুদ্র প্রাণ  
 আনিয়াছে অর্থ ডালি  
 প্রেম পুষ্পে গাঁথিয়াছি মালা  
 নাহি মম চামেলি শেকানী।  
 রাজা মহাজন আর সাধারণ  
 অর্থকে চেনে প্রাণ হতে বড় করে,  
 দরবেশ বাদশা আর অলি আক্সা  
 বাস কবে নির্লোভ অন্তবে।  
 বুঝি তাহা আজ ওগো মহারাজ  
 আনিয়াছি ক্ষুদ্র অর্থ,  
 তোমাৰি ডাকে আজ তুলি শত কাজ  
 হর গীব ছাড়ে স্বৰ্গ।  
 তুমি যে মহান তাহাবই সমান  
 হয়না কিছুই তুল্য,  
 জপে তপে সাজ সকলেবি মাঝ  
 প্রেম তাই হুবমূল্য।  
 বন্ধু যে যত সাক্ষাতে শত  
 ভুলোনা পীবেব ডাক,  
 এই মাধুবী ভবা বসন্তে চিব অনন্তে  
 বাজিছে পীবেব ঢাক।  
 ধবাব মাঝে ধরিতে সিঁধা  
 অধরাতে পেলাম আলো,  
 শুধু চাঁদ-তাবা নম আলোকে সেখাষ  
 তাইতো বেশেছি ভালো।  
 শত হুখ দুখ ভুলে হৃদয় ছয়ার খুলে  
 গাহিলাম ছন্দ বিহীন গুন,

কহিলাম ভাষাতে অভুল আশাতে

তুমি যে সাগবসম করুণ।

(মাজমুখুব পীর সেবাস্থেত সংঘ। মোহাম্মদ মুজিবব বহমানের মজলিস হইতে। প্রধান পরিচালক মোঃ দববেশ আলি।)

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় বারাসত চাঁপাডালির মোড়ে এক সমাবেশে ‘শাসন’ গ্রাম নিবাসী ফকির তৈয়্যেব আলি (৪০) নিজেকে পীর গোবাচাঁদের ফকির বলে পবিচয় দিলেন। তাঁর হাতের একটি ব্যাগে লেখা ছিল “পীর গোরাচাঁদ সেবা সমিতি”। তিনি নিম্নলিখিত গানটি গাইলেন,—

মকতে এলেন মোহাম্মদ মথুবাতে এলেন শ্বাম।

ইমান খেলা খেলেন বস্তুল লীলা খেলেন ঘনশ্বাম।

মা খোদেজা পাগল হল নবীব প্রেমে মদিনা।

বানীশ্বর স্তবে পাগল হযে বাধা চলে যমুনা।

ছুই রাখালে মজিষে মন গরু আব ভেড়ী চরা।

আযবে তোবা দেখে যাবে হিন্দু আব মোছলমান।

মদিনা আব মথুরা, হয যে সেখা স্বগল মিলন।

বলরাম আব বস্ত্বাম, বঘুবাম আব বলরাম।

ইমান খেলা খেলেন বস্তুল লীলা খেলেন ঘনশ্বাম।

একই মাযেব ছেলে মোবা একই স্তম্ভ কবি পান।

একই মাযেব ছুঙ্ক গিষে মোবা হিন্দু-মুসলমান।

ভুলে গিষে বেযাবেষি হিন্দুস্তান আব পাকিস্তান।

ভুলে গিষে বেযাবেষি পড কুবান আব সে পুবান।

মকতে এলেন মোহাম্মদ মথুবাতে এলেন শ্বাম।

ইমান খেলা খেলেন বস্তুল লীলা খেলেন ঘনশ্বাম।

‘এইকপ ছোট ছোট গীতসমষ্টি’ অনেক ভ্রাম্যমান ফকির গেযে বেড়ান বলে শোনা যায়। তাছাড়া পীর গোবাচাঁদের নামে বচিত নিম্নলিখিত স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থগুলিব সন্ধান পাওয়া গেছে,—

১। পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী : মহম্মদ আবদোজ্জা

- ২। পীব গোবাচাঁদ পাঁচালী : মুনশী খোদা নেওয়াজ
- ৩। বাংলার পীব হজবত গোবাচাঁদ রাজী : আব্দুল গফুর সিদ্দিকী,
- ৪। গোবাচাঁদ ও চন্দ্রকেতু : মোহাম্মদ হবমুজ আলী।

উপবোক্ত গ্রন্থ সমূহেব সংক্ষিপ্ত পবিচয় নিম্নে প্রদত্ত হল।

## ১। পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী কাব্য

পীব গোরাচাঁদ পাঁচালী কাব্যের রচয়িতা কবি মোহাম্মদ এবাদোল্লা। কবির জন্মভূমি বসিরাহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত পিষাবা নামক গ্রাম। পীব গোবাচাঁদের শেষ খাদিমদার শেখ দারা মালিকের মধ্যম পুত্র শেখ লাল, কবি এবাদোল্লাব পূর্ব পুরুষ। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ সাধক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁর অগ্রজ। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু্যব তাবিখ জানা যায়নি। তবে তাঁর কাব্যরচনার তাবিখ অল্পমায়ী জানা যায় তিনি খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকালের শেষ দিক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

তাঁর পুস্তকখানি মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০। আকৃতি ১০" X ৬"। পাঁচালী কাব্যখানি যথাক্রমে হামদো নাযাত ও গল্প এই তিনটি অংশে বিভক্ত। হামদো ও নাযাতের মূল বক্তব্য হল আল্লাহ-বন্দনা। এতে উৎসর্গপত্র ও ভূমিকা (গদ্যে লিখিত) আছে। সমগ্র কাব্যখানি হেমিটিক রীতিতে দ্বিপদী ও ত্রিপদী পর্ষাবে লিখিত। এই কাব্যের ভণিতার নমুনা এইরূপ,—

ভাগ্যমন্দ হয় বাব,                      বুদ্ধি লোপ হয় তাব  
নাহি আসে গোবাষ মিলিতে।  
হীন এবাদোল্লা কম,                      ভরসা কবি খোদাষ  
মবাবে শেষে গোবার হাতে ॥

কিংবা,

ভেঙ্গে পড়ে কোটাঘব,                      ভাগে লোক পেয়ে ভব  
ফাঁক পেয়ে চুবি কবে চোবে।  
গোবাব চরণ তলে,                      হীন এবাদোল্লা বলে  
ঘটে ইহা গোবাব জেকেবে।

এই পাঁচালী কাব্যের প্রতি পংক্তিতে আছে ষোল অক্ষর। প্রথম পংক্তির শেষে এক দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে দুই দাঁড়ি। কয়েকটি চরণের মাঝে মাঝে বড় হবফের দু'একটি করে শব্দ আছে। কবি একই শব্দ দু'বার না লিখে একটির পরিবর্তে '২' ব্যবহার কবেছেন।

কবি মোহাম্মদ এবাদোজ্জা সাহেবের 'গীত গোবাচাঁদ পাঁচালী কাব্য' চরিত্র পবগণার চলতি মুসলমানী বাংলা ভাষায় রচিত। ভাষা বেশ প্রাঞ্জল এবং তাতে আববী-ফাবসী শব্দ ব্যবহারেব প্রবণতা কম। শব্দ যোজনায় দুর্বলতা বা বর্ণাশুদ্ধি তেমন নেই। তাঁর কাব্যে বর্ণিত কাহিনীৰ চরক এইরূপ,—

মক্কাৰ কবিমোজ্জাব পুত্র আব্বাস আলি, আল্লাহু তা'লাব সাধন-ভজনে মগ্ন। একদিন তিনি হিন্দুস্তানের অন্তর্গত বালাণ্ডা পবগণায় ইসলাম ধর্ম প্রচার কববাব জন্ত আল্লাহ-নির্দেশ প্রাপ্ত হন। তিনি হিন্দুস্তানে এসে গাজীপুর হযে লিলেটে আসেন এবং সেখানে গীত শাহজালালেব নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ কবেন। দীক্ষান্তে ফিবে যান মক্কায এবং সেখানে মাতা-পিতাব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবে কবিমোজ্জাব পালক-পুত্র ছোন্দলকে সহচররূপে নিবে বালাণ্ডা পবগণায় এসে উপস্থিত হন। পশিমপো তাঁদেব সঙ্গে আবও হুফী ফকিরেব সাক্ষাৎ হয়।

বালাণ্ডা পবগণাব এযাজপুব নামক গ্রামে এসে গীত গোবাচাঁদ, সেখানকাব বাজা চন্দ্রকেতুব কাছ থেকে নজবানা আদায়ব নির্দেশ পাঠালে তাঁদেব মধ্যে বিবাদেব সূত্রপাত হয়। কয়কটি অলৌকিক শক্তিব পবিচয় দিযেও তিনি বাজাকে বশতা স্বীকাব কবাতে পাবেন না। ফলে উপস্থিত হয় বিবাদ এবং সেই বিবাদেব পবিণতিতে বাজা ও তাঁব পবিবাববর্গ দহ-ডুবিতে ধ্বংস প্রাপ্ত হন। গীত গোবাচাঁদ সেই রাজাব অহুচব ও সহযোগী যোদ্ধা হামা-দামা এবং আবো কবেকজন দৈত্যকে নিান কবেন। তাঁব সঙ্গে শেষ যুদ্ধ হয় হাতিবাগডেব বান্ধস-বাজ আকানন্দ ও বাকানন্দেব সঙ্গে। এই যুদ্ধে আকানন্দ-বাকানন্দ নিহত এবং তিনি গুরুতবরূপে আহত হন। অবশ্য অল্প কয়েকদিনেব মধ্যে তিনিও দেহত্যাগ কবেন। দেহত্যাগের পূর্বে তাঁবই নির্দেশমতন স্থানীয় বাসিন্দা কিত্ত ঘোষ ও কালু ঘোষ তাঁব মৃতদেহ সমাধিস্থ কবেন।

কবি মোহাম্মদ এবাদোজ্জা প্রত্যক্ষভাবে গীত গোবাচাঁদেব মাহাত্ম্যকথা এবং পবোক্ষভাবে আল্লাহু তা'লাব মাহাত্ম্য কথা প্রকাশ কবেছেন।

গল্পগ্রন্থে কবিব নৈপুণ্য পবিলক্ষিত হয়। কবিব ভণিতা থেকে জানা যায় অন্তরতঃ তিনি ছিলেন একজন ভক্ত। “হীন এবাদোলা কব” উক্তি থেকে আবো বোঝা যায় যে তাঁর মন ছিল বৈষ্ণবমূলভ ভাবাদর্শে উদ্ভূত। এই কাব্যে বর্ণিত অলৌকিক কীর্তিকলাপ ‘সেক স্তভোদয়া’-গ্রন্থে বর্ণিত অলৌকিক কীর্তিকলাপের কথাকে স্বরণ করিয়ে দেয়। রাজা লক্ষণ সেন বিস্মিত হয়েছিলেন শেখ সাহেবের অলৌকিক কার্যাবলী দেখে, আব রাজা চন্দ্রকেতুও বিস্মিত হয়েছিলেন পীর গোরাচাঁদ কর্তৃক প্রদর্শিত অলৌকিক কার্যাবলী দেখে।

## ২। পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী কাব্য

পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী কাব্যেব অন্ততম রচয়িতা কবি মুনসী খোদা নেওয়াজ। তিনি তাঁর আত্ম পবিচয়ে লিখেছেন,—

জেলা বর্ধমানের বাহাচুবপুর্বে ঘব \*  
ওবকে খেজুরহাটি সবাবে জানাই।  
পবগণা খণ্ডবোম জাহের আছে ভাই \*

কবিব পিতার নাম একরামদিন। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি মধ্যম।

দ্বিত্বিশ-পৃষ্ঠাষ মুদ্রিত তাঁর পাঁচালী কাব্যখানি হামধো-নাম্নাত এবং কেছা এই দুইভাগে বিভক্ত। আকৃতি ১০"×৬½" ইঞ্চি বিশিষ্ট। এতে দুটি গান আছে। একটিব বাগিনী বেহাগ, তাল আড়া। অন্য গানটি একটি, ধূয়া। প্রতি অহুচ্ছেদের আবস্তে পয়ার বা ত্রিপদী বলে উল্লেখ আছে। প্রথম পংক্তির শেষে দুই ঝাড়ি এবং দ্বিতীয় পংক্তিব শেষে তাবকা চিহ্ন। কোথাও বা ‘কমা’ব ব্যবহাব আছে।

পাঁচালীখানি বাঙ্গালা-মুসলমানি ভাষাব রচিত, কিন্তু সে ভাষা তেমন প্রাঞ্জল নয়। এতে আববী, ফারসী, হিন্দি প্রভৃতিব সাথে কিছু ইংবেজী শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দ ঘোছনায দুর্বলতা আছে, আছে প্রচুব বর্ণাশুদ্ধি। বর্ধমানেব আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবও এতে পড়েছে। পংক্তিব শেষে মিল ঘটানোব জন্য কোথাও কোথাও কবি অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহাব কবেছেন।



তাঁৰ কাব্যে ব্যবহৃত ভণিতাৰ নমুনা এইকপ : -

হীন খোদা নেওষাজ্জ কহে আমি গুনাগাব ॥

না জানি কি পরকালে হইবে আমাব ।

মুনসী খোদা, নেওষাজ্জ সাহেব-লিখিত পাঁচালি কাব্যেৰ কাহিনীৰ চূষক এইকপ :—

আল্লাৰ ফরমান পেখে দিল্লীৰ পীৰ গোবাৰ্চাদ বালাণ্ডা পৰগণায় এলেন। বালাণ্ডাৰ বাজা চন্দকেতুকে পীৰ বশুতা স্বীকাৰ কৰতে বললেন। বাজা বশুতা স্বীকাৰ কবলেন না। কলে রাজা পীৰ কর্তৃক অভিষপ্ত হলেন এবং সপবিবাবে ধ্বংস হবৈ গেলেন। বাজাৰ অহুগত হামা ও দামা নামক বীৰ ভাতৃদ্বয়ও গোবাৰ্চাদেৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধে পৰাস্ত হল। দক্ষিণ অঞ্চলেৰ অধিপতি দক্ষিণ বাঘ অবস্থা বুঝে নিষে, তাঁৰ বাজ্যেৰ অধেক পীৰ গোবাৰ্চাদেৰ জন্ত ত্যাগ কৰে তাঁৰ সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কবেন। কিন্তু হাতিয়াগডেৰ অধিপতি বাক্স-বাজ আকানন্দ এবং তাৰ কনিষ্ঠ ভাতা বাকানন্দেৰ সঙ্গে পীৰ গোবাৰ্চাদেৰ তুমুল সংগ্রাম হয়। এই যুদ্ধে আকানন্দ ও বাকানন্দ নিহত হন আৰু পীৰ গোবাৰ্চাদ গুৰুতৰভাবে আহত হন। অবশু কয়েক দিন পৰে তিনিও দেহত্যাগ কবেন। তাঁৰ ইচ্ছানুসাবে স্থানীয় অধিবাসী ভক্ত কিছু ঘোষ ও কালু ঘোষ, পীৰ গোবাৰ্চাদেৰ দেহ বালাণ্ডাতে সমাধিস্থ কবেন।

পীৰ গোবাৰ্চাদেৰ অন্তেকালেৰ বহুদিন পৰ একবাব বালাণ্ডা পৰগণায় বাঘেৰ নিদাৰুণ উপদ্রব দেখা দেয়। প্রজাগণ অতিষ্ঠ হবৈ উঠলে ব্যথিত পীৰ গোবাৰ্চাদ অন্তরীক্ষ থেকে বাদশাহ ছাৰা পেৰাব শাহকে বালাণ্ডা পৰগণায় শাসনকর্তা নিযুক্ত কৰাব ব্যবস্থা কবেন। পেৰাৰশাহ খুব প্রজা হিতৈষী ছিলেন। তিনি সেখানকাৰ অনেক স্থানেৰ বন কাটিয়ে সকলেৰ বসবাস-উপযোগী কৰে দেন। প্রজাগণ হুখে বাস কৰতে থাকেন। কালক্রমে দুষ্ট লোকেৰ প্রভাবে সেখানে দেখা দেব দাক্ষিণ অশান্তি। পেৰাব শাহ শান্তি কিবিলে আন্তে যথাসৰ্বস্ব পণ কবেন। প্রজা-হিতৈষী পেৰাব শাহ জনসাধাৰণেৰ ব্যবহাবেৰ জন্ত এক বিশাল দীঘি খনন কবান। কিন্তু অবস্থা এমনি দাঁডায় যাতে সেই দীঘিৰ জলে ডুবে তাঁকেই আত্মহত্যা কৰতে হয়। এৰু পর সেখানে আৰাব অৰাজকতা নেমে আসে।

পীর গোবাচাঁদ পুনর্বার মীবখাঁ নামক স্থানীয় এক সাধু ব্যক্তির সহায়তা নিয়ে সেখানে শৃঙ্খলা ক্রিয়াকে আনতে সচেষ্ট হন। মীব খাঁ দ্বিভ্র হবেনও পীর গোরাচাঁদের প্রতি আন্তরিক আশ্রয় ছিলেন। তাঁকে সাথে নিয়ে পীর সাহেব অলৌকিক শক্তির প্রভাবে ছুষ্ঠের দমন ও শিষ্টের পালন করে সেখানে শান্তি ক্রিয়াকে আনেন। সেই সময় থেকে তাঁর সমাধিস্থানে হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণের দ্বারা জিয়ারত অর্হুতান উদ্‌যাপনের সূত্রপাত হয়।

পীর গোবাচাঁদের কাহিনীতে দেখা যায় প্রত্যক্ষভাবে তাঁর এবং পবোক্ষ-ভাবে আল্লাহ্‌ তালার মহাশক্তি-কথা প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যের প্রারম্ভে কবি গেয়েছেন,—

পহেলা আবজ কবি নামেতে আল্লাব ॥

চৌদ্দভুবন বিচে যাব অধিকার + ইত্যাদি।

কবি ভণিতায় যা বলেছেন তা এইরূপ,—

কবি খোদা নেওয়াজ কয়,      ভাব বে মন খোদাতালাব,

জনম মোব গেল যে বিফলে ॥

খাকিতে এ জেনেগী,      কবিরে যে বন্দেগী,

তোবে যাবে পরকালে +

কাব্যখানি পাঠকালে পীর গোবাচাঁদের অলৌকিক শক্তির পবিত্র বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। তাঁর বীরবোদ্ধা রূপ সকলকে সহজে আকৃষ্ট করে। বীরত্ব কথা শুনবার স্বভাবসিদ্ধ আগ্রহ অনেক মানুষের। এ কাহিনী তাই পবিত্রাঙ্গী দান করে। একে পীর গোবাচাঁদ চবিত বললে অতুলিত হবে না। এই কাহিনী পাঠ করতে করতে তাঁর প্রতি একটা সমীহভাব জাগে। মূল চবিত্র পীর গোবাচাঁদের মৃত্যুতে ককণ রসাতলাসেব উদ্বেক হয়। এই কাহিনীতে দেখা যায় যে, তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর ক্রিয়াকলাপেব অবসান হয়নি। নানা রূপ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর অলৌকিক কীর্ত্তি সমগ্র কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে রাখতে সমর্থ হয়েছে। রসবিচাবে কাব্যখানি মিলনাস্ত পর্বাণে পড়ে। কাহিনীতে ঘটনার অবতারণার মাধ্যমে অঙ্কিত অশ্রাশ্র চিত্রে কবির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির তেমন কিছু পলিষ্ট পাওয়া যায় না। গল্প গ্রহণেও কবির নৈপুণ্যে বড়ো অভাব নেই। বারংবার মানব

চরিত্রের পাশে আছে বাঙ্গল-কপী মানবের চরিত্র, আব আছে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের চরিত্র। ছু'একটি চরিত্রে বৈবরিক হৃদয়-বুদ্ধির পরিচয় বর্ণনা লক্ষ্যণীয়। হাতীগড় নামক স্থানে একটি ঘটনার মাহুতের প্রতি মাহুতের মন কতখানি সন্দেহান্বিত হইয়াছিল তার নমুনা এইরূপ;—

মোনিব বলে দেওয়ান সকল আমি জানি।

পরের দাব পবে মজে কোথাও না শুনি \*

আমার তলব চিঠি তুমি কেন দাবে।

বুঝিবা কিকির করে খানা পানি দাবে।

খোদা নেওয়াজের এই কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর যে অলৌকিক ঘটনার বিবরণ আছে তা “সেক শুভোদবাত” শেখ কর্তৃক প্রদর্শিত অলৌকিক ঘটনার বিবরণের সঙ্গে তুলনীয়। একটি কাহিনীর তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ;—

চন্দ্রখেতু নামে বাজাব, কত সাজা দিল তার,

গোরাই পীর মকবুল খোদাব \*

তবু বাজা কবে হেলা, পাকাইল লোহার কলা,

বেড়াব ফুল ফুটল চাপাব।

“সেক শুভোদবাত” দৃষ্ট হই, বাজা লক্ষণ সেন, শেখ সাহেবের অলৌকিক শক্তিতে প্রথমে সন্দেহ কবেছিলেন। পবে তিনি দেখলেন ‘গটি-নাছ মুখে একটি মাবস পাখীকে। শেখ সাহেব, বাজাকে বিস্মিত করে এমন অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিলেন যাতে তাঁর আদেশে উক্ত মারস পাখীটি নিজের আহার্য নাছটি মুখ থেকে বেলে উড়ে চলে যায়।

অল্পকপ অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক কাহিনী আব যে সব কাব্যে পাওয়া যায় তাদের কবেকখানির নাম নিম্নে প্রদত্ত হল,—

১। গীত গোবাচাঁদ : মহম্মদ এবাদোলা

২। মানিক পীর : মোহম্মদ পিজিবদ্দিন

৩। বড় সত্যপান ও সম্ভাব্যতী কস্তাব গুখি : কুৎসবি দাস

৪। পীর এনদিন শাহ : আশক মহাম্মদ

৫। গাজী-কালু ও চম্পাবতী : আবদুব বহিম

৬। বায় মঙ্গল কাব্য : কুম্ভবাম দাস

৭। গাজী সাহেবের গান : নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সংকলিত প্রভৃতি।

বিষয়টি তুলনামূলকভাবে অল্পখবর কবলে দেখা যাবে যে অল্পরূপ ধরনের গল্পাংশ বামাষণ, মহাভাবত, শেক্সপীষের টেম্পেষ্ট, খৃষ্টীয় কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থ, কাব্য প্রভৃতিতে লিখিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, মধ্যযুগীয় সমস্ত দেব-দেবী বা তদ্ব্যন্থীয় চবিত্ত-ভিত্তিক প্রায় সমস্ত কাব্যে এই বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়।

### ৩। বালাগুর পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী

এই গ্রন্থের রচয়িতা আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১লা কার্তিক তারিখে বসিহাট মহকুমার বাহুড়িয়া থানাধীন খাসপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম মজুবহাট গ্রামের পাশে অবস্থিত। তাঁর পিতার নাম মুনশী গোলাম মাওলা সিদ্দিকী। আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে গেছেন। তাঁকে কেউ কেউ অল্পসন্ধান-বিণাবদ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এককালে আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব শিবালদহ অঞ্চলে চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, যাতে তিনি ডাক্তার বলে পরিচিত হন।

“মোহাম্মদী, মোহলেম হিতৈষী, The Musalman প্রভৃতি পত্রিকার সম্পর্কে এসে তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহশীল হন। বঙ্গবাসী, সঞ্জিবনী, হিতবাদী, দৈনিক বসুমতী, দৈনিক নাযক, দৈনিক সোলতান প্রভৃতি পত্রিকার সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। পববর্তীকালে তিনি পুথি সাহিত্যের সংগ্রহ ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হন এবং কতিপয় পুথির সম্পাদনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তাঁহার দীর্ঘকালের সম্পর্ক ছিল এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।”

“তাঁহার পিতা মুনশী গোলাম মাওলা সিদ্দিকী কলিকাতার কোব-আন শবীফ ও পুথি প্রকাশনা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। খাসপুরে গৈশব অভিহিত কবিয়া ডাঃ সিদ্দিকী কলিকাতায় গমন করেন। তথায় স্বল্পে শিক্ষা সমাপ্তির পব চিকিৎসা-শাস্ত্রে শিক্ষা গ্রহণ করেন। দুই বৎসর চিকিৎসাশাস্ত্রে

শিক্ষা গ্রহণের পব কলিকাতাব, শিষ্যালদহ-অঞ্চলে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। অতঃপব ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি সাব, স্ববেত্রনাথ ব্যানার্জি ও মবহুম আব্দুল বহুলের নেতৃত্বে বাজনীতিতে যোগদান করেন এবং তেজস্বী বক্তারূপে খ্যাতিলাভ করেন।”

[ আজাদ পত্রিকা ]

আব্দুল গফুর সিদ্ধিকী সাহেব দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখে বাইশ পুরুষের ভিটা ত্যাগ কবতঃ পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলা দেশে সপবিবাবে গমন করেন। সেখানে খুলনা জেলাব অন্তর্গত দামোদর নামক গ্রামে তিনি বসতি স্থাপন করেন। উক্ত গ্রামেই তিনি ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে পবলোক গমন করেন। তাঁর সাহিত্য কর্মের মধ্যে ‘বালাগুর পীব হজবত গোবাচাঁদ বাজী’ ছাড়া শহীদ তিহুমীব, লাঘলা মজহু প্রভৃতি গ্রন্থ এবং সাহিত্য পরিবর ও অগ্রাগ্র পত্রিকায প্রকাশিত প্রবন্ধ খুবই মূল্যবান। তিনি নামের সঙ্গে যে ডক্টর অর্থাৎ ডি লিট. খেতাব ব্যবহার কবতেন তা তিনি কোথায় কিভাবে পেয়েছিলেন তা জানা যায় না। ভাবতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুজব্বব আহমদ সাহেব, যিনি য়োবনে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন, তিনি ঐটিকে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি নব বলে আমার কাছে অভিযত প্রকাশ কবেছেন।

“বালাগুর পীব হজবত গোবাচাঁদ বাজী” নামক মুদ্রিত পুস্তকখানি ৮৬ পৃষ্ঠা সমব্বিত। পুস্তকের আকৃতি ৭”×৫” বিনিষ্ট। গ্রন্থখানিকে উপক্রমণিকা, জীবনী ও উপসংহার ঐই তিনটি প্রধান অঙ্গে বিভক্ত বলে ধবা যায়। জীবনী অংশে অনেক শিবোনামা দিবে তিনি পীব গোবাচাঁদের অলৌকিক কার্তিকলাপপূর্ণ কাহিনী বিবৃত কবেছেন। ঐই কাহিনীগুলিকে লোককথা পব্যাসে নেওয়া যাবে না। কারণ সিদ্ধিকী সাহেব ঐ গ্রন্থকে অনেকগুলি প্রাণাণ্য তথ্যপঞ্জীব ভিত্তিতে লিখিত বলে উক্ত গ্রন্থেই উল্লেখ কবেছেন।

গ্রন্থখানি আধুনিক সাধু বাঙ্গালা ভাষায় প্রাক্কল গঞ্চে বচিত। গল্প বলাব ভঞ্চিত পীব গোবাচাঁদের জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সংঘটিত কাহিনী ঐই

গ্ৰন্থে পৰিবেশন কৰা হয়েছে। কথোপকথনেৰে অল্পস্বত্বিত্তে কাহিনীটি বেষণ স্ত্ৰুপাঠ্য এবং চিৰাচৰিত পাঁচালীকাবগণেৰে স্ত্ৰাষ ধৰ্মভাৰ জাগবণেৰে প্ৰবল প্ৰবণতা না থাকায় ইসলামী কাহিনীতে একটি নতুন স্বাদ অল্পভব কৰা যায়। সবস ভক্তিমায লিখিত গ্ৰন্থখানি বিশিষ্ট সাহিত্য গুণ সমন্বিত হ্বে উঠেছে।

আব্দুল গফ্ফৰ সিদ্দিকী সাহেব যে কাহিনী পৰিবেশন কৰেছেন তা সংক্ষেপে এইৰূপ,—

হিজৰাহেব ৬২৩ সালে ২১শে বমজান তাৰিখেৰে প্ৰাতঃকালে শিশু আব্বাস আলী আৱবেব মক্কা নগৰীতে জন্মগ্ৰহণ কৰেন। আব্বাস আলীই পববৰ্ত্তীকালে গাঁৱ গোৱাৰ্চাদ নামে পৰিচিত হন। তাঁৰ পিতা হজ্জৰত কৰিম উল্লাহ্ ছিলেন শহীদ হজ্জবত হোসায়েন বাজীৰ অধঃস্তন বংশীয়ৰ এবং তাঁৰ গৰ্ভধাৰিণী হজ্জবত মাযমুনা সিদ্দিকা জন্মগ্ৰহণ কৰেছিলেন হজ্জৰত সিদ্দিক আব্ববকৰেৰ অধঃস্তন বংশে। আব্বাস আলীই তাঁৰ পিতা মাতাৰ প্ৰথম সন্তান।

৬২৭ হিজৰাহেব মাজ চাৰ বছৰ বয়সে তিনি শিক্ষাবস্তু কৰেন এবং ৭০৬ হিজৰাহেব মাজ বাবো বছৰ বয়সে তাঁৰ শিক্ষালাভ সমাপ্ত হয়। কোবান হামিছ শবীফেৰ উপৰ তাঁৰ দখল আসে, ব্যাকৰণ ও অঙ্ক শাস্ত্ৰে পৰিপূৰ্ণ জ্ঞান লাভ কৰেন এবং ফেকাহ শাস্ত্ৰে তাঁৰ অগাধ জ্ঞান জয়ে।

৭০৭ হিজৰাহেব তাঁৰ সংসাৰ বৈবাগ্য পবিলক্ষিত হয়। নামাজ, ৰোজা, কোবান-মজিদ এবং তসওফ শাস্ত্ৰেৰ আলোচনাৰ তিনি মগ্ন থাকতে ভালবাসতেন। হজ্জবত কৰিম উল্লাহ্ ও তদীয় পত্নী, পুত্ৰেৰ ভাবাস্তব দেখে উদ্ভিন্ন হলেন। পুত্ৰেৰ প্ৰতি সতৰ্ক দৃষ্টি বাখা সত্ত্বেও ৭০৮ হিজৰাহেব এক বাত্ৰে নিদ্ৰিত মাতা-পিতাকে বেখে আব্বাস আলী গৃহত্যাগ কৰেন।

কিশোৰ আব্বাস আলী বিবামহীন ভাবে পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বিশ্ৰামেৰে জন্ত একস্থানে অবস্থানকালে নিদ্ৰিত অবস্থায় স্বপ্নে এক দূৰবেশকে দৰ্শন এবং তাঁৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰলেন। নিদ্ৰাভঙ্গে তিনি নিজেৰে এক পৰ্ব্বকুটিৰে শাৰিত দেখলেন। এটি একটি আশ্ৰম। আশ্ৰমেৰে দববেশ বিখ্যাত হজ্জবত সৈবদ শাহ্ জালাল ৰাজী এযমনি। সেই দববেশেৰ নিকট তিনি ৭০৮ খেকে ৭২০ হিজৰাহেব মধ্যো কাদেবিয়া তবিকা মতে শিক্ষালাভ কৰে আধ্যাত্মিক জীবনে চৰম উন্নতি লাভ কৰেন।

এদিকে আব্বাস আলীর গৃহত্যাগের পব বাত্রি প্রভাতে পুত্রকে দেখতে না পেয়ে সৈয়দ করিম উল্লাহ্ বুঝলেন যে খাঁচায় আবদ্ধ পাখী শিকল কেটেছে। হজবত শাহজালাল রাজী নিজে মক্কায এসে সৈয়দ কবির উল্লাহকে আব্বাস আলীর শিকালভ কবাব কথা প্রকাশ কবেন। পবে তিনি সৈয়দ করিম উল্লাহকে আরো তিনটি পুত্র ও একটি কন্তালাভেব আশীর্বাদ কবে যান।

হজবত শাহ জালাল বাজী তদীয় খুল্লতাত হজরত শাহ সৈয়দ কবীর বাজীর আদেশক্রমে হিন্দুস্তানে ইসলাম ধর্ম প্রচাৰার্থে গমনেব, জন্ত উন্তোগ কবলেন। তৎপূর্বে হজবত আব্বাস আলী মক্কায এসে মাতা-পিতা ও ভাই ভগিনীগণের সহিত সাক্ষাত কবলেন। পুত্রকে দেখে মাতা-পিতা আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

কষেকদিনের মধ্যেই আব্বাস আলী বিদায় গ্রহণ কবে রওযান। হওযাব জন্ত প্রস্তুত হলেন। হজরত কবির উল্লাহেব পালক পুত্র আবছুল্লাহ, হজবত আব্বাস আলীর সংগে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পুত্রের মঙ্গল ভেবে হজরত কবির উল্লাহ ও হজবত মায়মুনা সিদ্দিকা, আবছুল্লাহ ওর্ফে সোলমের প্রস্তাবে বাজী হলেন। অতঃপব হজবত আব্বাস আলী, মাতা-পিতা, ভ্রাতা সৈয়দ শাহাদত আলী, সৈয়দ হাসান আলী, সৈয়দ মোহসেন আলী, ভগিনী সৈয়দা জযনাব খাতুনেব নিকট বিদায় নিষে মোর্শেদেব আশ্রম অভিমুখে অগ্রসব হলেন এবং শীঘ্র হজবত শাহ জালালেব নিকট উপস্থিত হলেন।

১২১ হিজবাম্বেব ৭ই ববিওল আউযাল তাবিখে হজবত শাহ জালাল রাজী, স্বয়ং হজবত শাহ সৈয়দ কবীর রাজীব উপস্থিতিতে হজবত সৈয়দ আব্বাস আলী প্রমুখ তিনশত একজন মুজাহিদেব একটি কাকেলা নিষে হিন্দুস্তান অভিমুখে যাত্রা কবেন। এই কাকেলায আবো মুজাহিদ পথিমধ্যে মিলিত হন। তাঁদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তিনশত দশ। এ সমবে দিল্লীর শাহী অখতে আসীন ছিলেন সম্রাট আলাউদ্দিন খিলযাযী। তাঁদেব দিল্লীতে উপস্থিতিব তাবিখ ১২২ হিজবাম্বেব ২২শে জেলহেজ্জা।

মোর্শেদেব নির্দেশক্রমে হজবত আব্বাস আলী দিল্লীতে হজবত আবছুল্লাহকে দীক্ষা দান করেন। এই সমবে হজবত শাহ জালাল বাজী হজবত

আব্বাস আলী রাজীকে সামন্তল আবেকীন ও কোতবুল আরেকীন এই উভয়বিধ দববেশী খেতাবে ভূষিত করেন।

দিল্লীতে অবস্থান কালে সিলহট-রাজ গোবিন্দের সহিত সম্রাট বাহিনীব সংঘর্ষের বিষয় অবগত হয়ে হজরত শাহ্ জালাল সদলবলে সিলহট অভিমুখে অগ্রসর হন। সংঘর্ষের মূল কাবণ ছিল সেখানকার মোসলেম আলি বোবহাহুদ্দিনের উপর রাজা গোবিন্দের অত্যাচার। এসময়ে সেই কাফেলায় আউলিয়াব সর্বমোট সংখ্যা ছিল তিনশত একষট্টি জন। সে যুদ্ধে রাজা গোবিন্দের পতন ঘটে। হজরত শাহ্ জালাল সিলহটেই থেকে যান।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর হজরত শাহ্ জালাল, হজরত আব্বাস আলীর নেতৃত্বে দ্বাবিংশজন আউলিয়াব একটি দলকে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে প্রেরণ করেন। সেই দ্বাবিংশজন আউলিয়াব নাম :-

- ১, হজরত সৈয়দ আব্বাস আলী রাজী—হাড়েয়া-
- ২, „ মোহাম্মদ শাহ্ সুলতান „ পাণ্ডুবা-হুগলী
- ৩, „ দাবাব খাঁ রাজী—জিবেণী
- ৪, „ আবদুল্লাহ্ „ শিখিনী
- ৫, „ আহমদুল্লাহ্ „ আনওয়ারপুৰ
- ৬, „ দাউদ আকবর „ সোহাই
- ৭, „ সাকীকুল আলম „ কেমিষা-খামাবপাড়া
- ৮, „ সইদ „ শালতিয়া-নৈহাটি
- ৯, „ হামেহুদ্দীন „ মোগলকোট
- ১০, „ কোববান আলী „ আরামবাগ
- ১১, „ মোমেহুদ্দিন „ বনডালা-বর্জমান
- ১২, „ ইলিয়াস „ আবাবমানিক
- ১৩, „ সৈয়দ আব্দুল কাদের „ বঙ্কোপসাগবেব নিকট
- ১৪, „ আবদুল নঈম „ কোলগব
- ১৫, „ আব্দুল অহমদ „ বায়গ্রাম
- ১৬, „ হোসায়েন হাযদব „ পূর্ণিষা
- ১৭, „ মোহাম্মদ কাজিল „ হিঙলগঞ্জ



১৮,	হজরত আবুল ফজল	বাজী—সরগব্বার নগর
১৯,	„ আব্দুল্লাহ আউয়াল	„ বাীবভূম
২০,	„ মোহাম্মদ হাসান	„ হাসনাবাদ
২১,	„ আব্দুল নতিক	„ সোনাবপূব
২২,	„ মোহাম্মদ দায়েম	„ ডািমগ হাববাব

হজরত আব্বাস আলী রাজী প্রথমে চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমাব রায়কোলা নামক গ্রামেব একপ্রান্তে এসে অবস্থান কবেন। রায়কোলা গ্রামেব সম্পূর্ণ অংশেব পূর্ব নাম ছিল দেবদাসপুর। তাঁদেব অবস্থিতিব স্থানটি আজিও বাইশ আউলিয়াব স্থান নামে প্রসিদ্ধ। এখানে তাঁবা কিছু বাজালা ভাষা শিক্ষা কবেন। বহু ব্রাহ্মণ ও অত্রাহ্মণ তাঁর নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। সেখান থেকে তিনি আরাজপুরে আসেন এবং অবিলম্বে দেউলিয়াব বাজা চন্দ্রকেতুব সহিত ধর্ম আলোচনায প্রবৃত্ত হন। সেই আলোচনা-সভায চন্দ্রকেতুব মহিষী কমলা দেবী উপস্থিত ছিলেন। মহিষী, হজরত আব্বাস আলীব বং, কপ, বাক্যবিভ্রাসাদিতে মুগ্ধ হবে ‘গোরাচাঁদ’ নামে সম্বোধন কবেন। আলোচনান্তে রাজা মন্তব্য করেন যে তাব বাজা-রক্ষাকারী ভাটীগডেব রাজা দক্ষিণবায, সাতহাতীগডেব বাজা আকানন্দ ও বাকানন্দ এবং গঙ্গাতীবে সাধনাবত জনৈক বোগীববকে যদি হজরত আব্বাস আলি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কব্বে পারেন তবে তিনিও ধর্মাস্তবিত হবেন।

হজরত আব্বাস আলি আল্লাহ তালার কৃপায প্রথমে এক অসাধারণ কেরামত প্রদর্শন কবে বোগীববেব ইঙ্গিত দেবী গঙ্গাকে দর্শন কবান। তবু অঙ্গীকারমত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না কবায আল্লাপ্রদত্ত শান্তি স্বরূপ বোগীববর জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে প্রোথিত হন। প্রোথিত উক্ত স্থানটি আজিও বোগীপোতা নামে খ্যাত।

আশী বছব বয়সে হজরত আব্বাস আলী বাজী ওবকে গীব গোবাচাঁদ রাজী সাতহাতীগডে উপস্থিত হবে জনৈক আদিবাসীব বাড়ীতে নব-নারীর ক্রন্দন ধ্বনি শুনেত পান। তাদেব ক্রন্দনেব কাণ অহুসদ্ধান কবে তিনি জান্বেত পাবেন যে বাজা আকানন্দ-বাকানন্দ প্রতি বছব কালী পূজাব সময় নৃত্তির সম্মুখে তিনজন নব অর্থাৎ নানুযকে বলি দিযে থাকেন। সেই আদিবাসীর

পৰিবাৰেৰ তিনজন এ বছৰেৰ পালৰ বলি হতে চলেছে। তাই সেই সময়টি তাদেৰ জীৱনেৰ চৰম দিন। পীৰ গোৱাচাঁদ তাদেৰ এৰং অস্তান্ত লোকেৰ নিকট ইসলাম ধৰ্মেৰ মৰ্মকথা ব্যাখ্যা কৰলেন এৰং উক্ত তিনজনৰ জীৱন ৰক্ষাৰ্থে সহাতুভূতি প্ৰকাশ কৰে কথেকজনকে ইসলাম ধৰ্মে দীক্ষিত কৰলেন।

পীৰ গোৱাচাঁদ, সাখী আবদুল্লাহ ও নও-মোসলেম উক্ত আদিবাসী মোহাম্মদ আবেদ আলীকে সঙ্গৈ নিষে বাজা আকানন্দ-বাকানন্দেৰ নিকট গেলেন। তাঁদেৰ মধ্যো কিছু সৰোষ কথোগকথনেৰ পদ আবস্ত হল যুদ্ধ। যুদ্ধে আকানন্দ ও বাকানন্দ উভয়েই পৰাজিত ও নিহত হল এৰং পীৰ গোৱাচাঁদ নিজে গুৰুতৰৰূপে আহত হলেন। এই দুৰ্ঘটনাৰ তাৰিখ হল ৭৭৩ হিজৰাব্দেৰ ৭ই ফাস্তুন। সেই অবস্থায় তিনি হজ্জৰত আবদুল্লাহ, নও-মোসলেমগণ এৰং বাৰাগাপূৰেৰ কিছু ও কানাই প্ৰমুখ ঘোষ নন্দনগণকে অনেক উপদেশ প্ৰদান কৰেন এৰং ৭৭৩ হিজৰাব্দেৰ ১২ই ফাস্তুন তাৰিখে ইহলোক পৰিত্যাগ কৰেন।

আব্দুল গফ্বৰ সিদ্দিকী সাহেব প্ৰদত্ত কাহিনীতে প্ৰত্যক্ষভাবে পীৰ গোৱাচাঁদ বাজীৰ এৰং পৰোক্ষভাবে আল্লাহ-মাহাত্ম্য তথা ইসলাম ধৰ্মেৰ মাহাত্ম্য বিবৃত হ'বছে। চৰিত্ৰাবলীতে দেৱ-দেৱীৰ কোন ভূমিকা দৃষ্ট হয় না, পীৰেৰ অলৌকিক শক্তিৰ পৰিচয় ব্যক্ত হ'বছে। এককালীন নববলি প্ৰথাৰ যে কদৰ্ষ ৰূপ স্থানীয় সমাজ-জীৱনকে দুৰ্বিৰহ কৰেছিল তা এই কাহিনীতে পৰিস্ফুট হ'বছে। তিনি মানৱ নামধাৰী ৰাজস চৰিত্ৰও চিত্ৰিত কৰেছেন। সাল তাৰিখ এৰং ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণেৰ নাম ধাম ও কাৰ্য্যাবলীৰ সঙ্গৈ সংযুক্ত হওঁবাৰ অনেক ঐতিহাসিক তথা এতে পৰিবেশিত হ'বছে। তাৰ পৃথকেৰ উপসংহাৰে পীৰ গোৱাচাঁদেৰ পৰবৰ্ত্তীকালেৰ ইতিহাস এৰং কিছু অলৌকিক কাহিনী লিখিত হ'বছে। সিদ্দিকী সাহেব সেখানে পেয়াৰ শাহ ও সঙ্গ এনেছেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে মাৰ্চ মাস "নিহিৰ" নামক পত্ৰিকায় পেয়াৰ শাহেৰ ৰূপবিৰাৰে আত্মহত্যা সম্বন্ধীয় যে সংক্ষিপ্ত কাহিনী প্ৰকাশিত হ'বছিল সে ও সঙ্গ উত্থাপন কৰে আবদুল গফ্বৰ সিদ্দিকী সাহেব উক্ত পত্ৰিকায় বিবৃত বক্তব্যকে সম্পূৰ্ণ অসত্য বলে অভিহিত কৰেছেন। তিনি উপসংহাৰে লিখেছেন, "হজ্জৰত পেয়াৰ শাহ ছিলেন ধাৰ্মিক ব্যক্তি। তিনি ধৰ্মকে অগ্ৰাহ কৰিবা ডনিয়াৰ ভ্ৰন্ত এমন কিছু কৰেন নাই যাহা তাৰা তাঁহাৰ আত্মহত্যাৰ কথা বিশ্বাস কৰিতে পাৰি।"

“বালাগুণাব গীব হজরত গোরাচাঁদ রাজী” নামক পুস্তকের উপসংহাবে যা বর্ণিত হয়েছে তা প্রধাণতঃ পেয়াব শাহ চবিত কথা। মহম্মদ এবাদোল্লা বচিত “গীব গোবাচাঁদ” কাব্যে পেয়াব শাহ প্রসঙ্গ নেই। খোদা নেওয়াজ সাহেব তাঁর ‘গীব গোবাচাঁদ’ কাব্যে লিখেছেন,—

এই সব বাত পেয়াব বাদশাকে কহিয়া ॥

দেখিতে ২ যার গায়েব হইয়া +

পরিবার সমেত কিস্তি গায়েব হইল ॥

দেখিয়া আলাউদ্দিন শাহ তাক্জবে বহিল \*

এখানেও বক্তব্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। কারণ, এই প্রসঙ্গে আব্দুল গফ্ফর সিদ্দিকী সাহেব, পেয়ার শাহকে অকৃতদার চিরকুমার আবেদ বলে উল্লেখ করেছেন।

### ৪। ‘চন্দ্রকেতু ও গোরাচাঁদ’ নাটক

“চন্দ্রকেতু ও গোবাচাঁদ” নাটকের রচয়িতা মোহাম্মদ হবমুজ আলি। বসিরাহাট, মহকুমা হাডোয়া থানার অন্তর্গত শ্রবণপুর গ্রামে মোহাম্মদ হবমুজ আলি সাহেবের জন্ম। তিনি স্থানীয় গোবাইনগর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি একজন হোগিও স্ট্রিকিংসক এবং সুদক্ষ রেডিও মেকানিক। হাডোয়া অঞ্চলে তাঁর খুব জনপ্রিয়তা আছে। গীব গোবাচাঁদ বিষয়ে আখ্যান—রচয়িতৃগণের মধ্যে আজ (১৯৭৫ খৃঃ ফেব্রুয়ারী) তিনিই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি।

মোহাম্মদ হবমুজ আলি কর্তৃক লিখিত নাটকের নাম ‘চন্দ্রকেতু ও গোবাচাঁদ’। হাতে লেখা এই নাটকের আকৃতি ৭" X ৬" ইঞ্চি বিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৫। এটি ষষ্ঠ অঙ্কে বিভক্ত। দৃশ্যাবলীর বিভাগ নিম্নবর্ণিত :

প্রথম অঙ্ক	চাবটি দৃশ্য
দ্বিতীয় ,	ছ’টি ,
তৃতীয় “	আটটি “
চতুর্থ “	ন’টি “
পঞ্চম “	চাবটি “
ষষ্ঠ “	তিনটি “

এই নাটকে ১৭ খানি গান সন্নিবেশিত হইছে। এটি তিন-চাব প্রকারেব বড়ব কালিতে লেখা। ভুলক্রমে দ্বিতীয় অঙ্ক দু'বার শিরোনামা দিবে লেখাব ফলে পঞ্চম অঙ্কেব স্থলে নাটকখানি ষষ্ঠ অঙ্কে পর্য্যবসিত হইছে।

নাটক বচনাব আবেশে কোন ভূমিকা, কোন কুশীলব-পরিচয় লিখিত নেই। কেবল মাত্র, এই নাটক দ্বিতীয়বার লিখবাব একটা কৈফিয়ৎ লিখিত হইছে।

নাটকেব সংলাপ বেশ সাবলীল। রাজা বা তদস্থানীয় ব্যক্তিব মুখেব ভাষা মার্জিত এবং সাধাবণ লোকেব মুখেব ভাষা স্থানীয় চলতি ভাষা। ভাষাব নমুনা এইরূপ,—

রাজা—এবাব স্বর্গ মর্ত্ত পাতালেব যত দেব দেবী আছে সকলেবই এ যাজ্ঞ নিমন্ত্রণ কবা হবে . ...

অত্র একটি চবিত্ত “হামা” বলছে—তাই তো, যা বোধ কবি আগ্ভাত, কান্ধব খাতি দেছে। তা নলি আগাদেব এবকম হবে কেন। মোদেব বল কুমে গেল কেন।

এ নাটকেব সংলাপেব কোন কোন স্থানে অর্থ সম্বন্ধেব অভাব এবং কিছু বর্ণাশুদ্ধি দৃষ্ট হয়। গানগুলি কোথাও দেহতত্ত্ব বিষয়ক, কোথাও বা লঘু হাস্য-বস মিশ্রিত। এক তোতলা সৈনিকেব ভাষাব কোঁতুক সৃষ্টিব প্রচেষ্টা হইছে। স্বগতোক্তি সংস্থাপন নাটকটির অত্রতম বৈশিষ্ট্য।

চন্দ্রকেতু ও গোবর্চাঁদ নাটকেব সংক্ষিপ্ত কাহিনী :—

রাজা চন্দ্রকেতু সাড়হবে চণ্ডীর পূজাব আয়োজন কবেছেন। জামাতা ববাহ ও কন্যা খনা গণনা কবে তাঁব অমঙ্গলেব যে ইঙ্গিত দিবেছেন তা নিরসনেব জন্তই এই পূজাব বিশেষ প্রয়োজন। দেশেব সাধাবণ মানুহও অদূরবর্ত্তী সেই বিপদেব আশঙ্কাব বিষাদ-মগ্ন।

পীর গোবর্চাঁদ যে এতদ্ অঞ্চলে এসে অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপেব পরিচয় দিতে আবেশ কবেছেন তা বটনা হইবে গিছে। রাজা চন্দ্রকেতুৰ বীৰ সেনানী হামা ও দামাব শা বীৰিক বল তিনি কৌশলে হবণ কবলেন তাও প্রচাবিত্ত হইছে। রাজা উদ্ভিন্ন হইে নিজে গোবর্চাঁদেব অলৌকিক শক্তিৰ পরিচয় নিতে চাইলেন। উদ্ভবেব সাক্ষাতকাৰ ও কথোপকথন হল। রাজা তাঁব শক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ ও উপহাস কবলেন।

পঞ্চাভীবে সাধনারত এক যোগীবাবের সহিত পীবের সাক্ষাৎ হল। উভয়ের মধ্যে আরম্ভ হল বাগ্ম্যুদ্ভ। অবশেষে যোগীবাব পরাজয় স্বীকার করলেন।

পরবর্তী ঘটনায় গীত গোবর্চাদ তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে রাজপ্রাসাদের লোহার প্রাচীরে চাঁপা ফুল ফুটিয়ে দিলেন। তবু রাজা গোবর্চাদের নিকট নম্র হলেন না। উপবন্ধ প্রহরী দ্বারা তাঁকে বেঁধে তিনি রাজসভায় আনাবার ব্যবস্থা করলেন। প্রহরী তাঁর আদেশ পালন করতে সমর্থ হল না। রাজা তখন ডেকে পাঠালেন হামা-দামা নামক তাঁর বিশ্বাস্য বীর সেনানীদ্যকে। হামা-দামা পূর্বেই বলহীন হয়ে পড়ায় তাবাও রাজ-আদেশ পালনে সক্ষম হল না।

রাজা চন্দ্রকেতু ও পীব গোবর্চাদের মধ্যে যুদ্ধ আবর্ত্ত হল। পীবের অলৌকিক শক্তিতে রাজার আনীত পাষাণ তাঁর কাছ থেকে মুক্ত হয়ে উড়ে চলে গেল রাজপ্রাসাদে। সেই পাষাণ দেখে পরিবারের সকলে চিন্তা করল যে রাজা বিপদাপন্ন হয়েছেন। অতএব তাঁরা পূর্ব সংকেত মতন পার্শ্ববর্তী কালীদেহে ডুব আত্মহত্যা করলেন। রাজা যুদ্ধে জবলাভ করে যিবে এলে দেখেন প্রাসাদ জন-মানব-শূন্য। কেবল পূজাবিনী এক বৃদ্ধা জীবিত আছেন। সেই করণ দৃশ্য দেখে রাজা পুনরায় গোবর্চাদকে আক্রমণ করতে ছুটে এলেন। কিন্তু ততক্ষণে পীব গোবর্চাদ অদৃশ্য হয়ে গেছেন। রাজা দুঃখে অভিমানে সেই কালীদেহে ডুবে নিজেও আত্মহত্যা করলেন।

পীব গোবর্চাদ এবার কাল, কিন্তু ও আবো কিছু লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে দক্ষিণ দেশের দিকে অগ্রসর হলেন।

মোহাম্মদ হবয়জ আলি সাহেব বচিত নাট্য-কাহিনীতে প্রত্যক্ষভাবে পীব গোবর্চাদ চবিত্ত্র মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু পরোক্ষভাবে আল্লাহ্, তখা ইসলাম ধর্ম-মাহাত্ম্য কথা বর্ণিত হয়েছে। এতে ছোট অনেক চবিত্ত্র এবং অনেক কাহিনী পরিবেশিত দেখা যায়। এতে পাশাপাশি কয়েকটি অলৌকিক কীর্তিকথা এবং বেশ কয়েকটি বাস্তব ঘটনার বিবরণ আছে। দ্বিবিদ্র গদ্যবিত্ত্র সংসার জীবনের চিত্র এই নাটকের অন্ততম বৈশিষ্ট্য। ঘন ঘন গান পরিবেশিত হওয়ায় বৃদ্ধা যার গ্রামে গুচলিত রাজা চণ্ডে নাটকপানি লিখিত। উপকাহিনীতে ভাবাক্রান্ত হলেও মূল কাহিনী লক্ষ্যচ্যুত হয়ে বস ভঙ্গ করেছে এমন মনে হয় না। উপযুক্ত ব্যক্তির মুখে উপযুক্ত ভাষা প্রদত্ত হওয়ায় চবিত্ত্রগুলি যেমন পরিষ্কৃষ্ট হয়েছে, সমাজ চিত্রও তেমন স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

শেখ আব্দুর রহিমের সম্পাদনায় ১৮২২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত 'মিহির' নামক পত্রিকায় পুৰাতত্ত্ব বিভাগে 'হাডোয়া' শীর্ষক রচনাংশে প্রকাশিত কাহিনীটি এইরূপ,—

চব্বিশ পরগণা জেলাব অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার এলাকাধীন একটি গ্রাম হাডোয়া, ইহা বালাঙা পরগণার মধ্যে অবস্থিত। এখানে প্রতি বছর পীর গোবাচাঁদ সাহেবের সন্মানার্থে ১২ই ফাস্তুন থেকে ১০।১২ দিন স্থায়ী একটি জুব্বুহু মেলা হইবে থাকে। প্রায় ৬০০ বছর পূর্বে ইসলাম ধর্মপ্রচারক পীর গোবাচাঁদ সাহেব এই স্থানে এসে উপনীত হন। জনশ্রুতি আছে যে, এই পবিত্রাঙ্গা মহাপুরুষ একটি মাজ ভূত সমভিব্যাহারে পদ্মাতীরবর্তী বালাঙা পরগণায় এসে রাজা উপাধিধারী চন্দ্রকেতু নামক সমৃদ্ধিশালী একজন গোঁড়া হিন্দু-জমিদারের বাড়ীর সন্নিকটে উপনীত হন। পীর গোরাচাঁদ, চন্দ্রকেতু রাজাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবার জন্য অনেক চেষ্টা কবতে লাগলেন। এতন্ত তিনি রাজার সম্মুখে কতকগুলি অলৌকিক কার্যও সম্পাদন করলেন। যেমন লৌহনির্মিত কলাকে পাকা-কলায় পরিণত করণ ও লৌহনির্মিত বেড়ায় চম্পক পুষ্প প্রস্ফুটিত করন। এতদভিন্ন তিনি বিরজা নারী রাক্ষসীর দ্বারা হত একটি ব্রাহ্মণের জীবন দান করেছিলেন। বা হোক, ঐ সকল অলৌকিক ঘটনাতেও চন্দ্রকেতুর অন্তর থেকে হিন্দুধর্মের সত্যতার ভাব কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি।

এব পর পীর সাহেব হাতিয়াগড় পরগণায় গমন করেন। সে স্থান রাজা মহিদানন্দের পুত্র আকানন্দ ও বাকানন্দ শাসন কবতেন। সেই রাজা প্রতি-বছর তাঁর একজন প্রজাকে নরবলি দিতেন। পীর সাহেব যে বছর সেখান উপনীত হন সেই বছর রাজার একমাত্র মুসলমান প্রজা মোমিনের 'বলি' হওয়ায় পালা পড়েছিল। পীর সাহেব তা শুনে স্বর্ণাবলম্বীর আসন বিশদ দেখে নিজেই তার পবিতর্কে রাজ-সকাশে উপনীত হলেন। রাজার অভিনাব-অগ্রযাত্রী কার্যকবনে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হল। সেই যুদ্ধে বাকানন্দ নিহত হন। আকানন্দ ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ শুধন করে অশ্রুশ্রমে স্তম্ভিত হয়ে পীরের বিদগ্ধে যুদ্ধার্থে বহির্গত হলেন। সেই যুদ্ধে পীর সাহেব আকানন্দের হাতে ভয়ানকরূপে আহত হলেন। স্থির হয়ে অস্তিত্ব আরোগ্যার্থে তিনি তাঁর ভ্রাতার স্মরণে পীর সাহেবের কাছে গেলেন। সে ভূত কোথাও পানো করেন পেল না। কহিত আছে যে, হাতিয়াগড়

পরগণায় পান কখনও জন্মে না এবং আবো লক্ষ্মীণ বিবয় হচ্ছে যে, এই স্থানে আজ পর্যন্ত কেউ পানের চাষ কবে না। তখন গীর সাহেব নিকুপায় হয়ে হাড়োয়া থেকে দু'কোশ দূরে কুলটিবিহাবী নামক স্থানে গমন করেন। - তাঁর ভৃত্য সেখানে তাঁকে একাকী রেখে চলে গেল। কথিত আছে, নিকটবর্তী জঙ্গলের অধিবাসী, কিছু এবং কালু ঘোষের একটি দুগ্ধবতী গাভী প্রত্যহ তথায় এসে পীব সাহেবকে দুগ্ধ পান করিয়ে যেত। যদি এই গাভীটি অলক্ষিতভাবে ক্রমাগত ৬দিন তাঁকে দুগ্ধ পান করাতে পারত, তাহলে তাঁর বাঁচবার সম্ভাবনা ছিল। - কিন্তু ৪দিন পর্যন্ত গাভীদোহন কালে দুগ্ধ না পাওয়ায় কিছু ও কালু ঘোষের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় অহুসস্থানে তারা জানতে পারল যে গাভীটি পীব সাহেবকে দুগ্ধ পান করিয়ে থাকে। পীব সাহেব তা জানতে পেরে নিশ্চিত হলেন যে, তাঁর যত্নে নিকটবর্তী হবে। তখন তিনি গোয়ালদ্বয়কে অহুসোধ কবলেন যে, তাঁর যত্নের পব ঘেন তারা মুসলমান রীতি অহুসাবে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে। যা হোক, অচিরে তাঁর জীবন বায়ু বহির্গত হল এবং ১২ই ফাস্তন উক্ত গোয়ালদ্বয় তাঁকে হাড়োয়ার সমাধিস্থ কবল। - একব্যক্তি গোয়ালদ্বয়কে এইসব কাজ লক্ষ্য কবে তাদেরকে উপহাস কবত ও জাতিচ্যুত করা ভয় দেখাত। একদিন তারা সেই ব্যক্তির উপহাসে অর্ধৈর্ষ্য হয়ে ক্রোধবশতঃ তাকে হত্যা কবল। এক্ষণ তারা গোঁড়ের স্ত্রীদ্বার আলাউদ্দিনের নিকট বিচারার্থে প্রেরিত হল। এদিকে কিছু ও কালু ঘোষ পীব সাহেবের সমাধিস্থানে গিয়ে নিজেদের বিপদের কথা বর্ণনা কবলে পীরসাহেব হঠাৎ সমাধি থেকে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ গোঁড়ে গমন করে উক্ত জাতদ্বয়কে বিপদ হতে মুক্ত কবলেন এবং তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন কবলেন। পীব সাহেব এ পর্যন্ত বাজা চন্দ্রকেতুকে শাসন কবাব বিষয় বিস্মৃত হননি। তিনি দ্বিতীয়বার গোঁড়ে গমন করতঃ পীব শাহ নামক এক ব্যক্তিকে বালাগাও শাসনকর্তা নিযুক্ত কবে পাঠান। এই নব-শাসনকর্তা বালাগাও উপনীত হয়েই চন্দ্রকেতুকে ডেকে পাঠালেন। চন্দ্রকেতু সে আদেশ শিবোধার্য করে পীব সাহেব কাছে যেতে মনস্থ কবলেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় তিনি একজোড়া সাবস পাখী সঙ্গে নিলেন। তিনি তাঁর পবিবাববর্গকে বলে গেলেন যে, যদি তাঁর ভাগ্য মন্দ হয় তবে সেই সারস পাখী দুটিকে ছেড়ে দেবেন। পাখী দুটি ঘরে ফিরে এলে বুঝবে যে

তঁার সমূহ বিপদ উপস্থিত এবং তৎক্ষণাৎ আপনা-আপনি স্বয়ং প্রাপ্ত হবার চেষ্টা করবে।

গীর শাহ, চন্দ্রকেতুকে একগু কষ্ট দিবেছিলেন যে তিনি হত্যাশাস হইয়ে পাখী দুটিকে ছেড়ে দেন। পাখী দুটি গৃহে প্রত্যাবর্তন করা মাত্র তঁার পরিবারস্থ সকলে জলময় হলেন। পরিশেষে রাজা চন্দ্রকেতু মৃত্তি লাভ কবে গৃহে ফিরে আসেন এবং দুঃখে শোকে অভিভূত হয়ে তিনিও তঁার আত্মীয়-স্বজনকে অসুস্থকরণ কবে আত্মহত্যা করেন।

গীর গোবা চাঁদের সমাধি-স্থানের নাম হয়েছে হাড়োয়া। এই স্থানে তাঁর হাড় সমাধিস্থ রয়েছে বলে এইরূপ নামকরণ হয়েছে। এইখানে ফাঙ্কন মাসে ১২১৪ দিন স্থায়ী একটি জুবুহুং মেলা হয়। অনেকদিন পর্যন্ত কালু ও কিছ ঘোষের বংশধরগণ এই মেলায় উপসভা ভোগ করেছিল। অবশেষে যখন তাঁদের বংশ লুপ্ত হয়ে গেল, তখন থেকে সমাধি-মন্দিরের ভাব মুসলমানদিগের হাতে অর্পিত হয়েছে। জুবাহার আলাউদ্দিন এই সমাধিমন্দিরের ব্যয় নির্বাহার্থ ৫০০ একব ভূমি নিষ্কর দান করেন কিন্তু এখন কেবল এই ভূমি নামমাত্র সমাধি মন্দিরের ব্যয় নির্বাহার্থ রয়েছে।

প্রায় এক শতাব্দী কাল ধরে গীর গোরাচাঁদ-মহাশয়-সম্বলিত সাহিত্য রচিত হয়েছে। খোদা নেওয়াজ সাহেবের কাব্যের রচনাকাল ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ কেহ বলেন এই কাব্যের রচনাকাল আনুমানিক ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ বা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।<sup>৭০</sup> কবি মোহাম্মদ এবাদোজ্জা সাহেবের কাব্যের রচনাকাল ১২১১ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে ফাঙ্কন। মূলতঃ এই কাব্য-কাহিনী পার্শী ভাষায় লিখিত ছিল বলে তিনি ভূমিকাও উল্লেখ করেছেন। তিনি আবো নিখেছেন যে, তঁার পূর্বপুরুষ মুনশী বাসারত হোসেন এই পুস্তকের বহুল প্রচারের জন্য শেখ লাল ও শেখ জয়নুদ্দিন সাহেব কর্তৃক বাঙ্গালা মুসলমানি ভাষায় পার্চালী ছন্দে অনুবাদ করান। পরে কবি মোহাম্মদ এবাদোজ্জা সাহেব নিজে সেই অনুবাদের নবল পুস্তক থেকে চব্বিশ পরগণার চলিত বাঙ্গালা ভাষায় এই পুস্তকখানি রচনা করেন।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব রচিত গ্রন্থের রচনাকাল উক্ত গ্রন্থে লিখিত নেই। পুস্তকের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে তা ১২৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টের পরবর্তীকালে রচিত। তবে এই কাল ১২৫০ খৃষ্টাব্দের ২২রা এপ্রিলের



পরে নয়। কারণ প্রথমতঃ গ্রন্থখানি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং দ্বিতীয়তঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার অন্তর্গত দামোদব নামক গ্রামে বান ১২৫০ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখে।

মোহাম্মদ হরমুজ আলী সাহেব লিখিত ‘চন্দ্রকেতু ও গোরাচাঁদ’ নামক অমুদ্রিত নাটকের রচনাকাল মূলতঃ ১২৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দ বলে তিনি উল্লেখ কবেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে মূল বইখানি অভিনীত হওয়ার পর হারিয়ে যাওয়ায় কিছু লোকের উৎসাহে তিনি নতুন করে ১২৬৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফাস্তান তারিখে লিখে আরম্ভ করেন। শেষ করার তারিখ তাঁর স্মরণ নেই, তবে তিনি বলেন যে নাটকখানি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই লিখেছিলেন।

নিম্নলিখিত পত্রিকা বা পুস্তকে পীর গোরাচাঁদ-সম্বন্ধীয় কাহিনী বা আলোচনা লিপিবদ্ধ রয়েছে,—

- ১, মিহির পত্রিকা : মার্চ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ
- ২, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা গেজেটে এন্স এন্স এন্স ওয়ালী সাহেব লিখিত বিবরণ
- ৩, বশোহব ও খুলনাব ইতিহাস : সতীশচন্দ্র মিত্র
- ৪, সত্যপ্রকাশ (বারাসত থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা) ১৯৬৯ ডিসেম্বর
- ৫, কুশদহ পত্রিকা : আশ্বিন ১৩১৮ বঙ্গাব্দ,
- ৬, কুশদহের ইতিহাস : হাসিরশি দেবী,
- ৭, বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড) : ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব নিম্নলিখিত পুথিগুলির তথ্যকে ভিত্তি করে তাঁর “বালাওয়ার পীর হজরত গোরাচাঁদ বাজী” নামক গ্রন্থ লিখিত বলে উল্লেখ কবেছেন,—

- ১, সিবাতে হজরত অহেদী : আব্দুল অহেদ :— হিজবী ৮ম শতাব্দীতে রচিত

- ২, “” হুলতাহুল আউলিয়া : শাহ হকীমুলতান :

হি : ৮ম শতাব্দীতে রচিত

- ৩, শহীদ হুজরত আব্বাস আলী : আহম্মদ শাহ : ৮৫৪ বঙ্গাব্দে রচিত
- ৪, পীর গোবর্চাদ : সুলতান শাহ ইমাম উদ্দিন : ১০ম বাংলা শতাব্দে "
- ৫, " : " : অজ্ঞাত : ১১শ " " "
- ৬, " : " : " : ২০শ " " "
- ৭, শহীদ হুজরত গোবর্চাদ : নৈয়ামতুল্লাহ : ২ম " " "
- ৮, বাইশ আউলিয়াব পুঁথি : সামসুল হক (হিন্দু নাম বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়)  
: ২ম বাংলা শতাব্দে রচিত
- ৯, আদমখোর আকানন্দ-বাকানন্দ : আব্দুল নজির : ২ম বঙ্গাব্দে "
- ১০, নিরাত হুজরত আবদুল্লাহ : হুজরত আবদুল্লাহ :  
৮ম হিজরী অব্দে রচিত
- ১১, হুজরত শাহ সোন্দলেব পুঁথি : সুনশী কাশিম উদ্দিন :  
১০ম বাংলা শতাব্দে রচিত
- ১২, তরিকায়ে কাদেবীয়া ও পীব গোবর্চাদের পুঁথি : ওমর আলি  
( হিন্দু নাম রামলোচন ঘোষ ) : ২ম বাংলা শতাব্দে রচিত
- ১৩, বাদশাহ আলাউদ্দিন ও পেয়ার শাহেব পুঁথি : মোহাম্মদ  
আবদুল বাবি : ১০ম বাংলা শতাব্দে রচিত

বলা বাহুল্য, উপবোক্ত তেরোখানি পুঁথির সন্ধান আজো পাওয়া যায় নি ।  
শেখ লাল ও শেখ জয়নুদ্দিন-অনুদিত পুঁথিও আর প্রাপ্তব্য নয় । অবশ্য তার  
অংশ বিশেষ ও তার কিছু আলোচনা ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব রচিত  
বাকী সাহিত্যের কথা ( দ্বিতীয় খণ্ড ) গ্রন্থে পাওয়া যায় মাজ ।

পীব হুজরত গোবর্চাদ রাজী কোন সময়ে এদেশে এসেছিলেন এবং এতদ  
অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাব সঠিক কাল নিরূপণ করা দুঃসাধ্য ।  
শামসুদ রহমান চৌধুরী লিখেছেন, —“ভারত সম্রাট গিয়াসুদ্দীন তোগলকেব  
রাজত্বকালে ( ১৩২০-২৪খৃঃ ) ১৩২১ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বীয় পীব শাহ হাসানসহ  
দিল্লীতে আগমন করেন । অতঃপর বিদ্রোহ দমনার্থ সম্রাট গিয়াসুদ্দীন এখন  
বঙ্গদেশে অভিযান করেন ( ১৩২৩ খৃঃ ) দরবেশ আব্বাস আলি মক্কা ও সে  
সময়ে সম্রাটের অভিযাত্রী বাহিনীর সঙ্গে এখানে আগমন করেন । ” ২৪

আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবেব বক্তব্য অনুযায়ী পীর শাহ ভাল্লালের  
সঙ্গে পীব গোবর্চাদের দিল্লীশহরে আগমন-কাল ১২২ হিজরীর ২২শে

জেলহেজ্জা। তাঁর মতে তখন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী। এবিষয়ে মতভেদ আছে। কারণ, শ্রাব যখনাথ সরকার লিখেছেন যে আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকাল ৬২৫ থেকে ২১৫ হিজরী পর্য্যন্ত।<sup>৩২</sup> আব্দুল গফ্ফার সিদ্দিকী সাহেব আরো লিখেছেন যে আলাউদ্দিন খিলজীর আদেশে পীর শাহজালাল সিলহট-রাজ্য গোঁব গোবিন্দের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সিলহট অভিযুগে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁর সন্মিলিতভাবে বাজা গোবিন্দকে পরাজিত ও নিহত করেন। পীর শাহজালালের দলের সহিত পীর গোবাচাঁদও ছিলেন। আলাউদ্দিন খিলজীর মৃত্যুর তারিখ ১৩১৬ খৃষ্টাব্দের ২রা জাম্মারী।<sup>৩৩</sup> হুতবাং ৭২২ হিজরী হিজরী (আল্লামানিক ১৩২২ খৃষ্টাব্দ) বা তার পূর্ববর্তী কালে নিশ্চয়ই মৃত আলাউদ্দিন আদেশ দিতে পারেন না। এবিষয়ে আচার্য শ্রাব যখনাথ সরকারের বক্তব্য প্রাধান্য যোগ্য,—

"Perhaps the greatest event of the reign of Sultan Shamsuddin Firuz (Dehlavi) was the expansion of the Muslim power into modern Mynensingh district and thence across the Brahmaputra into the Sylhet district of Assam.

... The legendary account of the Muslim conquest of Sylhet is available in a later compilation, Nasiruddin Haidar's Suhail-i-yaman. There are also Hindu legends regarding the defeat of the Valiant Rajah Gour Govinda of Sylhet, by an army led by pirs and ghayis, and reinforced by the troops of the Sultan of Bengal, Sultan Shamsuddin in the last quarter of the fourteenth century. Suhail-i-yaman is not a very trustworthy compilation, and with the Hindu legends the difficulty is that no sultan with the title of Shamsuddin reigned in Bengal in the last quarter of the fourteenth century Mr. Stapleton is right in fixing the date of the first invasion of Sylhet by Muslim armies in 703 A. H.

on the authority of the Dacca Museum inscription of one Rukn Khan dated 918 A H, ১৩১২

যশোহর-খুলনাব ইতিহাস লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখেছেন যে, ১২৩০—৩৩ খৃষ্টাব্দে ইজুত মুলুক আলাউদ্দিন জানী নামক জনৈক মুসলমান শাসক এতদ্ অঞ্চলের শাসন ভাব পরিচালনা করতেন। তাঁর সময়েই বর্তমান বাবাসত মহকুমার অধীন দেউলিয়া গ্রামে রাজা চন্দ্রকেতু বাস করতেন।

ডঃ আব্দুল কবির লিখেছেন “১১৮ হিজরী/১৫১২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এবং সিলেটে প্রাপ্ত জুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের সময়ের আর একখানি শিলালিপিতে শাহজালাল সম্পর্কে আরো তথ্য পাওয়া যায়। শিলালিপিকানি মোহাম্মদের পুত্র শবখ-উল-মশায়েখ মুখতুম শবখ জালাল মোজারবদের সম্মানে উৎসর্গ করা হইবে এবং এতে আরো জানা যায় যে, ৭০৩ হিজরী/১৩০৩ খৃষ্টাব্দে জুলতান শমস উদ্দীন ফিরুজ শাহের সময় সিকান্দর খান গাজীর হাতে সিলেট ইসলামের (মুসলমানদের) অধিকারে আসে।”

অতএব দেখা যাচ্ছে, পীর শাহজালাল সিলেটে গমন করিয়াছিলেন ৭০৩ হিজরীর পর। এই সময়ে যে দিল্লীতে সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজী অবস্থিত ছিলেন তা ঐতিহাসিক সত্য। ৭১৫ হিজরী বা ১৩১৬ খৃষ্টাব্দের পর আলাউদ্দীন খিলজী জীবিত ছিলেন না তাও ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব প্রদত্ত তথ্য অস্বাভাবিক একথা স্বীকৃত নয় যে পীর শাহজালাল ও তাঁর অন্ততম সাথী পীব গোবাচাঁদ রাজা ৭২২ হিজরীতে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন। সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্য অস্বাভাবিক যদি পীর গোবাচাঁদ এদেশে পীর শাহজালালের সঙ্গে এসে থাকেন তবে তা ৭০৩ হিজরীর সমসাময়িক কাল বলে ধরা যায়।

কুশদহ পত্রিকা ১৩১৮-এর ৬ষ্ঠ সংখ্যায় আছে,—“পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সৈয়দ হুসেন শাহ গোঁড়ের বাদশাহ হইলেন। গোবাগাজি বা পীর গোবাচাঁদ হিজলীর মুসলমান সেনাপতির পুত্র।”

এ বক্তব্যের পক্ষে কোন দিক থেকে সন্নিবেশ পাওয়া যায় না।

পীর শাহ জালালের অল্পমতি-স্বত্রে পীব গোবাচাঁদ দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ বাইশ আউলিয়ায় অন্ততম এক ইসলাম ধর্ম প্রচারক হিসাবে আগমন

করেছিলেন বলে ধবলে তাঁর বঙ্গে আগমন কাল খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বা শেষার্ধ্বে বলে অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক।

১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'নেদায়ে ইসলাম' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পীর শাহ জালালের জন্মসাল ১৩২২ খৃষ্টাব্দ লিখিত আছে।

"মুহররবেব ইতিহাস"-লেখক আবুল ফজল মহম্মদ আব্দুল ও, পীর শাহ জালালের জন্ম তারিখ ১২৫৫-২২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৩৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন।

সেক্ষেপ্তোদয়া গ্রন্থেব ভূমিকায় ডঃ হুসুমা'ব সেন বলেছেন,—“This Jalaluddin was apparently a Hindustani Mohmedan . . .”

ডঃ আবদুল করিম লিখেছেন,—“চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে (১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে) মরক্কো দেশীয় মুসলমান পরিত্রাজক ইবন্ বতুতা বাংলাদেশ সফর করেন এবং কামরুপের জলালাকীর্ণ স্থানে (অর্থাৎ সিলেটে) এক দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন যে, তিনি শয়খ জালাল তববেজীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং এভাবে তিনিই সর্বপ্রথম শয়খ জালাল-উদ্দীন, তবরেজী এবং শাহ জালালের অভিন্নতা সম্পর্কে বিতর্কের সূচনা করেন। ইবন্ বতুতাকে অবলম্বন করে কোন কোন আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন যে শয়খ জালাল উদ্দীন তবরেজী ও শাহ জালাল এক ও অভিন্ন। কিন্তু আমরা মনে করি যে, শয়খ জালাল-উদ্দীন তবরেজী ও শাহ জালাল উদ্দীন ভিন্ন ব্যক্তি এবং তাঁদের জীবৎকাল প্রায় একশত বৎসরের ব্যবধান।”

অব্যাক্ষ শহীদ লিখেছেন,—“মুহররবদ্বীয়া সম্প্রদায়েব মখদুম শয়খ জালাল মুজর'দ ইবন্ মুহম্মদ কুন'ইয়া'ই তুর্কীস্থানজাত বাঙ্গালী ছিলেন বলে কথিত। তিনি বর্তমান তুবস্কেব কুন'ইয়া শহর থেকে ইসলাম প্রচার ও জিহাদে অংশ গ্রহণ উদ্দেশ্যে পাক-ভারতে আগমন করেন এবং ৩১৩ জন দরবেশসহ সিলেট অভিযানে যাত্রা করেন। তিনি ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে সিলেট জয় করেন। মতান্তরে তিনি ইয়মেন দেশেব অধিবাসী ছিলেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে পীর শাহজালাল, পীর গোবাটাঁদ প্রমুখের এদেশে যে ধর্মপ্রচার কাহিনী ঐতিহাসিক মর্যাদায় উন্নীত, তা স্ত্রার যত্নাথ সরকারের ভাষায় “The legendary account of the Muslim conquest in the last quarter of the fourteenth century.”

পীর হুজরত গোরাচাঁদ বাজীর নামে দুইপ্রকার লোককথা আছে। যথা,—  
১। নিপিবদ্ধ লোককথা ও ২। প্রচলিত লোককথা যার কয়েকটি এখানে সংকলিত হল।

নিপিবদ্ধ লোককথা প্রধানতঃ বিভিন্ন কাব্যে বা জীবনী পুস্তকে লিখিত রয়েছে। প্রচলিত লোককথার ভিন্ন ব্যাখ্যা কারো কারো মুখে শোনা যায়। বলা বাহুল্য যে, এইসব লোককথার বাস্তবিকতা ও যৌক্তিকতা নির্ধারণ করা অসম্ভব এবং আমাদের আলোচ্যবিষয় বর্হিভূত। সে সব লোককথার কয়েকটি এইরূপ ;—

### ১। হাম্মী-জোল-কৌক-জোল

হাম্মী শব্দের অর্থ মা, জোল শব্দের অর্থ জলা জায়গা এবং কৌক শব্দের অর্থ কোমর। এই শব্দগুলি বারাসত-বসিরহাট অঞ্চলের প্রধানতঃ কৃষক মহলে ব্যবহৃত হয়।

হাম্মা ও দাম্মা নামে দুই সহোদর অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিল। অনেকে বলেন—ওদের ভাল নাম ছিল হাম্ম মুখোপাধ্যায় ও দাম্ম মুখোপাধ্যায়। তারা রাজা চন্দ্রকেতুর প্রজা ও বোদ্ধা। রাজা চন্দ্রকেতু ও পীর গোরাচাঁদের মধ্যে ধর্ম বিবয়ে মত বিরোধ দেখা দিল এবং এই বিরোধ থেকে উৎপন্ন হল দৈহিক যুদ্ধ। গোরাচাঁদ দেখলেন,—চন্দ্রকেতুকে পরাস্ত করতে হলে প্রথমে রাজার প্রাসাদের নিকটতম স্থানের প্রহরী বোদ্ধা হাম্মা-দাম্মাকে পরাস্ত করা দরকার। গোরাচাঁদ সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসব না হয়ে হাম্মা-দাম্মাকে পরাভূত করার রহস্ত কৌশলে ছেনে নিষেছিলেন। রহস্তটি এই যে হাম্মা-দাম্মার আহাৰ্য্য ‘আগ-ভাত’ যদি কেউ সংগ্রহ করে খেত কাককে খাওয়াতে পারে তবেই তাবা শক্তিহীন হয়ে পড়বে। গোরাচাঁদ তাঁর সাথী সোন্দলের সহায়তায় হাম্মা-দাম্মার বুদ্ধা মাতার কাছ থেকে কৌশলে সেই ‘আগ-ভাত’ সংগ্রহ করে এনে তার যথোপযুক্ত ব্যবহার কবলেন। ফলে কর্মরত হাম্মা-দাম্মা অকস্মাৎ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। তাবা তাদের মাকে সাবধান করে বেখেছিল, তবু এক্ষণ শক্তিহীন হয়ে পড়ায় তাবা বুঝতে পাবল যে তাদের মা নিশ্চয় কোন দুশমনকে ‘আগ-ভাত’ দিয়ে কেলেকে। তারা

মাগের প্রতি রাগে অন্ধ হয়ে বাড়ীতে ফিরে বৃদ্ধাকে বেদম প্রহার করে। যাব ফলে বৃদ্ধার মৃত্যু ঘটে।

বীর হামা-দামাব জননীও ছিল বীরাস্ত্রনা। বিশালকায়্য সেই বৃদ্ধাকে, জুড় হামা-দামা, চুলেব' মুঠি ধরে হেঁচুড়া-টানা কবে নিবে বাবার সময় সেই বীরাস্ত্রনাব-দেহভারে যে গভীর খাত মাটিতে সৃষ্টি হয়েছিল আজো তা মায়ী জোল নামে খ্যাত। সেই বিশাল দেহ টেনে নিবে বাবার সময় পথে এক স্থানে তারা বিশ্রাম করেছিল। বিশ্রামের সময়ে বৃদ্ধার কোমরের হাডের চাপে একটি গভীর খাদের সৃষ্টি হয়। কোমর বা কোঁকের চাপে সৃষ্টি খাদ বা জোলকে আজিও লোকে বলে কোঁক-জোল।

## ২। সাক্ষী তেঁতুল গাছ

-, বারাসত শহরের অনতিদূরে চন্দনহাটি মৌজায় একটি বহু পুৰাতন তেঁতুল গাছ তার জরাজীর্ণ চেহারা নিবে আজো দণ্ডায়মান আছে। এখানে এককালে এক বিশাল পুকুর ছিল। পুকুরটি এখন প্রায় মজে এসেছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। স্থানটি গীর একদিল শাহের আত্মনা থেকে মোটেই দূরে নব। গীর গোরাচাঁদ তাঁর ঘোড়ায় চেপে এসে গীব একদিল শাহেব সঙ্গে 'মোলাকাৎ' কবতেন। এই তেঁতুল গাছের তলায় বসে উভয়েব মনো দীর্ঘক্ষণ নানাবিষয়ে আলোচনা হত। গীব গোরাচাঁদ তাঁর ঘোড়াটি বেঁধে রাখতেন ঐ তেঁতুল গাছে। সেই বলবান ঘোড়াব বন্ধন-রশি টানাটানির ফলে তেঁতুল গাছেব গায়ে গভীর দাগ সৃষ্টি হইবেছিল। গীব গোবাচাঁদ বতবার এসে ঐ গাছে ঘোড়াটি বেঁধে রাখতেন ততবার গাছেব গায়ে বশিব দাগ আবে গভীর হত। সে দাগের চিহ্ন আজিও (১৯৭২) নষ্ট হয়নি।

## ৩। বেড়ু বাঁশতলা

হাডোবা থানাব অন্তর্গত লতাব বাগান মৌজা-সংলগ্ন বিষ্ণুবী মদীর তীরের দৃশ্য অপরূপ। তৎকালে গভীর জঙ্গলে আকীর্ণ এই স্থানটি সম্ভবতঃ সাধন-ভজনের উপযুক্ত নির্জন স্থান ছিল। গীব গোবাচাঁদ একসময়ে এখানে এসে ক্রিয়াক্ষণের জন্ত অবস্থান কবেছিলেন। তাঁর হাতে থাকত বেড়ু বাঁশের

একটি 'আশা-বাড়ি'। ভুলে হোক বা অস্ত কোন কারণে হোক তিনি এখানে তাঁর আশাবাড়ি বা লাঠিটা বেখে যান। কারো মত এই যে, সেই স্থানটি চিহ্নিত কবে তিনি লাঠিটা সেখানে পুঁতে রেখে গিয়েছিলেন। পববর্তীকালে বেড়ু বাঁশের সেই লাঠিটা শুকিয়ে না গিয়ে তা থেকে নতুন বাঁশ ঝাড়ের উৎপত্তি হয়। গীব গোবাচাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে তাঁর অবস্থিতি স্থানটি একটি নজরগাহরূপে এখনও পরিচিত এবং সেই বেড়ু বাঁশের ঝাড় আজিও সদর্পে বংশ বিস্তার কবে সুপ্রতিষ্ঠিত। সে ঝাড়ের বাঁশ পরিবারিক প্রয়োজনে কেউ ব্যবহার করেন না।

#### ৪। সিংহদরজার নজরগাহ

বেড়াচাঁদার অতি সন্নিকটে রাজা চন্দ্রকেতুৰ প্রাসাদ ও গড়। এযাজপুৰ নামক স্থানেব আভ্যনা থেকে এসে পীর গোবাচাঁদ তাঁর সাথে প্রথমে সাক্ষাত করতে প্রয়াসী হন। রাজা চন্দ্রকেতু সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়ে তাঁর গড়ের প্রবেশ দ্বারের মুখে অবস্থিত যে কক্ষে পীর গোবাচাঁদের সঙ্গে কথোপকথনে নিযুক্ত হয়েছিলেন গীব গোরাচাঁদের ভক্তবৃন্দ পববর্তীকালে ঐ ঐতিহাসিক সাক্ষাতস্থলটিতে একটি নজরগাহ নির্মাণ করে সেখানে ভক্তি-অর্থ স্বরূপ হাজত-মানত শিবনি দিতে আরম্ভ করে। প্রবেশদ্বার বা সিংহদরজার মুখে গোলাকৃতি বিশালকায় বহু প্রাচীন সেই নজরগাহটি আজিও দৃষ্ট হয়।

#### ৫। বাঘ-বন্দী

বাৰাসতের আমডাঙ্গা থানাস্তর্গত কামদেবপুরের যে স্থানে পীর গোবাচাঁদের নামে এক সুদৃশ্য নজরগাহ আছে, কবেক বছর আগেও সেখানে এমনটি ছিল না। তবে একটা ধান ছিল, যেখানে কেউ কেউ দুধ, ফল ইত্যাদি দিত। সে সময় প্রায়ই গভীর রাত্রে সেখানে বাঘ এসে নজরগাহে 'সালাম' জানিয়ে যেত।

কোন এক বাজে একটি বাঘ ঐস্থানে এসে 'সালাম' না জানিয়ে অবস্থান কবছিল। গীবগোরাচাঁদ জুড়ু হয়ে তাকে সেখান থেকে চলে যেতে আদেশ করেন। সেই হুঁবিনীত বাঘ তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করলে গোরাচাঁদ তাকে নিকটবর্তী একটি আমগাছে বেঁধে বেঁধে দেন। বাঘটি বন্ধন মুক্ত হতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে আত্মসমর্পণ কবে। গীব সাহেব অবশ্য



একঘণ্টা পবে তাকে মুক্ত কবে দেন। একঘণ্টা বন্দী থাকা কালে বলবান এবং হুঁসিলাত সেই বাঘের টানাটানিতে রশির বর্ষণে আমগাছেব গায়ে গভীর দাগ হয়ে যায়। সে দাগ এখনও (১৯৭২) দৃষ্ট হয়।

### ৬। পান-স্বরকী প্রসঙ্গে

হাতিবাগড নামকস্থানে গীব গোরাচাঁদের সঙ্গে সেখানকার অধিপতি রাক্ষসরাজ আকানন্দের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে প্রথমে আকানন্দের ভাই বাকানন্দ নিহত হয় এবং পবে আকানন্দ নিজেও নিহত হয়। আকানন্দ নিহত হওয়ার আগে চক্রবাণের সাহায্যে গীব গোরাচাঁদের গর্দানে গুরুতবভাবে আঘাত কবে। এই আঘাত নিরাময় করার ঔষধ গীব সাহেবের জানা ছিল। ক্ষত সারাতে অল্পপান হিসাবে প্রয়োজন হয়েছিল পান ও স্বরকীর। গোরাচাঁদ তৎক্ষণাৎ পান-স্বরকী সংগ্রহ করে আনবার জন্ত তাঁর সাথী সোন্দলকে বলেন। সোন্দল, বালাগু পুরগণায় পান-স্বরকীর বহু অল্পসন্ধান কবেও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। ঘটনাটি জেনে গীব গোরাচাঁদ বিষন্ন হয়ে বলেছিলেন যে বালাগু পুরগণায় কেউ যেন পানের চাব না কবে এবং স্বরকী দিয়ে ঘরেব ছাদ নির্মাণ না করে। তাঁর এই আদেশ এখনও তাঁর ভক্তগণ মেনে চলেন।

### ৭। বেড়ু বাঁশতলার সাপ

হাডোয়া থানাব নিকটবর্তী লতারবাগান মৌজায় গীব গোরাচাঁদের যে নজরগাহটি আছে সেখানমে বেড়ু বাঁশ ঝাড়ের পাশেই একটি অশ্বখ গাছ আছে। সেই অশ্বখ গাছে বাস কবত এক বিশালকায় সাপ। সাপটি এত বিরাট যে, মুবগী-হাস, ছাগল বা অল্পরূপ ছোট ছোট গৃহপালিত জীবকে সে অনায়াসে গিলে খেত। সেই সাপের উৎপাতে গ্রামের অধিবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। স্থানীয় অধিবাসী চক্রকান্ত হাইত ক্ষিপ্ত হয়ে বন্দুকের গুলীর সাহায্যে সাপটিকে হত্যা করেন। এই ঘটনাব কিছুদিন পরই হাইত মহাশয় কঠিন বোগে আক্রান্ত হন। সেই রোগেই তিনি পবে মাঝা যান। লোকের ধারণা যে গীরের নজরগাহ স্থানে জীবহত্যা করায হাইত মহাশয়ের সাপের পরিণতিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

## ৬। পীর গোবর্চাঁদের রাজার শরীফ

ঘোবতর যুদ্ধে রাক্ষসাদিপতি আকানন্দ-বাকানন্দ নিহত এবং পীর গোবর্চাঁদ গর্দানে গুরুতববপে আহত হয়েছেন। আহত অবস্থায় তিনি গভীর জঙ্গলে অবস্থান করছেন। তাঁকে দুধ দিয়ে সেবা কবছে একটি গাভী। গাভীর মালিকের নাম কালু ঘোষ। গাভীটি সকলের অজ্ঞাতে পীরকে সেবা করে। কালু সেই গাভীর দুধ কম হওয়াব কাবণ অহুসঙ্কান কবে বহুস্ত ভেদ করতে সমর্থ হল। সে তৎক্ষণাৎ আটক করল তাব গাভীকে। ফলে পীর সাহেবেব জীবন আরো লুকটাপন্ন হরে উঠল। পীর তখন কালুকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে অহুরোধ জানালেন,—“কালু! যত্নার পর তুমি আমাব শবকে বালাণ্ডা পরগণার বিজ্ঞাববী নদীব তীবে সমাধিস্থ কববে।”

কালু সে আদেশ মান্ত করে ষথান্থানে রাজাব শরীফ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

## ৯। বেড়াটাঁপা

দেউলার রাজা চক্কেতু। তিনি হিন্দুবাজা। প্রবল প্রতাপ তাঁর। হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তিনি অন্ততম প্রধান ধারক ও বাহক। পীর গোবর্চাঁদ এতদ্ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার কবতে এসে বুঝতে পারলেন যে চক্কেতুকে ইসলাম-ধর্মে দীক্ষিত করতে পাবলে তাঁর কাজ অনেক সহজসাধ্য হবে। তাই প্রথমেই তিনি সাক্ষাত কবলেন রাজাব সঙ্গে। আলোচনান্তে পীর গোবর্চাঁদ তাঁকে ইসলাম ধর্মগ্রহণের প্রস্তাব দিলেন। রাজা নানা অজুহাতে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবতে চাইলেন। রাজা বললেন,—“গুনলাম আপনি অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। আপনি কি অলৌকিক শক্তিব সাহায্যে আমাব ঘবে বক্ষিত লৌহকদলী পাকা কদলীতে পরিণত কবতে পাবেন?”

পীর গোবর্চাঁদ সম্মত হলেন। রাজাব আদেশে লৌহকদলী গোবর্চাঁদের সম্মুখে আনীত হল। পীর গোবর্চাঁদ মনে মনে আল্লাহ্ তালার নিকট মোনাজাত করার পব দেখা গেল সেই কাঁচা কদলী পাকা কদলীতে পরিণত হয়েছে। রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন—“আমার বিশ্বাস হয় না যে আপনি আমাব প্রাসাদ-বেষ্টিত লোহার বেড়ায় কমনীয় চাঁপাফুল কোটাতে পারবেন।”

পীর গোবর্চাঁদ বললেন,—“আল্লাব দোষায় তাও সম্ভব হতে পারে।”

এই বলে তিনি পুনর্বার আল্লাব নিকট মোনাজাত কবলেন। তৎক্ষণাৎ দেখা গেল লোহার বেডাষ অসংখ্য চাঁপাফুল ফুটে উঠেছে। সেই অসম্ভব ঘটনা দেখে সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। বাছা তবু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবেন নি কিন্তু বেডাষ চাঁপা ফুল ফোটানোর অলৌকিক ঘটনা লোককথায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। উক্তস্থানের “বেডাচাঁপা” নামকরণেব মধ্যদিয়ে সে লোককথা ঐতিহাসিক বাস্তবতার রূপ নিয়েছে।

### ১০। অনস্পূর্ণ লাল মসজিদ

হাডোয়া ধানাব অন্তর্গত লতারবাগানে লাল মসজিদেব নির্দর্শন আছে। মসজিদটি নির্মাণ কাজে হাত দিবেছিলেন পুরাতন খাসবালাণ্ডা নামক স্থানের মীরখাঁ নামক এক মুসলমান। প্রথম জীবনে তিনি পীর গোবাচাঁদেব পবম ভক্ত ছিলেন। পীরেব অল্পগ্রহে তাঁব দরিদ্র অবস্থা দূর হয়ে যায়। অবস্থাব উন্নতি হওবাব পব তাঁব এতই অহঙ্কার জন্মে যে তিনি মসজিদ নির্মাণ কবে এক কীর্তিস্থাপনে প্রয়াসী হন। মসজিদ নির্মাণের জন্ত সমস্ত সবঞ্চাম প্রস্তুত। তিনি বহুসংখ্যক বাজমিস্ত্রি সংগ্রহ কবে আনেন এবং একরাত্রেব মধ্যে মসজিদ নির্মাণ অবশ্যই সমাপ্ত কববেন বকে সদর্পে প্রতিজ্ঞা কবেন।

মীর খাঁব এই অহঙ্কারে অসন্তুষ্ট হয়ে পীর গোবাচাঁদ তাঁব অলৌকিক শক্তিতে বাজ্রি প্রভাতেব পূর্বেই প্রভাত হযেচে এমন পবিবেশ সৃষ্টি করেন। গাছে গাছে ঝেকে ওঠে কোকিল, বাড়ী বাড়ী ঝেকে ওঠে মোবগ। বাজমিস্ত্রিগণও কথা দিবেছিল যে তাবা এক বাজ্রি মধ্যেই মসজিদ নির্মাণ কাজ শেষ কবে দেবে। কিন্তু পাখীব কূজন শুনে তাবা নিবাবশ হয় এবং মসজিদেব কাজ অসম্পূর্ণ বেখেই স্থানতাগ কবে। অসম্পূর্ণ সে লাল মসজিদ আজো ( ১৯৭২ ) বিদ্যমান।

### ১১। নলপুকুর-চড়কপুকুর

লাল মসজিদেব দুপাশে দুটি বড় পুকুর আছে। একটির নান নলপুকুর, অত্রটির নাম চড়কপুকুর। চড়কপুকুর-নলপুকুরেব ধাবে প্রতি বছর চড়কেব মেলা হয়। ঐ পুনবেব হলে নাকি প্রচুর খাল। এবং বাসন পত্রাদি আছে।

গ্রামের হিন্দু বা মুসলমান যে কেউ এককালে তাব বাড়ীর বিশেষ উৎসবে ঐ পুকুরেব বাসনপত্রাদি ব্যবহার কবতেন। ঐ বাসনপত্রাদি পেতে হলে গৃহস্থকে বাজে পুকুর-ধাবে গিষে পবিত্র পোষাকে পবিত্র মনে পুকুরেব অধিষ্ঠাতাকে আপনাব প্রবোজনেব কথা জানিষে নিমন্ত্রণ করতে হত। নিমন্ত্রণ গৃহীত হলে পবদিন প্রাতঃকালে পুকুরেব পাড়ের কাছে অল্প জলের মধ্যে প্রবোজনীয় সমস্ত বাসনপত্রাদি পাওষা যেত। নিয়ম ছিল কাজ সমাধা হলে উপযুক্ত ভাবে পবিত্রাব-পরিচ্ছন্ন করে সেগুলি যথাস্থানে ফিরিষে দিষে যেত হত।

## ১২-। অর্থলোভী নরিস মণ্ডলের বংশধর

লতারবাগান নামক গ্রামে বেড়ু বাঁশতলাব পীর গোরাচাঁদেব নামে বেনজরগাহটি আছে তাব অন্ততম সেবায়ত ছিলেন মোহাম্মদ নবিস মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি। তাঁর বংশধরেব মধ্যকার এক ব্যক্তি ছিল নিদারুণ অর্থলোভী। লোভের জ্ঞ সে স্বাভাবিকভাবে উক্ত নজরগাহের সেবায়ত থাকাব অধিকার ফেলল হারিষে। কিন্তু অধিকার সে ছাড়ল না। অল্পদিনের মধ্যেই সে ব্যক্তি বাক্শক্তি হারিষে ফেলল। প্রথম দিকে সাধারণ লোক অকস্মাৎ তার বোবা হওয়ার কাবণ বুঝতে পায়ল না। পরে লোকটি এক অভ্যাশ্চর্য স্বপ্ন দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ল এবং ইজিতে তার স্বপ্নকথা প্রকাশ করলে তার একপ বোবা হওয়ার কারণ বোঝা গেল। স্বপ্নটি এইকপ :—

এক রাতে সে স্বপ্নে শুনতে পেল কে যেন গভীর আওষাজে বলছেন,—  
“টাকা, বড়ই টাকাব লোভ তোর। টাকার বড় দরকার, তাই না। বেশ, তুই নলপুকুরের ধাবে বাস গভীর রাতে,—টাকা পাবি, অনেক টাকা পাবি। কিন্তু একটি সর্ত—টাকার জ্ঞ তোকে দুটো ডাব দিতে হবে।”

ডাব দানের অর্থ হল ছেলে দান। ঐ ব্যক্তি তাব দুই ছেলেকে বিলজর্ন দিতে হবে এই গুপ্ত অর্থ বুঝতে পেবে অর্থলোভেব ত্রাষ স্বয় অপরাধের কথা সাধারণের মধ্যে যখন প্রকাশ করছিল তখন নাকি তার দুই গও বেয়ে অবিরল অশ্রু ঝবে পড়ছিল।

পীর গোরাচাঁদ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ লোককথা কিছু কিছু আছে। সেই লিখিত লোককথাগুলিব একটি এইকপ,—

রামজয় হড়। হড় ঠাকুরের নামে নাকি ভাঙা হাড়ি জোড়া লাগে। তাই আজো এ অঞ্চলের লোক শুভযাত্রার প্রাক্কালে মহাপুণ্যবাণ হড় ঠাকুরের নাম করে। মেঘেরা মাটির হাড়ি উনানে চাপাবার আগে ‘জয় রামজয় হড়’ বলে তাঁর স্মরণ করে পাছে হাড়ি ভাঙে সেই ভয়ে। শোনা যায় একদিন রাত দুপুরে পীব গৌরাচাঁদ অতিথি হলেন গোপালপুরে ( ভৈরব-গোপালপুর : বসিরহাট ) রামজয় হড়ের বাড়ীতে। প্রতাপশালী মুসলমান পীরকে সাদর আতিথেয়তা জানালেন হড় মশায়। পীর বললেন, “রামজয়, আরি বড় কুখ্যাত।”

অতিথিপরায়ণ ব্রাহ্মণ সভয়ে জিজ্ঞাসা কবলেন,—“কি দিয়ে আপনি সেবা ইচ্ছা করেন?”

পীর, ব্রাহ্মণের আতিথেয়তা পরীক্ষা করতে বললেন—“ইলিশ মাছ দিয়ে ভোজ্য দাও।”

‘হড় ঠাকুর’ তো ভয়ে কাঁঠ। রাত দুপুরে ইলিশ মাছ পান কোথায়। চিন্তিত ঠাকুর মশায় পীরের কাছে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতেই পীর বললেন,—“পুত্রে জাল ফেললে ইলিশ উঠবে।”

হলও তাই। পুত্রেই ইলিশ মাছ পাওয়া গেল।

জন্ম পত্রিকা : ৭ম বর্ষ : ১ম-২য় সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র ১৩৭১

প্রবৃত্তিতে নব-সংযোজন : সত্যেন-রায়

## নবম পরিচ্ছেদ

### গোরা সর্দে

পীর হজরত মায়ুদ আকবর রাজী বন্ধদেণে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পীর হজরত সৈয়দ আব্বাস আলি রাজী গুরুফে পীর হজরত গোবাটীর রাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত বাইশ জনের এক কাফেলার সহিত আগমন কবেছিলেন। তিনি “গোবা সইদ” নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। বাবাসত মহম্মদের দেগদা খানাব অন্তর্গত সোহাই নামক গ্রামেই তিনি অবস্থিত হন। সেখান থেকে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। পীর গোরাটাদের স্থান বালগুা পরগণাব হাডোবা অঞ্চল সোহাই গ্রামের যথেষ্ট সন্নিকটে অবস্থিত।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গোবা সর্দে, পীর গোরাটাকে সহযোগিতা করতেন। সোহাই গ্রামে থেকেই তিনি আম্মাহ-মাহান্দ্র প্রচাব করেন এবং তাতে আপনাব জাহিব হয়। তাঁর জন্মস্থান, জন্ম-তারিখ বা মৃত্যুর কাল কিছুই জানা যায় না। তবে সোহাই গ্রামেই তিনি এন্তেকাল বা মৃত্যুবরণ করেন। এইখানেই তাঁর পবিত্র মাজার শরীফ আছে।

পীর হজরত গোবা সইদ রাজীর পবিত্র মরদেহ বেথানে কবরস্থ কবা হবছিল, সেই স্থানে তাঁর ভক্তগণ ইট দিবে একটি দরগাহ নির্মাণ করে দিযেছেন। শুনা যায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাব বহু বিধা জমি পীরোত্তর হিসাবে উক্ত পীরের নামে উৎসর্গ কবেছিলেন। বর্তমানে দেখা যায় গ্রাম চার কাঠা পবিমাণ জায়গাব উপর পীরের দরগাহটি অবস্থিত।

“মোহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা ( ৫০ ) প্রমুখ সেবাসেত পীর গোরা সইদের দরগাহর তত্ত্বাবধান করেন। তাঁদের পক্ষে মোহাম্মদ মোকসেদ আলি বর্তমানে ( ১২৭০ ) দরগাহে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে ধূপ-বাতি প্রদান করেন।

প্রতি বৎসব পটিশে কানুন তারিখে দরগাহে পীরের নামে গুরস হয়। সে সময়ে এখানে একদিনের মেলা বসে। এই মেলায় পাঁচ-ছয় হাজার লোকের

সমাবেশ হয়। সেখানে ভক্তগণ গীতের উদ্দেশ্যে হাজত, মানত ও শিবনি প্রদান করেন। অনেক ভক্ত সেখানে লুট দেন। তাছাড়া প্রতি শুক্লপক্ষের একাদশ দিবসে বিশেষ অর্হস্তান হয় এবং সে সময় ঐ স্থানে উপস্থিত ফকিরগণকে ভোজন কবানো হয়। অনেক ভক্ত অগ্রান্ত দিনেও দবগাহে দুধ, ফল, বাতাসা প্রভৃতিও দান করেন।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব তাঁর “বালাগাব গীত হজবত গোরাচাঁদ রাজী” নামক পুস্তকে গোরা সইদেব খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। গীত গোরাচাঁদ পাটালী কাব্যে, কবি মহাম্মদ এবাদোজা সাহেব লিখেছেন,—

গোবা ছবিদ কহিল হুহাই নগব।  
জাইগীব দিছে আল্লা গুণের সাগব।  
মোছলমান কবিব জাইগীবে গিবা।  
তালজল রাজে আমি জোরেতে ধবিয়া ॥ (পৃ. ৮)

ভাবিতে ভাবিতে দেহে চলিতে লাগিল।  
গোরাচাঁদসহ ছইদ হুহাই আসিল।  
ছইদ গোরায কয় শুন বলি কথা।  
তুমি যাও বালাগাব আমি থাকি হেথা।  
কখন তোমাব পবে কেহ কবে জোর।  
ছোন্দল আসিবা যেন কবেন খবব।  
সম্বব করিবা আমি বাইবা তথাব।  
মুহুর্তেকে যুদ্ধ করে মাঝে তাহায ॥  
ছুই গীব এক সঙ্গে মিলি গলে গলে।  
বিদায় হইল গোরা লইবা ছোন্দলে ॥ (পৃ. ৮)

মহাম্মদ এবাদোজা রচিত ‘গীব গোবাচাঁদ পাটালী’ কাব্যের একস্থানে বর্ণিত গীত গোরা সইদেব বীরত্বগাথা সংক্ষেপে এইরূপ,—

হেতেগড়ের রাক্ষসামিষতি আকানন্দ ও বাকানন্দ নামক দুই ভাই-এর সঙ্গে গীত গোবাচাঁদ তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। প্রথমে এল বাকানন্দ। গীত গোরাচাঁদ যুদ্ধে তাকে হত্যা কবলেন। আকানন্দ তাব ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদে উদ্ভত হয়ে গীব গোরাচাঁদকে ধ্বংস কবতে এগিয়ে এল। তার সঙ্গে আছে

চক্রবাণ। এই চক্রবাণের সাহায্যে এমন আঘাত হানল যাতে পীবের স্বদেশে অর্ধেক কেটে গেল। এবাব পীবের জীবন সংশয়। তবে পীব জানতেন যে পান সহযোগে ওষুধ স্বতন্ত্রানে প্রয়োগ করলে তাঁর জীবন রক্ষা হতে পারে। কিন্তু তিনি আপন সহচর ছোল্লের সাহায্যে অনেক চেষ্টা করলেও পান সংগ্রহ করতে পারেন নি। পীর গোবাটাঁদ তখন হতাশাস হয়ে স্নহাই গ্রামে গিয়ে পীব গোবা সইদকে সংবাদ দিবার জন্য ছোল্লকে আদেশ করলেন।

ছোল্ল তখনই স্নহাই গ্রামে এসে পীব গোবা সইদকে সমস্ত বিবরণ জানালেন। সব শুনে ‘সইদ’ দুঃখে বিচলিত হয়ে বেঁচে ফেললেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হেতেগডের যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং ঢাল, তরবারি, খুস্তি, ধনুক-বাণ প্রভৃতি নিয়ে যাত্রা করলেন।

পীর গোবা সইদ বোডাঘ চড়ে এলেন হেতেগডে। অহুসঙ্কান করে সাক্ষাত করলেন পীব গোরাটাঁদেব সঙ্গ। উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধু-হুলভ কথাবার্তা হল। গোবাটাঁদেব পরামর্শক্রমে রাক্ষসবংশ ধ্বংস করতে অগ্রসর হলেন গোবা সইদ। তুমুল যুদ্ধে তিনি আকানন্দকে নিহত করতে সমর্থ হলেন। অতঃপর তিনি ফিরে এলেন স্নহাই গ্রামে।

পীব হজবত গোবাটাঁদ বাজীর সমসাময়িক বলে অহুমিত হয় যে পীব গোবা সইদ চতুর্দশ শতাব্দীর ধর্মপ্রচারক। পীব গোরাটাঁদেব মৃত্যুর পবেও তিনি কিছুদিন জীবিত ছিলেন তা প্রচলিত কাহিনী বা কাব্য থেকে জানা যায়।

পীব গোবা সইদের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক একটি লোককথা স্নহাই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। লোক-কথাটি এইরূপ :—

### পীরের দোয়া :

স্নহাই গ্রামে একদিন এক ব্যক্তি রোগে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে এসে হাজিব। তাঁর নাম মোহাম্মদ মোকসেম আলি (৩৫)। কঠিন পীড়ায় তিনি নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছেন। নিবামদেব কোন আশা নেই। অনেক ডাক্তার ও কবিবাজকে তিনি দেখিয়েছেন। অবশেষে পীব গোবা সইদেব দরগাহে এসে আকুল ভাবে প্রার্থনা জানালেন বোগ থেকে মুক্তির আশায়। তিনি পীবেব দরগাহে



রইলেন ধর্ণা দিয়ে। অবশেষে তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন, —“তুমি পীর গোবা সইদের দবগাহে নিজেকে নিবেদন কর, তোমার রোগ মুক্তি ঘটবে।”

পরদিন থেকে তিনি উক্ত দবগাহে ধূপ-বাতি দিতে আরম্ভ করেন। অচিরকাল মধ্যেই দেখা গেল যে তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্যালাভ করতে আরম্ভ করেছেন। বেশ কয়েক দিনের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি আক্ষও (১৯৭০) উক্ত দবগাহে সেবক হিসাবে নিয়ামিত ধূপ-বাতি দিয়ে থাকেন।

হিন্দু মুসলিম সকল ভক্তই তাঁর দবগাহে হাজত, মানত ও শিরনি দিয়ে থাকেন। এখানে মোরগ হাজত দেওয়া হয়। তবে সে মোরগকে জবাই করা হয় না, পীবের নামে উৎসর্গ করে দেওয়াই প্রথা। এটি খুব সম্ভবতঃ বৌদ্ধাদর্শে জীব হত্যা না করার বীতি এখানে অনুসৃত হয়েছে। এখানে দুটো দিবারও বীতি প্রচলিত।

---

## দশম পরিচ্ছেদ

### চম্পাবতী

চম্পাবতীর অপর নাম সুভদ্রা রায়। তিনি ব্রাহ্মণগণের রাজকন্যা। তাঁর পিতার নাম মুকুট বাব, মাতার নাম লীলাবতী, কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম কামদেব রায় এবং স্বামীর নাম বড়খা গাজী।

মুকুট রায়ের সহিত বড়খা গাজীর যুদ্ধ, মুকুট রায়ের পবাজয়, বড়খা গাজীর সহিত কন্যা চম্পাবতীর বিবাহ, পুত্র কামদেব রায় প্রমুখের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা। গীর মোবারক বড়খা গাজীর কথা এলো তে আলাউদ্দিন হুসেন। এখানে তাব পুনরুজ্জ্বল নিরর্থক।

বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত লালনা নামক গ্রামে চম্পাবতীর নামে একটি দরগাহ আছে। তাছাড়া আরো কোন কোন স্থানে চম্পাবতীর নামে দরগাহ আছে। তাদের মধ্যে বারানসী মহকুমার অন্তর্গত ঘোলা নামক গ্রামের নজবগাহ সম্পর্কে জানা যায় যে রাজা বাহাদুর বাহা বংশীয় জমিদারী ধারাব ধবলীমোহন রায় প্রতি বৎসর পৌষ স ক্রান্তির দিনে খুব জাঁক-জমকের সহিত এখানে শিবনি দিতেন। তাবপয থেকে স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম ভক্ত সেই প্রথা অনুসরণ করে আসতে থাকেন। জমিদারী উচ্ছেদের পর সে ধারা বন্ধ হবে গেছে।

এখানে চম্পাবতীর নামাঙ্কিত নজবগাহ-স্থানের জমির পরিমাণ বর্তমানে মাত্র তিন কাঠাব মতন। পূর্বে নাকি নজবগাহটি বন্দিবসদৃশ ছিল। পরে সেই পাকা দরগাহটি ইটের স্তূপে পরিণত হয়েছে। অনেকে বলেন এখানে এককালে একটি নাম-না-জানা গাছ ছিল। মবহম পাঁচকড়ি খাঁর পর শেখ মোজাম্মেল হক, চম্পাবতীর নজবগাহে ধূপ-বাতি দিয়ে জিয়ারত করতেন। চম্পাবতীর দরগাহের উত্তর পাশে আর একটি ইটের স্তূপ আছে। সেটিকে কেহ বলেন চম্পাবতী বা বিবি চম্পার দরগাহ, কেহ বলেন বনবিবির দরগাহ, আবার কেহ বা বলেন বিবি কামতমার দরগাহ।

চম্পাবতীর শেষ পৰিণতি কি হইছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। বিভিন্ন স্থানে তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—

১। খুলনা জেলায় সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত লাবসা নামক গ্রাম পর্যন্ত স্বামী বড়খা গাজীর সহিত চম্পাবতী আগমন করেছিলেন। মানসিক দিক দিবে কোন কারণে দাক্ষণ্যে আহত হইবে তিনি জীবন ত্যাগের সংকল্প নিয়ে পাক্ষীর মধ্যে থাকা অবস্থায় গলায় ছুরিকাঘাত করেন। পাক্ষী বেয়ে বক্তৃতা বক্তে দেখে বেহালাগণ পাক্ষী মাটিতে নামায়। তখন চম্পাবতীর রক্তাক্ত মৃতদেহ সকলের নজরে পড়ে।<sup>১৮</sup> (আঞ্চলিক লোককথা)।

২। লাবসা গ্রামে আসবার পর গাজীর সঙ্গ ত্যাগ করে চম্পাবতী পলায়ন করেন এবং নিকটবর্তী গণবাজার প্রাসাদে আশ্রয় নিয়ে বাকী জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন।<sup>১৯</sup>

৩। উক্ত লাবসা নামক গ্রামে তিনি আজীবন অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।<sup>২০</sup>

৪। লাবসা গ্রামে সাময়িক অবস্থিতির পর তিনি বড়খা গাজীর সহিত বৈরাট নগরে শঙ্করালায়ে গমন করেছিলেন।<sup>২১</sup>

৫। চম্পাবতী ছিলেন রাজা চন্দ্রকেতুব কস্তা। গীর গোবাতীদের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হইছিল।<sup>২২</sup>

৬। তিনি বোগদাদের খলিফা বংশের অনুতা কস্তা। ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে তিনি এদেশে আগমন করেছিলেন।<sup>২৩</sup>

কালের গতিতে চম্পাবতী কপকথায় পর্যাবসিত হয়েছে। প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। তবে ঘটনা বিশ্লেষণে এইটুকু উদ্ঘাটিত হয় যে তিনি মুকুট বাদ্যের কস্তা, গাজীর সহিত তাঁর বিবাহও হইছিল। লাবসা গ্রামের দরগাহ ও তথাকার লোককথায় স্বাভাবিক ভাবেই অসম্মান হয় যে চম্পাবতীর দেহান্তর উক্ত স্থানেই ঘটেছিল।

চম্পাবতীর দেহান্তর ঘটনা সম্পর্কে একটি লোককথা বসিরহাট উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত আছে। লোককথাটি সংক্ষেপে এইরূপ :—

### ১। চম্পাবতী :

মাতা-পিতার কাছ থেকে সাতশ নম্বনে বিদায় নিয়ে স্ত্রী বায় স্বামী গাজীর অহুগমন করলেন। সঙ্গে চলেছেন গাজীর সহচর কালু এবং স্ত্রী বায়

হোদব ভাই কামদেব। ব্রাহ্মণ নগব তিনি ত্যাগ করে চলেছেন। যাবেন। শুরালয় বৈবাট নগবে। দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসব হতে হতে এলেন লাবঙ্গা নামক গ্রামে। পাকী থেকে স্তম্ভা বাঘ তাকালেন বাইরের দিকে। দেখলেন বে আকাণে অসংখ্য চিল এবং শকুনি ও কাকের আনাগোনা। এত চিল-শকুনি কাক ওড়ার কাবণ জানবাব কোতুল হল তাঁব।

বডখা গাজী যুদ্ধে জবলাভ কবেছেন, তাঁর ভক্তগণের সে কি কম আনন্দের কথা! গাজী যুদ্ধে জয় লাভ কবে রাজকন্তা স্তম্ভাকে বিবাহ কবে এসেছেন, সেকি তাদের কম গোববেব কথা। গাজীভক্তগণ বিজয়ী গাজীকে সম্বর্দ্ধনা না জানিবে কি পাবে। সে জন্ত তো একটা বিজয়-উৎসব হওয়া চাই।

দূবে গ্রামে সেই বিজয়-উৎসব হবে। একটা বড় দ্বের থানা-পিনা হবে সেখানে। সেখানে কত গল্প জবাই করা হবেছে তাব হিসাব কে বাখে মাংস লোলুপ চিল-শকুনি কাকও সেখানে জটলা তো করবেই। হাঁড়-গোড় নিয়ে কলহে মন্ত কুকুৰকুলেব আশুযাজও শোনা যাচ্ছে।

গোহত্যার ব্যাপাবে সংস্কাবাচ্ছন্ন স্তম্ভা ও কামদেব মুহূর্তে যেন মরমে মরে গেলেন। মনে মনে এমন সাংঘাতিক ভাবে আহত হলেন যে স্তম্ভা পাকীব মধ্য থেকে গলাব ছুবি বসিয়ে আত্মহত্যা কবলেন। কামদেব আর গাজীর সঙ্গে অগ্রসর হলেন না। উদাসভাবে তিনি দিক পরিবর্তন করে একাকী পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসব হলেন।

স্তম্ভার প্রাণহীন দেহ লাবঙ্গা গ্রামেই সমাহিত কবা হল। তাঁর সমাধির উপর একটি চাঁপা ফুলেব গাছ লাগানো হয়েছিল। চম্পাফুল শোভিত স্তম্ভার সমাধি কালক্রমে মাষী চম্পাব দরগাহ বা চম্পাবতীব সমাধি বা চম্পাবতীব 'ধান' রূপে পবিচিতি লাভ কবে। পববর্তী কালে তাঁব চম্পাবতী নামটিই সমধিক প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### ঠাকুরবর সাহেব

জায়গাৰ নাম লাউজানি। বাংলা দেশের অন্তর্গত যশোহর জেলাৰ-  
বিনাইদহ থানাধীন এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম ব্রাহ্মণনগর। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ  
শতাব্দীতে এখানকাৰ ৰাজা ছিলেন মুকুট ৰায়। পীর মোবারক বড়খা গাজীর  
সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবেন। মুকুট  
ৰায়েৰ এক কন্যা ও এক পুত্র ছিল। তাঁদেব নাম স্বধাক্ষমে স্বভদ্রা ওকে  
চম্পাবতী ও কামদেব। চম্পাবতীৰ সঙ্গে বড়খা গাজীর বিবাহ হয়।  
কামদেব কিশোর অবস্থাতেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবেন।

বড়খা গাজী বিবাহেৰ পর পত্নী চম্পাবতীকে নিয়ে ব্রাহ্মণ নগৰ থেকে  
তাঁরা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন এবং খুলনা জেলাৰ সাতক্ষীৰা মহকুমাৰ  
অন্তর্গত লাবসা নামক গ্রামে আসেন। সেখান থেকে কামদেব কোন কারণে  
ব্যথিত হয়ে ভগিনীপতিৰ সঙ্গ ত্যাগ কবেন এবং খুলনা সীমান্ত  
অতিক্রম করে চব্বিশ পরগণাৰ বলিরহাট মহকুমাধীন স্বৰূপনগৰ থানাৰ  
অন্তর্গত গাবৰ্জা নামক গ্রামে আসেন। সেখানে অল্প সময় অবস্থানেৰ পর  
চাবঘাট নামক গ্রামে এসে উপস্থিত হন। কথিত আছে, তিনি হাঁড়ি বুকে  
নিয়ে যমুনা পাৰ হন এবং চাবঘাট গ্রামে আসেন। চাবঘাটেৰ সেখানে তিনি  
যমুনা পাৰ হৰেছিলেন তা আজো 'হেঁড়ের ঘাট' নামে পরিচিত। চাবঘাটেৰ  
দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে বাগ্‌ডেব ধারেৰ নিজৰ স্থানটি সন্ন্যাসী বা ককিরগণেৰ সাধন  
ভজনৰ পক্ষে অধিকূল। তিনি সেখানে মুসলমান ফকিরেৰ বেগে হিন্দু  
সন্ন্যাসীৰ মত কুটীর নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। তাঁৰ নাকি একটি  
পোষা বাঘ ও একটি পোষা কুম্বীৰ ছিল। তারা কাকেও হিংসা ববত না।  
গভীর ৰাত্রে তাবা ঐ ককিৰ-বেশী সাধকেৰ সাথে সাক্ষাত করতে আসত।  
তিনি ছিলেন বাক্‌সিদ্ধ। বিনা ওষুধে তিনি কত লোকের নানাবৰ্ম ব্যাধি  
আরোগ্য কবতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁৰ অসাধারণ তপশ্চক্ৰিৰ কথা চাৰিদিকে

প্রচারিত হতে থাকে। সাধাবশেষ নিকট তিনি ঠাকুরবব নামে পরিচিত হন। তাঁর মাধ্যমে ঠাকুরেব বব অথবা ব্রাহ্মণ ঠাকুরেব বর লাভ করে জনসাধারণ দ্বারা হতে পারত বলে হস্তে ঠাকুরবব নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বহুলোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। বশোহর-অধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যও তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি কবতেন। অনেক সময় ঠাকুরবব সাহেব প্রতাপাদিত্যের বাজধানী ধুমঘাটে যেতেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য কার্য ব্যপদেশে এতদ্ অঞ্চলে এলে অবশ্যই ঠাকুরবব সাহেবের আড্ডানায় এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে যেতেন।

চাবঘাটের পার্শ্ববর্তী অন্ততম গ্রামের নাম কাঁচঘহ। এ গ্রামের এক শৌণ্ডিক (শুঁড়ি)-এর পুত্র মাঠে গোচারণ কালে মাঝে মাঝে ঠাকুরবব সাহেবেব কাছে আসত। বালকটির নাম হরি। সে ককিরের প্রতি ভক্তিমান। ভক্তিমান বালক হরির প্রতি ঠাকুরবব আকৃষ্ট হন। সে ভবিষ্যতে তাঁর ধর্ম প্রচারেব প্রধান সহায় হবে মনে করে তিনি হরিকে বিশেষ কৃপা করেন। তাতে হরির অসম্ভব উন্নতি হয়। অর্ধোন্নতির সাথে সাথে হবি কাঁচঘহ গ্রাম ত্যাগ করে এবং চাবঘাটে এসে বসতি স্থাপন করে। চাবঘাটে হরি শুঁড়ি ভিটে আজো বিদ্যমান।

হরির ব্যবসায়-বানিজ্যে এত উন্নতি হয় যে তার বেশ কয়েকখানি পণ্যজিলা ছিল। সেগুলি পণ্য নিয়ে নানা দেশে গমনাগমন করত। চাবঘাটেব মাটির নীচে এক সময়ে তামাব পাতমুক্ত প্রকাণ্ড নৌকার ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল। চাবঘাটেব দক্ষিণে মাঠেব মধ্য দিবে 'হবে শুঁড়ির' রাস্তার চিহ্ন রয়েছে। ঐ রাস্তা পৌড়বঙ্গেব প্রাচীন রাস্তা থেকে নির্গত হবে যমুনাব মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

হবি ধনশালী হবে খুব গর্বিত হয় এবং হিন্দু ব সন্তান মুসলমান হওয়ায় ঠাকুরবব সাহেবকে সে স্বপ্নাব চোখে দেখতে থাকে। ঠাকুরবব সাহেব কিছু অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করে হবির উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। তাতেও ঠাকুরবব সাহেবকে অমান্য করলে হবি শেষে পীরের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়। তাব অনেক দৈব-দুর্ঘটনা ঘটে। পটুপীজ জলদ্রব্য কর্তৃক তাব পণ্যতরী বিনষ্ট হয় এবং আবার কিছু ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও সে পীরের শিষ্যত্ব মেনে নেয় না। অবশেষে সে এক নিদাক্ষণ বিপদের মধ্যে পতিত হয়।

সে সময় পোচুগীজ দস্যুরা খুব অত্যাচার করত। তাদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ব্যবসায়ীরা পলায়ন করে একজন দস্যুকে ধবে আনে এবং তাকে তারা মন্দিরে নিয়ে বলিদান করে। এ সংবাদ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কর্ণগোচর হয়। নিজেদের হাতে আইন তুলে নেওয়ায় মহাবাজ সেই ব্যবসায়ীদের ঔদ্ধত্যকে সহ্য কবেননি। তিনি বিচারার্থে কয়েকজন ব্যবসায়ীকে রাজ-দরবারে আসতে আদেশ পাঠান। এ ব্যাপারে সন্দেহ করে, হরিকেও উক্ত আদেশ জারী করা হয়। এ অবস্থায় ঠাকুরবর সাহেব তাকে বক্ষা করতে চাইলেন, কিন্তু হরি তাঁর শিক্ত্য নিয়ে রক্ষা পেতে চাইল না।

রাজদরবারে বিচারে হবিব শান্তি বিধান হলে তার অবর্তমানে পাছে তাঁর পরিবারবর্গ ধর্মাস্তুর গ্রহণ করে—এই আশঙ্কায় সংবাদবাহী দুটো পাখরা নিয়ে সে ধুমঘাটে যাত্রা করে। পরিবারবর্গকে বলে যায় যে, বিপদ ঘটলে পাখরা ছেড়ে দেওয়া হবে এবং এমনত ভাবে পাখরা ফিবে এলে পূর্ব ব্যবস্থামত তার পরিবারবর্গ যেন সহিত্র প্রকাণ্ড নৌকায করে যমুনা জলে প্রাণ ত্যাগ কবে।

উক্ত হত্যাকাণ্ডে নিজে লিপ্ত না থাকায় বিচারে হরি অব্যাহতি পায়। কিন্তু ঠাকুরবরের কৃপা-বঞ্চিত হবির হাত থেকে পাখরা দুটা ফসকে উড়ে যায়। তারা বাড়ীতে ফিবে এলে পরিবারবর্গ মনে করে যে হবির সমুহ বিপদ ঘটেছে। পূর্ব ব্যবস্থামত যমুনার জলে ডুবে তাঁরা আত্মহত্যা কবে। হরি দ্রুত বোড়া ছুটিয়ে এসে দেখে, সব শেষ। তখন হবিও মনের দুখে অস্বস্তি অবস্থায় লক্ষ্য দিয়ে যমুনা জলে সমাধি লাভ করে এবং পবিত্রতার সলে মিলিত হয়। প্রবাদ আছে,—“মবল, তবু হবি ‘গাঁৱ ঠাকুরবর’ বলল না।”

যমুনার যে স্থানে হবি সপরিবারে প্রাণত্যাগ কবেছিল তাকে এখনও লোকে ‘হবে শুঁড়ির দহ’ বলে।

৮মতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁর বশোহর খুলনার ইতিহাসে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রবিধানযোগ্য। ঠাকুরবর সাহেবের আন্ত্যনাটি যেখানে অবস্থিত সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন মনোরম, সেখানকার যে স্থানে তাঁর নখর দেহ সমাধিস্থ করা হয়েছিল তাব উপরে নির্মিত ছোট দরগাহগৃহটিও তেমন সুন্দর। একটা গম্বুজসহ চারকোণে ছিল চারটা মিনারেট। দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে দুটো দরজা। উত্তর পার্শ্বে উত্তর ও দক্ষিণ দিক বরাবর

কয়েককটি কবে ঘব, সবই ইটের তৈরী। সেগুলি রাজীনিবাসরূপে ব্যবহৃত হত। দবগাহেব পূর্ব দিকেব দবজাব উপর, দুখানি ইটে আরবী হরকে খোদিত লিপি। দক্ষিণ দিকেব দরজাব উপর আববী অক্ষরে অঙ্কিত হস্তী মূর্তি। গহুজটি বহুদিন ভগ্ন অবস্থায় ছিল। পবে কড়ি বরগা দিবে ছাদ এটে সংস্কার কবা হয়েছিল। সংস্কারকালে আববী-লিপি-খোদিত ইটগুলির লেখা পাঠোদ্ধারের আশায় সেবাবেতগণ সম্মেলন তুলে বেখেছেন, কিন্তু আজো তাব পাঠোদ্ধার সম্ভব হবনি। সেখানকাব রাজী নিবাসগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তপে পরিণত হয়েছে এবং দবগাহ গৃহাদিরও কিছু কিছু ক্ষতি হয়েছে।

গীর সাহেবেব সমাধি-স্তম্ভটি উপবীত দ্বাবা বেষ্টিত। সমাধি স্তম্ভের পাশে একটি তছবী বা জপমালা দেখা যায়। বিষ্ণুজাদি দিবে ঠাকুরবব সাহেবেব দরগাহে নিত্য সংক্ষিপ্তভাবে পূজা করাব রীতি প্রচলিত। বর্তমানে সে পূজা পদ্ধতিব ধাবা কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। সমাধি-স্তম্ভ-বেষ্টিত বে উপবীত ছিল তাও গত বৎসরের প্রথম দিক থেকে আর দৃষ্ট হয় না। মুসলিম সেবাবেতগণ নিত্য ধূপ-ধূনা ও বাতি জালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্থানীয় বা দূব অঞ্চল থেকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক এখানে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন কবতে আসেন। হিন্দুবা বাতাসাদি মিষ্ট দ্রব্য দিবে মানত ও শিরনি নিবেদন কবেন, মুসলিমবা মানত ও শিরনি ছাড়াও ছাগ-মুগগী হাজত নিবেদন করতেন। অনেক হিন্দু-মুসলিম ভক্ত আজো তা প্রদান করেন। ঠাকুরববের নামে মানসিক না কবে গ্রামবাসীগণ সাধাবণতঃ কোন কাজে অগ্রসর হন না। গ্রামেব নব বর-বধু ঠাকুরবব সাহেবেব দবগায় গিষে পূজা ও ভোগ দিবে তবে গৃহে প্রবেশ করে থাকেন। বহু পূর্বে পীবেব উরস উপলক্ষে এখানে মেলা বসত বলে শোনা যায়। এখনও পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ সময়ে ভক্ত যাত্রীগণেব সমাগম হয়।

মহাবাজ প্রতাপাদিত্যের পতনের পব ঠাকুরবব সাহেব বহুদিন জীবিত ছিলেন। অল্পমান করা যায়, চিবকুমার এই সন্ন্যাসী মুসলমান কবিরের বেশে সিদ্ধ পুরুষ হিসাবে দীর্ঘজীবি ছিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কাল হল ১৫৬০ থেকে ১৬০২ খ্রষ্টাব্দ পর্যন্ত। অতএব ঠাকুরবব সাহেব সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও জীবিত ছিলেন।



ঠাকুরবর সাহেবের দরগাহের অন্ততম বকঃবৃদ্ধ এবং মূল সেবায়ত্ত লেখ আবুল হোছেনের নিকট থেকে জানা গেছে যে, তাঁদের পূর্ববর্তী কোন এক পুঙ্খ মেদিনীপুর জেলার কোনো এক স্থান থেকে চারঘাটে আসেন ঠাকুরবর সাহেবের দরগাহের সেবায়ত্ত নিযুক্ত হবেন। তাঁর নাম বাবরুদ্দজ।

ঠাকুরবর সাহেবের নামে দু'একজন গ্রামবাসী গান রচনা করে গ্রামের আসরে গেয়ে বেড়াতেন। তেমন একজন গায়কের বাড়ী ছিল গোবরা নামক গ্রামে। তাঁর নাম চাঁদ মিঞা। নারিকেল বেড়িয়ার আব্দুল মালেকও অনুরূপ গায়ক ছিলেন। সে সব গানের পূর্ণ হাদিশ এখন হুম্মাপা। গানের দু'একটি পংক্তি এইরূপ :—

ক) নিবেদ কবি তোরে হরি

যাসনে তুই দরগা বাড়ী।

খ) ধরার বোঁ অস্তঃপতি গায় কত গীত।

বাড়ীর বার হয়ে দেখে খবা পাট্টনী চিং

গ) কি করিব কোথা বাব বে—

মোর ভগিনী জুড়জাকে

হায় দিতে হল তোমারে। ইত্যাদি—

ঠাকুরবর সাহেবের কথা কুশদহ পত্রিকা, কুশদহের ইতিহাস : হাসিরাশি দেবী, খাটুরাব ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী : বিপিন বিহারী চক্রবর্তী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (১৩২৩) আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব একখানি গ্রন্থের উল্লেখ কবেছেন। গ্রন্থখানির নাম “শাহ্ ঠাকুরবর”, বচনিতা “নছিয়দ্দিন।” রচনাকাল ১৩১০ বঙ্গাব্দ। শাহ্ ঠাকুরবর আমাদের আলোচ্য ঠাকুরবর সাহেব কি না নির্ণীত হয়নি।

ঠাকুরবর সাহেবের অলৌকিক কীর্তিকলাপকে কেন্দ্র করে কয়েকটি লোক-কথা প্রচলিত আছে। তাদের কয়েকটি এইরূপ :—

### ১। অশ্বের প্রণাম

চাবঘাট অঞ্চলের সুবিখ্যাত সমাজনেতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পঞ্চান চট্টোপাধ্যায়। দু'ব দু'ব গ্রামেও বিচার-সালিশীতে তাঁদের আসতে হত তাঁদের দুটি বলশালী অশ্ব ছিল। অশ্ব দুটি দরগাহ-সংলগ্ন এলাকা

প্রবেশের আগে হাটু ভেঙে নত হয়ে গীবের প্রতি প্রণাম জানাত। কোন একবার খেয়াল-বশতঃ প্রমথবাবু ও পঞ্চাননবাবু একটা সালিশীর ব্যাপারে ঠাকুরবব সাহেবের দরগাহে আসবাব পূর্বে নিজ নিজ অংশ বিনিময় করেন এবং সওয়ার হয়ে আসেন। প্রমথবাবুর অশ্বটি পঞ্চানন বাবুর কাছে খুব দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। সে দরগাহ এলাকায় প্রণাম বা সালাম না জানিয়ে প্রবেশ করে এবং সেখানকার বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই বটগাছের একটি প্রকাণ্ড ডাল ভেঙে পড়ে সেই অশ্বের পৃষ্ঠে। অশ্বটি যন্ত্রনায় আর্তনাদ করে ওঠে।

এর পর সেই অশ্ব নাকি কোন দিন দরগাহে এসে ঠাকুরবব সাহেবের প্রতি পূর্ববৎ সালাম না জানিয়ে সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে নি।

## ২। গজারোহীর পদব্রজে গমন

গোববডাঙ্গার জমিদার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। তিনি শিকারী সেজে বাবু নানেই সমধিক প্রসিদ্ধ। হাতীব পিঠে চড়েই তিনি যাতায়াত করতেন। ঠাকুরবব সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তিনি চারঘাটে আসতেন বটে কিন্তু যমুনায় ধাবে তিনি হাতীকে বেখে বাকী দীর্ঘ পথ পদব্রজেই গমন করতেন। ঠাকুরবব সাহেবকে তিনি যে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন এ থেকেই তা বোঝা যায়।

## ৩। ফুরফুরার পীর প্রাঙ্গণ

ফুরফুরার দাদাপীর হজবত আবু বকর সিদ্দিকী এতদ্ অঞ্চলে সর্বাধিক সম্মানিত পীর বল উনবিংশ শতাব্দীতে বহু লোকের নিকট গৃহীত সত্য। তিনি খুব কম বাবই বসিবহাট তথা চাবঘাট অঞ্চলে এসেছেন। কিন্তু যখনই এ অঞ্চলে আসতেন, তিনি তখনই একবার অবশ্য চাবঘাটে পীর ঠাকুরবব সাহেবের দরগাহে জিয়ারত করে যেতেন। সেই সময়ে তিনি ঠাকুরবব সাহেবের দরগাহে সেবায়ত্তগণের সঙ্গে সাক্ষাত কবে দীর্ঘক্ষণ বসে ধর্মালোচনা করতেন।

## ৪। ঠাকুরবব সাহেবের দরগাহে ধর্ম দ্বিগ্নে রোগমুক্তি

জৈনক ওড়িশা-বাসী একবার এ অঞ্চলে কর্মোপলক্ষ্যে এসে “শূল বেদনা” নামক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। ডাক্তার, বৈজ্ঞ প্রভৃতির নিকট

ঔষধপত্রাদি নিষেও কোন স্কল না হওয়ায় তিনি আত্মহত্যা উদ্যত হন। ঘটনা জানতে পেবে ঠাকুববর সাহেবের জনৈক ভক্ত তাঁকে গীবেব দরগাহের পবিত্র মাটি ব্যবহার কবতে পৰামর্শ দেন। পরামর্শ মোতাবেক ঐ ব্যক্তি প্রত্যহ দরগাহেব মাটি গায়ে মাখতে এবং সামান্য পরিমাণে খেতে আরম্ভ করেন। বেশ কিছুদিন মাটি ব্যবহার কবে কোন স্কলনা পেবে তিনি দারুণ ভাবে বিস্কৃত হযে ওঠেন এবং একবার দরগাহে পদাঘাত কবেন। পবদিন থেকে তাঁর শূল-বেদনা আরো তীব্র আকার ধারণ কবল। লোকে বলল যে তাঁর ভক্তিতে নিশ্চয় খাদ আছে। লোকটি ব্যথিত হযে পবে ব্যাকুলভাবে গীবেব দরগাহে ধর্না দিলেন এবং অল্প দিনেব মধ্যে তিনি সম্পূর্ণরূপে বোগ-মুক্ত হলেন।

রোগ-মুক্ত হওয়ার পব ওডিশার সেই ব্যক্তি তাঁর জীবনের সেই আশ্চর্য ঘটনার কথা আত্মতৃপ্তি সহকাবে গ্রামে গ্রামে বলে বেড়াতেন।

#### ৫। বকনা গল্পের দুধ

রাখাল হবি শুডি একবার ফকির ঠাকুববরকে তাদের চডুই-ভাতিতে আমন্ত্রণ জানালো। হবিকে ফকির সাহেব গকব দুধ দিযে ক্ষীৰ ভোগ কবতে বল্লেন। পালে একটি মাত্র দুধলো গাভী ছিল। তাব দুধ অল্প দেখে ফকির সাহেব, হবিকে বল্লেন বকনা গককে দোহন কবতে। শুনে তো সকল রাখাল বালক অবাক। ইতঃস্তত কবতে কবতে তাবা বকনা দোহন করে সত্য সত্যই দুধ পেল। সেই দুধ দিযে তাবা ক্ষীৰভোগ বা শিবনি তৈবী করল।

চডুইভাতিতে নিমন্ত্রিতগণ একে একে এসে জমা হল। তাদের সংখ্যা যে অনেক। শিবনিতে সংকুলান হওয়া অসম্ভব। ঠাকুববর সাহেব সব অবগত হযেও রাখালগণকে সেই শিবনি ভাগ করে দিতে বল্লেন। তাই কবা হল। দেখা গেল শিবনি পেযে শেষ পর্যন্ত কোন ভক্তই অতৃপ্ত নেই।

#### ৬। মোগ কাটার খাল

যশোহরাধিপতি মহাবাজ প্রতাপাদিত্য কোন কার্য উপলক্ষ্যে যদি চারঘাট অঞ্চলের উপর দিবে যাতায়াত কবতেন তবে তিনি অবশ্যই একবার ঠাকুববর সাহেবেব সহিত সাক্ষাত কবে শ্রদ্ধা নিবেদন কবে যেতেন। মহারাজ এ অঞ্চলে অধিকাংশ সময়ে নদী পথেই যাতায়াত কবতেন। ইচ্ছামতী নদী

বেষে নৌকা যে পথে ঠাকুববর সাহেবের দবগাহের ঘাটে আসত, সেই পথে ফিরে যেতে অনেক সময় লাগত। তাই মহাবাজ প্রতাপাদিত্য পথেব দূত্ব কমানার জন্য চারঘাটের দবগাহ থেকে দক্ষিণ দিকে ইচ্ছামতীকে সংযুক্ত করে একটি খাল কাটিয়ে নিষেছিলেন। চাবঘাট থেকে বাহুড়িয়ার নিকটবর্তী কাকড়াহুতি গ্রাম পর্যন্ত খালটি মহারাজের আদেশে মাত্র একমাসে কাটা হয়েছিল বলে এই খালটিকে মাস-কাটা'র খাল বলে।

### ৭। মুসলমানহীন গ্রাম

ব্রাহ্মণ নগর থেকে সাতক্ষীয়ার পথে লাবসা নামক গ্রামে কামদেব রাধাওরফে ঠাকুববর সাহেবের ভগিনী চম্পাবতী আত্মহত্যা করেছিল বলে অনেকের মত। এই আত্মহত্যার মূলেও নাকি ছিল ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর বীতশ্রদ্ধা। ঠাকুববর সাহেবও বিস্ময় হয়ে বুড়ন পরগণার মধ্য দিয়ে চাবঘাটের দিকে আসছিলেন। গাবড়া-কৈজুড়ী নামক গ্রামে এসে তাঁর দক্ষিণ পিঙ্গাঙ্গা পায়। এক গৃহস্থের বাড়ী গিষে তিনি 'পানি' প্রার্থনা করেন। গৃহস্থ জানান যে তাঁরা তো মুসলমান নন। ঠাকুববর সাহেব উক্ত গ্রাম ছুটিতে কোন মুসলমান বসতি নেই জেনে নাকি আবেগভরে বলেছিলেন যে কোন মুসলমান যেন ঐ গ্রামে বসতি না করে।

আজিও পর্যন্ত (১৯৭০) উক্ত গ্রামখন্ডের কোন বাসিন্দা মুসলমান নন।

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### তিতুমীর

তিতুমীর নামে যিনি জনসাধারণের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ তাঁর মূল নাম সৈয়দ নিসাব আলি। তিনি ভাবত-বিখ্যাত পীর হজরত শাহজালাল এয়মনিব অন্ততম স্ত্রীগোত্রীয় শিষ্য গীব হজরত গোরাচাঁদ বাজীর একত্রিংশ অধঃস্তব পুরুষ।

তিতুমীর ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তাবিখে বসিহাট মহকুমার বহুড়িয়া থানাধীন হাষদারপুর নামক গ্রামে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী কৃষকেব ঘবে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁকে লোকে তিতুমীর বলে কেন? বাল্যকালে তিনি প্রায়ই ঘুঘুঘুে জরে ভুগতেন। বোগমুক্ত হওয়াব জন্ত তাঁকে প্রায়ই শিউলী পাতা বা অগ্ন্যাগ্ন অল্পকপ তিতা পাতাব বস খেতে হত। তিনি তিতা পাতা খেতে তেমন আপত্তি কবতেন না বলে জয়নাব খাতুন আদর ক'ব দৌহিড়কে তিতা মিঞা বলে ডাকতেন। পববর্তীকালে মীর তিতা মিঞা “তিতুমীর” নামে অভিহিত হন।

কিশোর বয়সে কৃষিকার্ষে নিযুক্ত থাকার তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল। শরীর চর্চাব সাথে তিনি মল্লধুত্ব, লাঠি-সডকি চালনা এবং অগ্ন্যাগ্ন ক্রীড়ায পাবদর্শী হয়ে ওঠেন। তৎকালে দেশে চোব ডাকাতেব উৎপাত ছিল, ছিল জমিদাবেব ভাডাটে লোকেব অত্যাচাব। তাদেব অত্যাচাবী-হাত থেকে জনসাধারণেব রক্ষা কবাব সংকল্প তিনি মনে মনে গ্রহণ কবেছিলেন।

নদীয়ায কোন এক জমিদাবেব অধীনে চাকুবীবত থাকাকালে অগ্ন এক জমিদাবেব বিপক্ষে দাঁড়া করে তিনি অভিবৃক্ত হন। তাতে তাঁব কারাদণ্ড হয়। কারাবাসেব শেষে তিনি মুক্তি পেবে বেদনাহত মন নিবে মজ্জা শবীকে গমন কবেন। সেখানে হজরত শাহ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীব সাহচর্য্যে এসে মানসিক-ঔষধ্য পান এবং ওমাহাবী ধর্ম্মাদর্শে দীক্ষা গ্রহণ কবেন।

কিছুদিন পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ওয়াহাবী আদর্শ প্রচারে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবোধ কবেন।

হিন্দু বা বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিমগণের আচার-ব্যবহাবাদি তৎকালে ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী ছিল না। তা দূর করার জন্য ওয়াহাবীগণ প্রথমে ধর্মান্দোলন আৰম্ভ কবেন।

বঙ্গদেশে তখন জমিদার ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের তাণ্ডব চলছে। তাতে কৃষক সমাজের জীবন হবে উঠেছে অতিষ্ঠ। এইসব কৃষকগণের অধিকাংশই মুসলিম। জমিদার ও ইংরেজ সাহেবগণের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষকগণ ঘাষ ও সন্তোর জন্য তাঁদের পাশে দাঁড়াবার লোকের অভাব অনুভব কবছিলেন। সেই সমূহ বিপদের দিনে অত্যাচারিত মুসলিমগণের শ্রায় স্বার্থ রক্ষা কবা ধর্মান্দোলনকারীগণের নিকট অবশ্য কর্তব্যরূপে দেখা দিল। এতে শুধু মুসলিম নয় হিন্দু কৃষকগণও নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে এসে এই আন্দোলনের সংগে সংযুক্ত হলেন। এইসব হিন্দু ছিলেন বিশেষভাবে নিম্নবর্ণীয়, সামাজিকভাবেও উচ্চবর্ণীয় উচ্চহিন্দুগণের অবজ্ঞা তথা ঘৃণাপূর্ণ নির্ধাতনের কারণে তাঁরা বিক্ষুব্ধ হয়েই ছিলেন।

তিতুমীর নিজেও ছিলেন কৃষকের সন্তান। স্বাভাবিকভাবে সহজেই তিনি কৃষককুলের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত হলেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন ধর্মান্দোলন তাই এক ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে পরিণত হল।

সেকালে নীল চাষ খুব লাভজনক ব্যবসায় ছিল। এতদ্ অঞ্চলে যাতে ব্যাপকভাবে নীল চাষ হয় তাঁর জন্য নীলকর সাহেবগণও খুবই তৎপর ছিল। এ ব্যাপারে স্থানীয় জমিদারগণই ছিল তাদের প্রধান সহায়-সম্মল। বিশেষতঃ কৃষকদের ওপর প্রভাব বিস্তার কবে নীলচাষকে আবে লাভজনক করার জন্য নীলকরগণ ছিল উদ্যমী। স্থানীয় জমিদারগণও ইংরেজের ভাবেদারী কবে নিজেদের ভাগ্যপ্রসন্ন করার সুযোগ গ্রহণ কবতে চাইল। তাই সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রজ্জ্বলিত বিক্ষোভকে দমন করার জন্য জমিদারগণ নান্যভাবে কৃষকগণের উপর অত্যাচার কবতে লাগল। এমন কি পুঁজার জমিদার কৃষ্ণদেব বাঘ মুসলিমগণের “দাউব” উপর বর ধার্য কবলেন। এবার তিতুমীর কৃষকগণের উপর এই অত্যাচারের প্রতিবাদ কবলেন। গোবরডাঙ্গার হাট্টান কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দপুরের দেবনাথ বাঘ প্রমুখ কৃষ্ণদেবের সহায়তা কবে তিতুমীরের বিব্রোচরণ কবলেন। তিতুমীর এবার সহস্রাধি

ব্রুবলেন যে, ইংবেজের রাজশক্তিই এই সব জমিদারগণের যথেষ্ট অনুগ্ৰেবণা  
কোঁগাচ্ছে ; অতএব ইংরেজ বিতাড়নই সৰ্বাগ্ৰে প্ৰযোজন। ফলে কৃষক  
আন্দোলন, ইংবেজ বিতাড়ন আন্দোলনে পৰ্য্যবসিত হল। তাই তাঁৰ সংকল্প  
হল :—

- ১। ইংরেজকে এদেশ থেকে বিতাড়িত কৰতে হবে।
- ২। দেশে স্বাধীন ও সার্বভৌম সবকাৰ গঠন কৰতে হবে।
- ৩। ইংবেজের সাক্ষেপে জমিদারকে দমন কৰে কৃষকসমাজকে শোষণ ও  
অত্যাচার থেকে মুক্ত কৰতে হবে। ইত্যাদি।

তিতুমীর পরিচালিত ওয়াহাবী আন্দোলনকে কেউ কেউ ধর্মসংস্কার ও  
সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে আখ্যা দিষেছেন। তাঁদের বক্তব্য  
উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত। নিম্নলিখিত বক্তব্য কষটি থেকেও তা প্ৰমাণিত হতে  
পারে :—

- ১। হাকীম সাহেব তাঁর “ভারতের মুসলমান” নামক প্ৰসিদ্ধ গ্ৰন্থ  
লিখেছেন,—“কাষেমী স্বাৰ্ধসম্পন্ন বা যে কোন বিত্তশালী ব্যক্তি  
পক্ষেই ওয়াহাবীদের উপস্থিতি একটা স্বাবী ভীতির কাৰণ।  
অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰে ওয়াহাবী বিদ্ৰোহ কেবল মুসলমান সম্প্ৰদায়ের  
সংকীৰ্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাতে নিম্নবৰ্গের হিন্দুগণও  
অংশ গ্ৰহণ কৰেছিল।”
- ২। “ভারতে আধুনিক ইসলাম” গ্ৰন্থে ক্যান্টোয়েল লিখেছেন,—  
—“ওয়াহাবী বিদ্ৰোহ ছিল পূৰ্ণমাত্রায় শ্ৰেণী সংগ্ৰাম। ইহা  
হতে সাম্প্ৰদায়িক প্ৰশ্নটি ধীবে ধীবে অন্তৰ্হিত হযেছিল। শিল্প  
বিকাশের পূৰ্বযুগে শ্ৰেণীসংগ্ৰাম যেভাবে প্ৰাৰ সকল ক্ষেত্ৰে ধৰ্ম্মাৰ  
ধ্বনি গ্ৰহণ কৰেছিল, সেইভাবে এই শ্ৰেণীসংগ্ৰামেও ধৰ্ম্মাৰ ধ্বনি  
ব্যবহৃত হযেছে,—কিন্তু সেই ধ্বনি ধৰ্ম্মাৰ হলেও সাম্প্ৰদায়িক  
ছিল না।”
- ৩। “শহীদ তিতুমীর” গ্ৰন্থে আবদুল গফ্ফৰ সিদ্দিকী লিখেছেন,  
“তিতুমীর অগ্ৰ মতাবলম্বী মুসলমানদেরও বিৰুদ্ধে ছিলেন এবং তাদের  
অনেক মসজিদও পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। আবার এও জানা যায যে,  
ভূষণাৰ জমিদার মনোহৰ বাৰ, তিতুব দলভুক্ত ছিলেন এবং তিতুকে  
বহুপ্ৰকাৰে সাহায্য কৰেছিলেন।”

৪। ইংরেজের পৰম ভক্ত ও তিতুমীরের প্রথম বাঙালী জীবনীকাব বিহাবীলাল সরকার প্রায় শত বৎসর পূর্বে ইংবেঙ্গ আমলের স্বর্ণযুগে তাঁর “তিতুমীর ও নাবিকেলবেড়িয়ার লড়াই” গ্রন্থে লিখেছেন,—  
“তিতুমীর এই সকল অঞ্চলের বিভিন্ন জমিদারীর অধীনস্থ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাগণকে জমিদারের খাজনা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ পেয়ে অধিকাংশ প্রজা খাজনা বন্ধ করে দেয়। ...ক্রমে ক্রমে কয়েকখানি গ্রামের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের চাষীগণ তিতুকে স্বাধীন বাদশাহ বলে স্বীকার করল।”

ভারতের ব্রিটিশ শাসকের বিতাড়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তিতুমীর ছিলেন অগ্রগণ্য শহীদ। অধ্যাপক শান্তিময় বাব লিখেছেন,—  
“তিতুমীর সংগ্রামরত অবস্থায় বীরের মত মৃত্যু বরণ করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ হবার সম্মান লাভ করেন। .....এই বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া ভুল। বাবা দিতে চান তাবা সত্যের উপাসক নয়। কোন বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জগুই তাবা এই মুসলিম দেশ-প্রেমিকদের কাহিনীগুলিতে সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক কালিমা লেগন করেছেন।”

—তিতুমীর।

সুফী আদর্শের স্মার লৌকিক ইসলামের আদর্শ অনুসারী তিতুমীর বর্তমানে পীরের পর্ধ্যায়ে উন্নীত হয়েছেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। ডঃ এনাযুল হক লিখেছেন,—“শহীদ তিতুমীর ওবাহাবী আদর্শপন্থী,—সুফী মতবাদী নন। তবু তাঁর আদর্শ ছিল যেন সুফী আদর্শের স্মার লৌকিক ইসলামের আদর্শ।” ৩৫ বস্তুতঃ তিতুমীরের বহু ভক্ত তাঁকে সুফী পীর ককিবের স্মার ভজ্ঞা করেন। দুইশত বছর অতীত হল, যশোহর, খুলনা, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলের জনসাধারণ তাঁর ঐতিহাসিক মৃত্যুর জগু গোঁবর বোঁধ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংহতি সমিতির উদ্যোগে ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে তিতুমীরের দ্বিগতবর্ষ জন্মবার্ষিকী স্মরণে নাবিকেলবেড়িয়া গ্রামে শহীদস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে শ্রীপ্রভাত কুমার পাল যে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেছিলেন তা এইরূপ,—



## তিতুমীর প্রশস্তি

তুমি বীর বিপ্লবী বীর সালাম লহ সালাম  
 নিপীড়িত কৃষকের কাছে বীর তিতুমীর একটি নাম ;  
 জমিদার জোতদার ইংবাজ বেনিয়া  
 বৃদ্ধকৃষকে মেবেছিল দলিয়া  
 বলেছিলে তুমি সহিও না আর এ অত্যাচার অবিরাম ॥  
 লড়ে যাই ধবি, ভাই হাতিবাব সকলে  
 অধিকার আপনার কেড়ে আনো দখলে  
 রক্তলোলুপ স্বাপদে নাশিতে কব আপোহীন সংগ্রাম ॥  
 কৃষকের সরকাব করেছিলে গঠন  
 ছিল নাকে। জুলুম অবসান শোষণ,  
 মুক্তি আনন্দে কবে বলমল এই এলাকার প্রতি গ্রাম ॥  
 তব ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে স্বাধিকার বন্ধার  
 সহস্র জান কোরবান নারিকেলবেড়িয়ার  
 মুক্তিপথের তুমি যে শহীদ লহ মোব ছোট সালাম ॥

মহম্মদ মুজিব বিশ্বাস প্রমুখ সেবাসেতগণ তিতুমীরের শ্রুতি-বিজড়িত মসজিদে ধূপ-বাতি প্রদান করেন। প্রতি বৎসর বাহুড়িয়া থানাব অন্তর্গত সলুয়া নামক গ্রাম থেকে মরমেব সমর এক তাজিয়া বের হয় এবং তা নারিকেলবেড়িয়ার তিতুমীরের শ্রুতিস্থলে শোভাযাত্রা-সহকাবে আসে। পশ্চিমধ্যে ঘোষণাব, চণ্ডীপুব, বুকজ প্রভৃতি গ্রামেব হিন্দু-মুসলিমগণ অনুবোধ কবে সেই শোভাযাত্রাকারীগণের সাময়িক গতিবোধ করেন এবং ভক্তিসহকাবে ‘মাতম’ অনুষ্ঠান প্রদর্শন ও ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। প্রতি বৎসর তিতুমীরের জন্মভূমি হারদবপুবেও মহবমেব সমর বিবাট উৎসব হব, তাতে প্রায় আট-দশ হাজাব লোকেব সমাবেশ ঘটে। দশদিন ধবে সে উৎসব চলে এবং শেষ দিনে সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়।

শহীদ তিতুমীর সম্পর্কে বাংলা ভাষাব যে সব পুস্তকে বিভিন্ন অভিযন্ত লিখিত হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম এইরূপ :—

১। ভাবভেব ইতিহাস : খর্গটন

২। মুক্তিব সন্ধানে ভাবত : যোগেশ চন্দ্র বাগল

৩। ঠাটুবা ইতিহাস ও কুশরীপ কাহিনী : বিহাবীলাল চক্রবর্তী

৪। তিতুমীব : অধ্যাপক শান্তিময় বার

৫। ভাবতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম : সুপ্রকাশ বার

৬। বাঁশের কেলা : শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

৭। তিতুমীব : শ্রীশ্রামাকান্ত দাস। ইত্যাদি।

তিতুমীবকে নিয়ে কিছু স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থ বা পুথি রচিত হইবে। তাদের মধ্যকার কয়েকখানির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে লিপিবদ্ধ করা হ'ল :—

### ১। শহীদ তিতুমীর

শহীদ তিতুমীর নামক গ্রন্থের রচয়িতা আবদুল গফ্ফর সিদ্দিকী সাহেব। চব্বিশ পবগণার বসিরাট মহকুমার বাহুড়িয়া থানার অন্তর্গত খাসপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। পীর গোবাটান্দ ভাষা শহীদ তিতুমীরের বংশের সহিত তাঁর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাঁর পবিচর “বালাগুাব পীর হজবত গোবাটান্দ বাজী” নামক গ্রন্থ এসঙ্গে ইতিপূর্বেই প্রদত্ত হইবে।

ছিয়াশি পৃষ্ঠার লিখিত এই গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য। বহু দৃশ্যাপ্য তথ্য তার মধ্যে পবিবেশিত হইবে। অধিকাংশই ঐতিহাসিক তথ্য-বহুল এবং জীবনী গ্রন্থ বলে চিহ্নিত হলেও তিতুমীরের অসমসাহসিক কার্যাবলীর বিবরণ পাঠকচিত্তকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ কবে বাখে। যে সমস্ত অপ্রকাশিত পত্রাবলী এতে স্থান পেয়েছে তাব মূল্য অপবিসীম। গ্রন্থখানি বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তাদের প্রথম প্রকাশকাল ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। কলিকাতাহু ভাবতীর জাতীর গ্রন্থাগারে ঐ পুস্তকের এক কপি বক্ষিত হইবে। পুস্তকের নং বি ৯২২-৯৭—টি ৬৯৫ এস।

### ২। বাঁশের কেলা

“বাঁশের কেলা” একখানি নাটক। নাট্যকাব্যের নাম শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। নাগবদোলা, লাল রাজপথ, বিজ্ঞা নদীর বাঁধের পব, বক্তমাখা প্রভাত, রাজবন্দী প্রভৃতি নাটক রচনা কবে তিনি খ্যাতি অর্জন কবেছেন।

নাটকখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৮। এটি পঞ্চম অংক বিশিষ্ট এবং পঞ্চদশাধিক পৃষ্ঠার চবিত্ত ও চতুর্থাধিক নাবী চবিত্ত সমন্বিত। নাটকটিব গীত সংখ্যা ৯। এব মধ্যে একখানি গান রচনা কবেছেন শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য—একথা গ্রন্থকাব

উল্লেখ করেছেন। নাটকখানি উৎসর্গ করা হয়েছে প্রসিদ্ধ অভিনেতা ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের নামে।

সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

ইংবেজের অত্যাচার হাযদবপুব অঞ্চলের চাষীদের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে। খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহও দেখা দিয়েছে। চাষী সদানন্দের পুত্র রতন গুলীর আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে।

ইংরেজের পক্ষে কর্ণেল সুবেদার সিং কৃষক বিদ্রোহের নেতা তিতুমীরকে বন্দী করার চিন্তায় উদ্বিগ্ন। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় যে কোন মূল্যে তাঁর জমিদারী রক্ষায় ব্যগ্র। জমিদারের কর্মচারী হীরালাল যে কোন উপায়ে কালীপ্রসন্ন বাবুর জমিদারীটা কেড়ে নেবার মতলব করছে। ব্যবসায়ী দীনবন্ধু হাতী মুনাফা লুটবার ধান্দায় তৎপর। মিস্ত্রিন ফকির এদেশে ইসলামী-স্থান গড়ে তাঁর বাদশাহ হবার আশায় আশাবিভ।

ষড়যন্ত্র করে কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও তিতুমীরের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা হল। জমিদারের ভাগনে অনাদি দেশমাতৃকায় মুক্তির পথ নিয়ে সংগ্রামী নেতা তিতুমীরের পাশে এসে দাঁড়ালো। হিন্দুব সঙ্গে মিতালিতে মিস্ত্রিন কবিরের স্বার্থসিদ্ধি হবার নয়, তিতুমীরের মৃত্যুতেই তাব লাভ। তাই সে কৌশলে তিতুমীরের পুত্রকে পাঠালো সুবেদার সিং-এর কবলে। অপবাদকে সুবেদার-পক্ষী মহীশূরী ডলি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ধবা দিলেন তিতুমীরের নিকট। এই ঘটনায় সুবেদার সিং বিজ্ঞান্ত হল,—তিতুমীরকে ডুল দুবল। প্রতিশোধের বদলায় তিতুমীরের পুত্র বাদশার প্রাণ গেল গুলীর আঘাতে। তিতুমীরের মহত্বে বেঁচে বইল ডলি। তিতুমীরের ভগিনী পিষাবা দেশপ্রেমিক। অতৃদিকে সে ভালবেসে বিবাহে পর্য্যন্ত সম্মত। পিন্নার ভালবাসে অনাদিকে। কস্তম ভালবাসে পিষাবাকে। অনাদিও ভালবাসে পিন্নাকে। কস্তমের আশায় বাদ না সেধে অনাদি স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ কবলেও শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজের বিচাবে কস্তমের হয়ে গেল ফাঁসি। তিতুমীর নাথিকেলবেড়িয়ার বাঁশের কেল্লা কবে শেষ লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হলেন। কালীপ্রসন্ন প্রমুখ এগিষে গেলেন ইংবেজের সহযোগিতায়। ক্রমান্বয়ে ধবা পড়ল হীরালাল, দীনবন্ধু হাতী প্রমুখের শবতানী। গুলীর আঘাতে প্রাণ গেল অনাদিও, বল্লভের আঘাতে প্রাণ গেল মিস্ত্রিনের, গুলীর আঘাতে বুল সুবেদার সিং, তিতুমীরেরও বুকে লাগল গুলীর আঘাত। কালীপ্রসন্ন নিজের ডুল বুকে

তিতুমীরের কাছে এসে পড়লেন, তখন তিতুমীরের মৃত্যু উপস্থিত। শেষবারের মত তিনি বললেন, বিদেশী দুঃখমন্দের হাত থেকে গরীব-দুঃখী দেশবাসীকে বাঁচাতে, দেশের স্বাধীনতা আনতে গাঁয়ে গাঁয়ে তাবা যেন গড়ে তোলে এই তিতুমীরের “বাঁশের কেলা।”

বাঁশের কেলা নাটকে তিতুমীরের মূল বিবোধী চরিত্র পুঁডাব কৃষ্ণদেব রায় অনুপস্থিত।

কিছু ঐতিহাসিক পুরুষ ও কিছু কল্পিত ব্যক্তিকে নিয়ে বচিত এই নাটক। মতদ্বৈত জানা মাষ, বাদশা বলে কোন পুত্র বা পিষাবা বলে কোন ভগিনী তিতুমীরের ছিল না। তাছাড়া ফুলজান বিবি নামে ‘ভাবী’ ছিল না তিতুমীরের, তিতুমীরই তাঁর ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ।

কস্তম-পিষাবা, অনাদি-পিষাবা, সুবেদা-ডলির প্রণয়, এই নাট্যকাহিনীর অনেকখানি স্থান অধিকার করেছে। এতে জমিদার ও কৃষকের মধ্যকার সম্পর্কের বাস্তব রূপ ফুটে ওঠে, জমিদারের প্রতি নাট্যকাব্যের পক্ষপাতিত্ব অনুভূত হয় অথবা তিনি এটাকে ঐতিক ঐতিহাসিক নাটক করেন নি।

বুদ্ধ বিত্ত, তিতুমীরের পুত্র বাদশাব শিশুবেলা থেকে সাথী। সে হিন্দু বা মুসলিম নয়, সে বাঙালী। এই স্বজাতিত্ব বোধ তার মনে অঙ্কুরিত হয়েছে। তাই সে গেয়েছে,—

বাঙলা আমার সোনার মাটি বাঙলা মোর ভাই।

মায়ের গেহে ভাই-এর রেহে কতই সুখ পাই ॥

কোবাশে আব পুবানেতে,

বাম-রহিমে এক সুবেতে,

মায়েব দুঃখে বুক ভাসাতে কোথাও দেখি নাই ॥

হিন্দু-মুসলিমের মিলনের ভাবপ্রকাশক নাটকখানি এদেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করে। তিতুমীরকে বিবোধী পক্ষীয়গণ বিশেষতঃ জমিদারবা তাঁকে ডাকাতি বলে অভিহিত করলেও তাঁর দেশ হিতচরণা অপ্রকাশিত থাকে নি। তিতুমীরের ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না, ছিল প্রশস্ত হৃদয়। দেশের মুক্তির জন্য নিদারুণ পুত্রশোকও তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। তিনি আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামীব দৃষ্টান্তরূপে মৃত্যুবরণ করেছেন।

৩। তিতুমীরের গান :

তিতুমীরের নামে বচিত একখানি গানের পুঁথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

পুথিখানি বামচন্দ্রপুৰ গ্রামেৰ মোহম্মদ সহবালি সাহেবেৰ বাডী থেকে উদ্ধাব কৰেছেন বলে উক্ত বামচন্দ্রপুৰ গ্রাম, থানা বাহুড়িয়া, জেলা চব্বিশ পৰগণা নিবাসী শ্ৰীপ্ৰভাত কুমাৰ পাল মহাশয় আমাকে বলেছেন। পুথিখানি শ্ৰীপালের কাছেই আছে। সংকলন আঁমাৰ।

তিতুমীবেৰ গান-বচনিতাৰ নাম সাজন (গাজী)। সাজন গাজী ছিলেন তিতুমীৰেৰ সহযোদ্ধা। গানগুলি প্ৰথমে লিপিবদ্ধ ছিল না, লোকেৰ মুখে মুখেই ফিবত। সাজন গাজী যুদ্ধে পৰাস্ত হৰে বন্দী হন এবং জেলখানায় নিষ্ক্ৰিষ্ট হন। সাত বছৰেৰ মেয়াদে তাঁৰ জেল খাটতে হয়। জেলে থাকাকালে এই গান তিনি বচনা কৰেন। গানেৰ মধ্যে সাজন গাজীৰ নিম্নৰূপ বিবৰণ পাওয়া যায় :—

মোবসেদেৰ বাছৰ তলে

নাচাৰ সাজন বলে

ফজল কৰ আজিজেলগপফুল।

নামনি হালদাবেৰ গাতি

মেসে সোমপুৰ বসতি

জমা বাখি পাশ আউসে সোমপুৰ ॥

বড ভাই-এৰ নাম মাজমু

ছোট পাতলা মেজ সাজন

ছোট ভাই গিয়েছে মৰে।

সাজন বড গোনাগাৰ

সাত বছৰ মেয়াদ তাৰ

কষেদ হল দিনেৰ লড়াই কৰে ॥

সাজন গাজীৰ বসতি যে গ্রামকে 'মেসে' বলে উল্লেখ কৰা হলেছে বৰ্তমানে তা মেসিয়া নামে পৰিচিত। গ্ৰামটি ইছামতী নদীৰ একেৰাবে পশ্চিম ভীৰ সলগ্ন। ইহা বাহুড়িয়া থানাৰ অন্তৰ্গত। জানা যায় যে তখনকাৰ দিনে এতদ্ অঞ্চলে নানাবকম গান লোকেৰ মুখে মুখে ফিবত, লিখে বাখাৰ প্ৰবণতা সাধৰণ কৃষকেৰ মধ্যে ছিল না। সাজন গাজীৰ গাওয়া এই গান বা 'সাধবি' কাঁকড়াশুতি গ্ৰাম নিবাসী পৰাণ মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি শিখে নেন। পৰাণ মণ্ডলেৰ নিকট থেকে শিখে নেন বামচন্দ্রপুৰ গ্ৰাম নিবাসী সহবআলি মণ্ডল। সহবআলি মণ্ডলেৰ বৰ্তমান বয়স (১৯৭৪) প্ৰায় নব্বই বছৰ। তিনি তাঁৰ ২০। ২২ বছৰ বয়সকালে মুখে মুখে ফেৰা গান লিপিবদ্ধ কৰেছিলেন।

পুথিখানির নাম-পৃষ্ঠা বলে কিছু নেই। মাঝারি মোটা সাদা কাগজে নীল কালি দিয়ে লেখা। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ৫০১৬০ বছর আগে নীলের যে বড়ি কালি মুদির দোকানে পাওয়া যেত সেই কালিতে লেখা। কোথাও গাঢ় নীল, কোথাও হালকা নীল। কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা। পুথির আকৃতি ১১২"×১"। তার কোন কোন প্রান্ত পোকাকার খেয়েছে। উত্তর পশ্চিম কোণে জল পড়ে বহু লেখা মুছে গেছে। পুথির প্রথম দিকে দু'এক জায়গায় বাজারের সংক্ষিপ্ত হিসাব লেখা আছে। প্রথম দিকের লেখা দেখে বোঝা যায় যে সেটি পুথির মুখবন্ধ। প্রথম পংক্তি দেখে বোঝা যায় যে তার আগের পংক্তি ছিল। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ১৩২। শেষ দিক অসম্পূর্ণ বা খণ্ডিত। প্রথম থেকে কয়েকটি পংক্তির নমুনা :—

বোজা নামাজ বন্দেগীর মূল।

মোবসেদের জবানে শোন।

না থাকিবে পাপ গোন।

হেদেক দেলে কব দিন কবুল।

পন্নার হুন্দে এখানে সাজিরে দেওয়া হল, কিন্তু মূলতঃ পুথিতে গদ্যাকারে একটানা লেখা আছে এবং প্রতি মিলের সাথে দুটি দাগ দেওয়া রয়েছে। এর মুখবন্ধের বা ভূমিকার পব কাহিনী আরম্ভ। পুথির প্রায় প্রতি পৃষ্ঠার উপবিভাগে লেখা আছে “শ্রীশ্রীএলাহি ভরসা।”

পুথির ভাষা এক বকম দুর্বোধ্য। একান্তভাবে স্থানীয় আঞ্চলিক মৌখিক ভাষার সঙ্গে আমি ও প্রভাতবানু পবিচিত্র বলেই অনেক আল্লাসে পুথির পাঠোদ্ধার কব। এবং তাব কিছু মর্মার্থ উদ্ধার কব। সম্ভব হয়েছে। লেখক সহব আলি সাহেব যে নিভান্তই অল্প লেখা পড়া জানেন তা পুথির ভাষাদৃষ্টে সহজ অনুমান কব। যায়। বহু এছলামী ভাবপ্রবণ চিন্তার প্রকাশে এতে বাংলা, আরবী প্রভৃতি শব্দের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। বানানে প্রচুর অশুদ্ধি আছে। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার একেবারেই নেই। প্রায় সমগ্র পুথিখানি ত্রিপদী পয়ার হুন্দে বচিত। তবে চরণে সাজানো নেই।—একটানা লেখা একথা পূর্বেই বলেছি। একই শব্দ পব পব দুইবার ব্যবহারের পবিবর্তে ঐ শব্দের পাশে ‘২’ লিখিত হয়েছে। স্থানীয় শব্দের কয়েকটি নমুনা :—

যুতি

অর্থ

প্রকাবে

গে

..

গিবে

গামালি	”	গ্রামাঞ্চল
জোনামাত	”	প্রতিজন
কেগোর	”	কাকের
উব	”	উপুড
যোমা	”	যোঁয়। ইত্যাদি।

বহু পদের শেষে ‘ই’-কার আছে। যেমন,—পুবিচি, বন্দুকি, ইত্যাদি। কিছু কিছু ইংরেজী শব্দ বিকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যথা,—টোটা, ফয়ের, ছেপাই ইত্যাদি। ভাষার কিস্তি নমুনা :—

দৌড়ে এসে পূর্ব দিকে  
তলোয়ার মারিল ফিকে  
আশা করি রজিবুল্লার ছেরে।  
তেরিঙ্গ দে মারিল শুডি  
লান্ন লাহা কলমা পডি  
কোপ ধবিল লাঠিব উপবে।

বাংলা বহু শব্দের বিকৃত উচ্চারণ আছে। ভিত্তুমীরের ভাল নাম নিসার আলি। নিসার > মিসার > নেসার > মেসাব > মেছের আলি অগভ্রংশে ব্যবহৃত হয়েছে।

### সংক্ষিপ্ত কাহিনী

প্রাণপণ করে পুঁড়োর হাটখোলার এসে দুইটি গরু জবাই করা হল। পরে সকলে নদীর ধার ধরে লাউবাড়ির দিকে চলল।

লাউবাড়ির সাকের সরদার তিন গরু কোষবানি করে সুদৃভাবে সকলের খানা-পিনা দিলেন। তাবপব আবার আক্রমণ শুরু হল বজ্জের আওলাজে। বিপক্ষ বোদ্ধার নাম হরিদেব (বৃকদেব ?) তার ডান হাতে তলোয়ার বাঁ হাতে ঢাল। রজিবুল্লার শিরে নিষ্কিন্ত তলোয়ার, লাঠিব আঘাতে আহত হল। লাঠিব আঘাতে তাব মাথাখ বিরাট ক্ষত হল, পাঁজবার দুটো কাঠি ভেঙ্গে গেল,—তলোয়ার ছিটকে গিয়ে পড়ল দূরে। বহুলোক মারা পড়ল, বহু লোক দৌড়ে পালালো। জনৈক বোদ্ধা ব্রাহ্মণ পিপাসার পানি চাইলে, তাব গালে গাবা গোস্ত দেওয়া হল। হরিদেবের পক্ষে লাব্-সাব রক্ষী বাহিনী এল। গোলাম মাছুমেব ছবুমে তার ঘোড়া বেড়ে নেওয়া হল। সৈন্যগণ এবার ফিবে

এল সাড়াপোলে, সেখান থেকে বাবঘবে হলে নাবকেলবেডেব এসে জমা হল। আশ-পাশ থেকে ব্রাহ্মণদেব ধবে এনে মাথা মুড়িয়ে দাঙি বেখে দেওয়া হল। ব্রাহ্মণ বাড়ী এলে ব্রাহ্মণী অনেক তামাসা করে বল্ল,—(তাৰা) নামায পড়ে। তাতে তোমাদেব কি ক্ষতি? কেন কব্লে দাঙির জরিমানা? লক্ষ্মীছাড়া কৃষ্ণদেব পুড়োল করল পীবেব কারখানা। কাব কাহ থেকে দুর্বুদ্ধি পেয়ে বগড়া বাধিবে কৃষ্ণদেব গিয়ে বিবরণ জানাঅ কালীবাবুকে।

কালীবাবু সবাওখাল। (ধর্মবোদ্ধা স্থানীয়) সকলকে দমন কবার জন্য আলেকজান্ডার সাহেবকে হাজার টাকা নজরানা দিয়ে সিপাহী পাঠাবার ব্যবস্থা কবলেন। থানাখ থানায় বিপোর্ট গেল। বেলে অর্থাৎ বসিরহাটের দারোগাকে খবর দেওয়া হল। বাবাসতের ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে বন্দুকধারীগণ প্রস্তুত হল। আকেল মোল্লা এসে খবর দিল নারকেলবেডেব কেল্লায়। আলেকজান্ডার পুড়ার ঘাট পাব হয়ে এল কাঁকডাসুতি। কবেত মণ্ডল ছুটে এসে সে খবর দিল। বহু ছেলেমেবে ঘর ছেড়ে পালালো। এদিকে গোলাম মাসুমেব হুকুমে সকলে লাঠি নিয়ে প্রস্তুত হল। সিপাহীগণ গুলীৰ ডয় দেখিবে তিতুমীরেব দলকে যুদ্ধ থেকে নিবস্ত হতে বল্ল। কিন্তু ক্রুদ্ধ বোদ্ধাগণ কৃষ্ণদেবের উপর ভীৰভাবে ক্ষিপ্ত। তাৰা মৃত্যু পণ কবেছে। ধর্মের শক্তিতে মোরসেদ বা নেতাৰ হুকুম, তামিল করতে তারা প্রস্তুত। বন্দুককে তারা ভুজ্জ মনে কবে। ইসলাম প্রচাবক বিরাট ফকির (মেসেব আলি) নিসার আলিকে মাৰবে এমন সাধ্য কাব? তিনি বে মজাব হাজি।

নিসার আলি দিনেব যুদ্ধে জীবন দিবেছেন। সকলে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে এগিয়ে গেল। সিপাহীগণ বন্দুক চালালো। যুদ্ধ করল গোলাপ। সে যুদ্ধ বোবতব। সে যুদ্ধ কবল জামাত আলি জমাদাবেব সাথে। সে দৌড়ে গিৰে পডল ডডডডে নামক জাৰগায়। হানিফ দক্ষাদাবেবও সেই অবস্থা।

হতভাগ্য পবেত মণ্ডল গেল সাহেবেব সাথে। তিতুমীরেব দল তাকে দিল বেদম প্রহাৰ। কিন্তু সেই সাথে দাবোগাকেও তাৰা ধরে ফেলল। দাবোগা বলে,—আমার জাত মেরো না। আমি ব্রাহ্মণ আর তুমি সৈয়দ অর্থাৎ দুজনেই সমতুল।

হজরত হেসে বলে,—তোমাৰ জাত ভাঙলে আৰ গড়ে না।

মঙ্গলবারেব যুদ্ধে তিতুমীরেব পক্ষেব জয় হল। দবগ ভাৰা দাগাবাজি কবায় মল্লজঙ্গি খুব হুংখিত। ঘাট টাকাৰ লোভে পেযার আলি বেইমানি কবায় তার শক্তি দেওয়া হল।



যুদ্ধে পৰাজয়ের খবর শুনে কালীপ্রসন্নবাবু কৃষ্ণনগরে গিৰে বাজ-দববাবে জানালেন যে, তিতুমীরের লোকেবা কাষেত-বামনকে ধৰে মুসলমান কবছে। বাংলায় জারি কবছে আববীর মুসলমানী ভাবধাব। ময়জদি তাদেব সমস্ত খরচ যোগান দিচ্ছে। পুডোব কৃষ্ণদেব তাদেব দাডিপিছু আড়াই টাকা জবিমান। কবায় সকলে ক্ষিপ্ত হইছে।

কৃষ্ণদেব খাজনা আদায় কবতে লক্ষ্মীকান্ত পেবাদাকে পাঠালেন। দায়েম ও মুন্সুকটাদ খাজনা দিতে বাজী হল না। বাক্ষাধাকি থেকে মাঝামাঝি আবস্ত হল। দায়েম বন্দী হইবে আনীত হল কৃষ্ণদেবের নিকট। কৃষ্ণদেব বললেন, মেবে জখম কবে সবকে ধবে আন, সকলকে বাবাসতে চালান কবব।

দৌড়ে গিৰে কৃষ্ণদেবের লোকেবা কাদেবের বাড়ী ঘেবাও কবল। তখন সকাল। মোমিনগণ তখন নামায পড়ছে [এবপর পুথি খণ্ডিত।]

উপরোক্ত কাহিনী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে পুডোব জমিদার কৃষ্ণদেব বায় মুসলমান প্রজাগণের উপর দাডিৰ জন্ম মাথাপিছু আড়াই টাকা কব ধাৰ্য্য কবলে মুসলিমদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। স্বাভাবিকভাবে মুসলিমগণ ধর্মীয় আদর্শের কাবণেই একতাবদ্ধভাবে এইরূপ কব বা খাজনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইবে ওঠে। ধর্মীয় আদর্শের উপর হস্তক্ষেপ কবে যে খাজনা আদায়ের জন্য অমানুষিক অত্যাচার কবতে পাবে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ব্যক্তি তার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে এমন ঘটনা অস্বাভাবিক নহ। জমিদারী সামন্ততান্ত্রিক শাসন ছিল এব মূল প্রেরণ। এক সাধারণ নাগরিকের নিম্নলিখিত উক্তি থেকে দেখা যায় ;—

নামাজ পড়ে দিবা-বাতি

কি তোমার কবিল খেতি

কেনে কল্লো দাডিৰ জবিপানা।

খেপেছে যতক দেড়ে

কেউদেবের লক্ষি ছেড়ে

পুডোব কল্লো পীবির কারখানা ॥

[ লিপিপৃষ্ঠা ১০ ]

ব্রিটিশ বাজশক্তির সহায়ত। নিয়ে মুসলমানগণকে দমন কবাব জন্য কৃষ্ণদেবের প্রচেষ্টা ছিল। স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা থাকলে নিশ্চয়

তিতুমীৰ ও তার দলবলকে দমন করতে বন্ধুক-কামানের প্রয়োজন হত না। কৃষ্ণদেব স্থানীয় কিছু ভাড়াটে গুপ্তাব সাহায্যে তিতুমীৰকে দমন করতে গিয়ে বাববাব পবাস্ত হয়েছিলেন। এতদ্ অঞ্চলের মুসলিমগণের প্রাৰ্থ সকলেই কৃষ্ণক। সুতবাং কৃষ্ণদেব ওপৰ সাম্প্ৰদায়িক কৰ বা খাজনা আদায়ের কোঁশলে ইংবেদ্ধ ও তাদের সমস্বার্থবাদীবা যে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা কায়েম কবতে চেৰেছিল তাৰ কুফল সম্বন্ধে হিন্দু-কৃষ্ণকগণ ( যাৰা সাধাৰণ ভাবে নিম্ন-বৰ্গেৰ ) কিছু অনুমান কবতে পেৰে পূৰ্ণভাবে জমিদাৰ কৃষ্ণদেবকে সহায়তা কৰে নি এবং তিতুমীৰেৰ সাহায্যকাৰী মুসলিম কৃষ্ণকদিগেৰ বিবোধিতাও কৰে নি।

জমিদাৰ কালীপ্ৰসন্ন কিভাবে কৃষ্ণনগৰেৰ মহাবাজেৰ নিকট বিবৰণ দিছেন দেখা যাক,—

হদয়পুৰ ঘৰ তাৰ নাম তিতুমীৰ।

মক্কা-মদিনাৰ গিয়ে হইল হাজিৰ ॥ . .

নামাজ বোজা শেখাইত বাঞ্ছতে বলত দাড়ি।

দিনেৰ ভবিষ্য শেখায়ে কেৰে বাডি বাডি ॥

পাপ-গোনা বদকাম তাও কৰে মানা।

বাংলাৰ জাবি কৰে আববেৰ কাৰখানা ॥ .

না বুৰে যে কেইদেব কবিল বাহানা। .

কি দাড়ি আড়াই টাকা জরিপানা হয়।

সেইজন্য সবাজুলা বড খাপা হয় ॥

[ লিপি পৃঃ ২৮ ]

দৰিদ্ৰ ও নিপীড়িত কৃষ্ণকগণ যে আদৰ্শেৰ ভিত্তিতে জীবন-পণে সামান্য লাঠি-নিৰ্ভৰ কৰে যুদ্ধে ঝাঁপিৰে পড়েছে, এই গানে সেই ইসলামি আদৰ্শেৰ কথাই বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হৰেছে। দেশেৰ একপক্ষ যখন বৃটিশেৰ আশ্ৰয় নিৰে শুধু মুসলিম প্ৰজাৰ খাজনা আদাৰেৰ জন্য চৰম অত্যাচাৰে নিবত তখন অপৰ পক্ষে বৃটিশ বিতাড়নেৰ কথা উচ্চাৰণ কবলে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অমুসলিম জনসাধাৰণেৰ মনে কিৰূপ হতে পাবে তা সহজেই অনুমেৰ।

তিতুমীৰেৰ গান মূলতঃ আদৰ্শপৰাষণ যোদ্ধাগণেৰ বীৰত্ব গাথা। এ যুদ্ধ কাল্পনিক যুদ্ধ নহ। এ যুদ্ধেৰ বৰ্ণনাৰ তাই নেই বজ্জ, নেই যন্ত্ৰপুতঃবাৰি। সাধাৰণ মানুষেৰ সংগ্ৰাম বাজ্জন্তিৰ বিৰুদ্ধে। তাই এ সংগ্ৰামে সাধাৰণ মানুষেৰ নেই বথ, নেই সাৰথি। আছে শুধু ;—

গোলাম মাছুম হুকুম দিল      লাঠি কেয়া সব হাতে নিল  
ইট-পেটকেল ধবিল জোনাজাত ॥      [ লিপি পৃঃ ১৭ ]

ফিবে আবার বন্দুক ভাঙে      বাঘে যেমন...পড়ে  
গুলী পুৰতি নাহি দিল আব ।

গোলাপ গিৰে মাৰে লাঠি      লেগে গেল দাঁত কপাটি  
পিছনে পালালে চৌকিদাৰ ॥      [ লিপি পৃঃ ২১ ]

চুল ধৰে মাৰে ঝিকে      তিন চাব হাত পড়ে ফিকে  
আছাড় মেৰে চূৰ্ণ কৰে হাড় ॥      ( লিপি পৃঃ ২২ )

কাহিনীৰ সম্পূৰ্ণ অংশ ন। থাকোঁ মূৰ্খৰ পূৰ্ণ বিবৰণ পাওঁ মাৰ না।  
গীত রচয়িতা। সাজন, সাত বছৰ জেল খাটোৱাৰ সময়ৰে এই গান বচন। কবন।  
ভালপৰ পৰাণ মঙল সে গান শিখে নেন। তাঁৰ থেকে গ্রহণ কবন সহর  
আলি। সুতৰাং গানেৰ অনেক অংশ সংযুক্ত বা বিযুক্ত হ'ব পাৰে।  
তবু স্থানীৰ অশিক্ষিত মানুহেৰ মুখেৰ ভাষাৰ রচিত গানগুলি থেকে তিতুমীৰেৰ  
শাৱ-মূৰ্খৰ প্ৰতি সমৰ্থনেৰ প্ৰাণ-স্পৰ্শ পাওঁ। মাৰ ।

#### ৪। তিতুমীৰ ( নাটক )

১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্ৰীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়েৰ সম্পাদনাৰ “অভিনব”  
পত্ৰিকায় ( শাবদ সংকলন ) শ্ৰীশ্ৰামাকান্ত দাসেৰ লেখা “তিতুমীৰ” নাটক  
প্ৰকাশিত হ'বছে। নাটকটি দুটি পৰ্বে বিভক্ত। এব প্ৰথম পৰ্বে আছে  
পাঁচটি এবং দ্বিতীয় পৰ্বে তিনটি দৃশ্য। এটি সাতাত্ম পৃষ্ঠাৰ নাটক।

তিতুমীৰেৰ কৃষক-বিদ্ৰোহেৰ কাহিনী, স্বাধীন ভাৰত গড়াৰ ঐতিহাসিক  
মুহুৰ কথা, তাঁৰ অসাধাৰণ দেশ প্ৰেমেৰ কথা প্ৰভৃতি এ নাটকেৰ উপস্থাব্য।  
ধৰ্মেৰ নামে অধৰ্মেৰ যে কুৎসিত ৰূপ তাৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাৰ কথা  
নিষে এই যে নাট্যকাহিনী তা পৰিবেশন কৰা আপাততঃ প্ৰযোজনাতীবিক্ত মনে  
হলেও ইতিহাস হিসাবে তাৰ মূল্য অপৰিসীম। বস্তুতঃ কাহিনীৰ মধ্যে  
ঘটনাৰ মূল-ঐতিহাসিক দিকটি বক্ষিত হ'বছে। তিতুমীৰেৰ জীবনে  
প্ৰত্যক্ষভাবে সৰ্বপ্ৰথম আঘাত আসে পুঁডাৰ জমিদাৰ কৃষ্ণদেব বাঘেৰ দিক  
থেকে। নাট্যকাৰ সেদিক থেকে ভুল কবন নি। মুসলমান হ'ব ভণ্ড ধাৰ্মিক  
মোম্বা-মোম্বাভীগণেৰ বিৰুদ্ধে তিনি যে ভূমিক। নিষেছিলেন নাট্যকাৰ সেখানেও  
সত্য বস্তুকে এনেছেন। কিছু কাল্পনিক চৰিত্ৰ এই নাটকে আছে বটে কিন্তু  
তাতে মূল বস্তুবোৰ কোন ক্ষতি হয় নি। চৰিত্ৰ গুলি খুবই সাবলীল। ইংবেজকে

বিভাজিত কবে স্বাধীন ভাবত গড়াব যে প্রবল মানসিকতা। তিতুমীরের চরিত্রে প্রস্ফুটত তা প্রশংসার্হ। তাঁর আন্দোলন যে অসাম্প্রদায়িক ছিল সে তথাও নাট্যকার নির্ভীকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর আন্দোলন যে শুধু ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না এবং প্রথম দিকে তা ধর্মীয় মনে হলেও পরে যে তা ব্যাপক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে পর্য্যবসিত হয়েছিল তাও এ নাটকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাটকের শেষদিকে তিতুমীরের বাদশাহ হওয়ার দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অস্ত্রাখ্য তাঁর অসাধারণ চরিত্র নিম্নলিখ বলে প্রতিভাত হয়েছে।

নাট্যকার ছ'একটি নাম সম্ভবতঃ অনবধানভাবে অগ্রভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন, গোলাম মাসুমকে গোলাম মসুল বলা হয়েছে। আবাব মইজুদ্দিনকে মজলুদ্দীন বলা হয়েছে।

কাহিনী এত চিত্তাকর্ষক যে দর্শকগণকে শেষপর্য্যন্ত সমানভাবে আকৃষ্ট করে রাখে।

প্রবাদঃ—শহীদ তিতুমীরের নামে কবেকটি প্রবাদ ছড়ান আকারে প্রচলিত আছে। যথা—

১। গোলী খা ডালেগা।

২। আজ বেড়ুড়ের হাট,  
দাড়ি কেন্দ্রে দিখে কাট।

৩। সববে খেতে পড়,  
আব গোলা খেয়ে মব,  
মুকি আব আল্লা,  
বলতি দেলে না।

৪। নাবিকেল বেড়ে গাঁয়েতে  
একজন ছিল তিতুমীর,  
সবা-শবিসত তিনি  
কবিলেন জাহির।  
পাঁব-পষগম্ব কুতব-অলি

কিছুই তিনি মানিতেন না,  
এবার সাবলে ইংরেজ মাসু  
জানে বাথলে না । ১৬

৫। হেই বন্বন্ব ঘোবে লাঠি তিডুমীরের হাতে  
ফট্ ফট্ ফট্ গুলী চলে বাঁশের কেল্লা ফাটে ।  
(সিবাঙ্গ সাঁই : দেবেন নাথ)

৬। শালা, যেন তিডুমীরের লাঠি ।

---

## ত্ৰয়োদশ পৰিচ্ছেদ

### দাদাগীৰ সাহেব

ইসলাম ধৰ্মৰ প্ৰবৰ্তক হজ্জবত মোহাম্মদ মোস্তাফাৰ প্ৰথম খলিফা হজ্জবত আবু বকৰ সিদ্দিকীৰ পবৰ্ত্তী একত্ৰিশতম পুৰুষ পীৰ হজ্জবত আবু বকৰ সিদ্দিকী প্ৰায় দেড়শত বৎসৰ পূৰ্বে ১২৬৩ হিজ্জী-অব্দে অৰ্থাৎ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলাৰ ফুবফুবা শৰীফেৰ অন্তৰ্গত মিক্কা সাহেব মহল্লাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰেন। তিনি 'দাদাগীৰ সাহেব' নামে সমধিক প্ৰসিদ্ধ। হজ্জবত নবী নাকি-স্বপ্নযোগে তাঁৰ নাম বেখেছিলৈ আৰুজ্জাহ। তাঁৰ পিতাৰ নাম মাওলানা হাজী আবদুল মোস্তাদেৰ সাহেব এবং মাতাৰ নাম মোহান্না মহব্বতুন্নেছা খাতুন।

হজ্জবত দাদাগীৰ সাহেব মাজ নয় বৎসৰ বয়ঃক্ৰম কালে পিতৃহারা হন এবং শ্বেহশীলা মাতৃক্ৰোড়ে লালিত-পালিত হতে থাকেন। তিনি শৈশব থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্ৰ ছিলেন। তিনি ইংৰাজী শিক্ষা বৰ্জ্জন কৰেন। তিনি নাকি আল্লাহু তালাব ইচ্ছাৰ, তাঁৰ পূৰ্বপুৰুষ হাজী মাওলানা মোস্তাফা। মাদানী সাহেবেৰ স্বপ্নাদেশে এবং হজ্জবত নবীৰ নিৰ্দেশে ইংৰাজী পাঠগ্ৰহণ ত্যাগ কৰে আৰবী, ফাৰসী ও উৰ্দু ভাষাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰেন। প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰ সীতাপুৰ মাদ্ৰাসা, মহসীনীয়া মাদ্ৰাসা (হুগলী) ও নাখোদা মসজিদ-মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে শৰীফত বিষয়ে পাণ্ডিত্যেৰ অধিকাৰী হন। ১৩১১ বঙ্গাব্দে হজ কবতে গিৰে তিনি মক্কা ও মদিনা শৰীফে থেকে চল্লিশখানি হাদীস্ অধ্যয়ন কৰে প্ৰশংসা-পত্ৰ পান। তিনি কয়েকবাৰ মক্কাৰ হান এবং ইসলাম ধৰ্ম বিষয়ক বহু গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰেন। দেশে ফিৰেও তিনি বহু দ্বাৰ্ভ-গ্ৰন্থ পাঠ কৰে অগাধ পাণ্ডিত্য অৰ্জ্জন কৰেন। স্বদেশেৰ বিভিন্ন স্থানে পৰিক্ৰমণ-কৰে তিনি বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে ইসলাম ধৰ্মে দীক্ষিত কৰেন। 'হুগলী জেলাৰ ইতিহাস ও বঙ্গ-সমাজ' (তৃতীয় খণ্ড) নামক গ্ৰন্থে আছে যে নাকি প্ৰায় পাঁচ লক্ষ মুসলমান তাঁৰ শিষ্য গ্ৰহণ কৰেন। মাওলানা কহল আমীন সাহেব বলেন যে কত লক্ষ লোক দাদাগীৰ সাহেবেৰ শিষ্য নিৰ্গত হৈছে তা নিৰ্ণয়

কবা অসম্ভব। হজরত মাওলানা মোস্তাফা মাদানী নাকি এই ভবিষ্যত বংশধর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে সহস্র সহস্র লোক তাঁর খাঁটি মুবিদ হবেন।

শাস্ত্র-চর্চা ও আধ্যাত্ম-চিন্তা ছাড়াও তিনি বহু জনহিতকর কাজের মাধ্যমে তাঁর মহান-হৃদয়ের পরিচয় রেখে গেছেন। তিনি নিজ ব্যাঘে বহু দরিদ্র শিক্ষার্থীর আহাব ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া মাদ্রাসাব জন্ম শিক্ষক ও ছাত্রদের পাঠোপযোগী গ্রন্থ-সমন্বিত পাঠাগার তিনি নির্মাণ করে দেন। সুপেয় জলের জন্ম নলকুপ খনন এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ও তিনি স্থাপন করেন। তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্ম বাড়লা ছাড়া আসামের বহু স্থানেও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনি ‘আজ্জুমান ওয়াজিন’ নামে এক সংস্থা গঠন করে দেশে দেশে ধর্ম-প্রচারের ব্যবস্থা করেন। সামাজিক কলহ মীমাংসার জন্ম অনেক স্থানে তিনি সালিশী পবিষদ গঠন করে দেন। বাংলা ও আসামের আলেম বা মাওলানাদের নিষে স্বহস্তে গঠিত ‘জামায়েতে-উলেমা’ নামক একটি সংস্থার তিনি ছিলেন আজীবন সভাপতি। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের মধ্যে দলাদলির অবসান করে দৃঢ়বদ্ধ ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এই সংস্থার সহযোগিতা লাভের জন্ম দেশবন্ধু চিত্তবজ্রন দাস, ডঃ কিচলু, মৌলানা আজাদ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতা তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁর বহু গঠন-মূলক প্রচেষ্টার যা সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য তা হল ফুরফুরা শরীফের ‘ইছালে-হওয়ারা’ উৎসব। প্রায় আশী বৎসরের প্রাচীন এই উৎসবের বিবরণ দান প্রসঙ্গে ‘মিজান’ বিশ্বনবী সংখ্যা (১৯৭৫) লিখেছে,—

“ফুরফুরা শরীফের ইসালে সওয়ারায়ে অভূতপূর্ব জনসমাবেশ। প্রতি বছরের ঠায় এ বছরও ফুরফুরার বার্ষিক জলসা ২১, ২২ এবং ২৩শে ফাল্গুন অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হইতে দৈনিক ২২।২৫ খানি বাস ঐ তিনদিন জলসার যাত্রীগণকে লইয়া যাতায়াত করে। এবাবে ঐতিহাসিক জনসমাবেশ হয়। . . . বাংলাদেশ হইতে একটি বিশেষ ট্রেন শিবালাদহে আসে। . . . এ বছর সর্বাধিক লোক সমাগম হয় বলে জানা যায়।”

বাংলা ছাড়া আসাম এবং ভারতের অন্যান্য বহুস্থান থেকে লক্ষ লক্ষ লোক এই উৎসবে যোগদান কর্তে আসেন। দাদাপীর সাহেবের সহকর্মী ও শিষ্য মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে লিখেছেন, “হজরত পীর সাহেব ইছালে-সওয়ারা উৎসবে স্বদেশী-বিদেশী সমাগত লোকদের আহাবাদি সর্বপ্রকার ষড়্ধের ব্যবস্থা করতেন ও সর্বত্র ঘুরে সকলের অনুবিধা দূর

করতেন। সময়ে সময়ে নিজ-হাতে কাঠ নিবে যেতে দেখে শত শত মাওলানা কাঠ কাঁধে নিবে তাঁর পিছু পিছু ছুটতেন। তিনি একপ্রকার সারাদিন এমন কি অর্ধরাত্রি পর্যন্ত আহাৰের কথা ভুলে যেতেন। ১১৭৩ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকাৰ মাসউদ আৰ বহমানও লিখেছেন, “ইসালে-সওয়ার উৎসব ‘সওয়ার’ হাসিল বা পুণ্যার্জনের উৎসব।”

দাদাপীৰ সাহেবের অসাধারণ জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে মাওলানা কহল আমিন লিখেছেন,—তাঁর সভাতে ২০ হাজার থেকে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হত। .....হজবত পীৰ সাহেব যখন শেষবাবে বসিরাহাট বান, তখন লক্ষাধিক লোক তাঁর অভ্যর্থনার জন্ত বসিরাহাটের বাস্তা-ঘাট পূর্ণ কবে ফেলেছিল। তিনি কোথাও ধর্মালোচনা করবেন জানতে পাবলে চল্লিশ-পঞ্চাশ ক্রোশ দূর থেকেও লোক পতঙ্গের দ্যাব ছুটে আসত। ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, গুণী, মানী, আমির, নবাব, মন্ত্রী, মাওলানা, মৌলবী, মুন্শী, মাফাঁব, পণ্ডিত সকলেই তাঁর দর্শন ও দোয়াব প্রার্থী। সহস্র সহস্র হিন্দু-মুসলমান তাঁর নিকট থেকে ভেলপড়া নিতে মাতোয়ারা। তাঁর অমায়িক ব্যবহার এবং জ্যোতির্ময় চেহারা দেখে দূর-দূরান্ত থেকে আগমনের কষ্ট সকলে ভুলে যেত।

মাসউদ আৰ বহমান সাহেব লিখেছেন,—বিবাট ও অসাধারণ প্রভাবশালী ধর্মপ্রচাবক ছিলেন তিনি। বাংলা ও আসামের লক্ষ লক্ষ মানুষকে তিনি পথ দেখিয়েছেন; কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, বিভ্রান্তি ও হতাশার্লিষ্ট তৎকালীন মুসলমান সমাজকে সুস্থ করবার চেষ্টা কবেছেন। এই মহান পীৰ ও কর্মবীর প্রায় একশত বৎসর বয়সে ১৩৫৮ হিজরী ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ শুক্রবারে এলেকাল কবেন।

হজবত দাদাপীৰ সাহেবের পূর্বপুরুষগণের বিবরণ ঐতিহাসিক বটে। তাঁর পূর্বতন পঞ্চদশ পুরুষ হজবত মাওলানা মনসুব বাগদাদী এ দেশের ইতিহাস-খ্যাত। ৭৯৬ হিজরীতে সুলতান গিন্নাসুদ্দীন যখন ভাগীবথী নদীর তীরবর্তী স্থান অধিকারে অভিলাষী হন তখন বাংলার ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ভূস্বামী। তাবা ছিল বিদ্রোহী। তাদের দমন কববার জন্ত সুলতান গিন্নাসুদ্দীন সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। সেই সাথে তিনি প্রেরণ কবেছিলেন বড় বড় ওলি। তিনি হজবত শাহ সুফী সুলতানকে একদল পবাক্রমশালী সৈন্য দিবে বঙ্গদেশের দিকে পাঠিয়েছিলেন। হজবত শাহ সুফী সুলতান তাঁর সৈন্যদলকে গুভাগে বিভক্ত কবে তিনি স্বয়ং একদল সৈন্যসহ পাণ্ডুরা অভিমুখে



বাজা কবেন এবং অশ্রু দলকে সেনাপতি হজবত শাহ হোসেন বোখারির নেতৃত্বে “বালিয়া-বাসন্তী” অভিযুখে প্রেরণ করেন। এই শেষোক্ত দলেব সঙ্গেই ফুবুফুবাব হজবত দাদাপীর সাহেবের পূর্বপুরুষ হজরত মাওলানা মনসুব বাগদাদীও ছিলেন।

বালিয়া-বাসন্তীর বান্দী বাজার সঙ্গে তাঁদের ঘোবতর যুদ্ধ হব। সে যুদ্ধকথা এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী। যুদ্ধ শেষে মাওলানা মনসুব বাগদাদী ও অপর তিনজন মুসলমান সৈন্য পলায়নবত রাজ-সৈন্তের পশ্চাদনুসরণ কবে ‘কাগমাবী’ নামক মাঠে যুদ্ধে শহীদ হন। সেনাপতি সে সংবাদ পেযে তাঁদের স্মৃতদেহ ‘বালিয়া-বাসন্তী’-তে আনিযে দফন কবতঃ স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করান। বালিয়া-বাসন্তীতে মুসলমানগণের গোরব প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানকাব নাম করণ হর ফুবুফুরা শরীফ ২৭।

বস্তুতঃ হজবত দাদাপীর সাহেবের সমগ্র জীবন হল বিশেষভাবে তাঁব অসাধারণ কীর্তিকলাপের জীবন। সুতবাং তাঁর সম্পর্কে জানতে হলে সেই সব কার্যাবলীর পবিচর পেতে হবে। বলা বাছল্য, তাঁব অসাধারণ কীর্তিকলাপপূর্ণ (যাকে অলৌকিক বলা যায়) কথাতেই কয়েকখানি জীবনী গ্রন্থ লিখিত হয়েছে।

দাদাপীর সাহেবের জীবনী ও তাঁব অলৌকিক কীর্তিকলাপের বর্ণনা এ পর্যন্ত জাত তিনখানি পুস্তকে পাওয়া যায় :—

১। ফুবুফুবাব হজবত দাদাপীর সাহেব কেবলাব বিস্তারিত জীবনী

: হজবত মাওলানা কহল আমিন সাহেব

২। ফুবুফুবাব শবীফেব ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী

: গোলাম মোহাম্মদ ইব্রাহিম

৩। ধন্য জীবনের পুণ্য কাহিনী : আব্দুল আজিজ আল্ আমীন

তাছাড়া হুগলী জেলাব ইতিহাস ও বঙ্গ-সমাজ নামক গ্রন্থে দাদাপীর সাহেবের কথা বিবৃত হযেছে।

হজরত মাওলানা কহল আমিন সাহেব রচিত পুস্তকখানি অধুনা হস্তাপ্য।

“ফুবুফুবাব শবীফেব ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী” গ্রন্থেব রচয়িতা গোলাম ইব্রাহিম তাঁব পুস্তকে লিখেছেন যে তিনি সেখ সাাদীর জীবনী প্রণেতা বরুঝিরা (টাংগাইল) দাবছে নেজমিরা দাবল উলুম ছিদ্দিকিষা মাদ্রাসাব মোদারবেছ।”

৭"×৫" আকৃতিবিশিষ্ট মুদ্রিত পুস্তকখানিৰ পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১০। ইহা সুচীপত্ৰ, উৎসৰ্গ, ভূমিকা ও জীবনী এই চাৰটি প্ৰধান অঙ্গে বিভক্ত। 'প্ৰকাশক মদিনা বুক ডিপো, ১৮নং বৰীলক্ষ সৰণী, কলিকাতা-১। দাম ৩ টোকা ৫০ পয়সা। প্ৰথম প্ৰকাশকাল জানা যায় না। দ্বিতীয় সংস্কৰণকাল ১৩৭৩ সন। এই পুস্তক বচনাৰ জন্তু গ্ৰন্থকাৰ অবশ্য হজবত কহল আমিন সাহেবেৰ পুস্তকখানিৰ সাহায্য লওযাব জন্তু কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰেহেন।

এই গ্ৰন্থখানি আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যে বচিত। এতে আছে বহু আৱৰী-ফাবসী শব্দ। আৱৰী হবঁকে কবেকটি উদ্ধৃতিও সংযুক্ত হৈছে। গ্ৰন্থখানি পাঠকালে কোন কোন স্থানে আৱৰী-ফাবসী শব্দাধিক্যে সজল গতিৰ অভাব অনুভূত হয়।

আবদুল আজীজ আল-আমীন সাহেব ভিনজন পীবেৰ আশ্চৰ্য্য কৈয়ামতিৰ কথা নিবে কতকগুলি লোককথা তাঁৰ গ্ৰন্থে গ্ৰথিত কৰেহেন। উক্ত পুস্তকে জনাব আবুবকৰ সিদ্দিকী শীৰ্ষক অংশে চোন্ধাট লোক-কথা লিপিবদ্ধ আছে।

আমীন সাহেবেৰ পুস্তকখানিৰ প্ৰথম সংস্কৰণকাল ১৩৬২ সালেৰ ১লা ফাঙ্কন। ইহাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণকাল ১৩৬৩ সালেৰ ১লা বৈশাখ। মূল্য মাত্ৰ দু'টোকা।

গ্ৰন্থকাৰ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী এবং অনেক উপন্যাস, সমালোচনা গ্ৰন্থ ও জীবনী গ্ৰন্থেৰ বচয়িতা। কলিকাতাৰ কলেজ ক্লাট বাজাবে অবস্থিত 'হবক প্ৰকাশনী' থেকে মূলভে তিনি অনেক মূল্যবান সংস্কৰণ প্ৰকাশ কৰেহেন। তিনি 'কাফেলা' নামক মাসিক পত্ৰিকাৰও সম্পাদক-পৰিচালক।

হজবত দাদাপীৰ সাহেবেৰ জীবনকথাভিত্তিক উপবোধ্ত সমস্ত গ্ৰন্থে তাঁৰ মাহাত্ম্য কথা প্ৰত্যক্ষতঃ লিখিত হলেও পবোধ্ততঃ আল্লাহতালার মাহাত্ম্যকথাই প্ৰচাৰিত হৈছে। ইহা নিছক জীবন কথা বটে। সবস সাহিত্য সৃষ্টিৰ প্ৰচেষ্টা বলে মনে হয়। অবশ্য ইহা পাঠ কব্লে মহাপুৰুষেৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰ উদ্বেক হয়।

বঙ্গে বিংশ শতাব্দীতে জীৱিত পীৰগণেৰ মধ্যে হজবত দাদাপীৰ সাহেবই সৰ্বপাৰ্শ্বক প্ৰসিদ্ধ পীৰ ছিলেন। তাঁৰ জীৱিত-কালেই সম্ভবতঃ তাঁৰ জীবনী ৰচিত হৰেছিল। এ বিষয়ে হজবত তিনিই একমাত্ৰ পীৰ সাহেব। এন্তেকালেৰে

পর অত্যাশ্চর্য পীরগণের ত্রাণ তাঁর নামে কোন কাল্পনিক দরগাহ বা নজবগাহ সৃষ্টি হয় নি।

হজরত দাদাপীর সাহেবের অলৌকিক কীর্তি-কলাপ সম্পর্কীয় যে সব লোককথা পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাদের শিরোনামার একটি তালিকা নীচে প্রদত্ত হল।

গোলাম মহম্মদ ইব্বাছিন বচিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ লোককথাসমূহ নিম্নলিখিত শিরোনামায় চিহ্নিত করা যেতে পারে :—

- ১। ইহালে হুওয়্যাবের দিনে দাদাপীরের আদেশ
- ২। ফৎওয়্যাব ক্রটি আবিষ্কার
- ৩। জিজ্ঞাসার পূর্বেই উত্তর প্রাপ্তি
- ৪। সুদখোরের জন্ত অনাবৃষ্টি
- ৫। কম্পঙ্কর আসিবার ভবিষ্যৎ বাণী
- ৬। আটটি প্রশ্নের জবাব
- ৭। ওয়াজেব মধ্যেই মহলাব জওয়্যাব
- ৮। বাক্যহীনের মুখে বাক্য
- ৯। পীরের আদেশে নূর লাভ
- ১০। স্বপ্নে পীরের দর্শনলাভ
- ১১। পীরের দ্বাশ মবণাপন্ন পুত্রের সাক্ষাত লাভ
- ১২। ওয়াজেব মধ্যে ওয়াএজ্জদিন সাহেবের প্রশ্নের জবাব
- ১৩। অতিথির উপস্থিতির সংবাদ পূর্বেই পীরের জানা
- ১৪। বসিবহাটের জনসভায়
- ১৫। আবহুল হাই-এর জন্ত ঔষধ
- ১৬। আফছবদিন সাহেবের অভিজ্ঞতা
- ১৭। জনৈক কটি বিক্রেতার অভিজ্ঞতা
- ১৮। ত্রিপুরার আবহুল মজিদ সাহেব কথিত গল্প
- ১৯। পাহাড়পুরের কথা
- ২০। নোয়াখালির আবহুল ছামাদ কথিত গল্প
- ২১। ভবানীগঞ্জের আজিজার বহমান কথিত গল্প
- ২২। আজিজার সাহেব কথিত দ্বিতীয় গল্প
- ২৩। রাইপুরার আশরাফউদ্দিন পণ্ডিত কথিত গল্প

- ২৪। কুশখালিৰ হানিফ মুনশীৰ কথা
- ২৫। সাযেস্তানগবেৰ অন্ধ আশরাফ আলিৰ কথা
- ২৬। খবিবদ্দিন সাহেবেৰ বাকুশক্তি প্ৰাপ্তি
- ২৭। সাপেৰ মাধ্যমে পাৰবা-বাচ্চা প্ৰত্যাবৰ্তন
- ২৮। জাৰনা মাজেৰ নীচে টাকা-গহনা
- ২৯। পীবেৰ লাঠি দৰ্শনে বাঘেৰ ভয়
- ৩০। চক্ষুহীন। কণ্ঠ্যৰ চক্ষুপ্ৰাপ্তি
- ৩১। হাত বুলাইবা চক্ষু পৰিষ্কাৰ
- ৩২। মোষাজমপুবেৰ সুলতান আহম্মদ সাহেবেৰ অভিজ্ঞতা
- ৩৩। স্বাস বোগ হইতে মুক্তি
- ৩৪। হেদাওতুল্লাহ সাহেবেৰ অভিজ্ঞতা
- ৩৫। চোখেৰ দীপ্তি যেন ডে-লাইটেৰ আলো
- ৩৬। বাদ দেওয়া শব্দ ধৰা পড়িল
- ৩৭। না চাইতেই হবক দান
- ৩৮। অন্তৰ্য্যামী দাদাপীৰ
- ৩৯। চিকিৎসকেৰ ঔষধ লইবাব পূৰ্বেই বোগমুক্তি
- ৪০। যিষেৰ পোলাও কথা
- ৪১। মুৰ্ছ। বোগ হইতে মুক্তি
- ৪২। আজমীৰে দাদাপীবেৰ সহায়তাৰ খাজা সাহেব দৰ্শন
- ৪৩। আবদুল মা'বুদ ছাহেবেৰ অভিজ্ঞতা
- ৪৪। " " " আবে। অভিজ্ঞতা
- ৪৫। হাজি আবদুল মইন সাহেবেৰ বল। কাহিনী
- ৪৬। পীবেৰ দোষাৰ চাকুবী।
- ৪৭। পাবনাৰ মৌলবী ডাঃ সমছোল আজম সাহেবেৰ বৰ্ণনা
- ৪৮। ডাঃ আজম সাহেবেৰ দ্বিতীয় বৰ্ণনা
- ৪৯। " " " তৃতীয় "
- ৫০। " " " চতুৰ্থ "
- ৫১। " " " পঞ্চম "
- ৫২। " " " ষষ্ঠ "
- ৫৩। " " " সপ্তম "
- ৫৪। " " " অষ্টম "

৫৫।	"	"	"	নবম	"
৫৬।	"	"	"	দশম	"
৫৭।	"	"	"	একাদশ	"
৫৮।	"	"	"	দ্বাদশ	"
৫৯।	"	"	"	ত্রয়োদশ	"

আবদুল আজীজ আল আমীন সাহেব তাঁর "ধনুজীবনের পুণ্য কাহিনী" পুস্তকে নিম্নলিখিত শিবোনামাষ চৌদ্দটি লোককথা লিপিবদ্ধ কবেছেন,—

- ৬০। বিশ্বমায়ের ভালবাসায়
- ৬১। পরিচয়ের স্বকিকিৎ
- ৬২। গোস্বামির ক্যাসাদ
- ৬৩। আগুন লাগিল সব ঠাই
- ৬৪। জাফরনামাজের নীচে হাজার টাকা
- ৬৫। কৈবর্ত শিশুর বিপদ মুক্তি
- ৬৬। অজ্ঞাত প্রেমের জবাব দান
- ৬৭। প্রতাপ সেনের বোগমুক্তি
- ৬৮। সবকারী পদে প্রতাপচন্দ্র
- ৬৯। ইসলামের ছায়াতলে
- ৭০। পৌৰ সাহেবের আদেশ
- ৭১। ব্যাস মুখে আবদুল মোমেন
- ৭২। আল্লাব আবাবনাষ আবদুল মোমেন
- ৭৩। বিকল হল কলকবজা

মাওলানা কহল আমীন সাহেব বচিত পুস্তক আমার হস্তগত না হওয়ায় অন্ত্যস্থ লোক-কথামুলির উল্লেখ এখানে কর। সম্ভব হল না।

উপবোক্ত লোক কথার কোন কোনটি স্থান বিশেষে দ্বার উল্লেখ হয়ে থাকতে পারে; তবে মূল বক্তব্য একই থাকলেও বর্ণনার তারতম্যে সাদেব মধ্যকার গল্পাদেব পার্থক্য লক্ষণীয়। এই সব লোক-কথা এখানে সংগ্রহিত কবা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, শুধু পৌৰ-সাহিত্যের লোক-কথাসমূহ পুস্তক আকারে প্রকাশ কবলে তা বিঘাট আবতন বিশিষ্ট হবে এবং বাংলা লোক-সাহিত্যে তা হবে এক বিশ্লকব সংযোজন।

## চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

### নির্ধীন শাহ

পীর হজরত নির্ধীন শাহ বাজী নামে যে ফকির বা দরবেশ বাবাসত মহকুমার কাজীপাড়া অঞ্চলে অবস্থান কবেছিলেন, তাঁর কোন সঠিক জন্ম বিবরণাদি জানা যায় না। এতদ্ অঞ্চলে তিনি সাধারণ ফকিরের বেশে ঘুরে বেড়াতেন এবং যেখানেই কোন অমঙ্গলের ছায়াপাত দেখা যেত, তিনি সেখানে ছুটে যেতেন। সেখানে তিনি আর্ডমানুষের সেবার নিজেই নিয়োজিত কবতেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে তিনি দ্বন্দ্ব-শূন্য হয়ে সেবা কবতেন। তিনি আজীবন এতদ্ অঞ্চলে অবস্থিতি কবেছিলেন। মৃত্যুর পর ভক্তগণ কাজীপাড়ার তাঁর মরদেহকে কবরস্থ কবেন।

ভক্তসাধারণ তাঁর সমাধির উপর ইটের একটি স্তূপ দরগাহ গৃহ-নির্মাণ কবে দিবেছিলেন। দরগাহের পাশে কিছু মোসুমী ফুলের গাছ চার কাঠা পরিমাণ জায়গাটিকে মনোরম করে রেখেছে। ভক্তগণ দরগাহে পীরের নামে জিহাবত বা আত্মার শান্তি কামনা করে ধূপ-বাতি প্রদান করেন। অনেকে এখানে শিবনি বা মানত দিবে থাকেন।

পীর নির্ধীন শাহের নামে তাঁর দরগাহের সামনের বাস্তাটির নাম হবেছে নির্ধীন শাহ বোড। বাস্তাটি প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। এই দরগাহের সেবায়েত হলেন জনসাধারণ। এখানে বাৎসরিক কোন মেলা হয় না। পীর হজরত একদিল শাহের দরগাহ এই অঞ্চলেই অবস্থিত। পীর হজরত একদিল শাহের যথেষ্ট প্রভাব থাকা সত্ত্বেও পীর হজরত নির্ধীন শাহ একক বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত।

পীর হজরত নির্ধীন শাহের নামে বচিত কোন সাহিত্য বা কোন পুথির সন্ধান পাওয়া যায় না। এমন কি কোথাও তাঁর নামোল্লেখ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় না। কোন শতাব্দীতে তিনি অবস্থান কবেছিলেন তাও অজ্ঞাত। তাঁর অলৌকিক কীর্তিকলাপের নিরূপ লোক-কথাটি এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে ;

## ১। কীট, না বেদানার দান।

এক ব্যক্তি কোন এক সময় কি এক কঠিন বোগে আক্রান্ত হয়ে একেবারে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। তিনি বহু চেষ্টা করলেও বোগমুক্ত হতে পাবেন নি। মন্ত্রণায় কাতব হয়ে পাগলের মত আত্মনাদ করতে করতে রাত্ৰাষ বাস্তায় চলতে থাকেন। একস্থানে তিনি এক ফকিরের সম্মুখীন হন। ফকির তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। তিনি ফকিরের সংবেদনশীল কথায় অভিভূত হয়ে তাঁর অসহনীয় স্বাতন্যের কথা প্রকাশ করেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে ফকিরের শরণাগত হন এবং রোগমুক্ত হবে দেবীর জন্য কাকুড়ি-মিনতি করতে থাকেন। এই ফকির আবু কেহ নন,—ইনিই পীর হজবত নির্ধিন শাহ্ রাজী।

পীর নির্ধিন শাহ্ উক্ত আত্মব্যক্তির সমস্ত কথা শুনে নিলেন। তিনি আত্মব্যক্তিকে পথের ধারে পড়ে থাকা একটি মৃত কুকুরের নিকট ডেকে নিয়ে গেলেন। মৃত কুকুরটির গায়ের ক্ষতস্থানটি পচে-গলে গিয়েছিল। দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়ানোও কর্তব্য। গলিত স্থানে কুৎসিত-দর্শন বহু কীট ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পীর সাহেব বললেন, “—এ যে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—কুকুরের ঐ গলা জামগাষ ঐ যে দেখা যাচ্ছে,—তুলে নিয়ে খেতে পারিস্? তা হলেই তোব রোগ সেরে যাবে।”

ঐ ব্যক্তির মনে কি যেন ভাবের উদয় হল। তিনি তৎক্ষণাৎ গভীর শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে বলে উঠল,—“নিশ্চয় পারুব।”

তিনি অবিলম্বে এগিয়ে গিয়ে পচা দুর্গন্ধ মাংসের উপর চলন্ত কতকগুলি কীট মুঠোয় তুলে নিয়ে সেই ফকিরের স্মরণ করতে করতে কয়েকটি কীট মুঠের মধ্যে ফেলে দিলেন। কিন্তু একি। পর মুহূর্তে তিনি মুঠের মধ্যে সুপক্ক বেদানার গন্ধে ভরপুর অফুৰন্ত বসের স্বাদ পেয়ে স্তম্ভিত হলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি হাতের মুঠোর বাকী কীটগুলির দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, সেগুলিও আবু কীট নেই,—সেগুলি বেদানার পবিপক্ক লাল টকটকে দান। তিনি বিস্ময়ে অসাধারণ সেই ফকিরের পা জড়িয়ে ধরার জন্য পিছন ফিরে দেখেন যে ফকির ইতিমধ্যেই অদৃশ্য হয়েছেন।

বেদনাত্ত চিন্তে তিনি বাড়ীতে ফিরে এলেন। তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যে বোগমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন।

স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশীল, অনেকেই তাঁর দরগাহে শিবনি এবং মানত প্রদান করে থাকেন।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

### পাঁচগীর

পূর্ববঙ্গে গাজীর গীত থেকে পাঁচজন পীরের নাম পাওয়া যায় : তাঁদের নাম যথাক্রমে গিষাসুদ্দিন, সামসুদ্দিন, সেকেন্দার শাহ, বড় খাঁ গাজী ও কালু। এই পাঁচজন পীরকে নিয়ে পাঁচ-পীরের কল্পনা করা হইবে। এঁরা সকলেই ইতিহাস বিখ্যাত গাজী। বারাসত মহকুমার রঙ্গপুর, সেলার-হাট, জালসুখা প্রভৃতি গ্রামে পাঁচ পীরের নামে পীরোত্তর জমি আছে দেখা যায়।<sup>৪৪</sup> সুবর্ণ গ্রামে এই পাঁচ পীরের নামে একস্থানে পাঁচটি দরগাহ বা মন্দির আছে। জীহট্ট শহরে তাঁদের কবরস্থান “পাঁচ পীরের মোকাম” বলে পরিচিত।<sup>৪৫</sup>

দুস্তর নদী পথে নৌকা ছাড়বার সময় যখন দাঁড়ি-মাঝি নৌকার যথাস্থানে উপবিষ্ট হয়ে দাঁড়ে ও হা'লে হস্তার্পণ করে ভক্তিবিনীত বীর গভীরভাবে ডাকে,—

আমবা আহি পোলাপান, গাজী আছে নিখাবান।

শিবে গঙ্গা দরিয়া, পাঁচ পীর বদর বদর ॥

ভখন মনে হয় শুধু গাজী এবং বদর নয়, নাবিকের আরাধ্য দেবতা আরো আছেন : গঙ্গাদেবী—তিনি শুধু হিন্দুর সম্পত্তি নন, আর আছেন পাঁচ পীর। [যশোহর-খুলনার ইতিহাস : ১ম খণ্ড : চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : পৃষ্ঠা ৪১৮—৪২১]

পূর্ববঙ্গে যে গাজীর গীত প্রচলিত আছে, তার ভিতর পাঁচ পীরের কথা পাই ;—

পোড়া রাজা গরুেসদি,

তাঁর বেটা সমসুদি,

পুত্র তাঁর সাই সেকেন্দর।

তাঁর বেটা বরখান গাজী,

খোদাবন্দ মুলুকের বাজী,

কলিযুগে যাব অবসব ;

বাদশাই ছি'ডিল বঙ্গে,

কেবল ভাই কালু সঙ্গে,

নিজ নামে হইল ককির।<sup>৪৬</sup>



ভাৰতবৰ্ষৰ অনেকস্থানে পাঁচ-গীৰ আছেন। সত্ৰ লোক নিজে সে সব স্থানে পাঁচ-গীৰ হৰ্ষেছেন। বজ্জৰ পাঁচ-গীৰ—গৰসউদ্দিন, সামসুদ্দিন, সেকেন্দৰ, গাজী ও কালু। কিন্তু গাজীৰ গীতে এদের সহিত যে সম্বন্ধ দেখা যাচ্ছে, তাৰ সহিত ইতিহাস মেলে না। কেহ কেহ অনুমান কৰেন .. গৰসউদ্দিন বন্ডে দিল্লীৰ বাদশাহ গি়াসুদ্দীনকে বুঝাচ্ছে কিন্তু তাঁৰ সহিত সামসুদ্দিনেৰ কোন সম্বন্ধ নেই। বাজালাৰ এক বিখ্যাত গি়াসুদ্দীন ছিলেন, কিন্তু তিনি সেকেন্দাৰ শাহেৰ পুত্র। ... সেকেন্দাৰেৰ পুত্র গাজী কে ছিলেন বুঝা যায় না। মোট কথা পাঁচজনেৰ মধ্যে সামসুদ্দিন ও সেকেন্দাৰকে বিশেষৰূপে চিনতে পাবা যায়। সামসুদ্দিন, বজ্জৰ প্রথম স্বাধীন পাঠান শাসনকর্তা ; তাঁৰ সময়েই শ্রীহটে শাহজালালেৰ আগমন হৰ্ষেছিল ।

ঐৰোদশ শতাব্দীৰ শেষভাগে জাফৰখাঁ গাজী ত্ৰিবেণীতে এসেছিলেন। .... তাঁৰ এক পুত্ৰেৰ নাম বৰখান গাজী ; তিনি স্থানীয় বাজাকে পৰাস্ত কৰে তাঁৰ কন্যাকে বিবাহ কৰেন। সেই বৰখান গাজী ও আমাদেৰ প্রস্তাবিত “গাজীৰ গীতেৰ” বৰখান গাজী এক ব্যক্তি বলে মনে হয় না। কাবণ জাফৰ খাঁৰ মসজিদেৰ পাবসিক লিপিতে যে তাৰিখ আছে, তাতে ১২৯৪ খৃষ্টাব্দ হব , কিন্তু সে সময় যশোহৰ জেলাৰ মুকুট বাজা প্রায়দূৰ্ভূত হন নি। ৫৩

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

### ফাতেমা বিবি

সমগ্র ইসলাম জগতের সমুদয় নাবীৰ শিবোভূষণ পীরানী হজরত ফাতেমা বোহবা ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ বসুলউল্লাহু (সাঃ) এর কনিষ্ঠা নন্দিনী। তাঁর মাতা ছিলেন মহামাননীয়া উম্মুল মোমেনিন খাদীজাতুল কোব্বা। তাঁর জন্মস্থান “হয়যব বনি হাসেম”—এ অবস্থিত। আজকাল ঐ স্থানে “শাশিদা ও ছাবকল্লাবেল” মহল্লা বিবাজিত। তিনি ছিলেন আদর্শ কন্যা, আদর্শ পত্নী ও আদর্শ জননী। তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা, দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ, পিতৃভক্তি ও স্বামীভক্তি ছিল অতুলনীয়। তাঁর স্বামীর নাম শেবে খোদা হজরত আলী। জগতবিখ্যাত তাঁর দুই পুত্রের নাম—হজরত ইমাম হাসান ও হজরত ইমাম হোসেন। হজরত বসুল কবিন্ন (সাঃ) এর চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম এবং হজরত খাদিজাতুল কোব্বা (বাঃ-আঃ) এর ষাট বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁর জন্ম হয়। ঐতিহাসিকগণের মতে ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদের নবুযত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে হজরত ফাতেমার জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয় হিজ্ৰী একাদশ সনের ৩বা বমজান তারিখে<sup>৬৬</sup>। কাবো মতে তাঁর জন্ম তারিখ ৬১১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জমাদিসল আশ্বেরের পবিত্র জুম্মার দিন এবং মৃত্যুর দিন দ্বাদশ হিজ্ৰীব ৩বা বমজান<sup>৬৭</sup>। পীরানী হজরত ফাতেমা বোহবার সন্তান-সন্ততি মাধ্যমেই হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর বংশধার বন্ধিত হয়েছিল।

হজরত ফাতেমা বোহবা খুব সম্ভবতঃ আবব জগতের বাইবে কোনদিন যাননি। তিনি ভাবভবর্ষে কখনও আসেন নি। তবু তাঁকে মুসলিম-জগতের সকলেই সমূহ শ্রদ্ধা করেন। বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে তাঁর নামে কাল্লনিক দরগাহ্ আছে। বাবাসত থানার খুড়িগাছি মৌজার সহবা নামক গ্রামে হজরত ফাতেমা বোহবার যে কাল্লনিক দরগাহ্ আছে তা ইট দিয়ে তৈরী। এতদ্ অঞ্চলে তিনি বিবি ফাতেমা নামে সমধিক পবিত্রিত।

হজরত ফাতেমা বোহবার নামে বাবাসত থানাবীন মাঠগ্রাম, বেকনান

পুথুরিয়া, মালিকাপুর, পশ্চিম ইছাপুর, ঘোলা, সোনাখড়কি, খড়িগাছি-সহরা প্রভৃতি মৌজায় পীৰোত্তর জমি আছে<sup>৩৪</sup>। তাঁর প্রতি ভক্তিতে স্থানীয় ভক্তগণ সহরা গ্রামে যে দবগাহ নির্মান করে দিয়েছিলেন তাব উপর অশ্বখ-গাছ হয়েছে। সেখানে আজো প্রতি সন্ধ্যায় নিযমিত ধূপবাতি জ্বালিয়ে দিবে জিয়াবৎ করা হয়। উক্ত দবগাহের বর্তমান (১৯৭০) সেবিকার নাম মোসাম্মৎ শুকজান বিবি। তাঁর স্বামীর নাম মবছুম মোহাম্মদ পাঁচু সাধু ঝাঁ। মহবমের সময় স্থানীয় ভক্তগণের এক বিবাট শোভাযাত্রা এই দবগাহে এসে হজবত ফাতেমার উদ্দেশ্যে প্রদ্বা নিবেদন করে। তখন এখানে লাঠিখেলা বা অনুরূপ ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়। এ ছাড়া অন্য কোন সময়ে কোন অনুষ্ঠান বা মেলা হয় না। অনেক ভক্ত এই দবগাহে মাঝে মাঝে হাজত, শিবনি এবং মানত দিবে থাকেন। অনেকে বোগ নিরাময়ের আশায় হজবত ফাতেমা বোহরার এই দবগাহের মাটি ব্যবহার করেন। অনেকে এখানে ভেল বেখে বিবি ফাতেমা কর্তৃক মন্ত্রপুতঃ হযেছে এই বিশ্বাসে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করে বোগমুক্ত হন। এই দবগাহের পীৰোত্তর জমির পরিমাণ এখনও প্রায় পাঁচ কাঠা। এখানে কোন গুবস হয় না বা ভদুপলক্ষে মেলাও বসে না।

পীবানী হজবত ফাতেমা বোহরার নামে নিম্নলিখিত গ্রন্থ বা খণ্ড বচন বা তাঁর জীবনী বিষয়ক বচন পাওয়া যায়,—

- ১। হজবত ফাতেমা বোহরার জীবনচরিত : মোহাম্মদ বেলাজ্জুদীন আহম্মদ
- ২। হজবত ফাতেমা : মনিবউদ্দীন ইউসুফ
- ৩। ফাতেমার সুবত নামা : শেখ তনু ( তিনখানি পুথি )
- ৪। " " " : শেখ সেবাজ্জ চৌধুরী
- ৫। ফাতেমার জহবা নামা : আজমতুল্লাহ খোন্দকার
- ৬। বিবি ফাতেমার বিবাহ : অজ্ঞাত
- ৭। ফাতেমার সুবত নামা : কাজী বদিউদ্দীন

সংখ্যা ৩ থেকে ৭ পর্যন্ত পুথিগুলির কথা উল্লেখ করেছেন আব্দুল কবির সাহিত্য বিশাৰদ তাঁর পুথি পরিচিতি নামক গ্রন্থে।

মোহাম্মদ বেলাজ্জুদীন আহম্মদ সাহেবের হজবত ফাতেমা বোহরার জীবনচরিত গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় তাঁর বসতি ছিল চব্বিশ

পরগণা জেলাব দম্ভদম্ বেলগবে অংশন অঞ্চলের রমানাথ কুটীরে। তাঁর জন্মস্থান কোথায় তা জানা হুসোধ্য। আরো জানা যায়, তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও বচনা কবেছিলেন,—

- ১। এসলাম তত্ত্ব,
- ২। হজ্জবত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ)-এর জীবনচরিত,
- ৩। গ্রীস-তুর্ক ( প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ),
- ৪। আমাব সংসার জীবন,
- ৫। কৃষকবন্ধু,
- ৬। জোবেদা খাতুনের বোজানামচা, প্রভৃতি।

তাছাড়া তিনি নিম্নলিখিত পত্র-পত্রিকার প্রবর্তক বা সম্পাদক বা সহযোগী সম্পাদক ছিলেন,—

- ১। সুধাকব,
- ২। সোলতান,
- ৩। ইসলাম-প্রচারক,
- ৪। মোসলেম-হিতৈষী,
- ৫। নবমুগ,
- ৬। মোসলেম বাণী,
- ৭। বারত-বন্ধু, প্রভৃতি।

হজ্জবত ফাতেমা যোহবাব জীবনচরিত গ্রন্থখানিতে লিখিত ভূমিকার দেখা যায় তাঁর উক্ত বাসায় অবস্থান-কাল হল ১৫।৭।'৩৫। তাঁর পুস্তকখানি মৌলভী মোহাম্মদ কামালউদ্দিন সাহেব কর্তৃক সংশোধিত। লেখক সম্পর্কে এব অধিক কিছু জানা যায় না।

মোহাম্মদ বেবাজুদ্দিন আহম্মদ বচিত গ্রন্থের আকৃতি ৭"×৫"। গ্রন্থখানি বাঁধাই ও মুদ্রিত। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৮। তা ছাড়া চাব পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা আছে। এতে কোন সূচীপত্র নেই। অনেকগুলি শিবোনামায় গ্রন্থখানি লিখিত। আবো আছে পনেবোটি উর্দু কবিতা ও তাব বজানুবাদ। তাতে হজ্জবত ফাতেমা যোহবাব কথাই বিবৃত হবেছে। পুস্তকখানির প্রকাশক "মদিনা বুক ডিপো।"

মোহাম্মদ বেবাজুদ্দিন আহম্মদ সাহেব বচিত হজ্জবত ফাতেমা যোহরার জীবনচরিত গ্রন্থের ভাষা সাধু বাঙ্গালা গদ্য। এতে এত বেশী আববী-ফারসী

শব্দ বয়েছে যাতে গ্ৰন্থখানি পাঠকালে বাজালা ভাষাৰ যে মাধুৰ্য্য অনেকখানি বিনষ্ট হৱেছে তা বোৱা যায়। তাছাড়া পীৰ-পৰগন্থৰগণেৰ নামেৰে শেষে বাব বাব সন্মান-সূচক শব্দ ব্যবহৃত হওৱাৰ আবে। বোৱা যায় যে, গ্ৰন্থখানি একেবাবেই ধৰ্মগ্ৰন্থ বটে। ভাষাৰ নমুনা এইৰূপ,—

“হজবত সাবাদ-বিন-আবি ওকাছ (ৱাজি:) হইতে বৰ্ণিত হইবাছে যে, হজবত হবওৱাৱে আলম (দঃ) বলিবাছেন, জিববাইল আলায হেছালাম জাম্মাতেব একটি ছেব আমাব নিকট আনযন কবিলেন—যাহা আমি মেয-বাজেব বাজিতে দেখিবাছিলাম। ঐ ফল ভক্ষণ কবাৰ ঐ বাজিতেই হজবত খদিজাতুল কোব্বা (ৱাঃ—আঃ) আমাব ঘাবা গৰ্ভবতী হইলেন। সেই গৰ্ভেই ফাতেমা (বাঃ—আঃ) জন্মগ্ৰহণ কৰিল।” (পৃষ্ঠা ১৩)

এই গ্ৰন্থে বাজালা হবকে পনেবোটি উৰ্দু কবিতা বয়েছে। অবশ্য তাৰ বাজালা অনুবাদও বয়েছে। বল বাহুল্য সেই উৰ্দু কবিতাগুলি লেখক মোহাম্মদ বেযাজুদ্দিন আহম্মদ সাহেবেৰ নিজেৰ বচনা নহ। উৰ্দু কবিতাৰ কয়েকজন বচয়িতাৰ নাম ;—

- ১। আবদুল মজিদ সিদ্দিকী,
- ২। মাফীৰ হৈয়দ বাছেতে আলী বাছেত বহুওয়ানী,
- ৩। লেছানল হিন্দ হজবত আযিয লখনবী,
- ৪। মওলানা হিমাৰ ছিদ্দিকী প্রভৃতি।

কয়েকটি উৰ্দু কবিতাৰ বচয়িতাৰ নাম-উল্লেখ নেই।

গ্ৰন্থখানিৰ কোন কোন অংশ বিশেষ বিশেষ শব্দেৰ জগ্ম জীবনী পুস্তক হিসাবে পাঠ কবতে ভালই লাগে।

বেযাজুদ্দিন আহম্মদ সাহেব বচিত গ্ৰন্থ অনুযায়ী হজবত ফাতেমা যোহবাৰ জীবন কাহিনীৰ সংক্ষিপ্তৰূপ,—

৬১১ খৃষ্টাব্দেৰ ২০শে জমাদিসল-আবেবেৰ পবিত্ৰ জুমাৰ দিন প্রত্যবে হজবত ফাতেমা যোহবা জন্মগ্ৰহণ কবেন। তখন হজবত বহুল কবিম (দঃ)-এব বয়স্কৰ ৪০ বৎসৰ অতিক্ৰম কবে ৪১-এ পড়েছিল। এই সময় পবিত্ৰ কা’বাগৃহ নূতনভাবে সংস্কাৰ হছিল।

মাত্ৰ পাঁচ বছৰ বয়সে তাঁৰ মাতৃহীনা হওয়া অতি ছন্দৰবিদাবক ব্যাপাৰ। এই ঘটনা তাঁৰ ভবিষ্যৎ জীবনেৰ উজ্জ্বল পৰিণাম বলেই পবে প্রতিভাত

হয়েছিল। যদি তিনি শৈশবে মাতৃহীন না হতেন, তবে হয়ত অগ্নেব প্রতি দৰা ও সহানুভূতি প্রকাশ, আর্ত-দুঃখীৰ প্রতি করুণা বিতরণ প্রভৃতি তাঁর মহৎ গুণের বিকাশ হত না।

কিছুদিন পবে হজবত বহুল কবির (দঃ) এই মাতৃহীন। বালিকাব লালন-পালন ও গৃহ-কার্যাদিৰ সুশৃঙ্খলা সাধনেৰ জন্ত হজবত ছওদাকে বিবাহ কবেন। তিনি মাতৃহীন। বালিকাদিগেৰ প্রতি যথোচিত যত্ন ও স্নেহ প্রদর্শন কবতেন।

হজবত ফাতেমা যোহবা মহাল্লাব মেঘেদেব সাখেও বড় একটা মিশতেন না। এই নির্জন বাসে তাঁর জন্মের দৃঢ়তা জন্মেছিল। ঐ সময় মক্কাব সমুদয় অধিবাসী হজবত মোহাম্মদ (দঃ)-এব প্রতি নিতান্ত বিদ্বেষপৰাষণ ছিল; সকলেই তাঁর সঙ্গে শত্রুতাচরণ কবত। এমত বিপদেব মধ্যেও হজবত বহুল (দঃ) ধর্মপ্রচাবেৰ জন্ত ইতস্ততঃ গমন কবতেন, সময় মত আহাব এবং বিশ্রাম পর্যন্ত ঘটত না। এতদ্বন্ধেও তিনি হজবত ফাতেমাৰ প্রতি মনোযোগী ছিলেন। হজবত ফাতেমা যোহবাও পিতাব পবিত্র বচনাবলী ও উপদেশমালা খুব মনোযোগ সহকাৰে শ্রবণ এবং পালন কবতেন। কোন বিষয় নিষে জিন বা হটকাবিতা কবতেন না। বিপদ ও দাবিদ্রতাৰ ষাত-প্রতিষাতে তাঁকে দুনিয়াব লোভ, লালসা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি দোষ হতে আল্লাহ-তাযাল পবিত্র বেখেছিলেন। তিনি কোন জিনিষেবই অভাব বোধ কবেননি। সাধাবঞ্ মোটা ও ভালিযুক্ত কাপড় পৰিধান এবং যবেব মোটা আটাৰ কটি আহাৰ কবেই পবিত্র গুণ থাকতেন। সে খাদ্যও সকল দিন মিলত না। তিনি সকল বিষয়েই স্বীয় মহান পিতাব পদানুসরণ কবে চলতেন। তাঁকে কখনও নামাজে 'গাফেল' দেখা যায় নি। যথানিষয়ে কোব-আন 'হেলাওত' কবতেন। বয়স বৃদ্ধিৰ সাখে তিনি পিতাব প্রচাবিত এছলাম ধর্মাদর্শ সহজে ঘনিষ্ঠ ভাবে জ্ঞান, লাভে সক্ষম হন।

হজবত আলীর সহিত তাঁর বিবাহ হয়েছিল। হজবত আলি ছিলেন দবিদ্র। দবিদ্র স্বামীৰ গৃহে এসেও তিনি মহামান্য পিতাব উপদেশকে শিবোধার্য করতে লাগলেন। তিনি দবিদ্র স্বামীৰ প্রতি ক্ষণকালেব জগ্যও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নি। হজবত ইমাম হাসান ও হজবত ইমাম হোসেন নামক জগতবিখ্যাত দুই ভাই তাঁর পুত্র। পুত্রদ্বয় তাঁর নিকট ধর্ম ও নীতি শিক্ষা নিতেন।

দ্বাদশ হিজবীৰ ওবা বমজান-মবাবক মঙ্গলবাৰ দিবাগত বাত্রিকালে হজবত ফাতেমা যোহবা মৃত্যুবরণ কবেন।

গ্ৰন্থখানি আঁকাৰে ষত বড, কাহিনী হিসাবে তেমন বিস্তৃত ভাবে হজবত ফাতেমা মোহোৱাৰ কথা দিবে একটানা গ্ৰথিত নহয়। এতে ববং হজবত মহম্মদ ব্ৰজুল কৰিম (দঃ)-এৰ বিচিত্ৰ এবং মহনীয় কৰ্মখাৱাৰ পৰিচয় লিপিবদ্ধ হৈছে। আবে। লিপিবদ্ধ আছে তৎকালে 'এছলাম' প্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰামেৰ ইতিহাস।

গ্ৰন্থখানি পাঠকালে মাৰে মাৰে যে দীৰ্ঘ কবিতা পাওৱা যায় তাৰ অৰ্থ বুজতে না পাবলে পাঠকেৱ বিৰক্তি উপাদান হতে পাবে। সেই হিসাবে গ্ৰন্থটি একজন উৰ্দ্ধ জ্ঞানী 'মোৰ্শেদেব' নিকট বসে পাঠ নেওবা ও তাৰ ব্যাখ্যা শোনবাৰ মতন উপযুক্ত বলে মনে হয়। তবে তাৰ মধ্যে ষতটুকু বাংলা ভাষাৰ বোধগম্য তা পাঠ কবলে পাঠক অবশ্যই দুঃখ-দাবিদেবৰ সঙ্গ আপোষহীন সংগ্ৰামে বিজয়িনী এবং আদৰ্শ নাবী হিসাবে হজবত ফাতেমা মোহোৱাৰ প্ৰতি ও তদীয় পিতা হজবত কবিম (দঃ)-এৰ প্ৰতি তথা ইসলামেৰ মহান আদৰ্শেৰ প্ৰতি পাঠক অবশ্যই শ্ৰদ্ধাশীল হবেন।

মনিবউদ্দীন ইউসুফ সাহেব ৰচিত পুস্তকখানিৰ আকৃতি ৭ই"×৫ই"। বাৰ্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪। পুস্তকে ভূমিকা প্ৰদত্ত হয় নি। তবে "প্ৰাচীন আবেৰে নাবীৰ স্থান" শীৰ্ষক সূচনা-প্ৰবন্ধে প্ৰাচীন আবেৰেৰ কিঞ্চিৎ পৰিচয় পাওৱা যায়। হজবত মোহোৱাৰ জীৱন বৃত্তান্ত তিনি নিম্নলিখিত শিৰোনামাৱ আলোচনা কৰেছেন,—

আল আমীন ও তাহেবাব পৰিচয়

ফাতেমাৰ জন্ম

বাল্য ও কৈশোৰ

মদীনাৰ

বিবাহ

পতিগৃহে

সংসাৰ জীৱন

জননী কপে

মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ্জেৰ সফৰ

পিতৃশোক

দীপ নিৰ্বাণ

পুস্তকখানিৰ প্ৰকাশক ওসমানিয়া লাইব্ৰেৰী। ৩০, মদনমোহন বৰ্মণ ষ্ট্ৰীট

(মেছুয়া বাজার স্ট্রীট), কলিকাতা-৭। গ্রন্থের প্রথম ভারতীয় সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে হযত পুস্তকখানির পূর্ব-পাকিস্তানী (অধুনা বাংলাদেশ) সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল বা হয়ে থাকবে।

মনিব উদ্দীন ইউসুফ বচিত গ্রন্থে বিহৃত হজরত ফাতেমাব কাহিনীর সংক্ষিপ্তরূপ—

ধনবৈষম্যমূলক দাসত্বের যুগ। দুর্নীতিপরাধণ কোবেশ সর্দারগণ সব চাইতে বুদ্ধিমান ও প্রতিষ্ঠাবান। এব অন্তবালে চারিজন ও মানবীয় গুণাবলীও ফল্গুধাবাব মতন প্রবাহিত ছিল। আবুল্লাহ-পুত্র মুহম্মদেব বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতা দর্শন কবে মক্কাবাসী তাঁকে আল্ আমীন বলে সম্বোধন করতেন। অগৃদিকে ধনাঢ্য মহিলা ধোবালেদ কন্যা খাদীজাব নিরুপুৰ জীবনের স্বীকৃতি দিবে লোকে তাঁকে তাহেবা বা পবিত্রা বলে সম্বোধন কবতেন। বাণিজ্যকে উপসক্ষ্য করে এই দুই মহামূল্য মনি একদিন পবম্পবেব সান্নিধ্যে আসেন। উভব পক্ষের আলাপ-আলোচনার পর উভয়েব শুভ পবিগম সম্পাদিত হয়।

খাদীজার গর্ভে দুই পুত্র ও চাব কন্যা জন্মলাভ কবে। শৈশবেই দুই পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। তাঁব কনিষ্ঠ কন্যার নাম ফাতেমা। এই ফাতেমার সন্তান-সন্ততিব মাধ্যমেই রসুলেব বংশধাব বক্ষিত হয়।

ঐতিহাসিকগণের মতে ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে বসুল্লাহেব পষগম্ববী প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে, মতান্তবে নবুওত লাভেব পাঁচ বছর পব, ফাতেমাব জন্ম হয়। এই সময় মক্কার আন্তর্গোত্রীষ এক ভাবাবহ বক্তৃক্ষরী সংগ্রামেব সূত্রপাত হচ্ছিল। ফাতেমাব মহান পিতাব কল্যাণকব হস্তক্ষেপে তা বন্ধ কবা সম্ভব হয়। এই হজবত ফাতেমাই মুসলমান জগতেব নাবী-শিবোমণি, “খাতুনে জান্নাত”। মুসলমান জনগণ তাঁকে ‘বতুল’ বা সংসাব বিবাগিনী বলে অভিনন্দিত করেছেন। তিনি মাত্র আটশ বছবেব স্বল্প-পরিসব জীবনে ধর্মবোধ, পাতিব্রত্যা, ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণুতাব সহানুভূতি, স্মার-পবায়ণতা এবং সমর্পিত-চিত্ততাব আদর্শ দৃষ্টান্ত বেখে গেছেন।

হজবত ফাতেমাব চবিতকাবগণ বলেন যে শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত সবল ও গম্ভীর প্রকৃতিব মেয়ে। তিনি জ্যেষ্ঠা ভগিনীগণেব ন্যায় প্রতিবেশী



মেয়েদের সঙ্গে খেলা-ধূলা ও বাক্যালাপ করার জন্য পাড়াঘর ষাওয়াব চেয়ে গৃহে গুণবতী মাতার সাহচর্যে অবস্থান কবাকেই শ্রেয় জ্ঞান কবতেন। তিনি দেখেছেন, কি ভাবে তাঁর মাতা স্বীয় অগাধ ঐশ্বর্য্যপতির পারে উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি দেখেছেন, দীন-দরিদ্রের বন্ধু মহান পিতা যখন সর্ব্বদা দান করে নিঃস্ব হয়ে যাবে ফিরেছেন, মহীষসী মাতার হাসিমুখে তখনও উচ্চারিত হচ্ছে স্বামীর প্রতি সুমধুর স্বাগতম ধ্বনি। তিনি দেখেছেন মহান পিতা অজ্ঞাত কোন্ এক মহাকর্তব্যের হাতছানিতে ধ্যানমগ্ন হবে পড়েছেন, আব পতিব্রতা মাতা তাঁর স্বাভাৱিক মধুর উৎসাহবাণীর পুষ্পস্তবকে আচ্ছাদিত করে দিচ্ছেন। ফাতেমা মায়ের এইসব সংগণ পুরাপুরিই আরত্ব কবেছিলেন। একদিন রসুলুল্লাহ তাঁকে সন্তোষিত কবে বলেছিলেন যে তিনি যেন পরগণহরের মেয়ে বলে কোনদিন অহঙ্কার না কবেন। আল্লাহর সামনে ছোট-বড়র কোন প্রভেদ নেই—সেখানে সকলের সমান বিচার হবে।

খাদীজার পরলোকপ্রাপ্তি হয় নবুতাব দশম বৎসরে। এর সামান্য কয়েকদিন পূর্বে স্নেহমগ্ন পিতৃব্য আবু তালেবের মৃত্যু বসুল পরিবারে নিদারুণ শোকের হারা আনে। মক্কাব কোবেশ সর্দাবগণ রসুলুল্লাহর বিরুদ্ধাচরণে খোলাখুলিভাবে অবতীর্ণ হয় এবং স্বয়ং রসুলুল্লাহর উপর নির্ধাতন শুরু করে দেয়। এইসব দুর্ঘটনার সময় নবী-কন্যাকে কখনও সজল চোখে কখনও অনলবর্ণী দৃষ্ট ভক্তিমার পিতার পাশে স্নেহময়ী জননীৰ মতন দাঁড়াতে দেখা যেত।

কোরেশ সর্দাবগণ রসুলুল্লাহকে অসহ্য ভেবে তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। রসুল সেই বাত্রেই মক্কা ত্যাগ কবে মদীনা-অভিমুখে স্বাত্রা করলেন। কিছুদিন পরে ফাতেমাকেও সেখানে আনানো হল।

নবী-নন্দিনী হলেন পূর্ণযৌবনা, তাঁর বিবাহের সময় উপস্থিত হল। রসুলুল্লাহ হলেন জ্ঞানের নগবী, আলী তাঁর দরওয়াজা। দরিদ্র আলীর সহিত ফাতেমার বিবাহে হজরত রসুলুল্লাহ সানন্দে অভিমত দিলেন। ফাতেমাও লজ্জাবনতা হবে পিতার অভিমত অনুমোদন কবেছিলেন। সেই বিবাহে বাজার থেকে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি কেনা হল যৌতুক হিসাবে,—

একখানা পশমভবা তোষক, একখানা খেজুরের ছালভবা তোষক, একপা স্বথাক্রমে পশম ও ছালভবা দুটি তাকিয়া, একটি বেশমী একটি সুতী চাদর,

তু'গাছি চাঁদির বাজুবন্দ, দুটি মাটির কলসী, একটি আটা-পেয়ার ঝাঁত। ও একটি করে মোশক, খাট এবং জামানামাজ। অভিজাত বংশীয়দের বিবাহ-বীতির বিপবীত সরল ও অনাড়ম্বর এই বিবাহ ও ততোধিক সাদাসিধা যৌতুক।

পতিগৃহে গমনকালে পতির দারিদ্র্যহেতু তাঁর হৃৎ প্রকাশ পেলে মুহম্মদ (দঃ) বলেছিলেন,—“মা, পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান এবং আমার সাহেবাগণের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বিদ্বান তাঁরই সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছে,—এতে হৃৎ কি?”

পিতার উপবাস্ত সাত্ত্বনাবাক্যে মুহূর্তের মধ্যে সন্তোষের জ্যোতির আলো ফিরে পেলেন ফাতেমা।

অবশেষে ফাতেমা পতিগৃহে স্বামীর উদ্দোষ করলেন। স্বামীর পূর্বে বসুলের আদেশ অনুসারে তিনি ঘৃত, পনির ও খোবরা সহযোগে এক সুখাদ্য প্রস্তুত করে উপস্থিত মোজাহেদ ও আনসারিগণকে প্রদান করবার ব্যবস্থা করলেন। একটি বাটীতে কন্যা ও জামাতাকে আহাব করতে দেওয়া হল। পরে হজরত মুহম্মদ (দঃ) উভয়কে উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন।

আলী ও ফাতেমা মদীনার উপকণ্ঠে হাবেসা নামক এক আনসারিদের ভাড়াটে ঘরে এলেন।

নবী-নন্দিনী ফাতেমা ও আলীর সংসার জীবন ছিল সবলতা ও হৃদয়তার প্রতীক। কান্নিক পরিশ্রমে আলীকে প্রত্যহেব জীবিকা অর্জন করতে হত। হজরত আলীর একদিন মজুবী জুটল না। দিনান্তে বন্দবে এক মালবোরাই কাফেলা এসে হাজির হতে তাঁর কাজ জুটে গেল। মাল নাথাতে বাত হরে গেল। হজরত ফাতেমা ততক্ষণ পর্যন্ত উৎসুকভাবে স্বামীর পথপানে চেয়ে বইলেন। স্বামী ঘবে এলে ফাতেমা বস্ত্রাঞ্চলে তাঁর কপালের ঘাম মুছে দিলেন, তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়ে ঝাঁতের যব পিষতে বসলেন। তাবপব গভীর বাত্রে আহাব শেষ করে আল্লাহকে দিলেন অশেষ ধন্যবাদ।

হঠাৎ একদিন বসুলুল্লাহ এসে হাজির হলেন কস্তা ফাতেমার বাড়ীতে। কিন্তু পিতার মুখ গভীর কেন? নবীকন্যা ভো কেঁদে আকুল। বসুলের অনুগত আবু বাকের কাছে জানা গেল যে তিনি ফাতেমার ঘরের বড়ান পর্দা এবং

তঁাব হাতেৰ বোঁপাবলৰ দেখে অসন্তুষ্ট হৈছিল। হাব। এখনও এমন অনেক মুসলমান বসেছিল ঝাঁদেৰ পৰণে কাপড় পৰ্যন্ত নেই, দুইবেলা খাদ্যেৰ সংস্থান নেই।

ফাতেমাৰ এ এক নতুন শিক্ষা। ঐশ্বৰ্য্য মানুহেৰ ভোগেৰ সামগ্ৰী কিন্তু অন্যকে বঞ্চিত কৰে নহ। মুসলমানদেৰ ডাঙৰ শুখু মুখেৰ কথাতেই শেষ হৈছে বান্ধ না,—একেৰ দুঃখ দুৰ না হলে অন্যেৰ সুখভোগ অবাঞ্ছনীয়। তাই মদীনাৰ ঘৰে ঘৰে গৃহীনিগণ দুপুৰেৰ আশ্বিতে যখন গ। এলিৰে দেন, ফাতেমা গৃহদ্বাৰ বন্ধ কৰে তখনও গৃহকৰ্ম কৰেন। একদিন উম্মে আযমিন দেখেন যে নবীনন্দিনী একহাতে ঝাঁতা হুৰাচ্ছেন এবং অন্যহাতে শিশু হোসেনেৰ দোলনাৰ দোল দিচ্ছেন।

একবাৰ তিনবেলা উপবাসেৰ পৰ কিছু বৰ সংগ্ৰহ কৰে তা। থেকে কটি তৈৰী কৰলেন এবং আহাৰ কৰবাৰ আগে পিতাৰ কথা মনে পড়ায় ফাতেমা কয়েকটি কটি এনে পিতাৰ নিকট হাজিৰ কৰলেন। নবীৰ একটুকুৰা কটি মুখে দিলে বল্লেন,—“চাৰবেলা অনাহাৰে থাকাৰ পৰ এই কটিটুকুৰা তোমাৰ পিতাৰ মুখে গেল।”

একদা আলীৰ সঙ্গে নবী-কন্যাৰ মতান্তৰ হল। ফাতেমা অভিমানে পিতাৰ নিকট এলেন। সঙ্গে সঙ্গে আলীও সেখানে এলেন। অভিযোগ শ্রবণান্তে পিতা কন্যাকে বল্লেন,—“মোৰেদেৰ মধ্যে সহিষ্ণুতাৰ অভাৱ থাক। বাঞ্ছনীয় নয়।”

হজ্জত আলীও শ্বশুৰেৰ এই আচরণ লক্ষ্য কৰে বল্লেন—“আমি প্রতিজ্ঞা কৰলাম যে, আব কখনও নবীকন্যাৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে কোন কাজ কৰ্ব না।”

ঐতিহাসিকগণেৰ মতে বিখ্যাত ওছদ যুদ্ধেৰ বছৰে বমজান মাসে ফতেমাৰ প্রথম সন্তান হাসানেৰ জন্ম হৈছিল। ওছদ যুদ্ধেৰ পৰেৰ বছৰ হজ্জত ফতেমাৰ দ্বিতীয় পুত্র হোসাইনেৰ জন্ম হয়। উভৰ ভ্রাতাৰ নাম বেছেছিলেন নবী নিজে। ফতেমা তঁাব সন্তানদ্বৰকে অত্যন্ত স্নেহ কৰতেন। আবাব দীন-দরিদ্রকেও তিনি সন্তানদেৰ জ্ঞান স্নেহ কৰতেন। একদিন এক ক্ষুধাৰ্ত্তকে দিবাৰ মত আহাৰ্য ঘৰে না থাকাৰ নিজেৰ গলাৰ হাবটি তাকে অৰ্পণ কৰেছিলেন। অগ্ৰদিন প্রতিবেশী শত্রু শামউনেৰ স্ত্রীবিৰোগ হলে কেউ সেখানে খবৰ পৰ্যন্ত নিতে গেল না; তখন ফাতেমা সেখানে গিয়ে মৃত্তেৰ গোসল কৰিয়ে এবং দাফন-কাফনেৰ ব্যৱস্থা কৰে এলেন।

হজবত ফাতেমার দুই কন্যা সন্তানও জন্মগ্রহণ কৰেছিল। তাদের নাম মথাক্রমে জ্বনব ও উম্মে কুলসম।

মক্কা বিজয়ের অভিযানে হজবত ফাতেমাও বসুলুল্লাহের সঙ্গে ছিলেন। হোসায়েন বুদ্ধে জয়লাভের পর বসুলুল্লাহ্ মদিনায় ফিরে আসেন, এবং সম্ভবতঃ সেই সময় নবী-নন্দিনীও মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন।

হজবত ফাতেমার ইচ্ছা বহুদিন পর এবার পূর্ণ কবে তাঁর গৃহকর্মে সহায়তার জন্য বসুলুল্লাহ্ খবর বুদ্ধে প্রাপ্ত প্রচুর দাস-দাসীর মধ্য থেকে একজন দাসী প্রদান করেন।

সাম্যবাদী ইসলামী সমাজে দাস-দাসী বিষয়ক প্রশ্নটি গুরুতর প্রশ্ন। তখন দুনিয়ার সর্বত্র সামন্ত যুগের শৈশবকাল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বসুলুল্লাহ্ দাস-প্রথাকে অব্যাহত বেধেছিলেন। তবু তাঁর কাছে আপন কন্যা ও দাসীর মধ্যকার যে সম্পর্কের কথা বলেছেন ত লক্ষ্যণীয়,—

“যেব অধিক কাজ তুমি কববে, বাকী অধিক দাসীকে দিবে, কবাবে। দু’জনে মিলে ষাঁতা পিষবে। - তুমি নিজে যা খাবে, তাকেও তা খেতে দেবে, নিজে যা পববে তাকেও তা পবতে দেবে। তাকে আপন জনের মত দেখো।”

বস্তুতঃ এ ঘটনা সেই দাসীর জীবনে দাসীত্ব থেকে সাম্যবাদী বিবেচনার মুক্তি ভিন্ন আব কিছুই নয়।

পিতা যখন সমগ্র আববের অধীশ্বর তখনও কিত্ত সমাজের কঠোর বাস্তব সত্যকে অস্বীকার কবে জান্নাতে-খাতুনের সংসারে অধিকই লাঘব হয়নি। এমন অবস্থাও একদিন গেছে যে ঈদেব দিনে হাসান-হোসেনকে নতুন পোশাক কিনে দিতে খাতুনে-জান্নাত অক্ষম হয়ে পড়লে কোনো এক ব্যক্তি, ইমাম আতুদ্বয়ের জগ্ন ঈদেব সওগাত পাঠিয়ে দিবেছিলেন।

বসুলুল্লাহ্ মদীনা থেকে ফিরে এলেন মক্কা। সেখানে তিনি হজবত উদ্বাপন কবলেন। তাবপবই তাঁর জ্ব হল, এল অন্তিমকাল। হজবত ফাতেমা অহোবাত্র পিতাব শয্যাপার্থে বসে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা কবতে লাগলেন। মৃত্যুর পূর্বে কন্যাকে বসুলুল্লাহ বলেছিলেন যে মৃত্যুর পরপাবে খাতুনে-জান্নাতের সঙ্গে বসুলুল্লাহেব প্রথম সাক্ষাৎ হবে। বাস্তবিক, পিতাব পরলোকগমনের মাত্র ছমমাস পবেই হজবত ফাতেমাব মৃত্যু ঘটেছিল।

পিতাব মৃত্যুর পর হজরত ফাতেমার বাকী কয়েক মাসের জীবন বৈরাগ্যেব মাধ্যমে অতিবাহিত হয়। তিনি “জান্নাতুল বাকী” নামক মকদ্দানে এক জতামগুপ নির্মাণ করে সেখানে ধ্যানাঙ্গী হতেন।

কথিত আছে, পুত্র-কন্যাদের হাতে ফিদক নামক মকদ্দানের অধিকার তুলে দেবার জন্ত খলিফা আবু বকর সিদ্দীকের নিকট প্রার্থনা কবলে খলিফা বলেছিলেন—“নবীর কোন ওয়াশিহ হয় না, গোটা উম্মতের দীন-দুঃখীই নবীর উত্তরাধিকারী।”

খলিফার এমন যুক্তিপূর্ণ কথায় হজরত ফাতেমা মজ্জিতা হয়েছিলেন।

বলা হয় যে “জান্নাতুল বাকী” শোক মগুপে থাকাকালে হজরত ফাতেমা নিম্নলিখিতরূপ শোক-গীতি বচনা কবেছিলেন—

“আকাশের বুক ভরিল খুলাস নিভিল সহসা সূর্যকর,  
শত জ্যোতিষ্ক আকাশ-বেলায় মলিন হইল—হোল নিখর।  
এ জগত-সভা ভাঙ্গিয়া গেল বে,—শোকেতে ভবিল বন্ধ তাব,  
পশ্চিম হতে পূর্বব সীমার, ছড়াইয়া পড়ে সে হাহাকাব।  
মিশব এ্যমনে উঠে ক্রন্দন, গিবি-প্রান্তর কাঁপিছে হাব,  
ধবণী বৃকে এলো কি প্রলয়? সেই ভবে সবে কেঁদে লুটায়।  
এই পৃথিবীর মর্মে মর্মে বাজিছে একই ব্যথাব সুব,  
আব আসিবে না খোদাব বসুল, নারিবে না ওহী পুত মধুর।  
সালাম সালাম, হে পিতঃ বসুল জানাই তোমাবে লাখো সালাম,  
আমিন, আমিন। বলে ফেরেস্তা শুনি পবিত্র তোমাব নাম।”

চরিতকাবগণ বলেন যে বসুল্লাহেব মৃত্যুর পব আব কোনদিন হজরত ফাতেমাকে হাসতে দেখা যায়নি। পিতৃশোকে তিনি দিনে দিনে কৃশতন্ম হবে মৃত্যুবরণ কবেন। মৃত্যুকালে তাঁর কোন পীড়া দেখা দেয়নি। সেদিনটি একাদশ হিজরীর ওরা বমজান, তখন তাঁর ববস সাডে আটাশ বছর পূর্ণ হয়েছিল।

হজরত ফাতেমা কোথায় শেষ-শয্যায শায়িতা আছেন তা নিবে মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতে “জান্নাতুল বাকী” নামক স্থানই তাঁর সমাধিভূমি। তাঁর স্বামী হজরত আলী ছিলেন মুসলিম জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। আরবীয় সেই কবি একস্থানে পত্নী হজরত ফাতেমা সম্পর্কে লিখেছেন—

“আমাব নসীব মন্দ বলেই কবর হতে পাইনে সাভা  
নিত্য এসে জানাই সালাম দাওনা জবাব হে জোহবা।  
দীর্ঘ দিনেব মধুব স্মৃতি সব ভুলেছ আজকে বুবি,  
তাই, হৃদয় হাবাব সালাম শুনেও নীববে বও দুচোখ বুঁজি।”

পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা কম হলেও হজবত ফাতেমা যোহবা সম্পর্কে অনেক কথাই মনিব-উদ্দীন সাহেবের পুস্তকে স্থান পেয়েছে। খাতুনে জান্নাত সম্পর্কে এমন সবস ভাষায় ও একটা রুচন্দ ডক্সিমায় লিখিত কোন গ্রন্থ সম্ভবতঃ এখনো পর্য্যন্ত লিখিত হয়নি। পুস্তকখানি পাঠের সময় পাঠকের স্বতঃউৎসাহিত একটা ভক্তিতাব জেগে ওঠে। এই গ্রন্থেব অদ্ব্যতম লক্ষ্যনীষ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা আববী, ফাবসী প্রভৃতি শব্দেব প্রাচুর্য্যে কণ্টকিত নয়। আববী বা উর্দু কবিতা নেই। হু একটা কবিতাব সহজবোধ্য ভাবানুবাদ গ্রন্থখানিকে রসগ্রাহী হতে যথেষ্ট সহযোগিতা কবেছে। মূলতঃ হজবত ফাতেমা জোহবাব জীবনকথা বিবৃত হলেও কাহিনী পবিবেশন কবাব শিল্প-কৌশল পাঠকের ভক্তিনম্র ভাবনাকে ইসলাম ধর্মেব প্রতি শ্রদ্ধাশীল কবে তোলে। তাছাড়া মুসলমান জগতেব সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী হজবত ফাতেমা যোহবাব কথা এসঙ্গে সংক্ষেপে তৎকালীন আববেব ঐতিহাসিক বিবরণের কিছু অংশ লেখক সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ কবেছেন।

হজবত ফাতেমা যোহবাব কথা প্রায় হাজ্জাব বৎসবেব পূর্বেব কথা, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে তাব প্রথম স্থান লাভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। শেখ সেববাজ চৌধুরী, আজম তুল্লাহ খোন্দকার, কাজী বদিউদ্দীন এবং অজ্ঞাত কোন এক কবি কর্তৃক লিখিত ফাতেমা বিষয়ক গ্রন্থেব রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী বলে অভিহিত। “বিবি ফাতেমাব বিবাহ” নামক আবো একখানি পুঁথিব নাম পাওয়া যায়। উক্ত পুঁথিবও রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। মোহাম্মদ বেবাজুদ্দীন আহম্মদ বচিত “হজবত ফাতেমা যোহবা” গ্রন্থেব প্রকাশকাল ১৫. ৭. ৩৫। ১৯৩৫ ইংবেজী, নাকি ১৩৩৫ বাংলা তা বুঝা যায় না। আমাব হস্তগত পুস্তকখানিব অষ্টম সংস্করণেব প্রকাশকাল ১৩৭১ বঙ্গাব্দ। বস্তুতঃ প্রথম প্রকাশ ৩৬। ৩৭ বৎসব (১৯৭২-১৯৩৫) পূর্বে হযেছিল বলে ধবা যায়। মনিব-উদ্দীন ইউমুফ বচিত গ্রন্থেব রচনাকাল বাংলা ১৩৭৩ মালেব পয়লা বৈশাখ। সম্ভবতঃ

মনিবউদ্দীন ইউসুফ বচিত “হজ্জবত ফাতেমা” নামক গ্রন্থখানি বাজালা ভাষায় রচিত খাতুনে জামাতের জীবনী সম্পর্কীয় সর্বাধুনিক সাহিত্য-সংযোজন।

বারাসত থানাধীন সহরা গ্রামে পীরানী হজ্জবত ফাতেমা যোহরার নামে কল্পিত যে দবগাহ আছে, তাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি লোককথা প্রচলিত আছে। সেই লোককথার দুটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হল ;—

### ১। দরগাহের অশ্বখগাহ

বিবি ফাতেমার দরগাহ—গৃহটির উপর চার-পাঁচটি অশ্বখ গাহ ছিল। সেবাব কাঠের বাজাব-দর ছিল ভাল। স্থানীয় কোন এক লোভী ব্যক্তি উক্ত অশ্বখগাহ বিক্রী কবে অর্থ লাভ করতে চাইল। দবগাহেব গাহ বিনষ্ট করতে নিষেধ কবল অনেকে। সে কারো কথা না শুনে গাহ বিক্রী কবে টাকা নেয়। আশ্চর্য্যেব বিষয় দরগাহেব উপরিস্থ একটি অশ্বখ গাহ বাদে সবগাহ হয়ে যায়। বাকী গাহটি দিনে দিনে সতেজ হয়ে ওঠে। অপর দিকে উক্ত ব্যক্তির ঘরে আগুন লাগে এবং আরো কিছু কালের মধ্যে কোন ঘটনায় লোকটি নাকি খুন হয়ে যায়। উক্ত ব্যক্তির নাম ছবুলাল।

### ২। ভক্তির পুরস্কার

খুব বেশী দিনেব কথা নয়,—বহুব তিরিশেক হবে। কোন কারণ বশতঃ উক্ত দরগাহেব আশ-পাশেব ঘরে আগুন লেগে যায়। দবগাহেব সেবাবেত ছিলেন অতীব দরিদ্র ব্যক্তি। তিনি একমনে শুধু বিবি ফাতেমার নাম স্মরণ করতে থাকেন,—হে বিবি ফাতেমা। তুমি আগুন সংবরণ কবে দাও। আগুনের ভেজ আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে এবং শেষে নিভে যায়। পরে গিয়ে দেখা গেল যে,—মাঝখানেব উক্ত সেবাবেতের ঘরখানি বাদে আর সমস্ত ঘবই পুড়ে ছাই হয়ে মাটিতে মিশে গেছে।

সহরা গ্রামে অবস্থিত দরগাহকে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধা করেন। ভক্ত জনসাধারণ এখানে হাজত, মানত এবং সিবনি প্রদান করে থাকেন। অবিচলিত বিশ্বাসে তাঁদের অনেকে দবগাহ থেকে তেল-মাটি নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করেন। তাতে তাঁদের নাকি উপকার হয় বলেও শোনা যায়।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

### বদর পীর

শাহ্ বদর একজন খ্যাতিমান পীর। লোকে তাঁকে সাধারণতঃ বদর পীর, বদর শাহ্ বা পীর বদর বলে থাকেন। তাঁর পুত্র নাম মখদুম শাহ্ বদরুদ্দীন বদর আলম যাহিদী। কদলখান গাজীর সমসাময়িক দরবেশ বদর আলম এবং মখদুম শাহ্ বদরুদ্দীন বদর আলম যাহিদী একই ব্যক্তি বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক,—কাবণ উভয়ের আগমনকাল একই। শাহ্ বদরকে চট্টগ্রামে মুসলিম বিজয়ের অগ্রগণ্য পথিকও বলা হয়। চট্টগ্রামের অনায়াসে থানার বটতলী গ্রামে মহসীন আউলিয়ার রাজ্যে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে বুঝা যায় যে, পীর বদর শাহ্ ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। চট্টগ্রাম শহরের মধ্যবর্তী বংশীবাজার মার্কেটের দক্ষিণে তাঁর প্রসিদ্ধ দরগাহ্ বিদ্যমান। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই তাঁর দরগাহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি তাঁর মাযার নয়। তিনি এসে এখানে একটি খানখাহ স্থাপন করেছিলেন। সেটিই মাযার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। চট্টগ্রামের ভক্তগণ তাঁকে অভিভাবক ওলী বলে থাকেন। মাঝি-মাল্লাবা তাঁর নামে নদীতে পাড়ি দেন। কেহ কেহ তাঁকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রথম ইসলাম ধর্ম-প্রচারক বলে মনে করেন। চট্টগ্রামের যে পাহাড়টি পীর-পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ, তিনি নাকি সেখান থেকে জিন-পর্বীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই পাহাড়টিই এককালে আবকানের মগ দস্যুদের আড্ডা ছিল। অনুমিত হয় যে ঐ অঞ্চল থেকে জিন-পর্বী বা মগ দস্যুদের বিভাডনকালে পীর বদরের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়েছিল। প্রতি বৎসর ২৯শে বমজান তারিখে এখানে উরস হয়। সে উরসে বহু লোক-সমাগম হয় এবং তাতে জনসাধারণের মধ্যে শিবনী বিভরণের প্রচলন আছে।

নওল কিশোর কর্তৃক প্রকাশিত এ মৌলবী মোলান নবী খান দ্বত মিরআতুল কনেনন নামক গ্রন্থ থেকে মৌলান হুম্মদ উবয়ল হক দ্বত তথ্যক্রমে আউলিয়াই বাঙ্গালা প্রথম হুজুর উল্লেখ পাঠে জানা যায় যে, মখদুম শাহ্ বদরুদ্দীন বদর আলম যাহিদীর পূর্ব-পুরুষ ছিলেন হুজুর



শিহাবুদ্দীন ইমাম মকী। তাঁৰ পুত্ৰ হজ্জৰত কককদ্দীন, ইসলাম প্রচাৰ উদ্দেশ্যে পিতাৰ আদেশে প্রথম এ দেশে এসে, মিৰাঠাবাদেৰ নিকট বাস কৰতে থাকেন। তাঁৰ পুত্ৰ দ্বিতীয় শিহাবউদ্দীন যখন শহীদ হন তখন তাঁৰ পুত্ৰ হজ্জবত কককদ্দীন মাতৃগৰ্ভে ছিলেন। তাঁৰই কনিষ্ঠ পুত্ৰ শাহ বদকদ্দীন বদব আলম যাহেদী মিৰাঠাবাদে জন্মগ্ৰহণ কৰেন। তিনি বাল্যকালে বিখ্যাত পবিত্ৰাজক সুহাববদ্দীন্ দববেশ হজ্জবত মখদুম জালালুদ্দীন জাহানীয়া জাহান গশতেব ( ১৩০৭-১৩৯৩ খৃঃ ) বিশেষ আশীৰ্বাদ লাভ কৰেন। তিনি পিতাৰ উপদেশ ও বিহাৰ শৰীফেৰ হজ্জৰত মখদুম শবফুদ্দীন আহম্মদ ইয়াহুইয়া মানেবীৰ ( ১২৬৩-১৩৮০ খৃঃ ) অনুমতিক্ৰমে তিন-চাৰ শত দববেশ সজে নিষে বঙ্গদেশে আসেন এবং চট্টগ্রামেৰ সমুদ্রোপকূলে আন্তান। স্থাপন কৰে ইসলাম প্রচাবে মনোনিবেশ কৰেন। পৰে হিঃ ৭৮২/১৩৮০ খৃষ্টাব্দে হজ্জবত মানেবীৰ সজে সাক্ষাতেৰ উদ্দেশ্যে বিহাৰ শৰীফে যান। কিন্তু তাঁৰ পৌছিবাব অল্প কিছুদিন পূৰ্বে মানেবী দেহত্যাগ কৰেন। সুদীৰ্ঘ জীবন যাপন কৰে হিঃ ৮৪৪/১৪৪০ খৃষ্টাব্দে শাহ বদকদ্দীন বদব আলম যাহেদী বিহাৰে ইন্তিকাল কৰেন। তাঁৰ বংশধৰগণেৰ মধ্যে নওৱাৰ শামসুল উলেমা মৌলবী সইয়িদ আবদুল জব্বাৰ খান বাহাছৰ ও তৎপুত্ৰ খান বাহাছৰ সইয়িদ আবদুল মুমিন ( চট্টগ্রাম বিভাগেৰ কমিশনাৰ / আগষ্ট ১৯৬৯ ) সুপৰিচিত। তাঁৰ অপৰ আন্তান। বৰমান জেলাৰ কালুনাৰ (জ্যেষ্ঠ্যঃ পূৰ্ব পাকিস্তানে ইসলামেৰ আলোঃ চৌধুৰী শামসুৰ বহমান) এবং বঙ্গের আৰো স্থানে আছে। চব্বিশ পৰগণা জেলাৰ বাবাসত মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পৃথিবা-বদর নামক গ্রামে বদব পীবেৰ একটি দবগাহ আছে।

বদকদ্দীন সংক্ষেপে বদব এই নামে আৰো পীবেৰ কিছু বিবৰণ পাওৱা যায়। চৌধুৰী শামসুৰ বহমান লিখেছেন :—

শেখ বদকল ইসলাম শহীদ, হজ্জবত নুব কুতুবুল আলমেৰ সমসাময়িক বলে জানা যায়। বিয়াডুস সালাতীন গ্ৰন্থে বলা হবোছে যে, ইসলাম প্রচাৰ কৰতে গিৰে তাঁকে অনেক অত্যাচাৰ সহ্য কৰতে হৱেছিল এবং পেশ পৰ্যন্ত বাজা কংসেৰ হস্তে তিনি শহীদ হন। বাজাৰ প্রতি সন্মান প্রদৰ্শন না কৰাৰ অপবাধেই তাঁকে হত্যা কৰা হবোছিল। আশবাক জাহাঙ্গীৰ সিমুনানী, জোঁনপুৱেৰ সুলতান ইব্রাহিম শৰীফ নিকট লিখিত পত্ৰে এই শহীদ দববেশেৰ কথা উল্লেখ কৰেন।

শামসুৰ বহমান সাহেব আৰু একজন পীৰেৰ কথা লিখেছেন,—দিনাজপুৰ জেলাৰ হেমতাবাদ নামক স্থানে পীৰ বদৰুদ্দীন বদৰে আলম নামক একজন প্ৰাচীন দৰবেশেৰ মাজাৰ বিদ্যমান। সুলতান হোসেন শাহেৰ সময় ( ১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ ) এ দৰবেশ কতিপয় শিষ্ট-সাগবেদসহ উত্তৰবঙ্গৰ এ অঞ্চলে ইসলাম প্ৰচাৰেৰ উদ্দেশ্যে নিষে আগমন কৰেন। দৰবেশ সম্পৰ্কে স্থানীয় জনশ্ৰুতি থেকে জানা যায় যে, মহেশ বাজা নামে জনৈক হিন্দু সামন্ত তখন এ অঞ্চলে বাস কৰতেন এবং তিনি ছিলেন ভীষণ অত্যাচাৰী। শেধ বদৰুদ্দীনেৰ প্ৰচেষ্টায় অল্প দিনেৰ মধ্যেই স্থানীয় বহু হিন্দু ইসলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰায় তিনি, দৰবেশ ও তাঁৰ অনুচৰদেৰ প্ৰতি বিদ্ৰিষ্ট হৰে ওঠেন। দৰবেশ তখন বাজাকে দমন কৰায় জয় সোলতান হোসেন শাহেৰ কাছে সাহায্য চেৰে পাঠান। বাজা তাতে ভীত হৰে স্বীয় প্ৰাসাদ ত্যাগ কৰে স্থানান্তৰে প্ৰস্থান কৰেন। এভাবে বাজাৰ পলায়নেৰ পৰ বদৰুদ্দীন পবিত্ৰত্ব বাজবাড়ীতে গিৰেই নিজেৰ আস্তানা কৰেন। প্ৰাচীন কোন হিন্দু মন্দিৰ বা প্ৰাসাদেৰ ধ্বংসাৱশেষ থেকে সংগৃহীত প্ৰস্তৰ-বাজিৰ সাহায্যেই পীৰ বদৰুদ্দীনেৰ সমাধি নিৰ্মিত হৰেছে দেখা যায়। বাবাসভেৰ অন্তৰ্গত পুথিৰা-বদৰে হে দৰগাহ আছে তাৰ বিৱৰণ এইকপ :—

বদৰেৰ হাটখোলাৰ অবস্থিত দৰগাহ-গৃহটি ইটেৰ তৈৰী। গৃহটি সুৰমা বটে। গোলাম সুলতান শাহজী প্ৰমুখ এখানকাৰ সেৱায়ত। প্ৰতিদিন সেখানে তাঁৰা ধূপবাতি প্ৰদান কৰেন। পূৰ্বে এখানে মেলা বসত। প্ৰতি বৎসৰ ১২ই মাঘ তাৰিখে বিশেষ অনুষ্ঠানেৰ মাধ্যমে পীৰেৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হয়। ভক্তগণ পীৰ বদৰেৰ নামে হাজত, মানত ও শিবনী প্ৰদান কৰেন। তাঁৰ নামে প্ৰাণ নষ্ট বিধা জমি পীৰোত্তৰ আছে। এখানকাৰ হাটেৰ নামকৰণ তাঁৰ নামানুসাৰেই হৰেছে। অনেকে তাঁৰ নাম স্মৰণ কৰে হাটে সওদা বেচা-কেনা কৰেন। এতদ্ব্যতীত তাঁৰ অলৌকিক শক্তিৰ পৰিচায়ক একটি লোককথা প্ৰচলিত আছে। লোককথাটি এইকপ :—

ফকিৰ বেৰে বদৰ পীৰ

স্থানীয় এক বেহালা-বাদক পালা-জুৰেৰ একোপে মৰণাপন্ন। তখন পালা-জুৰে তেমন কোন অব্যৰ্থ ঔষধেৰ কথা এ অঞ্চলে সম্ভৱতঃ অজানা ছিল। বেহালা-বাদক নিৰাশ হৰে মৃত্যুৰ জন্য অপেক্ষা কৰতে থাকেন। এমতাবস্থা দেখে পীৰ বদৰেৰ ভক্ত জনৈক ব্যক্তি উক্ত বেহালা-

বাদককে সেই পীবেৰ দৰগাহে ধৰ্মা দিতে পৰামৰ্শ দান কৰেন। তিনি কয়েকদিন বদৰ পীবেৰ দৰগাহে ধৰ্মা দেৱাৰ পৰা একদিন ভোৰেৰ আৰু আলোৱ আলখাল্লা পৰা এক ফকিৰকে দেখতে পেলেন। ফকিৰ তাকে জিজ্ঞাসা কৰলেন,—“তুমি এখানে ধৰ্মা দিচ্ছ কেন?”

বেহালাবাদক বললেন,—“আমাৰ ৰোগ নিৰাগল্পেৰ জন্তু।”

—“তোমাৰ বেহালাখান! আমাৰ দিলে আমি তোমাৰ বোগ সাৰিবে দিতে পাৰি।”

বেহালাখানি সব সময় তাঁৰ কাছে থাক্ত। তিনি তৎক্ষণাৎ বেহালাখানি ফকিৰকে দিতে গেলেন। আশ্চৰ্য্য! ফকিৰ অকস্মাৎ অদৃষ্ট হয়ে গেলেন। সকালে বেহালা-বাদক দোহুল্যমান মানসিক অবস্থা নিয়ে বাতী এলেন,—পীৰ কি তাঁৰ সঙ্গে হলনা কবলেন।

আৱে! আশ্চৰ্য্যেৰ বিষয় যে কয়েকদিনেৰ মধ্যে তিনি সম্পূৰ্ণভাবে বোগমুক্ত হয়ে উঠলেন।

বদৰ পীৰেৰ নামে বচিত কোন সম্পূৰ্ণ-গ্রন্থেৰ সন্ধান আছে। পাওবা যায় নি। কবি আশক মহম্মদ বচিত “পীৰ একদলি শাহ্ পাঁচালী কাব্যেৰ” মধ্যকাৰ ২২৬ পংক্তিৰ একটি খণ্ড-কাহিনী পাওবা গেছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইৰূপ :—

পীৰ একদলি শাহ্ দীক্ষা নেবাৰ জন্য চট্টগ্রামেৰ পীৰ বদৰেৰ সন্ধান চল্লেন। চট্টগ্রামে গিবে বাৰ সাক্ষাত পেলে তিনি আকৃষ্ট হলেন, সে একজন বাখাল বালক। বাখাল বালকটি তখন ছিল ক্ৰীড়ান মন্ত। এমনই মন্ত যে কোন দিকে তাৰ খেয়াল নেই। একদলি শাহ্ তাকে নেহাত বালক-বাখাল বলে মনে মনে একটু অবজ্ঞা প্রকাশ কবলেন। বাখাল-বালক আৰু কেউ নন, তিনিই পীৰ বদৰ। একদলি শাহ্ অবজ্ঞা কৰায় তিনি অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে যান। এই ঘটনাৰ একদলি শাহ্ সন্নিহিত ফিৰে পান এবং বদৰ পীৰকে পাবাৰ জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

একদলি শাহ্ তখন বদৰ পীৰেৰ অন্যতম ভক্ত ‘সকল্লাব’ শবণাপন্ন হন। সকল্লাব বাতীতেই পীৰ বদৰেৰ কবৰ। তিনি গেলেন সেই কবৰেৰ সন্ধান। কবৰেৰ মধ্যে পেলেন বদৰ পীৰেৰ গলিত দেহ। অনেক কৃচ্ছসাধনেৰ দ্বাৰা তিনি পীৰ বদৰেৰ সাক্ষাত পেতে চাইলেন, কিন্তু তাতেও দেখা না পাওৱায়

পীৰ একদিন আগুনে প্ৰবেশ কৰে আত্মাহুতি দিতে গেলেন। এবাৰ বদৰ পীৰ হলেন সন্তুষ্ট। আগুনকে তিনি ফুলে ৰূপান্তৰিত কৰে একদিন শাহেব জীবন ৰক্ষা কবলেন। পৰে তিনি একদিন শাহকে দীক্ষা দিবে শিষ্যত্বে বৰণ কবলেন এবং পীৰ একদিনকে কিছু অলৌকিক শক্তিতে শক্তিমান হতে সাহায্য কবলেন। এবাৰ পীৰ একদিন শাহ বিদায় নিলেন বদৰ পীৰেৰ নিকট থেকে।

উপৰোক্ত কাব্য ব্যতীত জইদি বচিত মানিক পীৰেৰ “জহ্বানামা পীচালাভে” সন্নিবেশিত বদৰ পীৰেৰ মাহাত্ম্যকথা বেশ দৃষ্টি আকৰ্ষণ যোগ্য।

দুস্তৰ নদীপথে যাত্ৰাৰ আগে মাঝিৰা নৌকাৰ যথাস্থানে উপবিষ্ট হৱে হাঁলে হাত বেখে ভক্তিভবে সমবেত সুৰে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন ;—

আমৰা আছি পোলাপান  
গাজী আছে নিগাবান।  
শিৰে গজা দৰিবা  
পাঁচ পীৰ বদৰ বদৰ ॥

মুফীবাদ ও আমাদেৰ সমাজ নামক গ্ৰন্থেৰ এক প্ৰবন্ধে মনিব-উদ্দীন-ইউসুফ লিখেছেন,—“হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্ৰদায়েৰ মাঝি-মাল্লাবাই তাদেৰ গানে এই সাধকেৰ নামকে যুগ যুগ ধৰে স্মরণীয় কৰে বেখেছে। হিন্দুবা বলে,—

আমবা আছি পোলাপাইন  
গাজী আছে নিগাবান,  
শিৰে গজা দৰিবা  
পাঁচ পীৰ বদৰ বদৰ।

মুসলমানেবা বলে :—

আমবা আছি পোলাপাইন  
গাজী আছেন নিগাবান,  
আল্লা নবী পাঁচপীৰ  
বদৰ বদৰ।

এই পীৰেৰ নাম নিষেই পূৰ্ববঙ্গ গীতিকাৰ তঁাব পালা শুভ কবনৰ এইভাবে .—

চাইব দিক মানি আমি মন বৈলাম হিব।  
মাথাৰ উপৰে মানম আশী হাজ্ৰাব পীৰ ॥  
আশী হাজ্ৰাব পীৰ মানম লাং পেদাহব।  
শিৰেৰ উপৰে মানম চাটীগাঁব বদৰ ॥

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

### বড়খাঁ গাজী

পীর মোবারক বড়খাঁ গাজী বঙ্গে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন নামে পৰিচিত। সে নামগুলি এইরূপ :-

মোবারক সাহু গাজী, ৬৮

বড় খাঁ গাজী, ১৩

বরখান গাজী, ৫৫

মব্বা গাজী, ৪৭

গাজী সাহেব, ১৫

গাজী বাবা, ৬৮।

সমগ্র চব্বিশ পরগণা জেলার পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর প্রভাব বিস্তৃত। তা ছাড়া যশোহর, খুলনা, নদীয়া, ময়মনসিংহ জেলার বহুস্থানে তাঁর প্রভাব আছে। তাঁর লীলা-ক্ষেত্র মূলতঃ চব্বিশ পরগণা জেলাকে নিবে প্রায় আট-দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী।

তাঁর পিতার নাম সেকেন্দার শাহ, ১৩ —মতান্তরে চন্দন শাহ, ৬৮। কারো মতে, তাঁর পিতা ছিলেন পীর গোবার্চাদের সহচর শাহু আবদুল্লাহ, ওরফে শাহু সোন্দলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর মাতার নাম কুলসম বিবি। ৪০

তাঁর জন্ম বেলে আদমপুরে, —মতান্তরে বৈরাটনগরে ১৩। বেলে আদমপুর ৬৮ গ্রামটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত। কিন্তু বৈরাটনগর গ্রামটি যে কোথায় তা জানা যায় না। তাঁর কবরস্থান আলিপুর সদরের ক্যানিং থানাধীন ঘুট্টাবাী গ্রামে, ৬৮ —মতান্তরে তাঁর যত্নে হয শ্রীহট্ট জেলাব শিবগাঁও গ্রামে অথবা গাজীপুরে। ১৩

পীর মোবারক গাজীর দেহ-বর্ণনা এইরূপ :-

তাহার কপেতে আলো হইল ডুবন।

শশীহট্টা নিদে রূপ অতি সুশোভন ॥

সেৱক বৰ্ণনা কৰা অক্ষম আমাৰ ।  
 দুনিয়াতে নাহি কিছু উপমা তাহাৰ ॥ ১৩

অথবা,

ইল্ল যেন স্বৰ্গমাৰ বডৰ্খ। গাজীৰ সাজ  
 দেখিব। জুড়ায় দুটি অঁখি ॥  
 গীবিদা হেলান গা মথুৰ পুচ্ছেব বা  
 খাবাসে তুলিয়া দেব পান ॥  
 মাথায় চিকন কালা হাতে ছিলিমিলি মালা  
 গাজী পড়ে বসিয়া কোবাণ ॥ ৫৪

অথবা,

মোৰাবক বসে আছেন কদম্ব তলাষ ॥  
 হাসা চিতা দুটি বাঘ আছে দুইদিগে ।  
 গাজীৰ মাথায় জট দেখে দুই বাঘে ॥ ৬৮

অথবা,

জট মাথে গুণেব চট্ গাথেতে দিবাছে ।  
 পঞ্চম বৎসবেব বালক হইবা বৰেছে ॥১৫

অথবা,

গাজী সাহেবেৰ মূৰ্তি সুশ্ৰী বীৰপুৰুষেৰ মত । বজ্ৰ ফবসা, সব সমস্ত  
 যোদ্ধাব বেশ পৰেন । মুসলমানী চোগাচাপকান, পিবান, পাৰজামাণ্ড  
 পৰেন । মাথায় টুপি বা পাগড়ী, মুখে লম্বা দাড়ি, গৌপ-জোডা কান পৰ্য্যন্ত  
 বিস্তৃত । জুলুফি নামানো, চোখ দুটি বড বড, এক হাতে অস্ত্র বা আশাদণ্ড,  
 অপৰ হাতে লাগায় । পাৰে বুট জতো, পা দুটি বেকাবেৰ উপৰ দৃঢ়ভাবে  
 স্থাপন কৰা । বাহন বৃহৎ আকৃতিৰ ঘোড়া । পূৰ্ণ মূৰ্তি বিবল । ৩৮

গাজীৰ পট আন্ততোষ মিউজিয়ামে আছে । ২

পীৰ মোৰাবক বডৰ্খ। গাজীৰ বিবাহ হৈছিল ব্রাহ্মণনগৰেৰ বাজা মুকুট  
 বাৰেৰ কণ্ঠা চম্পাবতীৰ সঙ্গে । চম্পাবতী অল্পদিনেই মৃত্যু বরণ কৰেন, বা  
 আত্মহত্যা কৰেন ।

মতান্তৰে চম্পাবতী আত্মহত্যা কৰেন নি বা অল্পদিনে মৃত্যুবরণ কৰেন নি ।

পীৰ মোৰাবক বডৰ্খ। গাজীৰ দুই পুত্ৰেৰ নাম পাণ্ডা যাহ । নাম দুটি  
 যথাক্রমে দুঃখী গাজী ও মেহেৰ গাজী । তাঁৰ কণ্ঠা ছিল কিনা জানা যাহ না ।

দক্ষিণ চব্বিশ পবনগণাব ঘুটিয়াবী শবীফে অবস্থিত পীৰ মোবাবক বডখাঁ গাজীব কবরস্থান বা দরগাহে প্রতি সাজ-সকালে ধূপবাতি দিয়ে তাঁর আত্মাৰ শান্তিৰ জন্য জ্বিয়ারত অর্থাৎ আল্লাহ্ তালার নিকট প্রার্থনা কৰা হয়। ভক্ত জনসাধারণ তাঁর কবরস্থানে ফুল, ফল, দুধ, বাতাসা প্রভৃতি দিয়ে থাকেন। তাঁরা হাজত, মানত এবং শিবনিও দিবে থাকেন। তাঁর বংশধবগণই এখানকাৰ দরগাহেৰ সেবায়েত। বৰ্তমান (১৯৬৯) সেবায়োত্তগণেৰ বযোজ্যোঠ মোহাম্মদ আজিজ দেওয়ান (৮০), নানাজী (৮৫) মোহাম্মদ সৈয়দ আলি (৮২) প্রমুখ বলে অভিহিত।

ঘুটিয়াবী শরীফে প্রতি বছর ৭ই আষাঢ় তাবিখ থেকে সাতদিনের এক মেলা বসে। উক্ত তাবিখটি পীৰ মোবাবক বডখাঁ গাজীব তিবোধান দিবস বলে চিহ্নিত। উক্ত মেলা উপলক্ষে জনসাধারণেৰ যে সমাগম হয় তাৰ গড় পরিমাণ প্রায় ছয়-সাত হাজাব।

প্রতি বছর ১৭ই শ্রাবণ তাবিখে ঘুটিয়াবী শবীফে পীৰ মোবাবক বডখাঁ গাজীকে স্মরণ কৰে যে “উবস” উৎসব উদ্‌যাপিত হয় তা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। একদিনেৰ সেই উৎসবে লক্ষাধিক লোকেৰ সমাগম হয়। শিখালদহ থেকে বিশেষ ট্রেনেৰও ব্যবস্থা কৰ্ত্তে হয়। বজ্জেৰ বিভিন্ন অঞ্চল এবং বজ্জেৰ বাইৰে থেকেও বহু ভক্তেৰ আগমন ঘটে। এখানকাৰ মেলা, মেলা-প্রধান বাংলাৰ অন্যতম বিশেষ মেলা বলে প্রসিদ্ধ।

ঘুটিয়াবী শরীফে অবস্থিত পীৰ মোবাবক বডখাঁ গাজীব সমাধি বা দরগাহটি একটা সুদৃশ্য সৌধ বিশেষ। সৌধটি অনেকের নিকট গাজী বাবাব দরবাব নামে পরিচিত। দববার বা দবগাহেৰ গা খেঁসে ছোট-বড় কুটীৰ গড়ে উঠেছে। সেখানে পীরের দরগাহে দিবার জন্য প্রস্তুত শিবনি অর্থেৰ বিনিময়ে পাওয়া যায়। দবগাহেৰ পাশে বাজাব গড়ে উঠেছে। সেখানে গোমাংস ব্যতীত প্রায় সব পশাৰ পাওয়া যায়। ঘুটিয়াবী স্টেশন সংলগ্ন স্থানটি সব সময়ই জনবহুল। এখানকাৰ প্রধানতঃ দুটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যথা—

- ১। এখানে কেহ এমন কি কোন মুসলমানও গোমাংস গ্রহণ কৰেন না অর্থাৎ গোমাংস গ্রহণেৰ রীতি একেবাবেই নিষিদ্ধ। কথিত আছে যে জববদস্তি কেহ গোমাংস গ্রহণ কৰে সেই অবস্থান যদি সে দরগাহে প্রবেশ কৰে তবে তাৰ বক্তবমন হয় এবং তাতেই নাকি তাৰ মৃত্যু ঘটে।

২। পীৰ মোবাবক বডৰ্থা গাজী বড জববদস্ত পীৰ। কথিত আছে যে তিনি খুব উগ্রম্ভাববেব। তাঁৰ নামে কেউ অসম্মান-জনক উক্তি কৰুলে তিনি তাকে ক্ষমা কবেন না, তাতে ঐ ব্যক্তিৰ কোন মাৰাত্মক ব্যাধি হবে অথবা তাকে কোন দুৰ্ঘটনায় পড়তে হবে। অবশ্য বিপদাপন্ন হলে পীৰেব শবণ নিলে তাৰ নাকি বিপদমুক্তি হ'বে থাকে।

পীৰ মোবাবক বডৰ্থা গাজী একজন ঐতিহাসিক পীৰ। তাঁৰ কীৰ্তি-কলাপেৰ বৰ্ণনায় ক্ৰমান্বয়ে বং মিশ্ৰিত হলে জনসাধাৰণেৰ বনে তাঁৰ প্ৰভাব উত্তৰোত্তৰ বৃদ্ধি পেমেছে বলেই ওষাকিবহাল মহলেব বিশ্বাস।

“খাজীখোমে একটা প্ৰাচীন বৃহৎ পুষ্কৰিণীৰ দক্ষিণ-পূৰ্ব পাড়ে বডৰ্থা গাজীৰ আন্তানাটী অবস্থিত। পুষ্কৰিণীৰ উত্তৰ, দক্ষিণ ও পশ্চিম পাড়ে বাঁধানো প্ৰশস্ত ঘাট আছে। ইটক-নিৰ্মিত আন্তানা-ঘৰটী দক্ষিণমুখী; সম্মুখে বাৰান্দাযুক্ত ও উগৰে গম্বুজ বিশিষ্ট। সংস্কাৰ অভাবে ঘৰটী জীৰ্ণতাপ্ৰাপ্ত হইয়াছে। এই ঘৰেৰ মध्ये মাখাৰ পাগডী বাঁধা, মুখে চাপদাড়ি, পাৰে জুতা এবং দক্ষিণ হস্ত উৰ্দ্ধে তুলিয়া সোন্ধাবেশী অম্মাবোহী বডৰ্থা গাজী সাহেবেব মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠিত আছে। মূৰ্তিটী মনুষ্যপ্ৰমাণ হইবে। .... বডৰ্থা গাজীৰ নিষমিত পূজা হয় না। শুভবা যে যখন আসেন তখনই পূজাৰ আয়োজন কৰা হয়। সুন্দৰবনে বাঁহাৰা কাঠ কাটিতে অথবা মধু সংগ্ৰহ কৰিতে যান তাঁহাৰা প্ৰায় প্ৰত্যেকেই বডৰ্থা গাজীৰ আন্তানাৰ হাজত-পূজা দিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন প্ৰতি বৎসৰ নন্দান্নান উপলক্ষে যে সকল রাজী চক্ৰতীৰ্থে আসেন, তাঁহাৰা খাভীতে স্নান সাৰিষা গাজীৰ উদ্দেশে পূজা দিয়া যান।”

( পশ্চিমবঙ্গেৰ পূজা-পাৰ্বন ও মেলা, ৩য় খণ্ড, ১৯৫৮। )

পূৰ্ববঙ্গে প্ৰচলিত গাজীৰ গীতে পাঁচ পীৰেৰ কথাৰ গাজীৰ নিম্নকপ পৰিচয় পাওয়। যাৰ :-

পোডা বাজা গযেশদি,                      তাব বেটা সমসদি  
পুত্ৰ তাব সাই সেকেন্দাৰ।  
তাব বেটা বৰখান গাজী,                      খোদাবন্দ মুলুকেব বাজী  
কলিয়ুগে যাব অবসব।  
বাদসাই ছিডিল বঙ্গে,                      কেবল ভাই কালু সঙ্গে  
নিজনামে হইল ফকিব। ১৭



বাবাসত মহকুমার পাথবা নামক গ্রামে পীর মোবারক বডখাঁ গাজীর নামে একটি নজরগাহ আছে। সেটি প্রাসাদ বা গৃহ নয়। স্থানটি পুৰাতন ইটের একটি গৃহাকৃতি বিশেষ। প্রাচীন অশ্বখ, নিম, জাম, শিবির প্রভৃতি গাছে অঞ্চলটি সমাবীর্ণ। স্থানটি কেন্দ্র করে প্রায় বোল বিঘা পীরোত্তর জমি রয়েছে। তার কিছু অংশে সম্প্রতি চাষ হয়। পীরোত্তর সেই স্থানকে স্পর্শ করে বাবাসত—হাসনাবাদ রেল লাইন বিস্তৃত। এই স্থানে শিরনি-হাজত-মানত প্রদত্ত হয়ে থাকে। এই দরগাহের পূর্বতন খাদিমদার মোহাম্মদ সোন্দল শাহজী (৫৫) জানান যে, তাঁর কোন এক পূর্বপুরুষ তৎকালীন বাংলার সুবাদারের কাছ থেকে উক্ত দরগাহ-চিহ্নিত স্থান পীর বডখাঁ গাজীর নামে পীরোত্তর পান। কোন মৌলভীর পরামর্শক্রমে নাকি এই নজরগাহে জিবাবত উপলক্ষে ধূপ-বাতি দিবার যে বীতি ছিল তা বন্ধ হয়ে যায়। ধূপ-বাতি দিবার পুনরুদ্ধার হয় ১৯৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা ইফার্ণ বেলওয়ারেতে চাকুবীতে নিযুক্ত থাকা সূত্রে পাথবা-দাদপুরে অবস্থিত বেল ফটকে আগমনের পর এক দৈব ঘটনা থেকে সেই পুনরুদ্ধারের সূচনা। বেলকর্মীটির নাম শ্রীমদন মোহন মণ্ডল। শ্রীমদন মণ্ডলই বর্তমানে (১৯৬৯ খৃঃ) উক্ত নজরগাহের সেবায়ত রূপে ধূপ-বাতি প্রদান করতে আবৃত্ত করেছেন। বহুদিন পূর্বে এখানে বিবাটি মেলা বসত। কোন্ বিশেষ তাবিধে মেলা-অনুষ্ঠান আবৃত্ত হত তা আজ আর নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে সোন্দল শাহজী জানানলেন যে প্রতি চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহের কোনও একদিন সেই মেলাব সূত্রপাত হত। কি কারণে যে মেলাটি বন্ধ হবে গেছে তা আজ অজ্ঞাত।

পীর 'মোবারক বডখাঁ গাজীর নামে চিহ্নিত নজরগাহের একেবারে পাশেই অবস্থিত আছে মানিক পীরের একটি "স্থান"। পীরোত্তর জমির মধ্যে আবে আছে ছোট অথচ গভীর একটি পুকুর। তাকে পীর পুকুর বলা হয়। মাঠের বিচরণবত গরু বাছুর এই পুকুরের পানি পান করে পিপাসার তৃপ্তি করে। এখানকার একটি তালগাছের পাতা কাটাঁব একটি বীতি আছে। সাধারণতঃ ঐ গাছের পাতা কেউ কাটে না, যদিও কেউ কাটে তবে সে বাধ্যতামূলকভাবে অন্ততঃ দুইশানি পাতা গাছে বাধে। ঐকপ না করলে পীর ক্রুদ্ধ হন। তার ফলে উক্ত ব্যক্তির ক্ষতি হতে পারে বলে স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা। পীরের ভক্তগণ নজরগাহ-স্থানে দুধ, ফল-মূল, ধানের প্রথম আঁটি প্রভৃতি দান করে থাকেন।

বাবাসত মহকুমাব বাবাসত থানান্তর্গত উলা নামক গ্রামে পীব মোবাবক বড়খাঁ গাজীব নামে আর একটি নজবগাহ আছে। নজবগাহ-স্থানটির পৰিমাণ বর্তমানে (১৯৭১) প্রায় চাব-পাঁচ কাঠা। স্থানীয় কোন কোন অধিবাসীব নিকট শুনা যায় যে পূর্বে এখানে প্রায় সাঁইত্রিশ বিঘা পীবোত্তব জমি ছিল। বর্তমানে নজবগাহ স্থানটিতে ভূপাদি কোন চিহ্নও নেই। সাদা জমির উপর কিছু বিক্ষিপ্ত ইট দেখা যায়। উক্ত পীবোত্তব জায়গাব মধ্যে মসজিদ ও একটি হাই মাদ্রসা বয়েছে। এখানকাব বর্তমান সেবায়েত বা খাদিমদাব হলেন মহম্মদ শামসুজ্জহা মোল্লা (৬০) প্রমুখ। মূল সেবায়েতব নাম মুসী দবিকন্দীন মোল্লা বলে জানা যায়। তিনি উক্ত পীবোত্তব জমি পেয়েছিলেন ৮২নং স্বামবাজাব স্ট্রীট, কলিকাতাব কৃষ্ণচন্দ্ৰ বসু মহাশয়েব মাতা মাতঙ্গিনী দেবীর নিকট থেকে। অনেকে আরো বলেন যে, গাজীসাহেব নাকি তাঁব সহচব কালুকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। প্রতি বছবেব মাঘ মাসে নাকি এখানে মেলা বসত এবং তাতে প্রায় হাজ্জার লোকেব সমাবেশ হত।

এখানকাব নজবগাহ 'থানে' ধূপ-বাতি প্রদত্ত হত। অনেকে হাজত, মানত বা শিবনিও দিতেন।

বসিবহাট মহকুমাব অন্তর্গত বসিবহাট থানাধীন ফতেপুর নামক গ্রামে পীব মোবাবক বড়খাঁ গাজীব নামাঙ্কিত একটি নজবগাহ আছে। এখানে পাঁচ-ছয় কাঠা জমি পীবোত্তব হিসাবে পতিত আছে। পূর্বে নিষমিতভাবে এখানে ধূপ-বাতি প্রদত্ত হত, প্রতি পৌষ মাসে মেলা বসত। এখনও (১৯৭০) কেহ কেহ মোবগ বা খাসি হাজত দেন,—অনেকে হুধ, ডাব, বাতাসাদি দিবে থাকেন। সর্বসাধাবণই এখানকাব সেবায়েত।

জানা যায় স্থানীয় মোহাম্মদ মাদাব খাঁব পুত্র মোহাম্মদ আজাব আলি খাঁব নাকি শিশুকালে এক কঠিন ব্যাধি হবোছিল। পীব মোবাবক বড়খাঁ গাজীব উক্ত নজবগাহে মানত কবে তিনি বোগমুক্ত হন। মানত অনুযায়ী বোগমুক্ত হয়ে তিনি সাত-পাল। জাবীগান-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন কবে ছিলেন।

উপবোক্ত স্থানসমূহ ব্যতীত বঙ্গের অনেক স্থানেই পীব মোবাবক বড়খাঁ গাজীব নামে নজবগাহ আছে। তাদের মধ্যে কয়েকট স্থানের নাম,—

বাবাসত মহকুমা, হাবড়া থানা,	লটনী গ্রাম,
আলিপুৰ ... .	নারায়নপুৰ
আলিপুৰ .. .	শাহপুৰ,
সোনারপুৰ থানাধীন	সাজুৰ
সোনারপুৰ থানাধীন	নভাসন
বাকইপুৰ থানান্তর্গত	বাকইপুৰ

এইরূপ অনেক স্থানে বড়খাঁ গাজীর নজবগাহ আছে ।

পীর মোবাবক বড়খাঁ গাজীর জীবন ও তাঁর কীর্তিকলাপ সম্বলিত কাব্য-কাহিনী বা গদ্য-কাহিনী বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে । দুতাদের কয়েকখানি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে লিপিবদ্ধ করা হ'ল,—

### ১। গাজী-কালু ও চম্পাবতী কন্ঠার পুথি

গাজী কালু ও চম্পাবতী কন্ঠার পুথি বচরিত। পাঁচালীকাব আবদুৰ রহিম সাহেবের বিবরণ বিস্তৃতভাবে পাওরা যায় না । তিনি তাঁর পাঁচালী কাব্যের একস্থানে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,—

আবদুৰ বহিম আমি  
হীনেব বচন,  
পরিচয় শোন মোব  
কোথাখ ডবন ।

মহমদসিংহ জেলায় বাস গলাচিপা গ্রামে,  
আশুত্যাৰ বাজারের উত্তর পশ্চিমে ।  
বাড়িৰ দক্ষিণে নদী নলন্দা নামেতে,  
মহকুমা কিশোরগঞ্জের অধীনেতে ।  
জোষাব হোসেনপুৰ তাব অশুঃপাতি,  
আছি কতদিন আমি কবিতা বসতি ।

কবি আবদুৰ বহিম সাহেব বচিত আব কোন পুস্তকের সন্ধান পাওরা যায় না । তিনি যে কিছু কিছু ইতিহাস জানতেন তা বুঝা যায় । কারণ তিনি তাঁর কাব্যে বখাওসঙ্গে খ্রীষ্টের পীৰ শাহ জালালের সহিত তৎস্থানীয় রাজা গোবর্গোবিন্দের যুদ্ধ-বখা উল্লেখ ববেছেন । কবির জীবকাল জানা

হাৰ না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঁচালী কাব্যটি বচিত হৈছিল বলে অনুমিত হয়।

পাঁচালীকাব কবি আবদুৰ রহিম বচিত কাব্যখানি ৯২"×৬" আকৃতি বিশিষ্ট। পুস্তকখানি মুদ্রিত। তাব পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র বিবানকই। তাব শব্দগুলি হেমিটিক বীতিতে এবং পৃষ্ঠাগুলি সেমেটিক বীতিতে সজ্জিত—অর্থাৎ ডানদিক থেকে বাঁ দিক পৃষ্ঠা উল্টে পাঠ করতে হয়। গ্রন্থখানি হাম্‌দো-নাত্ [বন্দন।] এবং কেছা [কাহিনী] এই দুই প্রধান অঙ্গে বিভক্ত। আবাক কেছাব মধ্যে নিম্নলিখিত বিভাগটি রয়েছে;—

গাজীর জন্ম ও ককিরহু গ্রহণের বয়ান

বক্তৃতঃ এই অংশে কাহিনী সম্পূর্ণ কবা হয়েছে। আর কোন শিবোনামা কবি কেন দেন নি তা অজ্ঞাত। কাব্যে নিম্নপরিচয়ের ঊনচল্লিশটি গীত আছে,—

গীতের তালের নাম	গীতের সংখ্যা
আন্ধা	২৩
খয়েরা	১
আভা	১
ঠাস কাওষালি	১
ঠেকা	১
ধুবা	১২

সমগ্র কাব্যখানি পরাব ও ত্রিপদী এই দুই প্রকার ছন্দে বচিত। তাদের নমুনা এইকপ :—

পরারঃ

প্রথমে বন্দিনু নাম প্রভু নিবন্ধন ॥

এ তিন ভুবনে যত তাঁহার সৃজন \*

ত্রিপদীঃ

বৈরাট নগরে ধাম, শাহা সেকেন্দাব নাম,

রূপে যিনি পূর্ণ শশধর ॥

নগরের শোভা তাব, কি কব বয়ান আব

স্বর্গভূলা দেখিতে সুন্দর \*

অবশ্য পন্নাব ও ত্রিগদী ছন্দে উপবোক্ত রূপ সুস্পষ্ট বিভাগ অনুযায়ী পদ্যের আকারে লিখিত নয়,—কেবলমাত্র গীতগুলি প্রতি চরণে মিল করে পদ্যের আকারে সাজিয়ে লেখা। একেবারে পদ্যের আকারে লিখিত সেগুলি পাঠকবর্গের বুঝবাব সুবিধার্থে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রতি প্রথম পংক্তির শেষে দুই দাড়ি এবং প্রতি দ্বিতীয় পংক্তির শেষে তাবকা চিহ্ন আছে। ত্রিগদী ছন্দে লিখিত অংশে 'কমা' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। পদ্যের আকারে লিখিত হলে পাঁচালী কাব্যখানি প্রায় তিনশত পৃষ্ঠার গ্রন্থ হতে পারত।

পাঁচালী কাব্যখানি মূলতঃ সরল বাংলা ভাষার রচিত হলেও তাতে আবর্বা ও ফার্সী শব্দ মিশ্রিত হয়েছে। কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে একই শব্দ দুইবারেব স্থলে একবার লিখে তাবপরই '২' লিখিত হয়েছে। কোথাও বা ত্রিগদী পদান্তে 'ক' যোগে বিদ্যাসাগরী বীতি অনুসৃত হয়েছে। অনেক স্থলে অশুদ্ধ বানান রয়েছে। কতকগুলি নাম, যথা স্ত্রীদামকে স্ত্রীদাম, সম্ভবতঃ চম্পাই নগরকে ছাপাইনগর, দক্ষিণ বারকে দক্ষিণা দেও প্রভৃতি বিকৃত ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ইহা হয়ত কবির ইচ্ছাকৃত নয়,—হয়ত ভাষাব ওপব কবির দখলের অভাবের কাবশে ঘটেছে।

### সংক্ষিপ্ত কাহিনী :

বৈরাট নগরের অধিপতি শাহা সেকেন্দার যেমন ধনবান এবং শক্তিমান তেমনই দয়ালব। পাতালের রাজা তাঁকে রাজকর দিতে অস্বীকার করার অনিবার্য হুদে পাতাল-রাজ পরাজিত হলেন। আত্মসমর্পণ করে তিনি নিজের সুন্দরী কন্যা অজুপাকে শাহা সেকেন্দারের সঙ্গে বিবাহ দিলেন।

সেকেন্দার শাহাব ওবসে ও অজুপার গর্ভে যথাক্রমে জুলহাস সুজন এবং গাজী নামক দুই পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে। তাছাড়া বাপী অজুপা একদিন সাগরে স্নান করতে গিয়ে ভাসমান এক কাঠের সিন্ধুকের মধ্যে এক শিশু-পুত্রকে পেলেন। সেই শিশুও তাঁর পুত্ররূপে প্রতিপালিত হতে লাগল। তাঁর নাম রাখা হল 'কালু'।

জ্যেষ্ঠপুত্র জুলহাস বয়ঃপ্রাপ্ত হল। একদিন শিকারে গিয়ে সে মাষায়ুগের পশ্চাদধাবন করে পাতালে জঙ্গ রাজার রাজ্যে উপস্থিত হল। জঙ্গ বাহাদুর সুদর্শন জুলহাসের সাক্ষাত পেয়ে খুশী হলেন। তিনি তাঁর একমাত্র কন্যাকে জুলহাসের হাতে সমর্পণ কবলেন। জুলহাস সুজন সেখানে বধু "পাঁচতোলা" ও অন্যান্য পবিজনসহ বয়ে গেল।

কনিষ্ঠপুত্র গাজীৰ বয়স দশ বছৰ হলো। সেকেন্দাৰ শাহ পুত্র গাজীকে সিংহাসনে আৰোহন কৰিতে আদেশ কবলেন। গাজী তাতে সম্মত হলেন না, কাৰণ তাঁৰ ভখন বৈবাগ্য-ভাব উপস্থিত হৈছে। সেকেন্দাৰ ক্রুদ্ধ হইয়ে গাজীকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড কৰিতে জল্লাদকে হুকুম দিলেন। জল্লাদেব অস্ত্রাঘাতে গাজীৰ দেহে কোন ক্ষতও হল না।

তিনি আৰো ক্রুদ্ধ হৈ গাজীকে দশটি হাতীৰ পাৰেৰ তলাৰ ফেলে হত্যা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিলেন। তাকে হাতীৰ পাৰেৰ নীচে দেওয়া হল কিন্তু কিছু হল না, বৰং হাতীৰ দাঁত ও পা ভেঙে গেল। গাজীকে আগুনেৰ কুণ্ডে নিক্ষেপ কৰা হল। আল্লাকে স্মৰণ কৰাৰ গাজীৰ গাৰে আগুনেৰ তাপ লাগল না। দশ মন ওজনেৰ পাথৰেৰ সংগে যৈঁ যৈঁ গাজীকে সাগৰেৰ জলে নিক্ষেপ কৰা হল,—তবু তাঁৰ কিছু হল না,—বৰং পাথৰও জলে ভাসতে লাগল। গাজী যে ফকিৰ হৈছেহে,—তাঁকে মাৰে এমন সাধ্য কাৰ।

সেকেন্দাৰ শাহ পুত্ৰেৰ ফকিৰিৰ খাঁটিছ পৰীক্ষাৰ জন্তু সাগৰেৰ জলে মাৰ্কা-মাৰা সূঁচ ফেলে দিলে তাকে কুড়িয়ে আনতে বললেন। গাজী স্মরণ কবলেন আল্লাহকে। আল্লাহ তাতে সাভা দিবে খোষাজকে ডেকে এনে তাৰ কাছে সব বিবৰণ শুনলেন। আল্লাহেৰ অনুমতি অনুসাৰে খোষাজ ডেকে আনলেন সুৰ ও অসুৰি নামক দুই দানবকে এবং গাজীৰ আদেশ পালন কৰে সমুদ্র থেকে সূঁচ খুঁজে আনতে বললেন। দানবদ্বয় সমুদ্র সেচন কৰেও সূঁচ পেল না; পেল পাতালেৰ ফলানিৰ বেটীৰ মাথাৰ চুলে। দানবদ্বয় সেখান থেকে সূঁচ সংগ্ৰহ কৰে এনে দিল গাজীৰ হাতে। গাজী পিতাৰ হাতে সেই সূঁচ দিলেন। সেকেন্দাৰ শাহ এবাৰ নিবস্ত হলেন। তিনি তবু পুত্ৰকে পুনৰাৰ বাজ্যভাৰ গ্রহণ কৰাৰ জন্তু অনুৰোধ জানালেন। গাজী সেবাৰও ঐস্তাৰ প্রত্যাখ্যান কৰে পিতাকে ‘সালাম’ জানিষে বিদায় নিষে গেলেন মাতাৰ কাছে। গাজী সেই গভীৰ বাত্ৰে নিদ্রামগ্ন সকলকে বেখে ফকিৰেৰ বৈশ ধাৰণ কৰে গৃহত্যাগ কবলেন। গৃহ প্রাঙ্গন ত্যাগ কৰাৰ পূৰ্বে দেখা হল কালুৰ সঙ্গে। কালুও দৃঢ় মন নিয়ে গাজীৰ অনুগমন কবলেন।

প্রাতঃকালে গাজী ও কালুকে নগৰেৰ মধ্য পাওয়া গেল না। গাজীৰ বিবাহে সকলে হাস হাস কৰে কেঁদে উঠল,—কাঁদল হাতী, ঘোড়া, গৰু, পাখী প্রভৃতি।

ফকির গাজী ও কালু পথ চলেছেন। চলতে চলতে এসে উপনীত হলেন সমুদ্রতীরে। সমুদ্র পার হওয়া যাব কি করে। তাঁরা শরণ নিলেন আল্লাহ তালার। আল্লাহের পরামর্শে তাঁরা হাতেব “আশাবাড়ি” সমুদ্রের উপর ফেলে আশাতরী-যোগে ভাসতে ভাসতে এসে উপস্থিত হলেন বাঙ্গলা দেশের সুন্দরবনাঞ্চলে। এখানে থাকাকালে সুন্দরবনের প্রায় সকলে গাজীর শিহ্নত্ব গ্রহণ কবল।

সাত বছর সেখানে থাকার পর দুই ফকির আবার যাত্রা শুরু করলেন। চললে চলতে গেলেন ছাপাই নগরে। এখানকার রাজা শ্রীদামের বাড়ির সামনে এসে তাঁরা জিগীব বা উচ্চৈঃস্বরে আওবাজ দিলেন—“ল। এলাহ।।”

এত বড় স্পর্ধা,—বাড়ীর সামনে মুসলমানের আগমন এবং জিগীব ছাড়া। জুড়ু হয়ে রাজা তখনই কোটালকে হুকুম দিলেন যে ফকিরদ্বয়কে গর্দান ধরে নগর থেকে বেব কবে দাও।

দুর্ধর্ষ গাজী ও কালু দুঃখিত হয়ে নিকটবর্তী এক কাননে প্রবেশ কবলেন। খেদবত দুই ফকিরের দুঃখে সহানুভূতিশীল হয়ে আল্লাহ তাল। আহাৰ্য্য পাঠিয়ে দিলেন। গাজী ও কালু সেই আহাৰ্য্যে তৃপ্ত হলেন। কালু ভাবলেন, এমন দুর্দাচার রাজার বাড়ীতে আগুন লাগলে ভালই হত। সত্য সত্যই বাজবাটীতে, তথা বাজধানীতে আগুন ধরে গেল। বহু ধন-সম্পদ অগ্নিদগ্ধ হল। রাজা শ্রীদাম তখনই জ্যোতিষী ডাকিয়ে আগুন লাগার রহস্যজেনে নিলেন এবং তাঁর পরামর্শে গাজী ও কালুর পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। রাজাকেও বাজপুরীর সকলকে কলেমা পাঠে মুসলমান হতে হল। পুর্বী আগুন নিভে গেল, যেমনকার পুর্বী তেমনই অক্ষত রূপ ফিরে গেল। রাজা সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে দিলেন। দুই ফকিরের সুখে দিন কাটতে লাগল।

ফকিরের শয্যা বন, ধূলা, মাটি-ছাই। মাষাব জালে আবদ্ধ সুখের জীবন তো ফকিরের জন্ত নয়। সুতবাং গাজী ও কালু তখনই শ্রীদাম বাজার রাজ্য ছেড়ে চললেন—অন্তঃ, অন্তঃখানে।

তাঁরা বুঝলেন, “কাটিলে মাষাব জাল কেহ কাব নয়।” নগরবাসী তাঁদের বিচ্ছেদে বোদন কবতে লাগল।

দ্রাম্যমান ফকিরদ্বয় এলেন এক গভীর অবণ্যে। সেখানে কর্মবত সাতজন কাঠুরিয়ার সাথে তাঁদের হল সাক্ষাত। কাঠুরিবারা বড়ই গর্বী, কিন্তু

অভিথি আপ্যায়নে তাদের সে কি আন্তরিকতা। পরম সন্তুষ্ট হয়ে গাজী সেই কাঠবিয়োগণের হুঃখ দূর করার জন্ত তাদেরকে সঙ্গে নিলেন। এরপৰ তাঁরা এলেন সমুদ্রের তীরে। সেখানে গাজী যেইমাত্র “মাসি মাসি” বলে ডাক দিলেন, সেইমাত্র এক দেবী ভেসে উঠলেন জলের উপর। গাজী তাঁর মনের বাহা প্রকাশ কবলেন। দেবী ও তদীয় কথা সেই ফকিরের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে বহু ধনবত্ত দান কবলেন। গাজী, সাহা-পরীকে ডাকিয়ে সেই জঙ্গল কাটিয়ে এক সুন্দর পুৰী নির্মাণ কবতে আদেশ দিলেন।

সাহা-পরী আনলো আৰো বাহান্ন হাজাৰ পৰী। দুই দিনের মধ্যে তাৰা নগরী গড়ে দিল। সাধাৰণ মানুৰ সেই পুৰী দেখে চমৎকৃত হল। প্রজাগণকে কব দিতে হৰ না,—তাৰা সবাই পেল লাখেবাজ। শহৰেব সে এক অপকণ শোভা; তাৰ নাম রাখা হল সোনারপুৰ।

গাজী ও কালু পরম আনন্দে সোনারপুৰে অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন কোকাক থেকে হৰজ্ঞান পৰী এল। তাৰা গাজীৰ রূপ দেখে মুগ্ধ। দক্ষিণ নগৰেব মটুক বাজার কথা চম্পাবতী ভিন্ন গাজীৰ রূপেব তুলনা নেই। পৰীগণ নিদ্রাভিভূত গাজী ও চম্পাবতীৰ মিলন ঘটাল। গাজী ও চম্পাবতী পবম্পর পরম্পরেব প্রেমে মুগ্ধ হয়ে বিবাহে সন্মত হলেন। কিন্তু মুসলমান ফকির গাজীৰ পরিচয় পেয়ে চম্পাবতী লজ্জায়, কোভে ভেঙে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দেখলেন “গাজী বিনে সংসাবেতে পতি নাহি আর।” চম্পাবতী সম্পূর্ণরূপে গাজীৰ উপব নির্ভর কবলেন। কিন্তু গাজী বিবাহেব পূৰ্ব পর্যন্ত চম্পাবতীকে পত্নীত্বে বরণ কবলেন না,—শুধু ইসলাম ধৰ্মে দীক্ষা দিলেন।

পবদিন গাজী ও কালু পথে নেমে এলেন। গাজী তখন সবিস্তাবে চম্পাবতীৰ সঙ্গে তাঁব মিলন কথা কালুৰ নিকট ব্যক্ত কবলেন। অতদিকে চম্পাবতীও তাঁর তাঁব মনের কথা জননী লীলাবতীর নিকট ব্যক্ত কবলেন। লীলাবতী, কথা চম্পাবতীকে সান্ত্বনা দিলেন যে “তাৰ ধ্যানে রহ তাবে ঘৰে বসি পাবে।” কালু,—গাজীৰ আতীশা পূরণেব জন্ত ব্যবস্থা কবতে দক্ষিণানগর অভিমুখে যাত্রা করলেন।

দক্ষিণানগৰে প্রবেশেব পথে কালু এলেন এক নদীৰ তীরে। খেলাঘাটের পাটনীর নিকট থেকে তিনি জানতে পেলেন যে দক্ষিণানগৰে কোন শূদ্ৰের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কোন শূদ্ৰ সেখানে প্রবেশ করলে তাৰ প্রাণ হানি হওযাব



সম্ভাবনা। কালু সব ভীতিকে উপেক্ষা কবে নগবে প্রবেশ কবলেন এবং রাজসভায় উপস্থিত হবে সজ্ঞাবে আওয়াজ দিলেন,—“ইল্লাল্লাহী!”

রাজা ক্রোধাক্ত হবে কোটালকে আদেশ দিলেন,—খাড ধবে এ ফকিবকে বেব কবে দাও।

কালু আর অপেক্ষা না কবে পূর্ব ঘটনা উল্লেখ কবতঃ সবাসবি গাজীর সঙ্গে চম্পাবতীর বিবাহের প্রস্তাব দিলেন।

কালুব এই প্রস্তাবে অপমান, ঘৃণা ও ক্রোধে অগ্নিসম হয়ে বাজা দূত কঠে কোটালকে হুকুম দিলেন,—“হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে, বুকে দশ মণ ওজনের পাথর চাপিয়ে একে কাবাগাবে বন্দী রাখ।”

বাজা ‘ভেগ’ নিষে চম্পাবতীকে গ্রহণ কবতে ছুটে গেলেন, কিন্তু চম্পাবতী কোঁশলে আত্মরক্ষা কবলেন।

গাজী উদ্বিগ্ন,—কালুব কিবতে দেবী কেন। কালু বন্দী অবস্থায় কাবাগাব থেকেই গাজীকে স্মরণ কবছেন। গাজী ধ্যানযোগে কালুব অবস্থা জানতে পারলেন। কালুব জন্মে তিনি কেঁদে ফেললেন। বিপদের দিনে আহান জানালেন বাঘ-শিয়গণকে। সুন্দরবনের বিভিন্ন দিক থেকে বাঘগণ ছুটে এল তাঁর কাছে। তারা সদর্পে বলল,—হে পৌৰ। ডোমার পাশে আমবাও আছি।

নানা নামধারী, নানা আকৃতির বাঘ। খান্দেওবা, দানেওয়ারা, কেন্দুয়া, কালকুট, লোহাজুড়ি, নেখোভা, নাগেশ্বরী এবং আবও কত কত। তাঁরা তখনই যুদ্ধসাজে সজ্জিত হল। গাজী নির্দেশমত তারা অগ্রসর হল দক্ষিণা নগরের দিকে। পশ্চিমধ্যে সাধারণ লোক এত বাঘ এক সঙ্গে যেতে দেখে ভীত হতে পারে, একপ আশঙ্কা কবে গাজী তাদেরকে ফুক দিয়ে ভেড়া-ভেড়ীতে রূপান্তরিত কবে দিলেন।

দক্ষিণা নগরে যাবার পথে গাজী সর্বসঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন এক নদী তীরে। সেই নদীর খেয়াঘাটের পাটনী ছিবা ও ভোবাব লোভ গেল সেই সুভৌল ভেড়া-ভেড়ীর মাংসে। তাদের দাবী, পাবানী হিসাবে তাদেরকে ছুটো ভেড়া দিতে হবে। গাজী তাতে সন্মত হবে দুটি ভেড়া পাটনীদের জন্ম বেধে নিজে সর্বসঙ্গে পাব হয়ে চললেন। পশ্চিমধ্যে তিনি তিনশত পবী সংগে নিয়ে অগ্রসর হলেন।

পাটনী তো ভেড়া-কুপী দুই বাঘকে ঘৰে এনে খুব খুশী। পৰদিন তাদের বুড়ী মা গোয়াল কাঁট দিতে গিৰে ভেড়ার এক 'চুস' খেলে তো অজ্ঞান এবং তাতেই তার মৃত্যু হল। পাটনীদেব মৃত। মাতাব শ্রাদ্ধেৰ ভোজ হৰে ভেবে শ্রাদ্ধ গেলেন সেই ভেড়াঘৰকে উৎসৰ্গ কৰতে। ততক্ষণে ভেড়া কপাতিৰিত হল বাঘে। সকলে ভয়ে যেদিকে পাবল পলায়ন কৰল। পাটনী বলল—মুসলমান ফকিৰেব কাছ থেকে সে আর কোনদিন পাবেব কড়ি নেবে না। বাঘ দুটি ততক্ষণে ছুটে এসে উপস্থিত হল পাব গাজীৰ নিকট।

গাজীৰ পৰামৰ্শ মতন বাজে বাঘগণ দক্ষিণা নগৰেৰ প্ৰত্যেক বাড়ী ঘিৰে অবস্থান করতে লাগল। প্ৰভাত হলেই গৃহবাসী ঘৰেব বাইৰে এসে দেখে বাঘেব সমাবেশ। কেউ তৎক্ষণাৎ ঘৰে প্ৰবেশ কৰে কপাট বন্ধ কৰল, কেউ বা ক্ৰত ছুটে পালিষে চলে গেল অগ্ৰ কোথা। সংবাদ গেল বাজবাড়ীতে। বাজা নগৰবাসীকে ভীত হতে নিবেদন কৰলেন। তিনি দূত মাধ্যমে প্ৰধান সেনাপতি দক্ষিণ দেও-এৰ নিকট হুবিভ-সংবাদ পাঠিৰে বাঘ সৈন্যগণেৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধে অবতীৰ্ণ হতে আহ্বান জানালেন। দক্ষিণাদেও তৎক্ষণাৎ বগসাজে সজ্জিত হৰে যুদ্ধক্ষেত্ৰে উপস্থিত হলেন। বাজা-সভাসদ এবং আৰো অনেক বাড়ীৰ ছাতে বসে সে যুদ্ধ অবলোকন কৰতে লাগলেন।

গাজী একা নন, তাঁৰ আছে বাঘ সৈন্য। দক্ষিণাদেও একাই বীৰ-যোদ্ধা। দুৰ্বল মন দক্ষিণাদেও তাই নদীতীৰে গিৰে জলদেবীৰ সহযোগিতা প্ৰাৰ্থনা কৰলেন। এতে জলদেবীৰ নিকট তিনি কুমীৰ সৈন্য পেলেন।

বাঘ ও কুমীৰেৰ মৰ্য্যে যুদ্ধ আবশ্য হল। কুমীৰেব কাঠসম শক্ত দেহে আঘাত কৰতে পাবল না বাঘ সৈন্য, বৰং তারা আহত হল। বিমৰ্ষ হৰে বাঘ ফিৰে এল গাজীৰ কাছে। গাজী বিবৰণ শুনে খোদাব কাছে প্ৰাৰ্থনা জানালেন। বোদ্ধেৰ খবতাপ দেখা দিল খোদাব ইচ্ছাৰ। কুমীৰগণ সে তাপ সহ্য কৰতে না পেৰে সাগৰেব জলে কাঁপ দিল। দক্ষিণা দেও তখন দানব-বাজেৰ শরণ নিলেন। দক্ষিণা দেও-এৰ পীড়াপীড়িতে দানবরাজ তাৰ সাহায্যে ভূত ও প্ৰেতগণকে আদেশ দিলেন লগু-ভগু কাণ্ড কৰতে। গাজী তা জানতে পেৰে 'ফুক' দিলেন চাবদিকে। সংগে সংগে দাউ দাউ কৰে জলে উঠল আগুন। ভূত-প্ৰেতগণ প্ৰাণ নিয়ে পলায়ন কৰল। দক্ষিণা দেও সম্মুখ যুদ্ধে গাজীৰ নিকট শেষ পৰ্যন্ত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰলেন।

দক্ষিণ। দেওএর পরাজয় বাজাকে চিত্তাশ্রিত করুল। সভাসদগণ স্বপক্ষীয় সৈন্যবলের অসাধারণ শক্তির বিবরণ দিয়ে রাজার প্রাণে সাহস সঞ্চার করুলেন। এবার তোপ, তাঁব, হাতী প্রভৃতি সমর-উপকরণে সজ্জিত হবে বাজ। স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। গাজীও যুদ্ধে খোদা ভরসা কবে অগ্রসর হলেন। তুমুল যুদ্ধ আবিস্ত হল। রাজার তোপের মুখে গাজীর পক্ষের কোন ক্ষতি হল না দেখে বাজ। স্তম্ভিত হলেন। বাঘ-সৈন্য বেপরোয়াভাবে বাজ-সৈন্য ধ্বংস করতে লাগল।

বাজার ঐশীশক্তি-সম্পন্ন একটি কুরা ছিল। রাজিকালে নিহত বাজ-সৈন্যের গারে সেই কুরার জল ছিটিয়ে তাদেবকে পুনর্বাণ জীবন্ত করা হল। জীবনপ্রাপ্ত সৈন্যগণ পুনরায় এল যুদ্ধক্ষেত্রে। এইভাবে প্রতিদিন যুদ্ধ চলতে লাগল। সংবাদ এল গাজীর কাছে যে বাঘ-সৈন্য কিছু সংখ্যক কবে প্রতিদিন আহত হচ্ছে। অথচ রাজার পক্ষে কেউ মরছে না। গাজী ধ্যানবোধে ঐশীশক্তি-সম্পন্ন কুরা-রহস্য জানতে পারলেন। গো-বোধ কবে ঐ রূপের মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করে তার ঐশীক্ষমতাকে নষ্ট করলেন গাজী। ঘটনা জানতে পেরে রাজা বুঝলেন যে এবার তাঁর পরাজয় অবশ্যজারী। বাজ। দ্রুত পলায়ন করলেন। এবারে বাঘ-সৈন্যগণ কারাগার থেকে কালুকে মুক্ত করল। তারা বাজাকে ঝুঁজে বাব করে এনে হাজির করুল গাজীর নিকট। বাজাকে বাঘের হাত থেকে মুক্ত কবে গাজী ও কালু কিন্তু তাঁকে সসন্মানে আসন দিলেন। বাজ। আশ্বস্ত হয়ে গাজী-কালুকে সাপবে রাজ-সিংহাসনে বসালেন। বাজ। পরে কলেমা গড়ে মুসলমান হলেন এবং সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গাজীর সহিত কথ। চম্পাবতীর বিবাহ দিলেন।

বাজপ্রাসাদে মহানন্দে গাজী-কালু এক পক্ষকাল অভিবাহিত হল। ফকিরের পক্ষে এইরূপ মায়ায় আবদ্ধ হওয়া অনুচিত অনুভব করার সংগে তাঁরা পুনরায় পথে বাহির হলেন। তখন বহু চম্পাবতীও তাঁদের সঙ্গ নিলেন। গাজী কিছুতেই চম্পাবতীকে সঙ্গ থেকে নিরস্ত করতে পারলেন না। তাই তিনি অলৌকিক শক্তিবলে চম্পাবতীকে কখন হরিদ্রা ফুল, কখন অম্বুরীরূপে সংগোপনে কিছুদিন নিজেব কাছে রাখলেন। পরে ফকিরি জীবনের জঞ্জালময়রূপে গনে হওয়ায় চম্পাবতীকে শেওড়াগাছে রূপান্তরিত করে স্থাবর করতে চাইলেন। তাতে চম্পাবতী কঁদে আকুল হলেন। গাজী তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি চম্পাবতীকে অবশ্যই ত্যাগ করবেন না। কিছুদিনের জন্য তাঁরা ভ্রমণ কবে

ফিবে আসবেন, —ততদিনে চম্পাবতী যেন নিশ্চেষ্টে বসে আল্লাহ্‌তালাব নাম স্মরণ কব্বেতে থাকেন।

গাজী ও কালু গ্রন্থান কবলেন। পশ্চিমধ্যে তাঁদের সাথে সাক্ষাত হল গোদ বোগাক্রান্ত জামালিয়ার সঙ্গে। তাব দুঃখে ব্যথিত হয়ে পীব গাজী, জামালিয়াকে বোগমুক্ত কবলেন এবং সে যাতে সপ্তম পুঙ্খ পর্যন্ত ধনশালী থাকতে পারে একপ আশীর্বাদ করে অগ্রসর হলেন। এবার তাঁবা ভপস্কাবত তিনশত ষোগীব সন্মুখীন হলেন। ষোগীগণ গাজীকে প্রহার কর্তে উদ্ভত হলে গাজী তাঁদেবকে দেব-দর্শন কবিয়ে মুক্ত কবলেন এবং পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কবলেন।

সেখান থেকে পীরদ্বব বিদায় নিষে এলেন পাভালে জঙ্গ রাজাব বাজো। সেখানে জ্যেষ্ঠজাত জুলহাসের সাথে গাজী ও কালুর সাক্ষাত হল। ক্রন্দনরত। মাতাব নিকট প্রত্যাবর্তন কবাব জন্য জুলহাসের নিকট গাজী অনুবোধ কবলেন। জুলহাসেব স্বত্তব-স্বাত্ত্বীও সে প্রস্তাব শুনলেন। অবশেষে তাঁবা সকলের সম্মতিতে জুলহাস ও তাঁর পত্নী পাচতোলাসহ প্রস্তুত হয়ে বিদায় নিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে গাজী সেই শেওড়া গাহকে চম্পাবতীব পূর্বরূপে রূপান্তরিত করে সাথে নিলেন। তাঁদের সকলের মধ্যে দীর্ঘ কথোপকথন চলল। তাঁবা এলেন দক্ষিণানগরে। মটুক বাজা ও লীলাবতী রাণী তাঁদেবকে বযোগমুক্ত আদর-আপ্যন্ন কবলেন। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে বহু স্থানে ভ্রমণ কবে তাঁবা তিন বছর পর ফিবে এলেন সোনাবপুবে। তাবপর এলেন হাপাইনগবের জীদাম বাজাব নিকট। সেখানে আতিথেয়তার সম্ভব হলেন এবং অবশেষে ফিবে এলেন বৈবটনগরে।

গাজী ও কালুর ফকিবি জীবনের বিস্তৃত কাহিনীসহ পুত্র জুলহাস ও পুত্রবধূ পাচতোলা এবং চম্পাবতীকে লাভ কবে বাজা সেকেন্দার ও রাণী অজুপা আনন্দসাগবে নিমজ্জিত হলেন।

আবদুর রহিম সাহেব প্রণীত “গাজি-কালু-চম্পাবতী কতাব পুখি” নামক কাব্যে বর্ণিত উপবোধ কাহিনী, পীব মোবাবক বড়বাঁ গাজীর জীবন কাহিনীর সবটুকু নয়। এটি তাঁর জীবনের প্রথম দিককার কাহিনী মাত্র। বড়বাঁ গাজীর অলৌকিক কীর্তিকথা প্রামাণ্য পেলেও এই কাহিনীতে ইসলাম

ধৰ্ম প্রচাৰ-প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। ভিন্ন ধৰ্মাবলম্বী নাবীপুৰুষেব মধ্যে বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব পাঠকেব মনে কোতুল উদ্বেক স্বাভাবিক ভাবেই কবেছে এবং একে অবলম্বন কৰে কবি প্রণয়-আখ্যানটিকে অবশুস্তাবী সংঘৰ্ষেব মাধ্যমে বেশ আকৰ্ষণীয় কৰে তুলেছেন। অলৌকিক শক্তি পৰিচাষক যে সব ঘটনাৰ সমাবেশ কৰা হযেছে তা একেবারেই অবিস্বাস্ত—বিশেষতঃ বৰ্তমান যুগে। পীব মোবাবক একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে তাঁৰ কাৰ্য্যাবলীৰ সংগে এইসব অলৌকিক-কীৰ্তিকলাপ অবিস্বাস্ত বোমাটিক কাহিনীতে পৰ্য্যবসিত হযেছে। সবল বিশ্বাসী গ্রামবাসীৰ মনে এই কাব্যেব স্বথেষ্ট প্রভাব থাকলেও ইসলামি আদর্শেব সঙ্গ অলৌকিকতাৰ এই কাহিনী সামঞ্জস্যপূৰ্ণ নয়।

আবদুর রহিম সাহেব প্রণীত কাব্য এবং এবই আদর্শে বচিত একখানি নাটক ব্যতীত রাবমঙ্গল কাব্য, গাজী সাহেবেব গান, হজবত গাজী সৈয়দ মোবাবক আলি শাহ সাহেবেব জীবন চৰিতাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থে পীব মোবাবক বড় খাঁ। গাজীৰ মাতাৰ নাম, শৈশবকালেব কথা, তাঁৰ জন্মকথা প্রভৃতি পাওযা যায় না।

মধ্যযুগীয় অগ্ৰাণ্ড পাঁচালি কাব্যেব বৈশিষ্ট্য এতে পূৰ্ণমাত্রায় বিবাজিত। বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ—

১। আল্লাহ তালাব কৃপায় অজুপা সুন্দবীৰ গৰ্ভহ সন্তানেব দেহে প্রাণ প্রবেশ কৰণ।

২। অন্তঃসত্ত্বা অজুপা সুন্দবীৰ দশমাস্তা অর্থাৎ দশ মাসেব অবস্থাব বৰ্ণনা কৰণ।

৩। গাজী ও দক্ষিণ রায বা বাজা মটুক-এব যুদ্ধেব সহযোগী সৈন্য বাঘগণেব নামবৈচিত্র্য এবং চৰিত্র বৰ্ণনায় দৃষ্ট হয ঋন্দেওবা নামক বাঘ সৈন্যগণেব প্রধানকে। সে বান্ধসেব গৰ্দান ভেঙে আহাব কৰে। বেড়াভাঙ্গা নামক বাঘ অভিযব ভীষণাকৃতি। সে অমুব সিংহকে হত্যা কৰে ভক্ষণ কৰে। দানেওবা নামক বাঘ লাক দিবে চলে। সে যেন আকাশেব সূৰ্য্যকে ধবে খেতে চায। এইরূপ আবো কষেকটি বাঘেব নাম ভিজবাজ, কালকুট, টিলাচন্দ্ৰ, কেদুয়া, মেচি, লোহা জুড়ি, পেচামুখা ইত্যাদি।

৪। মঙ্গল কাব্যেব সাধাবণ বৈশিষ্ট্যেব অগ্ৰতম হিসাবে এই কাব্যে নমনীয়তাৰ দৃষ্টান্ত আছে যে মুসলমান হযে গাজীৰ পক্ষে হিন্দু ব্রাহ্মণ কথা

বিবাহ কবাব বিপক্ষে কোন বিকল্প মানসিকতা সৃষ্টি হয় নি। অগব দিকোত্রাক্ষণ-  
রাজা মটুক দেবেব হিন্দু সংস্কারেব ভিত্তি এত দৃঢ় ছিল না যাতে তিনি মুসলমান-  
হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ মনে করতে পারেন। তবু 'কাব্যখানি'  
মৌলিকভাবে ইসলামি ভাবনা ভিত্তিক।

৫। পীর বড় খাঁ গাজীর অলৌকিক শক্তির কাহিনী মনসামঙ্গল  
কাব্যাদি অলৌকিক কাহিনীর কথ। অবলম্বন করায়।

৬। উপবোধকল্প বৈশিষ্ট্যেব সঙ্গে অধিকন্তু লক্ষ্যণীয় যে এই 'কাব্য-  
কাহিনীতে কৃষ্ণকথাব প্রভাব, প্রহ্লাদ চবিত্র প্রভাব, লাবলা-মজনুর প্রণয়  
কাহিনী প্রভাব, সংসার বিবাগী বুদ্ধদেবেব প্রভাব প্রভৃতি সুস্পষ্টভাবে পড়েছে।

৭। কৃষ্ণেব মথুরায় গমনেব পর ত্রজে যে বিরহভাব সৃষ্টি হয়েছিল, গাজী  
দক্ষিণানগর ত্যাগ কবলে সেখানে অনুকূপ বিরহভাব জাগবিত হয়েছিল।

৮। কৃষ্ণেব প্রতি ভক্তি-পরীক্ষা দিতে প্রহ্লাদকে যেসকল মৃত্যুব সন্মুখীন  
হতে হযেছিল, আল্লাহর প্রতি ভক্তির প্রমাণ স্বরূপ গাজীকে সেইকূপ বুদ্ধে পাষণ-  
নিযে সমুদ্রে নিমজ্জন বা হাতীর পায়েব তলাব পিষ্ট হওয়ার মতন আর্বো-  
কঠিন পরীক্ষাব সন্মুখীন হতে হয়েছিল।

৯। সুফী মতাদর্শে আকৃষ্ট হলেও গাজী কর্তৃক সংসার ত্যাগ ও  
ফকিববেশে যবেব বাইবে অর্থাৎ পথে পথে আপন আদর্শ প্রচার করার ঘটনা  
বুদ্ধদেবেব সংসার ত্যাগেব ও তাঁর কার্যাবলীর সঙ্গে তুলনীয়।

এইকূপ আরো বৈশিষ্ট্যেব সঙ্গে কাব্যখানির নিজস্ব যে সব বৈশিষ্ট্য আছে  
তাদেব কযেকটি এইকূপ :—

হিন্দুর বর্ষশ্রেষ্ঠ ত্রাক্ষণ কথার সহিত মুসলমান যুবকের প্রণয় এবং বিবাহ  
সংঘটিত হয়েছ।

দেব-দেবী মাহাত্ম্য প্রচাবেব ঝায় আল্লাহ্ মাহাত্ম্য প্রচারেব চেষ্টার  
মধ্যে প্রধানতঃ ইসলাম ধর্ম প্রচার প্রবণতাই একাশিত হয়েছ।

পাতালের দেবীর সহযোগিতায় গাজী ও কালু সোনারপুরে এক সুন্দর  
নগর গড়ে তুললেন।

পত্রবাহক পারাবত-মাধ্যমে প্রণয় নিবেদন ও বিবাহ কিছু কিছু সংকল্প-  
পুস্তকেব কাহিনীতে দৃষ্ট হয়। এখানে গাজী ও চম্পাবতীর প্রণয় বিষয়ক  
যোগাযোগ-মাধ্যম হিসাবে পরীগণেব ভূমিকা দৃষ্ট হয়।

লায়লা-মজনু বা বোমিও-জুলিয়েট বা কিছুটো দুখান্ড-শকুন্তলাৰ প্ৰণয় কাহিনীৰ মত গাজী-চম্পাবতীৰ প্ৰণয় কাহিনী এ কাব্যে অনেকখানি স্থান অধিকাৰ কৰে আছে। বিশেষ কৰে শিকাৰে গিৰে পাচতোলাৰ সঙ্গে বিবাহ ঘটনা স্মৰণীয়।

মুফী-পীৰগণেশৰ আদৰ্শ হিসাবে গাজীকে অবিবাহিত ককিৰ হিসাবে পাওয়া যায় নি। সংসার ত্যাগী ককিৰেৰ পক্ষে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওবা এক অভূতপূৰ্ব ঘটনা।

হিন্দু ভ্ৰামণ কণ্ঠ্য হ'বে মুসলমানৰ পানি গ্ৰহণ ঐ হিন্দু কণ্ঠ্যৰ পক্ষে বেমান অনতিক্ৰম্য বাধা, তেমনি এক পুৰুষে অনুবক্ত নাবীৰ অস্ত পুৰুষে মনোনিবেশ কৰা সেই হিন্দু কণ্ঠ্যৰ আৰু এক দুৰতিক্ৰম্য বাধা। এতে প্ৰথম সংস্কাৰেৰ ঘটল পৰাজয় এবং দ্বিতীয় সংস্কাৰ হল বিজয়ী।

মন্তবলে বাঘকে ভেড়ায় পৰিণত কৰাৰ মতন ঘটনা এই জেগীৰ পাঁচালী কাব্যেৰ বৈশিষ্ট্য। জীৱন-কুখ্যৰ জলৈৰ সাহায্যে মৃতকে পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ ঘটনা পীৰ গোৱাটাঁদ কাব্যেও দৃষ্ট হয়।

পৰাজিত দক্ষিণ ব্যৱকে নিৰে পৰীক্ষণ ভাষাসা কৰেহে। কবি এই প্ৰসঙ্গে কিছু হাস্যবস পৰিবেশন কৰেহেন।

গাজী-কালু-চম্পাবতীৰ কাহিনী উপলক্ষে মুসলমান কবি ইসলামি মানসিকতাৰ জন্ত ইউসুফ জোলেখাৰ কথা, সতী মবিন্না, ছব, নবীকথা প্ৰভৃতিৰ উল্লেখ কৰেহেন। তাছাড়া শাহ জালাল পীৰ, বদৰ পীৰ, গোঁব গোবিন্দ প্ৰভৃতি ঐতিহাসিক এবং কাল্পনিক বহু ব্যক্তি সম্পৰ্কিত কিছু কিছু ঘটনাৰ গল্পস্থানীয় কথা এই কাব্যে লিপিবদ্ধ হ'বেহে।

পীৰ পাঁচালী কাব্যে অনেকস্থলে ধৰ্মপ্ৰচাৰ কৰা নিৰে অগ্ৰ ধৰ্মাবলম্বীৰ সহিত সংঘৰ্ষ হ'বেহে দেখা যায়। কিন্তু পীৰ মোবাবক বডৰাঁকে নিৰে বচিত এই কাহিনীতে প্ৰণয় নিৰে সংঘৰ্ষ এবং পৰে ধৰ্মাস্তব গ্ৰহণেৰ প্ৰশ্ন এসেছে।

গাজী-কালু-চম্পাবতী কাহিনীতে অঙ্কিত চবিত্ৰগুলিতে নিয়লিখিত বিভাগ দৃষ্ট হয়—

১। মানব চবিত্ৰ, যথা—গাজী, কালু, চম্পাবতী, মটুক, লীলাবতী  
প্ৰভৃতি।

২। দেব চবিত্ৰ, যথা—জলদেবী।

- ৩। পশু চবিত্ৰ, যথা—বাঘ, কুমীৰ, ভেড়া প্রভৃতি ।
- ৪। বান্ধু চবিত্ৰ, যথা—দক্ষিণা দেও ।
- ৫। পৰীচবিত্ৰ ( এদেব নামকৰণ কৰা হুৰনি ), এবং
- ৬। প্ৰেত চবিত্ৰ,—দানব, ভূত প্রভৃতি ।

প্ৰত্যেকটি চবিত্ৰ স্বতন্ত্ৰ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত । মানব চবিত্ৰে মানবীয় সাধাৰণ গুণাবলী, বান্ধু চবিত্ৰে বান্ধুসীৰ ব্যবহাৰ এবং এইকপ ভাবে অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্ৰেত চবিত্ৰে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পৰিস্ফুট হুৰে উঠেছে । একমাত্ৰ গাজী ও কালুকে মানব হওবা সত্ত্বেও অলৌকিক ক্ৰিয়াকলাপ প্ৰদৰ্শনেৰ মাধ্যমে যেভাবে দেখা যায়,—তাতে তাঁদেবকে কখন কখন বাহুদৰ বলে মনে হয় । পৰী, প্ৰেত, দেব-দেবী তো কাল্পনিক ব্যাপাৰ,—তাঁদেব চবিত্ৰ তেমন ভাবেই চিত্ৰিত কৰা হুবেছে ।

সমগ্ৰ কাহিনীতে কালু শাহেব চবিত্ৰটি অতীব চিত্তাকৰ্ষক । তিনি গাজীৰ সহোদৰ নন, নন সেকেন্দাৰ শাহেব পুত্ৰ বা গাজীৰ বৈমাত্ৰ ভাই । তিনি শুধু জাতপ্ৰতিম সাথী—ইসলামি আদৰ্শেৰ অনুসৰণকাৰী সহযাজী ফকিৰ মাত্ৰ । একসাথে শৈশব-কৈশোৰ কাল অতিক্ৰম কৰাৰ ফলে তাঁদেব মধ্যে যে মমত্ব যে সহমৰ্মিতা গড়ে উঠেছে তা পৰিত্ৰ এবং অটুট । তাই তিনি গাজীৰ সুখ-দুঃখেৰ সমান অংশীদাৰ হতে পেবেছেন মনে-প্ৰাণে । তাঁৰ চৰিত্ৰেৰ সবচেয়ে আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হুছে তিনি একজন সত্যকাৰ মুকী-ফকিৰ । তাই তিনি বিভাজ্য গাজীকে বলেছেন,—

ফকিৰেৰ বিমি নহে থাকা এক ঠাই ।

এদেশ ছাডিয়া চল অগ্ৰ দেশে যাই ।

কালু অগ্ৰ য়ে ভাব প্ৰকাশ কৰেছেন তাৰ অংশ বিশেষ এইকপ :—

বন্দী হইল ভাই মোৰ ভবেৰ মায়াৰ ।

এ জাল কাটিতে তাৰ সাধ্য নাহি আৰ ।

ফকিৰ হইল যিছে নামেতে আল্লাব ।

এই সব লোভ যদি মনে তাৰ ছিল ।

ৰাজত্ব ছাডিয়া কেন ফকিৰ হইল ।

কালু বস্তুতঃ গাজীৰ সহিত বক্তৃ-সম্পৰ্কে সম্পৰ্কিত নন । গাজীৰ মাতাৰ নিকট কালু সন্তানবৎ প্ৰতিপালিত হুবেছিলেন । সেই সম্পৰ্ক ধৰে গাজীৰ



একনিষ্ঠ সহচর হিসাবে কালুকে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। কালুও একজন রক্ত-মাংস সম্বলিত মানুষ। তাঁকে কোথাও ভাব-প্রবণ দেবা যায় না। নারীর প্রতি তাঁর কোন দৃষ্টিও দৃষ্ট হয় না। বরং তাঁকে সাধন-ভজনের পক্ষে বিহ্বল-চিত্ত গাজীকে সংযত করার জন্য উপদেশ দিতে দেখা যায়। গাজী সংসার ত্যাগ করে পবিত্রাজক হলে কালু তাঁর সঙ্গ গ্রহণ করেন, যেন তিনি ব্যতীত গাজীকে রক্ষা করার অর্থ কেহ ছিল না। বাস্তবিক সশরীরে সুস্থ অবস্থায় গাজী ও তাঁর পবিত্রাবের অত্যন্ত ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে বৈরাট নগরে শাহ সেকেন্দার ও তদীয় পত্নী অজুপার নিকট উপস্থিত করতে পারেন। কালু খুব তৃপ্ত। কালু যেন এক বিবাত দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করতে পারেন পবন আনন্দিত।

গাজী এই কাব্যের নায়ক চরিত্র। মানুষ হিসাবে তাঁর মধ্যে বড় বিপুল কিছু বহিঃপ্রকাশ হতে পারে এটাই স্বাভাবিক। তা বলে তিনি মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হন নি, যদিও এক-আধটু বিপথগামী হয়েছিলেন। যে যুগের চিত্র এই কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে, সে যুগে ইসলাম ধর্ম এ দেশে ব্যাপক আকারে প্রচারিত এবং প্রসারিত হচ্ছে। সে সময় আরব, পারস্য প্রভৃতি স্থান থেকে সুফী দরবেশগণ ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আসছেন। সুফী দরবেশ হিসাবে ধর্মপ্রচারকের মানবিক ব্যবহার এদেশের জনসাধারণের মনকেও স্পর্শ করেছে। মুসলমান জনমানসও যেন এই ধর্মের প্রচারের স্বপক্ষে উন্মুখ হয়েছিল। তদুপরি এ দেশের গোঁড়া বর্ণাশ্রমবাদীগণের তখন ক্ষয়িষ্ণু। অবস্থা এবং নির্ঘাতিত তথ্য অবহেলিত অন্ত্যজশ্রেণীর সাধারণ মানুষ সামাজিক দ্বাষ্য অধিকার পাওয়ার আগ্রহে ছিল অধীর। গাজী এইরূপ অনুকূল অবস্থার পবিত্রেক্ষিতে তারুণ্যের সবলতার সামাজিক মুক্তির বাণী নিয়ে এগিয়ে এলেন জনসাধারণের মাঝে। চম্পাবতী-লাভের উন্মাদনা গাজীর চরিত্রে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু কবি যে ভাবে কাহিনী গ্রথিত করেছেন তাতে মনে হয় “প্রেম মানুষের জন্য, কোন বিশেষ ধর্মের জন্য নয়।” মধ্যযুগে অনেকে সামাজিক বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন—প্রচলিত বর্ণগত বিভেদ দূর করতে। নব-নারীর প্রেমের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করাও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য হিসাবে পবিত্রীকৃত হয়েছে।

গাজীর নিজস্ব দর্শনের আর এক পবিচর তাঁর উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়।

কালু যেখানে গাজীকে উপদেশ দিচ্ছেন যে তিনি নারী-ধ্যানে খোদাকে হাবাবেন, সেখানে তার উত্তরে গাজী বলছেন—“এই ধ্যানে খোদা লাভ হবে।”

কালু বলে নাহি আছে খোদাব আকার।

গাজী বলে মত মূর্তি সকলি তাহার ॥

কালু আবে প্রশ্ন কবেছেন এবং তার উত্তরও পেবেছেন। স্বথা—

কালু বলে প্রেমে প্রাণ যদি যায়।

গাজী বলে স্বর্গে গিয়া পাইব তাহার ॥

কালু বলে সংসাবেতে হয় যদি বিয়া।

গাজী বলে গেল তবে কার্য সিদ্ধি হৈয়া ॥

কালু বলে কিবা কহ না পাৰি বুঝিতে।

গাজী বলে সোজা পথ নাহি ইহা হইতে ॥

কালু বলে বিয়া কব ভজিবা কাহারে।

গাজী বলে গাঁথা বেই জামাব অন্তরে ॥

অর্থাৎ সংসারী থেকেও সাধন-ভজন সম্ভব। কান্ড-কান্ড ভাবকে গাজী সাদবে আশ্রয় করেছেন। কঠোর কৃচ্ছসাধন যে জীবন-সর্বস্ব নয় গাজী তা নিশ্চয় জানেন। তবে নারী যখন তাঁকে মূল লক্ষ্য থেকে আকর্ষণ কবছে বলে মনে হবেহে, তখন তিনি বিবি চম্পাকে সেওড়া গাছে পবিগত কবে অগ্নসর হবে চলেছেন। পুনরায় তিনি চম্পাবতীকে মানবী রূপে কপান্তবিত করে বৈবাট নগরে মাতা পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন কবেছেন—তিনি সংসার জীবনেব-সহিত সংযুক্ত হয়েছেন।

চম্পাবতী চবিত্রে পতিপ্রাণ নারীর পবিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কারও তাঁকে মুসলমানকে বিয়ে করা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। এগম সংস্কারকে অতিক্রম কবে গেছে। মাতা লীলাবতীর প্রভাব তাঁর মধ্যে এসেছে। যেখানে দেখি মাতা লীলাবতীর মাতৃহৃদয় কন্ডার বেদনায় ব্যথিত, সেখানে তিনি বলেছেন—

বিধিব যদি লিখা হয় কপালে তোমার।

তাহা কে ষত্তিতে পারে শক্তি আছে কাব ॥

এক্ষেত্রে লীলাবতী ঘোবতর অদৃষ্টবাদী। গাজী যে মুসলমান তা তিনি জেনেও কথার প্রতি সমর্থন জানিয়ে উভয়ের মিলনের পথে প্রতিবন্ধক হন নি। হিন্দু-ব্রাহ্মণ রমণীর চরিত্রে সত্যিই যে কত বড় স্থান অধিকার করে থাকে এটি তার অস্বতম একটি দৃষ্টান্ত। জাতি নয়, ধর্ম নয়,—সেখানে শুধু সন্তানের প্রতি মাতার অপরিসীম ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে।

সকল চরিত্রের বিস্তৃত আলোচনা এখানে বাহ্যল্য মাত্র। সামগ্রিকভাবে মুসলমান সমাজটিতে যতটুকু চরিত্র-পরিচয় পাওয়া যায় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :—

বৈরাটনগরের অধিপতি শাহ সেকেন্দার সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি ধনবান, তিনি হাতেমের সমান দাতা, তিনি রোস্তম বা শাহ নুবিমানের চেয়ে শক্তিশালী। পাতাল রাজ্যে তাঁর কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন এবং সমর্পণ করেছেন কতক অভূপা সূন্দরীকে। তাঁর পরিবারের চিত্র হল উৎকালীন রাজা-বাদশাহ্ মুসলমান পরিবারের চিত্র। তাই তাঁর পুত্র জুলহাস শিকারে গেলেন এবং পাতাল-রাজ্যে একমাত্র কথাকে বিবে করে সেখানেই থাকতে মনস্থ করলেন। পিতা ও মাতার অনুমতি গ্রহণ করার আগেই পুত্র বিবাহে সম্মত হলেন,—বাজা-বাদশাহ কোন কোন পরিবারে এমন ধারা ছিল। তবে অপব দিকে বাবী অভূপা সাগরে ঝাঙকার আগে স্বামীর অনুমতি নিরেছেন দেখা যায়।

রাণী অভূপাকে খোন্দার নিকট স্তব (নামাজ) করিতে হয় সকলের মঙ্গল কামনায়। তিনি গর্ভবতী হওয়ার পর সাত মাসে নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য সাধ-উক্ষণ করেন। বাদশাহ্ সেকেন্দার দশ বছরের পুত্র গাজীকে সিংহাসনে বসাবার জন্ত আহ্বান জানান। সমাজে তখন এইরূপ চিন্তার পরিবেশ যে ছিল তা এইসব ঘটনার সূত্রধরে বোঝা যায়।

গাজী, পিতার আদেশ অগ্রাহ্য করেন আল্লাহভাবে বিভোর হওয়ার কারণে। এইরূপ পিতৃদ্রোহী সন্তানকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার বেৎশাজ অপ্রচলিত ছিল না। অবশ্য কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনার বিবরণ বিবৃত হয়েছে যার সামাজিক কোন মূল্য দেওয়া চলে না। তবে সেকেন্দার শাহের পরিবার তথা মুসলমান সমাজের মানুষের মন যে হিন্দুধর্মপ্রাণিত পৌরাণিক কাহিনী-প্রভাবিত মানস-লোকের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না—তা সুস্পষ্ট।

সন্তানের প্রতি জননীর কি অপবিসীম বাৎসল্য এবং জননীর প্রতি সন্তানের কি অসাধারণ ভক্তি তৎকালেও মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল, এখানে তাব প্রমাণ পাওঁষা যায়। সন্তান গাজী আপন মাতাকে সালাম জানাচ্ছেন। গাজী সালাম জানালেন পিতাকে,—মাথা নীচু করে পিতার উপদেশ বাক্য শোনেন,—তাঁর চোখ থেকে ববে অশ্রু। মাতা অজুপা পুত্ৰকে কোলে বসিয়ে আদর করেন, নিজের হাতে আহাৰ কবান। মাতা, পুত্ৰের বিমৰ্ষ বদন দেখে হৃৎথে বিহ্বল হন। পুত্ৰকে নিজের বুকে নিয়ে পরম তৃপ্তিতে নিদ্রা যাওঁয়ার যে বাৎসল্য অনুভূতি তা গাজীর সংসারের তথা মুসলমান সাধারণের সমাজেবও এক বাস্তব চিত্র। অধুনা যেহন গ্রামের কে কোথায় গেল, কিভাবে দেশত্যাগী হল তার খবর বাখার প্রতি সাধারণের ঔৎসুক্যে অভাব লক্ষিত হয়,—তখনকার দিনে ঠিক তেমতি ছিল না। ববং গ্রামের একজন লোক ফকির হৰে যাওঁয়ার ব্যথাৰ গ্রামবাসীর মধ্যকার যে বেদনাৰ চিত্র পাওঁয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে এই ঘটনার গ্রামের জনসাধাৰণসহ সমগ্র প্রকৃতিই যেন হতো বিষম্বা-ক্রন্দনবত।

একান্নবর্ষী পবিত্ৰাৰেব ভ্ৰাতৃ-সদৃশ কালু বৈরাগ্য-আদৰ্শে নিজের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বিসৰ্জন দিবে ভ্ৰাতৃ-বাৎসল্যেব অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন কৰেহেন।

ব্ৰাহ্মণ ধৰ্মেব আদৰ্শ থেকে মুক্ত হৰে উঠতে তৎকালীন নও-মুসলমান সমাজ সক্ষম হন নি। তাই দেখা যায় গাজী কুশাৰ কাতব হৰে পড়লে আল্লা ককণা পববশ হৰে তাঁর আহাৰেব জোঁগান দিলেন,—অৰ্থাৎ গাজী বিন। এচেঠার আহাৰ পেলেন। এইকপ ঘটনাৰ বাস্তাবতা ইসলামি ধ্যান বা ধাবণায় নেই। অগত্ৰ দেখি তিন বার কুকদিৰে পানি নিক্কেপ কবতেই ছাপাইনগৰেব পৰিব্যাপ্ত আঙুন নিভে গেল। এ থেকে জানা যায় যে তৎকালীন মুসলমান সমাজেও অনুকপ কুসংস্কাৰেব স্থান ছিল। শুধু তাই নয়,—ভূত-প্ৰেত প্রভৃতির অস্তিত্বে এবং মন্ত্ৰ-তন্ত্ৰেও বিশ্বাস ছিল দেখা যায়।

এ কাব্যে মুসলমান নাবী সমাজেব সুস্পষ্ট চিত্র স্কুটে ওঠেনি। মাত্ৰ কয়েকজন মুসলমান নারীৰ চৰিত্ৰেব বিক্ষিপ্ত পৰিচয় পাওঁষা যায়। অজুপা ও পাচতোলাব নারীমূলভ আচৰণ তৎকালীন সমাজেব নাবীৰ সঙ্ঘদবতাব চিত্র বটে,—তবে সামাজিক আচাৰ-আচৰণেব বিশেষ কোন চিত্র মিলে না। এক স্থানে দেখি কালু গৃহে প্রত্যাবৰ্তন কৰে পিতৃসদৃশ শাহ সেকেন্দাবকে ছালাম জানাচ্ছেন। সেখানে নিম্নলিখিত দৃশ্যটো অনুধাবনযোগ্য :—

পালজে বসিবা ছিল শাহা সেকেন্দার ।

হেনসমে কানু সাহা জোড় করি কর ॥

ছালাম করিবা খাড়া সম্মুখে হইল । ইত্যাদি—(৮৮ পৃঃ)

কানু হাতজোড় কবে সেকেন্দারকে ছালাম জানাচ্ছেন,—অভিবাদনের  
এ পদ্ধতি; ইসলামে দেখা যায় না। অগ্রজ দেখা যায়,—

চাম্পাবতী-পাচতোলা আসিবা ছবায় ।

ছালাম কবিল ধবি স্বাভাউব পার ॥ (৮৯ পৃঃ)

মুসলমান নারী সমাজের মধ্যে ছালাম কবাব পদ্ধতিতে স্বাভাউব পাৰে  
স্ববাব রীতি এখানে দৃষ্ট হইছে। এ দৃষ্ট আজ আব বড় একটা দৃষ্ট হয় না।  
কিন্তু এই আদর্শ সমূহ সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ্য-আদর্শ প্রভাবিত। কবি আবদুল  
রহিম সাহেব নিজেও এই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। কারণ তিনি তাঁর  
ভণিতাব এক স্থানে লিখেছেন,—

পাঠকে প্রণামি পুখি সমাপ্ত হইল । (৮৯ পৃঃ)

আবো দ্রষ্টব্য যে, চাম্পাবতীর মাতার নিকট জুলহাসের পত্নী পাচতোলা  
এবং গাজীর পত্নী চাম্পাবতী এসে—

“লীলাকে প্রণাম তাবা দুজনে কবিল ।” (৮৭ পৃঃ)।

বলা বাহুল্য লীলাবতী তখন মুসলমান হইবেছেন, চাম্পাবতীও তো গাজীর  
সাথে বিবাহের পূর্বেই মুসলমান হইবেছেন এবং পাচতোলা তো মুসলমান  
বটেই। অতএব দেখা যায় যে মুসলমান হইবেও তাঁরা তখনও ব্রাহ্মণ্য  
আদর্শকে বিসর্জন দিতে পাবেন নি,—তাই তাঁরা “প্রণাম” জানিয়েছেন  
“ছালাম” (আস্‌ছালাম আলাযকুম)—এব স্থানে।

কানু-গাজী-চাম্পাবতী (নাটক)

“কানু-গাজী-চাম্পাবতী” নাটকের বচনিতাব নাম সতীশচন্দ্র চৌধুরী।  
তিনি বাইশখানি গ্রন্থের প্রণেতা বলে এ পর্যন্ত জানা গেছে। তাঁর বচিত  
সুদূর্ নাটকের সংখ্যা তেবো। তা ছাড়া তাঁর বহু সাময়িক বচনাও আছে।  
এ ব্রাহ্মণ্য একখানি গ্রন্থ ব্যতীত সমস্ত গ্রন্থই অমুদ্রিত বইবেছে। তাঁর বচনাবলীর  
একটি সাধারণ তালিকা এইরূপ :—

১। পূজাব পঞ্চবঙ	নাটক	
২। যুগল মিলন	"	
৩। উত্তৰ	"	
৪। পঞ্চবঙ	"	
৫। আবেগ বিভোৰা	"	
৬। কালচক্ৰ বা বশিষ্ঠের ব্রহ্মত্বলাভ	"	
৭। আছতি	"	
৮। চন্দ্রবিন্দু	"	
৯। মনসা মহিমা	"	
১০। বগলতা	"	
১১। বন বিবি	"	
১২। কালু-গাঙ্গী-চম্পাবতী	"	
১৩। পীৰ একদিল শাহ	"	[ প্রাপ্তব্য নহ ]
১৪। হিন্দুস্থান	কবিতা সংকল	—মুদ্রিত
১৫। বহু ভাৰাত	নাটিকা	"
১৬। দ্বিবিজয়	বহু উপন্যাস	
১৭। ব্রহ্মশাপ	বড় গল্প	
১৮। প্রবন্ধ সংকলন :—		
(ক) কে তুমি, (খ) কেন ভালবাসি, (গ) প্রেমের বন্ধন,		
(ঘ) হান্ন হাৰ কেন কেঁদে মৰি, (ঙ) ভালবাসি		
১৯। ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী		—মুদ্রিত
২০। বাংলা প্রবাদ-প্রবচন		

কালু-গাঙ্গী-চম্পাবতী নামক এই নাটক তিনি মাত্র দুই দিনে লিখে সমাপ্ত কৰেছিলেন। এতে বোৰা যাৰ যে তাঁৰ অসাধাৰণ প্ৰতিভা ছিল। নাট্যকাৰ ছিলেন চব্বিশ পৰগণা জেলাৰ বালাসত মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বামনমুড়া গ্রামেৰ অধিবাসী। তাঁৰ পিতাৰ নাম বামলাল চৌধুৰী। তাঁৰ দুই সহোদৰেৰ অগ্ৰতম অৰুণচন্দ্ৰ চৌধুৰী মহাশয় নাট্যকাৰেৰ অনেক নাটকেৰ কপি কৰে দিৱেছিলেন। নাট্যকাৰ গুস্তিষা উচ্চ বিদ্যালয়ে বহুদিন শিক্ষক—কবয়িক হিসাবে কাজ কৰেছিলেন। তাঁৰ মৃত্যু তাৰিখ হল ১৯৬১ খ্ৰীষ্টাব্দেৰ ২৪শে জানুৱাৰী। গুস্তিষা বিদ্যালয়েৰ প্ৰধান শিক্ষক ভাবকনাথ সিংহ ১৭-৩-১৯২০

খ্রীষ্টাব্দের একটি প্রশংসাপত্রে লিখেছেন যে বাবু সতীশ চন্দ্র চৌধুরী ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, কষ্ট সহিষ্ণু এবং বুদ্ধিমান যুবক। তিনি ছিলেন ভদ্র এবং কর্তব্যপরায়ণ।

নাট্যকার সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের “কালু-গাজী-চম্পাবতী” নামক নাটকখানি পুথি আকারে পাওয়া গেছে অর্থাৎ নাটকখানি এ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নি। পুথির আকৃতি ১০½”×৮½”। তাব পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ৫১। বেশ পুরু সাদা কাগজে লেখা। পুথির কিছু অংশ পোকার কেটেছে। তার অবস্থা জরাজীর্ণ। এর পৃষ্ঠাঙ্ক লিখিত নেই। নাটকখানি পঞ্চাংক বিশিষ্ট। প্রতি অংকে চারটি কবে দৃশ্য। প্রতি দৃশ্যান্তে বিরতি-সূচক চিহ্ন অংকিত হয়েছে। প্রতি দৃশ্যারম্ভের সংযোগস্থল উল্লেখ করা হয়েছে। স্বথারীতি কুশী-লবণের একটি আলাদা পবিচিতি-পত্র আছে। পুথির শেষ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পবিচিতি দৃশ্যানুযায়ী প্রদত্ত হয়েছে। নাটক আরম্ভের আগেই আছে আবাহন ও বন্দনাগীতি। তারপরই শুভ সূত্রপাতের পূর্বেই শিরোভাগে লিখিত আছে “শ্রীশ্রী হক নাম”। নাটকে নাট্যকার “প্রবেশ-গ্রস্থান” নির্দেশিকাও দিবেছেন। বন্দনা-গীতির মধ্যে তিনি ভণিতার বলেছেন,—

এ দীন সতীশে ভণে, (খোদা) কব কৃপা নিজগুণে,  
পীর ফেবেস্তা যত প্রথমে করি বন্দন।  
(আজি) হও সবে অনুবুল অধম লব স্মরণ।

নাটকখানি গাঢ় কালো কালিতে লেখা,—অক্ষরগুলিও বেশ মোটা মোটা গোটা গোটা। নাটকের শেষে লিখিত আছে copied by Arun Chandra Chowdhury কিন্তু copied by শব্দ দুটি কাটা। নাট্যকারের অন্ত্যান্ত রচনার লেখা হস্তাক্ষর দেখে মনে হয় এ নাটক তাঁর নিজের হাতের লেখা নয়। অরুণচন্দ্র চৌধুরী তাঁর সহোদর। তাঁদের একাম্রবর্তী পরিবার। তাঁর লেখা সহোদর অরুণচন্দ্র চৌধুরী নকল করে দেবেন এটা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং এটি মূল নাটক নয় বলে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। তবে এ বধ্যকার আবাহন, বন্দনা-গীতি ও পাত্র-পাত্রী পবিচর অংশ যে নাট্যকারের নিজের হস্তাক্ষর রয়েছে তা তাঁর নিজের লেখা অন্ত্যান্ত রচনার হস্তাক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝা যায়। এতে সর্বমোট ৪৩ খানি গান আছে। প্রকৃতিগতভাবে এদের সংখ্যা স্বথাক্রমে এইরূপ :—

ভক্তি গীতি	৫ খানি,
বাংসল্য গীতি	৭ খানি,
প্ৰণব গীতি	১০ খানি,
অখ্যায় গীতি	২ খানি
প্ৰহসন গীতি	৫ খানি
বীৰ ব্ৰহ্মাৰ গীতি	১ খানি,
দেশাত্মবোধক গীতি	৪ খানি,
ঈশ্বৰ বন্দন	৬ খানি,
অন্ত্যন্ত গীতি	৩ খানি ।

নাটকখানিৰ বচনাকাল এইকপ লিখিত আছে,—“এই পুস্তক সন ১৩২০ সালেৰে ৬ই পৌষ ববিবাব আৰম্ভ এবং ৮ই পৌষ মঙ্গলবাব সমাপ্ত হইল ।”

এ নাটক যে একখানি কাব্যেৰ নাট্যকপ তা নাট্যকাৰেৰ স্বীকৃতিতেই পাওৱা যায় । তিনি লিখেছেন,—“হিন্দুস্থান, মনসা মহিমা, বনবিবি প্ৰভৃতি গ্ৰন্থ-প্ৰণেতা বামনমুড়া নিবাসী স্ত্ৰীসতীশচন্দ্ৰ চৌধুৰী কৰ্ত্তক নাট্যকাৰে পৰিচিত ।” তবে এ পুস্তক যে কোন পুস্তকেৰ নাট্যকপ তা কোথাও লিখিত নাই । সম্ভবতঃ মুনশী আবদুৰ রহিম প্ৰণীত ‘গাজী-কালু ও চম্পাবতী’ কাব্যেৰ ছাৰা অবলম্বনে ৰচিত নাট্যকপ । আবার দেখা যায় যে আবদুৰ রহিমেৰ কাব্যেৰ নামকৰণেৰ প্ৰথম শব্দ ‘গাজী’ কিন্তু সতীশচন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ নাটকেৰ নামকৰণেৰ প্ৰথম শব্দ ‘কালু’ । তবে খোন্দকাৰ আহম্মদ আলী এবং মোহাম্মদ মুনশী ৰচিত কাব্যদ্বয়েৰ নামকৰণেৰ সঙ্গ সতীশচন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ নাটকেৰ নামকৰণেৰ সম্পূৰ্ণ মিল আছে । দুখেৰ বিষয় শেখোক্ত কাব্যদ্বয় আঞ্জো আমাদেৰ হস্তগত হয়নি,—হয়ত তা একেবাবেই হুপ্ৰাপ্য ।

পশ্চিমবঙ্গেৰ সাহিত্যিক ভাষাৰ সঙ্গে বাৱাসত—বসিৰহাট অঞ্চলেৰ চলিত ভাষাৰ সংমিশ্ৰণ এই নাটকে দৃষ্ট হয় । নবাব বা বাজাৰ মুখে পাওৱা যাৰ মাজিত ভাষা, অৱশ্যকৈ কৃষক, ব্যাধ পাটনী, বিডিওৱালা প্ৰভৃতিৰ মুখে পাওৱা যাৰ স্থানীয় অমার্জিত ভাষা । নবাব সেকেন্দাৰ বলছেন,—“এ ক্ষীণ শৰীৰে আৰ গুৰুতৰ পৰিশ্ৰম কৰ্তে পাৰি না । বিচাৰ-বিতৰ্ক-বাজনীতি যেন বিষম বলৈ বোধ হয় ।”



পাটনীর মুখের ভাষার নমুনা ; —“সে আজ্ঞে, তবে আমি চল্লম—  
পেবণাম্ ।”

নবাবের কোষাধ্যক্ষের পত্নীর মুখের ভাষা,—“কে বা হাঘবে হতভাগা—  
নেলাক্কেলে—ববাম্ববে উনপাঁজ্ববে । বল্লৈ কথা তনিসুনে । মুজো খ্যাংবায়  
সোজ্জা কব্ব ।”

ব্যাধিনী বল্ছে,—“আব ত্ৰাক্কা কন্তে হবে না ।”

নাটকে নাটক-নাটিকা হতে আবস্ত কবে রাজা-পুৰোহিত-বেগম প্রভৃতি  
প্রায় সকলের কণ্ঠে গীত সন্নিবেশিত হইবে । গানগুলিও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ।  
কবেকটি গান পাঁচালীর সুবে গাইবার উপযুক্ত । কতকগুলি অধ্যাত্মভাবে  
পূর্ণ । কতকগুলি গান সস্তা বসপুষ্ট । গানগুলি অবশ্য বিশেষভাবে ‘রাজার’  
ব্যবহারের উপযোগী ।

সমগ্র নাটকখনি গদ্য ও পদ্য উভয় ছন্দে রচিত । পবীৰাও পদ্যে  
কথোপকথন কবেছে ।

নাট্যকার এই অল্প পরিসর নাটকের মধ্যে অনেক প্রবচন সংযুক্ত করেছেন ।  
যথা,—

- ১। এ হুনিয়া ভোজের বাজী ।
- ২। বাধে কুষ্ঠ মাঝে কে ?
- ৩। নিল জ্বের নাহি লাজ নাহি অপমান,  
সুজনকে এক কথা মরণ সমান ।
- ৪। নথ নাড়াব বেলা তো কসুব নেই,  
নে নে আব নাচতে এসে  
ঘোমটা টেনে কাজ নেই ।
- ৫। কুসন্তান হলেও কখন কুমার হতে পাবে না ।
- ৬। মাতা-পিতা ধন-জন কেউ কারো নয় ।
- ৭। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি,  
বাম না হতেই রায়াষণ ।
- ৮। গবজে গয়লা ঢেলা বয় ।
- ৯। মধু অভাবে শুভ, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ।
- ১০। হল ডিল তো কল্লেন ভাল,  
খেলেন কচু তো বল্লেন নিচু ।

নাটকখানিতে ব্যবহৃত ভাষাৰ গতি সহজ ও স্বচ্ছন্দ। হেকমৎ, কসম, দবদ, নফৰ প্রভৃতি কিছু কিছু আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহৃত হবছে, কিন্তু ইংবেজী কোন শব্দ পৰিলক্ষিত হয় না। স্থানীয় ভাষাৰ ক্ৰিয়াপদে ‘আম’ প্রত্যয়েৰ স্থলে ‘এম’ প্রত্যয় লক্ষ্যনীয়। যথা :—কল্লেম, চল্লেম প্রভৃতি। আঞ্চলিক ভাষাৰ প্রকৃষ্ট নিদৰ্শন নাটকেৰ অগ্ৰতম চৰিত্ৰ “কপটাদেব” মুখে পাওৱা যায়। যথা :—

ঘৰে দোৰ দিহে কচে কি ? আচ্ছা বও, আমি কেঁদে ককিহে সাড়া  
দিহে দেখি। (গলা শানাইয়া) বলি বাড়ী আহ গা ?”

“কালু-গাজী-চম্পাবতী নাটকেৰ” কাহিনীৰ সৰ্গে মুনশী আবদুৰ বহিম সাহেবেৰ কাব্য “গাজী-কালু-চম্পাবতী” কাহিনীৰ সাধাৰণ মিল আছে। সুতৰাং কাহিনীৰ বিবৰণ পুনৰায় এখানে প্রদত্ত হ'ল না। কাহিনীটিকে নাটকোপযোগী কৰাৰ জন্তু কপটাদ, বিডিওহালা, বিত্ত প্রভৃতি কিছু পার্শ্ব-চৰিত্ৰ নাট্যকাৰ সংযুক্ত কৰেছেন। তা ছাড়া এতে নৃত্য সহযোগে গান পৰিবেশন কৰা হবছে। উক্ত কাব্যেৰ সাধে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষ্য কৰা যায—

১। চম্পাবতী, গাজী ও কালু, এই তিনি নামেৰ গাজী নামটি আবদুৰ বহিম সাহেব আগে ব্যবহাৰ কৰেছেন এবং কালু নামটি সতীশচন্দ্ৰ চৌধুৰী মহাশয় আগে ব্যবহাৰ কৰেছেন কেন তা কবি বা নাট্যকাৰ কেউই কিছু বলেন নি। তবে এব প্রধান দুটো কাৰণ আছে বলে মনে হয়। প্রথমতঃ গাজী অপেক্ষা কালু বয়সে বড়। সুতৰাং সম-আদৰ্শে বিশ্বাসী এবং ধৰ্মপ্ৰচাৰে সম অংশীদাৰ কালুকে নাট্যকাৰ গোণ ব্যক্তি বলে মনে কৰেন নি। দ্বিতীয়তঃ ইসলামেৰ বাণী ও আদৰ্শ প্রচাৰই পীৰ-দরবেশগণেৰ জীবনেৰ মূল উদ্দেশ্য, অতএব সেই আদৰ্শ থেকে কালু বিচ্যুত হন নি, উপবস্ত মাঝে মাঝে গাজী যখন বিভ্রান্ত হ'ৰে লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হওৱাৰ উপক্ৰম কৰেছেন, তখন কালুই তাঁকে পদস্থলন হতে বক্ষা কৰেছেন।

২। পাঁচালী কাব্যেৰ কাহিনীতে গাজী ও চম্পাবতীৰ প্রণয়-কথা মুখ্যস্থান অধিকাৰ কৰেছে, যদিও তাঁৱা শেষপর্যন্ত ইসলামেৰ জয়গান গেৰেছেন। সতীশ চৌধুৰী মহাশয় তাঁৰ নাটকে গাজী ও চম্পাবতীৰ প্রেম-কথাকে উপেক্ষা

করেন নি। তিনি পীৰ-ককিৰগণের যে আসল উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্ম প্রচার—তা মূল চিন্তায় বেখে এই কাহিনী গড়ে তুলেছেন।

৩। আবহুব বহিম সাহেব বচিত কাব্যে মটুক বাজার বাজ্যপ্তক সকলের ইসলাম ধর্মগ্রহণের কথা আছে, কিন্তু নাট্যকাব সতীশচন্দ্র চৌধুরী তাঁর নাটকে মটুক বায়কে ধর্মান্তরিত হইবেছেন এমন দেখান নি। কেবল রাজার পুৰোহিত দক্ষিণা দেওকে মুসলমান হতে হবে, গাজীব এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশিত হইবেছে মাজ—তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কৰেছিলেন এমন কিছুই দেখানো হয় নি। তবে সাফাই নগরের রাজা মুসলমান হলেন—সে চিত্র সতীশবাবু দিবেছেন। বস্তুতঃ, মটুক বাজা এবং দক্ষিণ বায় যে মুসলমান হয়েছিলেন এমন বস্তুব্য আপাততঃ নজবে পড়ে না। কৃষ্ণবাম দাসের “বায়মজল” কাব্যে শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের ভিত্তিতে মিলন ঘটতে দেখা যায়—ধর্মান্তরিত হওবার কথা সেখানেও নেই। মহম্মদ এবাদোলা বচিত “পীৰ গোবর্চাদ” কাব্যেও দেখা যায় দক্ষিণ বায় ধর্মান্তরিত হন নি,—তবে বাজ্য নিজে উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ পীৰ গোবর্চাদ ও দক্ষিণ বায়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইবেছিল। মুজী খোদা নেওয়ারাজ বচিত “গোবর্চাদের কেছা” কাব্যেও দক্ষিণ বায়ের মুসলমান হওয়ার কথা নেই—সেখানেও উভয়ের মধ্যে সহাবস্থানের কথা বোঝিত হয়েছে।

৪। আবহুব বহিম সাহেব পীৰ মাহাত্ম্য-কথা স্তনাতে গিবে গাজী-চম্পাবতীর বিবাহকে কেন্দ্র করে কাহিনীটিকে আদি-বসাত্মক কবে তুলেছেন। তাদের প্রেমকথায় সন্তুষ্ট না হতে পেরে যেন কিছু বভিজীলার কথা বলে সাধ মিটিয়েছেন। আদি-বসাত্মক চটুলতা প্রকাশের দুর্বলতা দুব কববার চেষ্টায় তাই কবি শেষ দিকে গিবে নবী কথা, শাহ জালাল কথা, বদর শাহ কথা প্রভৃতি অনেক কথা বলে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হইবেছেন। নাট্যকাব সতীশ চৌধুরী এ সব দিক থেকে পরিস্থিতির পরিচয় দিইয়েছেন। ধর্মপবায়ণ ব্যক্তির নিকট তাঁর নাট্য-কাহিনী আদিবসাত্মক বলে মনে হবে না। গাজী ও চম্পাবতীর মধ্যে প্রণয়ালাপের মধ্যে একটা সংঘত ভাব লক্ষিত হবে—উভয়ের মিলনের মধ্যে একটা স্বর্গীয় পবিত্র ভাবধারা পবিবেশনের প্রচেষ্টা দেখা যায়।

৫। দেশপ্রেমাত্মক কথা “গাজী-কালু-চম্পাবতীর” কাব্য-কাহিনীতে স্থান পায় নি। ‘গাজী-চম্পাবতীর প্রেমকথা’ দিইে সাধারণের মনোবঞ্জন-প্রবণতা

স্পষ্ট অনুভূত হয় ; ধৰ্মকথা পৰিবেশন। গোঁণ হয়ে উঠেছে। সতীশবাবুর নাটকে কোন সংঘৰ্ষমূলক চিন্তাব চেবে, দেশাত্মবোধক প্রত্যক্ষ ঘটনার উপস্থাপন। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

৬। কালু-গাজী-চম্পাবতী নাটকের কাহিনীতে সমাজের তৎকালীন অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম-দ্বিতীয় দশকের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। তৎকালীন উচ্ছৃঙ্খল সমাজ, এমন কি সমাজ-শ্রেষ্ঠ পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের আচাৰ-আচরণ, এই নাটকের অন্ততম চবিত্র বাজা রামচন্দ্রের স্তায় শ্রেণী-চবিত্র এই নাটকে প্রতিফলিত হইবে।

রাজা বামচন্দ্র যিনি রাজসভার নৃত্যপট্টরসীগণের নাচ-গানে আনন্দ-বিভোর হয়ে চবম সুধ অনুভব করতে চাইতেন, তিনি ভোজন বসিকতার যে পবিচয় দিয়েছেন তা এইরূপ—

লুচিষ্ক মণ্ডাশ্চ ক্বীব দধি সন্দেশং ।

খাজা গজা কচুরিঞ্চ পবমান ইত্যাদিং ॥

তিনি আরো বলেছেন যে, পঞ্চ ‘ম’ কাবই সুখের আধার। সেখানে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নম্র নিবে আপত্তি জানানলেন,—“আমি জানি পঞ্চ ‘ম’ কার সবচেয়ে খাবাপ জিনিষ।”

এ সবই তৎকালীন বিলাসী রাজসভাবর্ণের বাঁটি চিত্র। ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণের চাড়ুবী-চরিত্র এখানে সুস্পষ্ট। মুসলমান কালু রাজসভার উপস্থিত হলে রাজসভা অপবিত্র হয়েছে, অতএব তা পবিত্র কবাব ব্যয়-কার্পণ্য ভাব প্রকাশ পাওয়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয় বললেন—“অবহা বুঝে ব্যবহা দিতে না পারলে কি আজকাল পুরুভগিবি চলে!”

৭। দেশ-প্রেমের হাওয়া যে গ্রামে গ্রামে তখন ( ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দ ) বেশ খানিক প্রবেশ কবেছিল তা বিডিওঘালাব গান থেকে বুঝা যায়—

চাই, গোলাপী বিডি চাই,  
বিদেশী সিগারেটের  
মুখে দে না ছাই।  
মৌবী এলাচ মৃগনাভি,  
বোম্বে মাদ্রাজ বর্ষা পাবি,  
ঘরের সোনা ফেলে দিলে,

পবের বিষ কেন খাই ।  
 কাজ কৰ মিলে মিশে  
 দেশের পরসা থাকবে দেশে  
 কেন মৰ কল্প সতীশে  
 আপশোষে বাঙালী ভাই ।  
 যেও না আব পববশে  
 যায প্রাণ ক্ষতি নাই ॥

৮। অনুকপ দেশ-প্রেমান্বক কথা গাজী-কালু-চম্পাবতী কস্তাব পুথিতে নেই। এইসব পুথিতে কিছু প্রণয়-কথা ও ধর্মকথা ছাড়া সাহিত্য-বসান্বক কিছু নেই। তাই কোন কোন সমালোচক এইরূপ পাঁচালী কাব্যগুলিকে উপেক্ষা কবেছেন। এমনকি তাঁরা এইসব বচনাকে কদর্য ভাষায় বচিত বলে মন্তব্যও কবেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁরা হয়ত খবর বাখেন না যে, এখনও কোন কোন অঞ্চলের নিবন্ধন জনসাধারণ আগ্রহসহকাৰে ভক্তিভাবে এই সকল রচনার মাধ্যমে পীৰগণের মাহাত্ম্য-কথা অবগত হবো থাকেন। তাঁরা এগুলিকে যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে উপভোগ তো কবেনই এবং সেই সাথে প্রচুর আনন্দও লাভ কবেন। যে মুসলমান সমাজ-চিত্র অল্প কোন সাহিত্যে স্থান পাবনি, ইতিহাসের ক্ষেত্রে যার মূল্য অপবিসীম,—তা এই বচনাবলীতে ধৰা পড়েছে।

৯। আধুনিক কালের স্ত্রোণ-ব্যক্তির এক মনোবম চিত্র অঙ্কন করে নাট্যকাব লিখেছেন :—

কলির একি কাণ্ড দেখি ॥  
 বলব কাবে মনের কথা,  
 কে আছে এমন দুঃখের দুঃখী ।  
 এখন মাগ হযেছে মাথাব মণি,  
 ভাতার ব্যাটা যেন ঢেঁকি ।  
 বাপ-মা যে গো পাষ না খেতে,  
 ছেলে আছেন হয়ে খেঁকী ।  
 কলির একি কাণ্ড দেখি ॥

১০। গাজীর মাতা ‘অজুপা’র পাগলিনী হওয়া আচাব-ব্যবহার দীনবন্ধু মিত্রের নীলদৰ্পণের নবীনমাধবের মাতার পাগলিনী হওয়া আচাব ব্যবহারকে স্মরণ কবিষে দেয়। গাজীর মাতা অজুপা বলেছেন,—

—“কে তুই, কে তুই? দুব হ দুব হ। তুই আমাৰ সামনে থেকে  
সবে যা,—আমাৰ নিঃশ্বাস গাষে লাগবে। (উচ্চ হাস্য, চিন্তা, ক্রন্দন)”  
কিংবা,—“ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বান্ধুসী।” ইত্যাদি।

১১। নাটকখানি পূৰ্ণমাত্রায় পীৰমাহাত্ম্য-নাটক নামেই অভিহিত। এতে  
পীৰেৰ সাত্ৰে দেব-দেবীৰও আগমন ঘটেছে, দৈববাণী শ্রুত হৈছে,  
মৰ্ত-পাতালৰ মध्ये যোগাযোগ হৈছে, আল্লাহু তা’লাকে ভক্তিভাবে ডেকে  
অলৌকিক শক্তিতে শক্তিশালী হতে দেখা গেছে, স্বপ্ন-দৰ্শনকে বাস্তবে পৰিণত  
হতে দেখা গেছে, যাহু বা মন্ত্ৰবলে নিজ কপ পৰিবৰ্তিত হতে বা তৎকৰ্তৃক-  
অসম্ভব কাজ সম্পন্ন কৰতে দৃষ্ট হৈছে, এমন কি দেখা গেছে যে—  
ভাগ্যবিচাৰেৰ ফল ঠিকভাবে ফলেছে। বাস্তব সমাজ-জীবন ভিত্তিক  
নাটকে এ সবেৰ অনুপ্রবেশ অস্বাভাবিক বলে সহজেই স্বীকৃত হতে  
পারে। তা ছাড়া জল্লাদেৰ হাতেৰ তববাবি ভেঙে যাওয়া, হাতীৰ পায়েৰ  
তলাৰ পিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আহত না হওয়া, ভাবী পাথৰ শোলাৰ ছায় হান্ধা  
বোধ হওয়া, প্রহ্লাদেৰ শ্বাষ গাজী তাঁৰ পিতাৰ বিকদ্ধাচরণ কৰে আল্লাহেৰ:  
ভক্ত হলে সংসাৰ ত্যাগ কৰা প্রভৃতি ঘটনাগুলি বিচাৰ কৰে কাহিনীটিকে  
হিন্দুদেৰ পৌৰাণিক কাহিনীৰ অনুকৃতি বলা সঙ্গত।

১২। নাটকেৰ কাহিনী থেকে প্রমাণিত হয় যে, পীৰগণেৰ কীৰ্তিকলাপে  
হিন্দুগণও মুগ্ধ না হৈ পাবেন নি। পীৰ দৰবেশও দেখা য়ান হিন্দুৰ দেবীকে  
যথেষ্ট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কৰেহেন। একস্থানে পীৰ বডৰ্খা গাজী পাতালেৰ  
অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাগৰ-মাসীৰ শবণাগ্ন হৈছে তাঁৰ সাহায্য প্রার্থনা কৰুহেন,—

মাসী পূৰ্ণ কৰ বাসনা।  
যাচি তব ককণা ॥  
তুমি বিনা বিজন বনে  
কে আছে আব বল না।  
... ..  
নগবে বসাতে সাধ  
উপায তো দেখি না।  
স্বীকাৰ না হলে মাসী  
ও চৰণ তো ছাড়ব না।

সাগর-মাসীও দেখা গেল গাজীর অনুবোধের উত্তরে বললেন,—

“বাপ গাজি। এব জন্ত চিন্তা কি। উঠ, চল,—আমি এব উপায় কবে দেব। চল, পাড়ালে আমার কথা পদ্মাবতীর কাছে চল। সে তোমাকে দেখলে বড় খুশী হবে।”

১৩। পৌৰাণিক আদর্শের কাহিনী হলেও তৎকালীন বাঙালী-সমাজ-চিত্র এই নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। কপটাদ ও তাঁব গৃহিনীর চবিত্র, অজুপা ও পাঁচতোলাব চবিত্র এবং আচার-ব্যবহাবাদি খাঁটি বাঙালী চবিত্ররূপে উদ্ভাসিত। জামাতা গাজী ও কত্যা চম্পাবতীকে বিদায় দিবার সময় স্বাস্তভী লীলাবতী বলছেন :—

“বাবা, চম্পা আমার অভিমানিনী, বড় মল্লের, বড় আদরের সামগ্রী।

স্বত্ব কবে বেখ। আর অধিক কি বলব।

মা চম্পা, স্বস্তব-স্বাস্তভী প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি কবে।। পতি পবন গুরু, কখনও তাঁব অবাধ্য হযো না। তাঁব অমতে কোন কাজ কৰো না। লোকে যেন নিন্দা না কবে। মনে বেখ, তাঁব চেবে কলঙ্ক মেয়ে মানুষের আর কিছুই নেই। আশীর্বাদ কবি তোমরা সুখী হও।”

১৪। নাট্যকাব ভূত-প্রেতের অবতারণা কবে সুন্দরবনাঞ্চলের তৎকালীন সবল অধিবাসীদেরও মনোভাব এবং তৎসহ তাদের ভূত-প্রেতে বিশ্বাসের চিত্র অঙ্কন কবেছেন।

১৫। ব্রাহ্মণ্য আদর্শ ইসলাম ধর্ম সমাগমে আহত। দৃঢ়ভাবে তা প্রতিষ্ঠিত করার শেষ চেষ্টায় ব্রাহ্মণ রাজা মটুক বান্ন আহ্বান জানাচ্ছেন :—

“উঠ সৈন্যগণ, এস ব্রাহ্মণগণ, যদি নিজ ধর্ম-অস্তিত্ব রক্ষা কর্তে চাও,  
—যদি জাতিকুল মান বজার বাখ্তে চাও,—তবে চল, সকলে একযোগে বীরদর্পে যুদ্ধে গমন কবি।”

১৬। নাট্যকাব বাঘসৈন্তের মুখে ভাষা আৰোপ কবেন নি, যদিও তিনি বাঘগণকে মঞ্চে আনয়ন কবেছেন, তাদেরকে যুদ্ধে আহ্বান কবা হয়েছে মাত্র। গাজী প্রসঙ্গে বিভিন্ন কাব্যে বাঘগণের নামের বিবরণ লিখিত হয়েছে,—নাট কাব সেকণ নামও উল্লেখ কবেন নি।

১৭। স্বাধীনতা আন্দোলনের আবহাওয়া এই নাটককে স্পর্শ করেছে।  
কারণ, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কথোপকথনের মধ্যে একটি গানে আছে :—

“—প্রাণনাথ পায়ে পড়ি,  
দাও না কিনে দেশী শাড়ী,  
নইলে চলেই যাব বাপের বাড়ী  
যতন করে দেশের জিনিষ মাথায় তুলে রাখ না।  
হৃদয় খুলে ‘সতীশ’ বলে এই কথাটি ভুল না ॥

১৮। নাট্যকাব স্বদেশী যুগের তৎকালীন আবহাওয়ার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহবন্ধনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তবু বিদেশী জিনিষকে বরদাস্ত করেন নি। তিনি নিজে “এলাহি ভবসা” স্মরণ করে প্রথমে শিবোনামা লিখে নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন তবু ইংবেজগণের অধীনতাপাশকে স্বীকাব করেন নি। তিনি চার খানা দেশাত্মবোধক গান এই নাটকে স্থান দিয়েছেন। গানগুলির শব্দচয়ন ও গ্রন্থনা দেখলে বোঝা যায় যে নাট্যকাব এইরূপ গান রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি তাব বিভিন্ন গ্রন্থে অসংখ্য গান রচনা করে গেছেন।

কালু-গাজী ও চম্পাবতী নাটকে অঙ্কিত চবিত্তাবসীকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিভাগে বিভক্ত করা যায়—

- ১। মানব। যথা,—সেকেন্দার, গাজী, কালু, চম্পাবতী প্রমুখ
- ২। দেবতাস্থানীয়। যথা,—সাগর মাসী।
- ৩। অমানব। যথা,—বাক্স, ভূত-প্রেত ও পবী।
- ৪। পশু। যথা,—বাঘ ও কুম্বী।

তাছাড়া চবিত্তগুলি অল্প ভাবে বিভক্ত করলে দেখা যাবে যে মানব চবিত্তে অভিজাত ও অনভিজাত শ্রেণীর চবিত্ত রয়েছে। অনভিজাত বলতে—  
বিডিওয়াল, কৃষক, ব্যাধ প্রভৃতিকে চিহ্নিত করা যায়।

গাজী ধর্মপরাধ মানব। সুফী ফকিরের আদর্শ-অনুসারী গাজী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন—কিন্তু সেখানেই তাঁর গতি শেষ হবে যাব নি। গাজী উদাসীন, যোদ্ধা, প্রেমিক, দহাবান, গাজী ভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল; গান মানসিক দিক থেকে যথেষ্ট দৃঢ়।



কালুও ধৰ্মাপবারণ মানব। তিনি গাজীৰ বন্ধু, ভাতা, ভৃত্য—সব কিছু। তিনি গাজীকে সুফী-ফকিৰের আদর্শে নিষ্ঠাবান থাকতে সর্বপ্রকার পবামর্শ দিয়েছেন। পীৰ গোবাচাঁদের সাথে সোন্দলের সঙ্গে তাঁর বেশ কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। সোন্দলের ঞ্জ তিনিও পালক-পুত্র।

সেকেন্দর শাহকে বাদশাহ অপেক্ষা পিতা হিসাবে অধিকতর আকর্ষণীয় চৰিত্র বলে মনে হয়। তিনি ভাগবতের হিবণ্যকশিপুব সঙ্গে কিছুটা তুলনীয়। তবে তিনি আল্লাহকে অস্বীকার করেন নি। পুত্রের প্রতি সমধিক স্নেহপবায়ণ ছিলেন বটে।

মাতা হিসাবে অজুগা ছিলেন খাঁটি বাঙালী ঘবের আদর্শ জননী। পুত্র বিহনে বিবহ যে কতখানি ভীত্ব হয়ে জননী হৃদয়ে আঘাত করে তাব জলন্ত নিদর্শন এই চৰিত্রটি। পুত্রবধূর সহিত তাঁব ব্যবহার, পুত্রের জন্ত তাব মুহূর্ত যাওয়া বা পাগলিনী হওয়া দীনবন্ধু গিঞব “নীলদর্পণ”—নাটকের কাহিনীকে স্মরণ কৰিয়ে দেয।

বাজা মটুক ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধাবক ও বাহক। বাজা হিসাবে তিনি কঠোর নীতি অনুসবণকারী। আপন কস্তাব প্রতিও তিনি বাজোচিত ব্যবহার কবেছেন। শেষ পর্যন্ত গাজীব নিকট পবাজিত না হলে কিছুতেই তিনি মুসলমান ধর্মাবলম্বীৰ সহিত কস্তাব বিবাহ দিতে সম্মত হতেন না। অর্থাৎ ধর্মত্যাগ কৰ। ববং তাঁব পক্ষে সহজ কিন্তু জীবন ত্যাগ কৰা যায় না। অপবপক্ষে চম্পাবতীৰ পতিগৃহে ষাড্রাকালে পিতা হিসাবে মটুক বাজা যে উপদেশ দান কবেছেন তা থেকে তাঁব আদর্শ গৃহী হৃদয়েৰ পবিচল পাওয়া যায়।

বাণী লীলাবতী ছিলেন একজন আদর্শ নাবী। তিনি জননী। তাই কস্তাব অন্তব-বেদনাকে তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব কবেছিলেন। গাজী মুসলমান হলেও যেহেতু গাজীব নিকট চম্পাবতী আত্মসমর্পণ কৰেছেন, সেই হেতু আব কারো কাছে তিনি আত্মদান কবতে পাবেন না—এ শিক্ষা তাঁব মাযের কাছ থেকে গৃহীত। বাণী লীলাবতীৰ নিকট পতির ধর্মই পত্নীৰ ধর্ম। ব্রাহ্মণ-বমণী হলেও মুসলিমকে পতিত্বে বরণ কবার মতন এত বড সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া কম বিস্ময়ের বিষয় নয।

চম্পাবতী চঞ্চলা-চপলা, গাজীব প্রেমে উন্মাদিনী। পিতাব আদেশে তাঁকে

কাবাগাবে থাকতে হয়েছে। অবশ্য তিনি পিতার প্রতি কিছু অভিমান প্রকাশ কৰেছেন। তিনি মাতার আনুকূল্যে সংস্কার-মুক্ত হবে মুসলমান গাজীকে বিবাহ কৰেছেন। স্বস্তব বাড়ীতে এসে স্বাভাৱিকতে স্বস্তব-স্বাস্তী এই অস্তায়কে গ্রহণ কৰেছেন।

সাংগৰ মাসী দেবী হলেও সাধাৰণ নাবীৰ মতনই অধিকাংশ আচৰণ কৰেছেন। তাঁৰ কথাৰ কোথাও হিন্দু বা মুসলমান এমন প্রশ্ন আসে নি।

বাংলাদেশৰ মতন মুসলমান বিধেয়ী লোকৰ অভাৱ সেকালে ছিল না। ‘পঞ্চ’-ম কাব সাধনাই তাদেব অনেকৰ জীবনেৰ সৰ্বস্ব। তবে চৰম আঘাতে এ সব চৰিত্ৰেৰ লোক সাধাৰণ ভাবে একেবাবেই ভূমিতে প্ৰপিত কৰে।

অনুকপভাবে ব্ৰাহ্মণ, বৈষ্ণৱ, কপটাদ, বিহুৱক, হবি, তৰি প্ৰভৃতি প্ৰত্যেকটি চৰিত্ৰ স্বতন্ত্ৰ মহিমাৰ ভাষ্যৰ।

নাটকখানি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অৰ্থাৎ আজ থেকে অৰ্ধ শতাব্দীৰও পূৰ্বে ৰচিত। তৎকালেও হিন্দু-মুসলমানৰ মध्ये বিবাহ সংঘটন বাঙালী সমাজে অননুমোদিত ছিল না—এই নাটক তাৰ প্ৰকৃষ্ট প্ৰমাণ। সেই সংগে আরো কষেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়—

- ১। সংসাৰ ভ্যাগী সুকী ফকিৰেৰ বিবাহ,
- ২। দেবীৰ সঙ্গে পীৰেৰ কথোপকথন,
- ৩। বাঘ ও কুমীৰেৰ যুদ্ধ বৰ্ণনা,
- ৪। প্ৰণয়খান এই কাহিনীতে যথেষ্ট প্ৰাধান্য লাভ কৰেহ,
- ৫। গাজীৰ বিবাহ—শ্ৰীকৃষ্ণেৰ ব্ৰজ ভাগেৰ ফলে ব্ৰজপুৰে যে বিবাহ সৃষ্টি হৰেছিল—তাৰ সঙ্গে তুলনীৰ,
- ৬। পীৰ গোবাচাঁপ কাব্য বা পেতুৰাৰ কেছাতে বৰ্ণিত জীবন-কুঁসাৰ জল অপবিত্ৰকৰণ কাহিনীৰ প্ৰতিকূল দৃষ্ট হয়।
- ৭। পীৰ একদিল শাহ কবোও দেখা যাৰ মন্ত্ৰনলে পীৰ এক সময় বাথকে ভেড়াৰ কপাত্তবিত কৰেছেন।

৩। ৱায়-মঙ্গল কাব্য

বাংলাদেশ কাবোৰ ৰচয়িতা হুজুৰান দেৱেৰ বাসস্থান ছিল চক্ৰিশ পৰগণা দেশৰ অন্তৰ্গত নিমতা নামক গ্ৰামে। তাঁৰ জন্ম তাৰিখ অনুমানিক ১৮৫৬—৫৭ খৃষ্টাব্দ। কাব্য ৰচনাৰ কাল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। তাঁৰ ৰচিত

পুস্তক সংখ্যা পাঁচটি বলে জানা যায়। তাদের নাম যথাক্রমে কালিকা মঙ্গল, ষষ্টিমঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল। কবি ছিলেন বৈষ্ণব ভক্ত। ধর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমগ্রযেব পক্ষপাতী। বাস্তবতা তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কৃষ্ণবাম দাসের তৃতীয় বচনা এই বায়মঙ্গল কাব্য। কাব্যের আকার ১৪"×৫"। পত্রসংখ্যা ১ হতে ২৫ পর্যন্ত। পুঁথিতে দুই-তিনজনের হস্তাক্ষর পবিলক্ষিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিসংখ্যা ১৭৯৮।

এই কাব্য ত্রিপদী ও ত্রিপদী পষাবে রচিত। এতে বেশ কিছু বর্ণাঙ্কিত আছে। ল ও ন এর আকৃতি একই প্রকার। ঙ ও অ এর মধ্যে ব্যবহারের কোন নিষম নেই। ন য ব জ শ এরও ব্যবহারের কোন নিষম নেই। প্রচুর আববী (যেমন মোকাম), ফাবসী (যেমন গাবিদা) ও হিন্দী (যেমন পাগু) শব্দ থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় লিখিত কাব্যখানি সুখপাঠ্য। বেশ কয়েকটি সুপ্রচলিত প্রবাদ এতে বসেছে।

### সংক্ষিপ্ত কাহিনী

পুষ্প দত্ত সাধু, পাটনে যাওয়ার পথে সেই নৌকার মাঝিগণের নিকট পীৰ বড়খাঁ গাজীর নিয়লিখিতরূপ বিবরণ শুনলেন :—একবার ধনপতি সওদাগর পাটনে যাবার পথে পীৰ বড়খাঁ গাজীকে জিজ্ঞাসা জানিবে কেবল দক্ষিণ বায়ের পূজা কবায় গাজীর সাথী ফকিরগণ অসন্তুষ্ট হয়ে ঘটনাটি পীৰ বড়খাঁ গাজীর গোচরে আনলেন। পীৰ সাহেব সব বৃত্তান্ত শুনে নিজে বুঝলেন যে সেই অঞ্চলে তাঁর অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তিনি কষ্ট হলেন এবং দক্ষিণ বায়ের নামে সৃষ্ট ঘব ভেঙে দিলেন। ফলে দক্ষিণ বায়ের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়ে উঠল অনিবার্য। উভয় পক্ষেই সৈন্য হ'ল বাঘ-সৈন্য। নানা বর্ষের, নানা চেহাবার, নানা চরিত্রের এবং নানা নামের বাঘ ভাব।। পীৰ বড়খাঁ গাজী এবং দক্ষিণ বায়ের আস্থানে সেই সকল বাঘ নিজ নিজ অধিপতির নিকট উপস্থিত হল এবং নিজ নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। এক নির্দিষ্ট সময়ে আবহুত হল তুমুল সংগ্রাম। যুদ্ধ অব থামে না। যুদ্ধে জয়-পবাজ্যের নিষ্পত্তির কোন সম্ভাবনা নেই। এমতাবস্থায় এক মিত্র দেবতা তাঁদের উভয়ের মধ্যে এসে উপনীত হলেন,—

অর্দ্ধেক মাথাষ কাল। একভাগ চুড়া টালা  
 বনমালা ছিলিমিলী তাতে  
 ধবল অর্দ্ধেক কাষ অর্ধ নীলমেঘ প্রায়  
 কোরাণ পুৰাণ দুই হাতে ।

- অর্ধ-শ্রীকৃষ্ণ ও অর্ধ-পীৰ (?) বেশধারী সেই পৰমেশ্বৰ যুদ্ধবত দক্ষিণ বায় ও  
 বডখাঁ গাজীকে ঠাণ্ডা কবলেন । তিনি উভষেৰ মধ্য সৌহার্দ্য পুনৰাষ স্থাপন  
 কৰে দিলেন । মিটমাটেৰ সৰ্ত হ'ল,—

বড খাঁৰ মহাকাষ গোবে কেবামত তাষ  
 হইবে লোকেৰ কাম কতে  
 যেখানে পীৰেৰ নাম বাবাম মোকাম থান  
 যত ক্ষততাল্য নাম হতে ।  
 মাষা যুগু এইকপ দক্ষিণ দেশেৰ ভূপ  
 পূজা কবিলেক যতজন  
 এখানে দক্ষিণ বায় সব ভাটী অধিকার  
 হিজলীতে কালু বাষ থানা  
 সৰ্বত্র সাহেব পীৰ সবে নোষাইবে শিব  
 কেহ তাহে না কবিলে মানা ।

সেই দিন হতে পীৰ মোবাবক বডখাঁ গাজী এবং ঠাকুৰ দক্ষিণ বাষ  
 আঠাবো ভাটী বাজ্যেৰ সমান অধিকাৰী হলেন । পবাজযেৰ গ্লানি কাৰো  
 স্পৰ্শ কবল না ।

এই কাহিনী শুনে পূজা দিও তৰে গাজী পীৰেৰ মোকাম থেকে সওদাগর  
 ডিঙ্গা ছাড়লেন ।

বাষমঙ্গৰ কাব্যংশেৰ এই কাহিনীটিতে মূলতঃ সমন্বযেৰ কথা প্রাধান্য লাভ  
 কৰেছে । সে সমন্বয ঈশ্বৰ-অভিপ্ৰেত । এমন এচেষ্টা সবাসবি সচরাচৰ  
 দৃষ্ট হয় না । পীৰ গোবাচাঁদ-কাব্যে পীৰ গোবাচাঁদ এবং দক্ষিণ বাসেৰ  
 মধ্য সন্ধি স্থাপন ভাটি প্রদেশেৰ উপৰ উভসেৰ সমান অধিকাৰেৰ সৰ্তে  
 সহাবস্থান প্ৰবৰ্তিত হৰেছে । বাঘ-ঈশ্বৰেৰ বিভিন্ন পৰিচয় এবং তাৰেৰ  
 মধ্যকাৰ যুদ্ধেৰ বিস্তৃত বিবৰণ হৃদযগ্ৰাহী ।

বাষ এবং পীৰেৰ দ্বন্দ্ব মূলতঃ অধিবাৰ বিস্তাবেৰ দ্বন্দ্ব । স্থল দৃষ্টিতে হিন্দু

ও মুসলিমৰ মধ্যকাৰ আপন আপন প্ৰভাৱ বিস্তাৰেৰ প্ৰচেষ্টা বলে অনুভূত হয়। উভয়েই দেব বা অল্লাহেৰ বলে বলীযান। উভষেৰই বল বাঘ-সৈন্য নিষে। সমগ্ৰ কাব্যে মানব ও পশু এই দুই চৰিত্ৰেৰ সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

যৌবৰাজ্য পৰিত্যাগ কৰে সংসাৰ বিবাগী হয়ে দেশদেশান্তৰে ভ্ৰমণকালে চম্পাবতীৰ ৰূপলাবণ্যে মুগ্ধ হওঁৱাৰ পৰেৰ কিছুদিনেৰ কাহিনীৰ সঙ্গে এব কোন সাদৃশ্য নেই। এতে প্ৰোচ বডৰী গাজীৰ জীৱন-চিত্ৰ সুপৰিস্ফুট হযেছে। গোঁৱমোহন সেন ৰচিত কাব্যেৰ কাহিনী এবং কলেমদী গায়েন গীত, গাজী সাহেবেৰ গানে বৰ্ণিত কাহিনীৰ মধ্য সাদৃশ্য বযেছে। গাজীৰ মাহাত্ম্য যে দক্ষিণ বায়েৰ মাহাত্ম্য অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহ, আলোচ্য কাব্যাংশে তা পৰিস্ফুট হযেছে। অপৰ পক্ষে দক্ষিণ বায় যে গাজীকে অবজ্ঞা কৰ্ত্তে সমৰ্থ নন তাও এই কাহিনীতে স্পষ্ট। প্ৰত্যক্ষভাবে ধৰ্মপ্ৰচাৰ বা ধৰ্মৰক্ষা বিষয়ক প্ৰশ্ন এখানে নেই। কাহিনী দৃষ্টে মনে হয় এই কাব্যাংশে বৰ্ণিত দক্ষিণ বায় এবং গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্যে বৰ্ণিত দক্ষিণা দেও বা দক্ষিণ বায় একই ব্যক্তি নন। খুব সম্ভৱ দক্ষিণ বায় কোন ব্যক্তি বিশেষ নন, দক্ষিণ বায় অৰ্থাৎ দক্ষিণেৰ বায় আঠাবো ভাটি ৰাজ্যেৰ প্ৰতিনিধি বিশেষ। এবং এই কাৰণেই দক্ষিণেৰ বংশানুক্ৰমিক অধিপতিগণ “দক্ষিণ-বায়” উপাধিতে অভিহিত হযে আসুছেন।

### ৪। গাজী সাহেবেৰ গান

গাজী সাহেবেৰ গানেৰ ৰচয়িতা কে তা জানা যায় না। উক্ত গান ৰচয়িতা আদৌ একজন মাত্ৰ কবি ছিলেন কিনা তাও অজ্ঞাত। বংশানুক্ৰমে গ্ৰামেৰ বিশেষতঃ হেদনমল্ল পৰগণাৰ ফকিৰগণ গ্ৰামে গ্ৰামে এই গান গেয়ে বেবন। নগেলনাথ বসু মহাশয় এই গান জনৈক কলেমদী গায়েনেৰ নিকট ৰেখে সংকলন কবেন। বাংলা ১৩৩৫ সালেৰ ৬ই জ্যৈষ্ঠ তাৰিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদেৰ প্ৰথম মাসিক অধিবেশনে উক্ত গান নগেলনাথ বসু কৰ্ত্তক পঠিত হয়। কলেমদী গায়েন ছিলেন উক্ত অঞ্চলেৰ সিতাঙ্গণ্ডু গ্ৰামেৰ অধিবাসী। তিনি হেদনমল্ল পৰগণাৰ অন্ততম জদিমাৰ দুৰ্গাদাস বাবুৰ প্ৰজা। মোকমুখে প্ৰচলিত এই গান তিনি গেয়ে বেডাভেন।

গাজী সাহেবেৰ গান, মোবাবক গাজী সাহেবেৰ উপাখ্যান নামেও পৰিচিত। এই সংকলিত গানেৰ মধ্য ৮২৮টি পংক্তি বযেছে। গানগুলি ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ পত্ৰিকাৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত হব।

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ বিশেষতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম চব্বিশ পৰগণার সাধাবণ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষের ব্যবহৃত চলিত ভাষায় গাজী সাহেবের গানগুলি বচিত। জাম্যমান ফকিরগণ আপনাব সুবিধামত শব্দ সংযোজন-বিযোজন কৰাৰ এৰ ভাষা অনুৰূপ বিশেষ অঞ্চলের মৌখিক ভাষায় সমৃদ্ধ হযেছে। কয়েকটি শব্দের রূপান্তর কিভাবে হযেছে তা দেখানো হল,—

পুতুব	>	পুখুব
সিপাহী	>	সেফাই
আসিল	>	আইল। ইত্যাদি

ত.ছাড়া বেশ কিছু আববী, কাবসী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হযেছে। যথা :—

গোছল্	অর্থে	হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন কৰা,
চৌহদ্দি	"	সীমানা,
ভেজিল	"	পাঠালা,
মেবা	"	আহাব,
বোলাইয়া	"	ডেফে নিরে, ইত্যাদি।

গানগুলি দ্বিপদী পষারে বচিত। এতে অনেক অশুদ্ধ বানান বযেছে।

গাজী সাহেবের গানের ভাষায় গায়ন ও নকলকাবীর দোষে আধুনিক ছাপ পড়সেও এর মধ্যে ইংবেজ প্রভাবের কোন নিদর্শন নেই। মুসলিমের বচনা হলেও বা মুসলিম গায়নবা এই গান সর্বত্র সুব-লবযোগে গাইলেও এতে তেমন বিশেষ একটা উর্দু ভাষার ছাপ পডেনি। গোছল, সিরনী, হাজত, মুর্শিদ, তলব, হকিকৎ, বেসবিকৎ, আউলে প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি শব্দ ছাড়াও সর্বত্র চব্বিশ পৰগণার স্থানীয় বাংলা ব্যবহৃত হযেছে। এইরূপ গান বঙ্গের নানাস্থানে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের নানা অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যেও প্রচলিত আছে।

### সংক্ষিপ্ত কাহিনী

মোবাবক গাজী আপন পুত্র ডঃবী গাজীকে জানালেন যে তিনি ঘুটিয়াবীতে একটি পুতুব কাটিযে তাতে মক্ক। থেকে পানি এনে বাব্ববেন এবং এই স্থানকে মক্ক। বলে প্রচার কববেন। এতে যাত্রীরা এসে পদধৌত কববে না; গোছল কব্বতে পাববে এবং যদি ভাবা খোদাব নিকট মোনাজাত কবে তবে তাদের মনের আশা পূর্ণ হবে।

মোবাবক গাজী আপনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী সেইকপ একটি মক্কা সেখানে নিৰ্মাণ কৰালেন।

নবাব চাকৰ এসে খাজনা আদাৱেৰ জন্ত জমিদাৰগণকে তলব কবতে সেবেস্তাদাৰকে আদেশ দিলেন। সেবেস্তাদাৰ জানালেন যে, মেনদমল্ল পৰগণাৰ ৰাজা মদন ৰায়েৰ নিকট তিন সনেৰ খাজনা বাকী আছে। নবাব ক্রুদ্ধ হয়ে মদন ৰায়কে হাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে আনতে বললেন। বাবো জন সিপাহী তিন মাস হেঁটে এসে পৌঁছালো। কলকাতাৰ কালীঘাটে। তাৰা কালীমাতাৰ কাছে মানত কবল যে যদি ভাৱা ৰাজাকে বাৰীতে সন্ধান পাব তৰে ফেৰবাৰ পথে বিহুপত্ৰে কালীমাতাকে পূজা দিলে যাবে। অন্তৰ্যায়ী গাজী এ কথা জানতে পেৰে পুত্ৰ দুইগৰা গাজীকে ডেকে জানালেন যে যদি ৰাজাৰ হাতে দড়ি পড়ে তৰে কেউ যেন তাঁকে বাৰা বলৈ না থাকে। এব উপাৱেৰ কথাৰ গাজী জানালেন যে, ৰাজা তাঁৰ কাছে এলে তিনি অবশুই আশীৰ্বাদ কৰবেন।

সিপাহীগণ ৰাজপুৰীতে আসতেই চাৰিদিনে সাভা পড়ে গেল। ৰাজা ভীত হৰে মন্ত্ৰীৰ সঙ্গে পৰামৰ্শ কৰে ঘৰেৰ মধ্যে লুকালেন। পেলাদাৰা বাইৰে হৈ চৈ কবতে থাকল ৰাজা শেষে দেওৱান মহেশ ঘোষকে তানেৰ সামনে কথা বলতে অনুৰোধ কৰলেন। মহেশ ঘোষ তো চাকৰী হাততে চাৱ তবু পেলাদাদেৰ সামনে যেতে চাৱ না। অনেক অনুৰোধে মহেশ ঘোষ তো কালীঠাকুৰেৰ নাম স্মৰণ কৰে ভাদেৰ সামনে এল। সে বলল,— ৰাজা পেঁচাকুল পৰগণাৰ তালুকে গেছেন। জমাদাৰ সে কথা বিশ্বাস কবল না। তাকে চাঁপা গাছে বেঁধে খুব প্রহাৰ কবল। সেই প্রহাৰে মহেশ ঘোষ মৃতপ্ৰায় হল। শেষ পর্যন্ত মন্ত্ৰী মহাশয় ৰাজাৰ নিকট থেকে আটশ টাকা নিয়ে মোবাবক গাজীৰ নাম স্মৰণ কৰে পেলাদাগণকে ঘুষ দিলেন এবং তাৰ বদলে দশ দিনেৰ সময় পেলেন। মন্ত্ৰী এবাৰ মৃতপ্ৰায় মহেশ ঘোষকে ৰাজাৰ নিকট আনলেন এবং গাজীৰ স্মৰণ কৰে অনেক চিকিৎসা—শুশ্ৰূষা দ্বাৰা তাকে বাঁচালেন। মৃতপ্ৰায় মহেশ শেষ পর্যন্ত অসাধাৰণ উপাৰে জীবন ধৰে পাওৱা ৰাজা বিস্মিত হলেন। তখন সে বহুত উদ্ঘাটন কৰে মন্ত্ৰী বললেন,—

মন্ত্ৰ-ভন্ত নহে, গাজী সাহেবেৰ গান ॥

মহাৰাজ মদন ৰায় তখন মন্ত্ৰী মহাশয়েৰ নিকট মোবাবক গাজীৰ বিস্তৃত বিবৰণ নিলেন। তিনি বিশ্বয় বিমুগ্ধ হৱে ফুল-শিৰনি সংগ্ৰহ কৰে শিবনিৰ

হাঁড়ি ভক্তিতে নিজ মস্তকে বহন কবে সোনারপুৰ থেকে ঘুটারি বনে এসে উপস্থিত হলেন।

অন্তর্যামী গাজী, বাজার আগমন বিষয় জেনে পাঁচ বছরের বালকরূপে হেঁড়া-শুনের চট গায়ে দিয়ে পথে বসে ভুলা-বালি মাথুতে লাগলেন।

মন্ত্রী মহাশয়ের পবামর্শে উক্ত বালকের স্বরূপ জেনে রাজা মদন রায় গাজীর চরণ ধরে কাদতে লাগলেন। বালক গাজী সান্ত্বনা-বাক্যে বাজাকে আশ্বস্ত কবে তাঁর পুকুরে খানিক মাটি কাটতে বললেন।

গাজীর নির্দেশমতন তিন কোপ মাটি কোদাল দিবে কাটতেই বাজার পবণের কাপড় খুলে গেল। কাপড় খুলে যাওয়ার ঘটনায় গাজী মত্তব্য করলেন যে তাঁর জমিদারী মাত্র তিন পুকুর থাকবে। বাজা অপব্যয় মার্জনা প্রার্থনা করলেন। তখন গাজী সেই বাজার পোষ-পুত্রের সাহায্যে জমিদারী রক্ষা হবে বলে শান্ত করলেন। সর্বশেষে রাজা ঢাকা থেকে আগত সেফাইদের কথা জানিয়ে বিগদ উদ্ধারের প্রার্থনা জানালে গাজী বললেন ;—

শমনের ভয় আদি নাহিক বহিবে।

দশওরাজ্যতে স্বাৰ। মাত্র সেলাম কবিবে ॥

তোমার সঙ্গেতে স্বাবে চাকব হইয়।।

মোকদ্দমা কতে হবে ঢাকাতে গিয়া ॥

শুভ মঙ্গলবার স্বাত্রাব দিন হিব হল। গাজী তাঁকে শুক্লবার স্বাত্রে উদ্ধাব কববেন। বাজা বললেন,—

সাত খাশী দিবে তব নামে হাজত দিব।

গান-বাইন্ ডেকে তব গান কবাইব ॥

গাজীর আশীর্বাদ নিবে বাজা বাড়ীতে ফিবলেন। জমাদার কষ্ট হল। বাজা স্মরণ কবলেন গাজীর নাম। তখন সেফাইগণ অজ্ঞান হযে (কাঠের পুতুলের স্থায়) দাঁড়িযে বইল। পবিচয পেযে জমাদাব তখন মদন বাযকে মহাবাজ বলে সেলাম কবল। শেষে মহাবাজের প্রার্থনায় গাজীব দরায় সেপাইগণ জ্ঞান ফিবে পেল।

বাজা এবাব নবার সান্ধাতের জন্ত স্বাত্রা কবলেন। বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করে তিন মাস পবে তিনি ঢাকায় পৌঁছিলেন।



ৰাজি দুই প্ৰহৰে গাজী সাহেব পুত্ৰ দুঃখী গাজীকে কুশা ঘাস অনতে বললেন। দুঃখী গাজী কুশা ঘাস আনলেন। কুশা ঘাস নিষে ভ্ৰমবেৰ কপ ধৰে গাজী আঁখিৰ পলকে ঢাকা শহৰে উপনীত হলেন।

নবাব নিখিড অবহাৰ শুনলেন—মদন বায় দৰবাৰে এলে যেন তাঁকে সাদৰ অভ্যর্থনা জানানো হয়। একথা শুনে নবাব কেঁদে ফেললেন। তিনি গাজীকে আঁৰ দেখতে গেলেন না। গাজী ভ্ৰমৰ-কপে নবাবেৰ দপ্তৰখনায় গিয়ে বকেবা তিন লক্ষ তিন হাজাৰ টাকাৰ অঙ্ক ডাইনে থেকে বামে ফেলে তৎক্ষণাৎ ফিৰে এলেন ফুটিয়াবী আস্তানায় এবং ‘অঙ্ক’ কৰে আপনাৰ মূঠে প্ৰবেশ কবলেন।

পৰেৰ দিন নবাবেৰ লোকজন সাদৰে ৰাজাকে দৰবাৰে নিষে গেলেন। দপ্তৰে দপ্তৰ আনা হল। নবাব তখন ৰাজাকে বেশৰিকৈৰ পাট্টা কৰে দিলেন। সেখান থেকে অনতি বিলম্বে ৰাজা বিদাৰ নিলেন।

কয়েদখানাৰ পাশ দিষে ষাওন্নাৰ কালে কষেদগণ ৰাজাৰ নিকট তাদেৰ মুক্তিৰ ব্যবস্থা কৰাব অনুৰোধ জানাল। ৰাজা সম্মতি নিলেন নবাবেৰ কাছ থেকে এবং নিজে কষেদখানাৰ প্ৰবেশ কবলেন তাদেৰ মুক্তিৰ জন্ত। বন্দী বাবড়ুগাৰ পাৰেৰ বেড়ী কাটতে তাঁকে আড়াই ঘণ্টা কষেদখানায় থাকতে হল। তাৰপৰ তিনি গাজীকে স্মৰণ কৰে প্ৰত্যাবৰ্তন কবলেন।

ৰাজা মদন বায় পান্ধী কৰে দুই সপ্তাহ পৰে কলকাতায় এসে পৌছিলেন। কয়েদীগণ-প্ৰদত্ত পীৰেৰ হাজত বাবদ এক হাজাৰ টাকাৰ মিঠাই কিনে তিনি একশত এক ভাৰ মুটেৰ স্কন্ধে দিষে সোনাৰপুৰে এলেন। গোঁড়দহে এসে সাতটা খাশী কিনলেন এবং সব নিষে গাজীৰ সম্মুখে এসে গলবন্ধে অৰ্পণ কবলেন। গাজী সাহেব খুশী হৰে ৰাজাকে আশীৰ্বাদ কবলেন। আড়াই হালা কাঁচা বেনাৰ সাহায্যে খাশীৰ মাংস বান্ধা কৰে হাজত দেওয়া হল। গাজী সাহেব একাটি মসজিদ নিৰ্মাণ কৰাব জন্ত ৰাজাকে স্থান দেখিষে দিলেন। ৰাজা শুধু বিপদকালে গাজীৰ চৰণ পাওঁৰাৰ প্ৰাৰ্থনা জানালেন। গাজী বললেন—কোন চিন্তা নেই। ৰাজা তখন সেলায় কৰে আপন ভবনে চলে গেলেন।

গাজী সাহেবেৰ মাহাত্ম্য প্ৰচাৰই এই কাব্যংশেৰ মূল উদ্দেশ্য। এটি থণ্ড কাব্য। গাজীৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন কথা এতে নেই। কালু-চম্পাবতী প্ৰসঙ্গ এতে ৰাদ পড়েছে। বায়মজল কাৰ্যেৰ অংশ বিশেষ এবং গৌৰমোহন সেন ৰচিত

জীবনী গ্রন্থেব অংশ বিশেষেব সঙ্গে এই কাহিনীৰ সাদৃশ্য আছে। পীৰ একদিল শাহ কাব্যে বৰ্ণিত পীৰেব শিক্ৰপ ধাৰণ বিবৰণেৰ সঙ্গে এব মিল দৃষ্ট হয়।

বাজুয় আদায়েব জন্ত কিকপ জ্বলুম কৰা হত তাৰ বিবৰণ এই কাব্যাংগে আছে। অলৌকিক শক্তিতে মেদনমল্ল থেকে চক্ৰেব নিমেৰে চাকাৰ উপস্থিত হওবাৰ গল্প তখনকাৰ দিনে সাধাৰণ মানুষেব নিকট অবিশ্বাস্য ছিল না বলে মনে হয়।

গাজী সাহেবেৰ গানে বৰ্ণিত চৰিত্ৰাবলী অনেকখানি বাস্তব। এখান চৰিত্ৰ মদন ও বায়ু গাজী সাহেব। তাছাড়া মন্ত্রী, নবাব, দেওৱান প্রভৃতিৰ চৰিত্ৰ পাঠকেৰ মনে বেথাপাত কৰে।

#### ৫। কালু-গাজী

কালু-গাজী-চম্পাবতীৰ কাহিনী-ভিত্তিক একখানি নাটকেৰ পুঁথি সম্প্রতি পাওবা গেছে। নাট্যকাৰেব নাম কোথাও লিখিত নেই। কোন ভণিতা বা মুখবন্ধ বা ভূমিকা বা কুশী-লব পৰিচিতি নেই। পুথিখানি আমি উত্তৰ চব্বিশ পৰগণা জেলাৰ বসিবহাট মহকুমাৰ স্বৰূপনগৰ থানাধীন তবগীপুৰ নামক গ্রামেৰ অধিবাসী মোহাম্মদ আতিষাৰ রহমানেৰ বাডী থেকে পেৰেছি। জনাব আতিষাৰ রহমান বলেন যে পুথিখানি তাঁৰ পিতা মবহুম জেহেৰ আলি পাডেৰ লেখা। পুথিখানিৰ কভাৰ পৃষ্ঠাৰ ইংৰেজীতে যা লেখা আছে তা খুবই অস্পষ্ট। লেখা আছে Hachamudin. “উক্ত হাচামউদিন” এব পৰ যা লেখা আছে তা পাঠসাধ্য নহ। পুথিখানি জেহেৰ আলি পাড সাহেবেৰ লেখা নহ বলে আমাৰ ধাৰণা। কাৰণ—

- ১। জেহেৰ আলি পাড সাহেব তবগীপুৰ প্রাথমিক বিদ্যালয়েৰ শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি নাকি “নৰ্মাল” পাশ ছিলেন। এ হেন ব্যক্তিৰ পক্ষে মাৰাষ্ট্ৰক বকমেৰ বানান ভুল এই নাটকে ভুবি ভুবি থাকতে পাবে না।
- ২। জেহেৰ আলি পাড সাহেব ছিলেন “এজিদ্ বৰ” নাটকেৰ বচনিতা এবং উক্ত নাটকেৰ পৰিচালক। তাঁৰ নাটক বসিবহাট উত্তৰাঞ্চলে অসাধাৰণ অভিনয় সাকল্যে ঐতিহাসিক খ্যাতি অৰ্জন কৰেছে। তাঁৰ পক্ষে অঙ্ক ও দৃশ্য নিৰ্দেশনাৰ সাধাৰণ ক্ৰটি থাকতে পাবে না।

অতএব কালু-গাজী নাটকেৰ বচৰিতাকে হাহাম-উদ্দীন সাহেব বলে গ্রহণ কৰতে পাৰা যায়।

পুঁথিখানিৰ পৃষ্ঠাসংখ্যা চৌষট্টি। বৰ্ষ অংক কিন্তু নাটকখানি দৃশ্যবিহীন। পুঁথিটি মনে হয় অসম্পূৰ্ণ। এতে চোদ্ধটি গীত আছে, আছে স্বগতোক্তি।

বদৰ, খোঁষাজ, জল্লাদ, শিব, গঙ্গা প্ৰভৃতি অতিৰিক্ত চৰিত্ৰ নাট্যকাৰ সংযুক্ত কৰেছেন। পৰীগণেৰ নামকৰণে যথা,—নীলাম্বৰী, পক্ষৰাজ, যমবদ প্ৰভৃতি লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য। গাজী ও চম্পাবতীৰ মিলন কাহিনীই এই নাটকেৰ মূল প্ৰতিপাদ্য।

গ্ৰামাঞ্চলে যাত্ৰাৰ আসবে সাধাৰণ মানুহ আনন্দলাভ কৰেন। আলোচ্য নাটকখানি সেই উদ্দেশ্যটুকু সফল কৰতে সমৰ্থ বটে। নাটকখানি সম্পূৰ্ণৰূপে হিন্দু-মুসলমানৰ সহাবস্থান ভাবনাৰ উপযোগী।

নাটকখানি বচনাৰ ভাষা নিৰ্ণয় কৰা যায় না। জেহেৰ আলি পাডেৰ যুত্ৰুকাল ১৩৬২ বাংলা সাল। অতএব তাঁৰ সময়সাময়িক কালে বচিত বলে ধৰলে এই নাটকেৰ বচনাকাল বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰথমার্ধৰ পূৰ্বে হতেই পাবে না।

#### ৬। গাজী-কালু-চম্পাবতী

মোছান্নেফ গোলাম খববৰ ও আবদুৰ বহিম সাহেব বিবচিত ৭৮ পৃষ্ঠাৰ একখানি কাব্য পাওবা যায। কাব্যখানি সন ১৩৪৫ সালে প্ৰকাশিত। গ্ৰন্থখানি দুপ্ৰাপ্য। শ্ৰীযুক্ত বিনয় ঘোষেৰ কাছে তাৰ একট কপি আছে।

গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্যেৰ বচৰিতা আবদুৰ বহিম সাহেব এবং এই কাব্যেৰ অন্ততম বচৰিতা আবদুৰ বহিম সাহেব একই ব্যক্তি বলে অনুমিত হয়। আবদুৰ বহিম সাহেবেৰ কাব্যেৰ প্ৰকাশকাল ১৩৭৪ সাল। এব পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২। পৰবৰ্তীকালে তাৰ পৰিমাৰ্জন ও পৰিৱৰ্ত্তন হওবা খুব স্বাভাবিক। এব পক্ষে কাব্যদ্বয়েৰ প্ৰথম দুই পংক্তি লক্ষ্যনীয় :—

প্ৰথম কাব্য (প্ৰকাশ ১৩৪৫) : প্ৰথমে প্ৰণাম কৰি প্ৰভু কবতৰ ॥

আকাশ পাতাল আদি সৃজন যাহাৰ \*

দ্বিতীয় কাব্য (প্ৰকাশ ১৩৭৪) : প্ৰথমে বন্দিনু নাম প্ৰভু নিবঞ্জন ॥

এঁ তিন ভুবনে যত তাঁহাৰ সৃজন \*

খুব সম্ভবতঃ প্রকাশকগণ ব্যবসায়ের প্রবোজনে ইচ্ছামত প্রোথিতবশা গ্রন্থকাবের নাম ব্যবহাৰ কৰেছেন এবং কাহিনীৰ কলেবৰ বৃদ্ধি কৰেছেন।

## ৭। হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি শাহ্ সাহেবের জীবন চৰিতাখ্যান

“হজবত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি শাহ সাহেবের জীবন চৰিতাখ্যান” নামক গ্রন্থেৰ বচৰিতা গোঁবমোহন সেন মহাশয় বাংলা ১৩০০ সালের চৈত্র মাসে ৫নং মদন দত্ত লেন, বহুবাজাব, কলিকাতাৰ আপনাৰ বাড়ীতে জন্মগ্রহণ কৰেন। তাঁৰ পিতাৰ নাম সিদ্ধেশ্বৰ সেন। গোঁবমোহন সেন ছিলেন ধৰ্মপৰাম্ৰণ, ছিলেন অত্যন্ত সবল প্রকৃতিৰ। ব্যবসায়-জনিত ব্যাপাবে বন্ধনা-লাভেৰ ফলে তিনি তীব্র মানসিক অশান্তি-সাগৰে নিমজ্জিত হন। আশাহত হৃদয় নিবে অবশেষে তিনি এক পরম শুভক্ষণে ঘূটিয়াবী শবীফেৰ পীৰ মোবারক বডৰ্খা গাজীৰ সমাধি বা দবগাহ-হানে এসে উপনীত হন এবং সেখানকাৰ পৰিবেশ তথা গাজী সাহেবের মাহাত্ম্য-কথায় অভিভূত হৰে এক নিৰ্মল সাত্বনা খুঁজে পান। সেই সময় থেকে শেষ জীবন পৰ্যন্ত তিনি প্রতিদিন কলকাতা থেকে ঘূটিয়াবী শবীফে পীৰ মোবারক বডৰ্খা গাজীৰ দবগাহে ভক্তি নিবেদন কৰতে আসতেন। এমনকি তাঁৰ পুত্ৰেৰ বিবাহেৰ দিনেও এ নিয়মেৰ ব্যতিক্রম হয়নি। দবগাহে বসে তিনি বৰচিত গান এমন ভয়ৰ হৰে কৰতেন যে তাঁৰ দুই গুণ বেৰে অৰোৰে অক্ষৰাবা নামত। বহু ভক্ত তাঁৰ সেই গান শ্রদ্ধ হৰে শুনে ভক্তি-প্রণতঃ হতেন।

“হজবত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি শাহ্ সাহেবের জীবন চৰিতাখ্যান” নামক পুস্তিকা হাড়া তিনি অন্ত কোন পুস্তিকাদি প্রকাশ কৰেছিলেন বলে জানা যায় না। প্রথম জীবন থেকেই তিনি সঙ্গীত বসিক ছিলেন। স্বনামধন্য আবদুল আজিজ খাঁ ছিলেন তাঁৰ সঙ্গীত-গুরু। গুৰুৰ কাছে তিনি গাজী সাহেবের গান শুনতেন। পৰবৰ্তীকালে সঙ্গীত-গুরু আবদুল আজিজ খাঁ, শিষ্য গোঁবমোহন সেনেৰ নিকট গাজী-ভক্ত হিসাবে শিষ্যত্ব গ্রহণ কৰেন। সাতবট্ট বছৰ বয়সে ইংবেজী ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দেৰ ২৪শে ফাল্গুন তারিখে এই মহাপুৰুষ দেহত্যাগ কৰেন। তিনি সাত পুত্র ও পাঁচ কন্যা বেৰে যান। ঘূটিয়াবী শবীফেৰ গাজী সাহেবের দবগাহেৰ সন্নিকটস্থ সুদেবী নিকেতনেৰ সুসজ্জিত বাগান বাটীতে তিনি সমাধিহু হন। পৰবৰ্তীকালে তিনিও পীৰেৰ পৰ্য্যাবে

উন্নীত হইবে বলে অনেকের ধারণা। তাঁর সমাধির উপর ইচ্ছক-নির্মিত একটি সুবন্দ্য স্মৃতি-সৌধ নির্মিত হইয়াছে।

তাঁর পুত্র গাজীভক্ত শ্রীনিমাইচাঁদ সেন মহাশয় তাঁর পিতার সমাধি বা দবগাহ-স্থানের বর্তমান উদ্ভাবনকারক।

গোবিন্দমোহন সেন বিবচিত গ্রন্থেব দ্বিতীয় সংস্করণের একখানি আমার হস্তগত হইয়াছে। এৰ পৃষ্ঠাসংখ্যা পঞ্চাশ। আকৃতি ৭½"×৬½"। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ কাল বাংলা ১৩৬৮ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ। হাজী শেখ মহম্মদ ইয়াব আলী, সাকিম বোডাদহ, জেলা হাওড়া কর্তৃক ভাষান্তৰিত পৰিবৰ্জিত ও সন্নিবেশিত। পুস্তকটির প্রথম সংস্করণের তাৰিখ জানা যায় নি। এটি মুদ্রিত পুস্তক। তাৰ মাঝাবি কভাৰ পেজ আছে। পুস্তকের চাৰিটি অঙ্গ যথাক্রমে—

- ১। নিবেদন বা ভূমিকা,
- ২। ধন্য গাজীব আন্তান। বা বন্দনা গীতি,
- ৩। কেছা এবং
- ৪। সমাপ্তি সংগীত।

কেছাৰ মধ্যে আটটি শিবোনামা আছে। যথা,—

- ১। মন্দিবাসেব ( মহেন্দ্ৰ বায়েব ? ) জমিদারী ও মোবাবক গাজীব বন্দী হওয়ার বহান,
- ২। মোবাবক গাজীব নাবাষণপুৰ গ্রামে স্বাভা,
- ৩। মোবাবকের সাপুৰ স্বাভা,
- ৪। মোবাবকের ঘুঁটাৰি গ্রামে স্বাভা,
- ৫। স্বাভা মদন বায়েব ভলবে সিপাহী আগমন,
- ৬। পীৰপুকুৰে স্বাভা মদন বায়েব মাটি কাটা,
- ৭। মদন বায়েব আভাই স্বৰ্গী জেলবাস ও
- ৮। দুঃখী দেওবানের সন্তানাদি হওয়ার বহান।

সবস্তু 'পাঁচটি গান ও ষোলটি কবিতাৰ মধ্যে কেবল কেছা অংশেই চাৰিটি গান ও পনেৰোটি কবিতা আছে। তাছাড়া এই পুস্তকে আছে আৰো চারখানি ছবি ( আলোক চিত্র )। চিত্রগুলি যথাক্রমে :—

- ১। গাজী বাবাব দববাব,
- ২। নারায়ণপুৰে গাজী বাবাব হোজ্ৰা,

৩। সাহপুৰেব সেই শুক্ল শেওড়া গাছ বাব তলাৰ গাজী পীৰ আসন কৰবাব  
পৰ গাছটি আবাব বেঁচে ওঠে, এবং

৪। পীৰ পুৰুবে যাত্ৰীবা শিবনী ভাসিষে বসে আছেন।

গ্রন্থখানি সাধু ভাষাৰ বচিত। দীৰ্ঘ বাক্য ব্যবহাবে দক্ষতার  
অভাব থাকায় অনেক স্থলে ভাবেৰ স্বচ্ছন্দ একাশ হয় নি। গ্রন্থেৰ ভাষা  
আধুনিক। ইসলামি ভাবাদর্শে বহু আববী, উৰ্দু হিন্দী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত  
হবেছে। বানানে অনেক স্থলে অশুদ্ধি আছে। গান ও কবিতাগুলি বিভিন্ন  
ছন্দে, যথা,—কোথাও দ্বিপদী কোথাও ত্রিপদী পৰাবে বচিত। বিশেষ  
বিশেষ অংশ বেখাঙ্কিত ববেছে। কবিতাৰ পংক্তিগুলিৰ মধ্যকাৰ সৰ্ব্বত্র,  
অক্ষৰেব সংখ্যাগত সমতা বক্ষিত হয় নি।

### সংক্ষিপ্ত কাহিনী

কোন এক সময় দিল্লীতে চন্দন শাহ নামক জনৈক বাদশাহ রাজত্ব  
কৰতেন। তাঁৰ সমৰে একবাৰ বৰ্গীদেব উৎপাত দেখা দেয়। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ  
উজ্জীবকে ডেকে বৰ্গীদেব তাড়াবাব নির্দেশ দিলেন। আদেশ পেয়ে উজ্জীব  
চললেন শিবিৰ অভিমুখে। পথিমধ্যে সাক্ষাত হল এক বৃদ্ধ ফকিৰেব সাথে।  
ফকিৰ জানালেন, বাদশাহ বেন বৰ্গীদেব সঙ্গে বৃদ্ধে লিপ্ত না হন। কারণ  
তাঁৰ বাজত্বেৰ মেবাদ উত্তীর্ণ হবেছে। উজ্জীব ফিৰে এসে ঘটনাটি বাদশাহকে  
জানালেন। বাদশাহ ক্রুদ্ধ হয়ে উজ্জীবকে লাঞ্ছনা কবলেন। উজ্জীব অগত্যা  
সেনাপতিৰ সঙ্গে যোগাযোগ কবলেন। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ আবন্ত হল, কিন্তু  
অতি অল্প সময়েৰ মধ্যে বাদশাহেৰ অধিকাংশ সৈন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হল। বাদশাহ  
ব্যাপক সৈন্য ধ্বংসেৰ সংবাদ পেয়ে অচৈতন্য হলেন এবং স্বপ্নে সেই ফকিৰেৰ  
সতর্কবাণী পুনৰাব শুনতে পেলেন। এবাবে ফকিৰেব পৰামৰ্শ শিরোধার্য  
কৰে মিষা-বিবি অৰ্থাৎ সেই বাদশাহ ও বেগম দু'জনেই চলে এলেন ঢাকাৰ এক  
মোমিনেৰ বাড়ীতে। মোমিন তাঁদেবকে সাদৰ অভ্যর্থনা জানালেন। কিছুদিন  
পৰ সেই মোমিন তাঁদেবকে সঙ্গে নিষে স্থানীয় বাদশাহেৰ নিৰ্বট সন্ত ঘটনা  
জানালেন। বাদশাহও সানন্দে বেলে-আদমপুৰেৰ ভদ্রলেব পাট্টা দিবে দিলেন  
চন্দন শাহকে। চন্দন শাহ বেলে-আদমপুৰেৰ পাট্টা পেয়ে এসে উপহিত হলেন  
সেখানকাৰ বাবন মোল্লাৰ (বাবুৰ আলি মোল্লা) বাড়ীতে। নিজেৰ পৰিচয়  
দিভেই আনন্দিত হলেন বাবন মোল্লা। তখন বাবন মোল্লা, চন্দন শাহকে-

জমিদারী বালাখানার বসিয়ে নিজে উজ্জিবের কার্য্যভার গ্রহণ কবলেন।

বেশ কিছুকাল পবে সেই ফকির এলেন চন্দন শাহের খবর নিতে। কোন সন্তান না হওয়ার কাৰণে চন্দন শাহের দুঃখেৰ কথা তিনি অবগত হলেন। মনোবেদন। দূৰ করার উদ্দেশ্যে তাঁকে একটি ফুল দিখে ফকির বিদায় নিলেন। সেই ফুলের জ্ঞান নেওয়ার বিবিৰ সন্তান লাভ সম্ভব হল। সেই সন্তানই হলেন মোবারক গাজী।

মোবারক গাজী পঞ্চম বছৰে মজ্জবে গেলেন। স্বথা সময়ের মধ্যে তাঁৰ শিকালোভ সমাপ্ত হল। পিতা চন্দন শাহ জমিদারী ভার মোবারক গাজীকে দিখে জঙ্গলের এক কদম গাছেৰ তলায় বসে আল্লাব জেকেব আবস্ত কবলেন। অল্প সময়ের মধ্যে চন্দন শাহের মৃত্যু হল। কদম গাছ তলায় তাঁৰ দফন কৰা হল। মোবারক গাজী সেখানে প্রতিদিন জিন্নারত কবভেন এবং যোগাসনে বসভেন। সেই ফকির আবার এসে মোবারক গাজীকে ফকির হওয়ার উপদেশ দিলেন। গাজী তাঁৰ শিষ্যত্ব গ্রহণ কৰে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ কবলেন। তাঁকে সংসারে ধৰে বাখাৰ জগত বাবন মোল্লা বিবাহ দিলেন গাজীকে। দুঃখী গাজী ও মেহেৰ গাজী নামে তাঁৰ দুই পুত্রও হল। তবুও মোবারক গাজী আন্তে আন্তে সংসাবেৰ কথা এক প্রকার ভুলে গেলেন।

বোলা নামক স্থানের রাজা মন্দিৰ (মহেন্দ্র ?) বাষেৰ দববাবে সাড়ে তিন বছরের খাজনা বাকী পড়ায় মোবারক গাজীকে কাবাকদ্ধ হতে হল। গাজী স্বৰণ কবলেন পীৰ মহিউদ্দীনকে (মজিনুদ্দীন ?)। পীৰ মহিউদ্দীন অবিলম্বে গাজীকে কারাগার থেকে উদ্ধাৰ কৰে বেলেৰ জঙ্গলের কদম গাছেৰ ভলে নিরে গেলেন। সেই বাতে কাবাগার দদ্ধ হল। রাজা মন্দিৰ বাষ সিপাহীগণকে গাজীৰ অস্থিগুলি কবৰ দিতে নির্দেশ দিলেন। সিপাহীগণ গাজীৰ পলায়ন সংবাদ দিল। রাজা ক্রুদ্ধ হযে গাজীকে পাকডাও কর্তে হুকুম জারী কবলেন। সিপাহীবা জঙ্গলে দুটি সাদা বাঘ কর্তৃক গাজীৰ মাথাৰ জট আংলাতে (আঙ্গুলের সাহায্যে বিলি দিতে) দেখে ভীত হয়ে সে সংবাদও বাজ-সমীপে নিবেদন কব্বল। রাজা স্বয়ং এসে সে দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হলেন। তিনি গাজীৰ পায়ে ধৰে ক্ষমা প্রার্থনা কবলেন। গাজী কিছু প্রসন্ন হলেন। রাজা

জমিদাৰ লাখেৰাজ পাট্টা লিখে দিলেন গাজীৰ পুত্ৰ দুঃখী গাজীৰ নামে। শেষ পৰ্য্যন্ত গাজী বাৰেৰে ভয় দেখিবে বাজা মন্দিৰ বাৰকে সেখান থেকে বিভাভিত কৰলেন।

অন্ত একদিন মোৰাবক গাজী এক অজ্ঞাতজনেৰ গায়েবী আওষাজ স্তনলেন,—“হে গাজী! এখানে থাকলে ভোমাব জাহিব হবে না। তুমি অপরা পৃথিবীতে যাও।”

গাজী অবিলম্বে সদা বাৰ দুটিকে সঙ্গে নিবে মক্কা অভিমুখে যাত্রা কৰলেন। পথিমধ্যে দেখা হল দেবাদিদেব মহাদেবেৰ সাথে। মহাদেবকে প্ৰণম কৰে তিনি অপরা পৃথিবীৰ সন্ধান পেলেন না। তখন তিনি সেখান থেকে মহাদেবেৰ পৰামৰ্শে দুৰ্গা মাতাৰ কাছে গেলেন। দুৰ্গা মাতাৰ পৰামৰ্শ পেলে এবাৰ তিনি সেখান থেকে গেলেন বসাসাকিনেৰ পাগল পোৰেৰ নিকট অপরা পৃথিবীৰ সন্ধান নিতে। পাগল পোৰ, গাজীকে পাইকহাটীৰ দিকে যেতে বললেন। পথিমধ্যে পল্লবা নামক গ্রামেৰ এক বিখ্যাত আলেম তাঁকে আপন বাডীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে গাজী অনেক উপদেশ গ্রহণ কৰে পাইকহাটীৰ হেলা খাঁ নামক জমিদাবেৰ বাডীতে এসে কিছু আহাৰ্য্য চাইলেন। হেলা খাঁ তাঁকে সদাবে দুধ-ভাত খাওৱালেন এবং যাতে অপরা পৃথিবীৰ সন্ধান পান এমন আশীৰ্বাদ কৰলেন। মোৰাবক গাজী সেখান থেকে এলেন বিদ্যাবতী নদীৰ তীৰে। খেৰা ঘাটেৰ পাটনী মটুক, কপৰ্দকহীন গাজীকে পাব কৰতে অস্বীকাৰ কৰল। গাজী, বদৰস। পোৰেৰ সহায়তান্ন নদী পাব হলেন। ডুবুও মটুক পাবেৰ কডি চাইল। গাজী তখন পুত্ৰ দুঃখী সে কডি মিটিমে যাবে বলে প্ৰস্থান কৰলেন। তিনি এবাৰ এলেন নাৰায়ণপুৰে। সেখানে মন্দিৰেৰ পুৰোহিতেৰ পত্নী নিৰ্বেশজ হুয়েছিলেন। পুৰোহিত শৰণাপন্ন হলেন গাজীৰ নিকট। গাজী সদৰ হলে ব্ৰাহ্মণীকে গৃহে ফেৰাবাৰ ব্যবস্থা কৰে চলে গেলেন ‘ভাবাহেদে’ পুকুৰেৰ ধাবে। সেখানে সেওড়া গাছ তলাৰ আন্তান। নিলেন। সেখানে কেবল ব্ৰাহ্মণেৰ বাস। ব্ৰাহ্মণেৰ গ্রামে মুসলমান! গ্রামেৰ জমিদাৰ বাস চাটুজ্জেৰ মাতাৰ অনুবোধে ফকিবকে অগ্ৰহ যেতে বলা হল। ফকিব গাজী ক্ষুৰু হৰে অগ্ৰহ গেলেন। বাস চাটুজ্জেৰ পত্নী দীঘিতে জল আনতে গিৰে আৱ ফিৰে এলেন না। ঘটনাৰ কাৰণ জেনে বাস চাটুজ্জেৰ বৃদ্ধা মাতা ফকিৰেৰ নিকট ক্ষমা চাইলেন। গাজীৰ প্ৰস্তাব



অনুযায়ী বড় পীৰ সাহেবকে জোড়া খাসি হাজত দিবার প্রতিজ্ঞা করলে তবেই পুত্রবধু যবে ফিবে আসতে পাবলেন। কিন্তু খাসির বদলে মোরগ হাজত দেওয়ায় গাজী বললেন,—‘এ জনমে যাবে না নারায়ণপুরে বাঘের ভয়।’

অবশেষে মোল্লা পাড়ায় গিয়ে রামবাবু ডেকে আনলেন কাছিম নক্শবকে এবং মোবগের হাজত দিলেন। গাজী তাদেবকে সুখে থাকাব আশীর্বাদ করলেন।

পরে একদিন হঠাৎ কি ভেবে গাজী, দেবী নাবায়নীৰ মন্দিরে গিষে দেবীৰ নিকট ‘অপরা পৃথিবীর’ সন্ধান জানতে চাইলেন। নাবায়নী তাঁকে গোমাংস গ্রহণ কবতে নিষেধ কবে কুবালী নামক স্থানের এক মরা সেওড়া গাছেৰ ডলার আসন নিতে বললেন। গাজী সেখানে আসন নিলে কয়েকদিনেৰ মধ্যে মরা সেওড়া গাছ জীবিত হস্বে ওঠে এবং তাতে কদম ফুল ফোটে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে গ্রামবাসী সেই ফকিবকে অসামান্য ব্যক্তি বলে বুঝতে পাবে। তাবা গাজীৰ নিকট থেকে নানা প্রকাৰে উপকাৰ পেলে সে ধারণা দৃঢ়মূল হয়।

মোবাবক গাজী তাঁৰ বাঘ দুটিকে দিনে ভেড়াৰ কপান্তরিত কবে বাখতেন। কল্লেকজন লোভী ব্যক্তি তাদেবকে গাজীৰ নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে যায়। দিনে তাবা ভেড়া থাক্ত কিন্তু বাত্রে হত বাঘ। বাত্রে সেই বাঘ দুটি নিজমূর্তি ধারণ কবায় তাবা ভেড়া দুটিকে সকালে গাজীকে ফিরিয়ে দিল।

গ্রামবাসীগণ পানীৰ জলেৰ অভাবে একটা পুকুর খনন কবাবার জন্ত গাজীকে আবেদন জানালেন। গাজী মাত্র দেড় শত কোবাদাব আনাতে বললেন। কোবাদাব এল। পুকুরেৰ স্থান নির্দিষ্ট হল। পুকুর কাটাও হল। পবে গাজী কর্তৃক আহূত হস্বে কোবাদাবগণ কিছু খাবাব খেতে বসল। মাত্র দুই মালসাব “খানা” বা খাদ্যদ্রব্যও তারা খেযে শেষ কবতে পাবল না,—গামছাব বেঁধে বাড়ী নিয়ে গেল। পবদিন জলভর্তি দুই পুকুর দেখে সকলে আনন্দে নাচতে লাগল।

এই গ্রামে বামা মালুঙ্গী ও স্তামা মালুঙ্গী নামে দুই কাঠুবিয়া ছিল। ৫০০০ টাকা পাওষাব ব্যাপাব নিষে গাজীৰ সঙ্গে তাদেব মনোমালিন্য ঘটল। একদিন জঙ্গলে বাঘে বামাৰ কান ছিঁড়ে নিয়ে গেল। সে ফিবে এসে গাজীৰ পা ধরল জড়িষে। গাজী তাঁৰ কানে হাত বুলিষে কাটা কান জোড়া

জাগিথে দিলেন। এবার সে প্রতিদিন গাজীকে ‘নাস্তা’ ( দুধ ও ফল ) দিবার প্রতিজ্ঞা কবে চলে গেল।

সেই বাত্রে গাজী শুনলেন গায়েবী আওলাজ—“এই বনে আগুন লাগাও। সে আগুন যেখানে নিভবে সেখানেই ‘অপবা পৃথিবীর’ সন্ধান পাবে।” সেই কথা যত আগুন লাগানো হল। আগুন এসে নিভুল ঘুটিয়াবী গ্রামে। গাজী সেখানে বিদ্যাধরী নদীর তীরে বাদাম গাছের তলায় আপন যোগের আসন কবলেন। সেখানে বসে তিনি জিগির দিতেই এলেন তাঁর মুবশিদ, যিনি গাজীকে ‘আল্লাহ দরগাহে’ ‘একিন’ কবতে বললেন।

গাজী বায়গগকে আহ্বান করলেন এবং তাদের ঘাৰা সেখানে ঘৰ তৈরী কবালেন।

এবার এলেন জগত বিখ্যাত বড়পীর সাহেব। বড়পীর সাহেব সেখানকার সেই নজবগাহের খাদিম হিসাবে মোবাবক গাজীকে নিযুক্ত কবে অন্তর্হিত হলেন। মোবাবকের নাম শুনে কেহ এলে গাজী তাকে বড়পীরের নামে হাজত দেওরাতেন। এইভাবে গাজীর জাহির হল চারিদিকে।

কিছুদিন পর এক ‘দেউনীর’ ( দেবনী বা দেবী ) আত্মা নদীর কূল ভেঙে মোবাবকের আসনের দিকে অগ্রসর হল। গাজীর নিবেধ-অনুরোধ অমান্য করার দেউনী বদ-দোরা পেয়ে বড়পীর সাহেবের হাজতের জন্ত মশলা পেরাব পাথবে পবিগত হল। অবশ্য দেউনীর অনুবোধে গাজী সেখানে ষাতে গোহত্যা না হয় তাৰ প্রতিজ্ঞা দিলেন।

পরে একদিন গাজী বেলে আদমপুর থেকে তাঁর পুত্রদ্বকে ঘুটিয়াবী শবীফে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কববার জন্ত সংবাদ পাঠালেন। হুজ্বী গাজী তৎক্ষণাৎ পিতার উদ্দেশ্যে যাত্রা কবে এলেন নদীর ধারে ও মটুক পাটনীর খেয়া নৌকা চড়ে পিতার বকেয়া প্রাপ্যসহ পাবানির উপযুক্ত কডি দিয়ে দিলেন। তারপর তিনি ঘুটিয়াবী শবীফের পথ-নির্দেশ নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হলেন যথাস্থানে এবং পিতাকে ‘সালাম’ জানালেন।

[ পরবর্তী কিছু ঘটনা ‘গাজী সাহেবের গান’-এব প্রায় সমতুল। সুতরাং এখানে তাৰ পুনৰুল্লেখ নিবৰ্থক। ]

একবার সাতই আষাঢ় পর্যন্ত হুষ্টিপাত না হওয়ার গ্রামবাসীগণ পীর মোবারক গাজী সাহেবের শরণাগত হলেন। তিনি তাঁদেবকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে একটি ঘরে প্রবেশ কবে দরজা বন্ধ কবলেন। নিষেধ বইল যে যতক্ষণ তিনি আপনা হতে দরজা না খুলছেন ততক্ষণ যেন অপব কেউ সে দরজা না খোলেন। পীর গাজী সেই অর্গলবন্ধ ঘরে একাকী খোদাতালালাব প্রার্থনায় নিযুক্ত হলেন।

ইতিমধ্যে একদল পাঠান দূর থেকে এল বড়পীরের নামে হাজত দিতে। তারা অপেক্ষা কবে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ল এবং দরজা খুলে ফেলল। দরজা খুলে দেখা গেল—কি সর্বনাশ!—পীর মোবারক বডখা গাজী সেখানেই ‘ইন্তেকাল’ অর্থাৎ দেহত্যাগ কবেছেন।

গাজী বাবাব নির্দেশ মতন ফবিদ নকুব আপন কন্যাকে হুৎখী গাজীর সহিত বিবাহ দিলেন। হুৎখী গাজীর পুত্র সা-দেওয়ানের বংশধরগণ আজো গাজী বাবাব আশ্রয়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে চলেছেন।

গৌরমোহন সেন বিবচিত ‘হজবত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি শাহ সাহেবের জীবন চবিতাখ্যান’ নামক গ্রন্থ ব্যতীত এমন সম্পূর্ণ গাজী-জীবনী গ্রন্থ আর পাওয়া যায় নি। কোন কোন কাব্য বা গানে গাজীর প্রথম বা মধ্য জীবনের কথা আছে—কিন্তু শেষ জীবনের কথা আর কোন গ্রন্থে নেই। এই গ্রন্থে চম্পাবতী প্রসঙ্গ নেই, নেই দক্ষিণ রাস প্রসঙ্গ। “গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্য, গাজী সাহেবের জীবন চবিতাখ্যান, রাসমঙ্গল কাব্যংশ, গাজী সাহেবের গান ও কালু-গাজী-চম্পাবতী নাটক” এই কল্পখানি গ্রন্থের মধ্যে গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্য ও গাজী সাহেবের জীবন চবিতাখ্যানে তাঁর জন্মকথা আছে।—অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। কাব্যে এবং নাটকে ‘সেকেন্দার শাহ’ বলে তাঁর পিতার নামোল্লেখ আছে কিন্তু এই জীবন চবিতাখ্যানে তাঁর পিতার নাম বলা হয়েছে ‘চন্দন সাহা’। কাব্যে-নাটকে মাতার নাম ‘অজুপা’ লিখিত হয়েছে। এ গ্রন্থে সে উল্লেখ নেই। এই পুস্তক ব্যতীত অন্য কোথাও তাঁর পুত্র হুৎখী গাজী ও মেহের গাজীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। গাজী সাহেব জনৈক রাজ্যের নিকট নিগৃহীত হয়েছিলেন—এমন ঘটনার প্রসঙ্গে একাধিক রাজার নাম পাওয়া যায়। গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্যে রাজ্যের নাম শ্রীদাম রাজ্য, গাজী-কালু-চম্পাবতী নাটকে তাঁর নাম বামচন্দ্র এবং জীবন

চৰিতাখ্যানে এমন ব্যক্তি হলেন মন্দিৰ (মহল্ল) বাঘ। শ্ৰীদাম বাজা ও বাচ্চল্ল ইসলাম ধৰ্মে দীক্ষিত হৈছিলেন কিন্তু মন্দিৰ বাঘ ধৰ্মান্তৰিত হন নি। এই জীবন চৰিতাখ্যানে ধৰ্মপ্ৰচাৰ প্ৰসঙ্গ নেই। বডৰ্খী গাজী যে বড পীৰ সাহেবেৰ ডক্ত ছিলেন সে কথা কেবলমাত্ৰ এই গ্ৰন্থেই বৰ্ণিত হৈছে। গ্ৰন্থখানি ইতিহাসেৰ মত কৰে লেখা হৈছে বটে, কিন্তু এব সব তথ্য ইতিহাস-ভিত্তিক নহ। লোকমুখে প্ৰচাৰিত বজ্জিত-অতিবজ্জিত কাহিনী নিষে সজ্জিত বলে অনুভূত হয়। পীৰ একদিল শাহ কাব্যেৰ সঙ্গ এই গ্ৰন্থেৰ নিয়লিখিত সাদৃশ্য দেখা যায় :—

- ১। ঘোলাৰ কাছাবিতে পাইক-পিন্নাদাৰ সঙ্গ বাজা মন্দিৰ বাঘেৰ নিকট উপস্থিত হওয।
- ২। গককে বাঘে এবং পুনবাঘ বাঘকে গকতে কপান্তৰিত কৰাৰ অনুকপ ঘটনা।
- ৩। গাজী সাহেবেৰ শ্বাশু একদিল শাহেৰ পঞ্চম বৰ্ষাৰ বালককপ ধাৰণ কৰা।
- ৪। গাজী সাহেবেৰ শ্বাশু একদিলেৰ ভ্ৰমৰ-কপ ধাৰণ কৰা,
- ৫। পীৰ একদিলেৰ সহিত লক্ষ্মী দেবীৰ সাক্ষাত্তেৰ শ্বাশু পীৰ বডৰ্খী গাজীৰ সহিত দুৰ্গামাতা এবং নাবাৰণী দেবীৰ সঙ্গ সাক্ষাৎকাৰ।

নৌকা ছাড়া জলেৰ উপৰ দিষে পদচাৰণা কৰে নদী পাৰ হওবাৰ কথা পীৰ গোবাচাঁদ কাব্যে দৃষ্ট হয়। এই গ্ৰন্থে মটুক নামক পাটনীৰ কথা আছে। গাজী-কালু-চম্পাবতী কাহিনীতে মটুক ছিলেন ব্ৰাহ্মণনগবেৰ বাজা, তিনি চম্পাবতীৰ পিতা। অৰ্থাৎ গাজীৰ শ্বশুৰ, তিনি ইসলাম ধৰ্মে দীক্ষিত হৈছিলেন।

এই গ্ৰন্থে মদন বায়কে ঢাকাৰ নবাব দৰবাবে যাবাৰ কথা দেখি, গাজী সাহেবেৰ গানেও দেখি তাঁকে ঢাকাৰ নবাব দৰবাবে য়েতে হৈছে। এখানে গ্ৰন্থকাৰ মুৰ্শিদাবাদেৰ নবাব মুৰ্শিদ কুলীখাঁৰ দৰবাবে মদন বাঘেৰ যাওযাৰ প্ৰসঙ্গ কি ভাবে উত্থাপন কৰেছেন তা প্ৰণিধান যোগ্য। গাজী সাহেবেৰ গান প্ৰসঙ্গে নগেন্দ্ৰনাথ বসু মহাশয় বলেছেন যে সপ্তদশ শতাব্দীতে নবাব নাজিমের পূৰ্বে গাজী সাহেবেৰ নাম জাহিৰ হৈছিল। মদন বাঘেৰ অষ্টম অধ্যস্তন

পুরুষ ৷ দেবেজ্জকুমার বাবচৌধুরীর বক্তব্য অনুসারে ঢাকার তৎকালীন নবাবের নাম সাযেস্তা খাঁ বলে উল্লেখযোগ্য।

পীর আউলিয়াগণের প্রভাব তৎকালে রাজশক্তিকেও নিয়ন্ত্রিত করত। মোবাবক গাজীর পিতা চন্দন শাহ দিল্লীর বাদশাহ হযেও এক ফকিরের নির্দেশে সিংহাসন ত্যাগ করেন। অশ্রদ্ধ দেখা যায়, মদন বাব স্থানীয় অধিপতি হযেও তিনি পীর মোবাবক বড়খাঁ গাজীর প্রভাব-মুক্ত নন। ঢাকার বা মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ পর্যন্ত পীর মোবাবক গাজীর নির্দেশে মদন বাবের তিন সনের রাজত্ব মকুব করে পীরের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। ফকিরের নির্দেশে ফকিরি গ্রহণ—এমত ঘটনার দৃষ্টান্ত অন্য গ্রন্থের কাহিনীতে বিবল।

এ গ্রন্থে মোবাবক গাজীকে মোবাবক বা মজলুম বলে বতখানি প্রতিভাত হয়, গাজী বা যোদ্ধা বলে তা হয় না। তাঁর অলৌকিক কীর্তিকলাপের পরিচয়ে অনেকে মুগ্ধ হযেছে, হযেছে ভীত, মদন বাব প্রমুখ হযেছেন আশাবিস্তিত। তিনি আজীবন থেকেছেন আল্লাহের পবন ভক্ত এবং কেবলমাত্র জনকল্যাণকর কাজেই বাজা-প্রজাকে আহ্বান করেছেন,—ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজনকে মূল্য দিতে আগ্রহী ছিলেন না।

বড়খাঁ তদীয় পুত্র দুঃখী গাজী ও মেহের গাজীর সংভাবে কৃষিকাজ করাকে স্বাভাবিকভাবে পির কর্ম বলে অনুমোদন করেছেন। সংস্কারের গোঁড়ামি তাঁকে পবাত্ত করিতে পারে নি বলেই তো তিনি দেউনীর অনুবোধ ব্রহ্ম করে ছুটিয়ারী শরীফে গো-হত্যা নিষিদ্ধকরণ অনুমোদন করেছেন।

মোবাবক গাজী ধর্মীয় সহাবস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে হিন্দু ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন নি। অপরা পৃথিবীর সন্ধানে তিনি মহাদেব, মঙ্গা থেকে দুর্গা, নাবায়ণীর কাছ পর্যন্ত ধাবিত হযেছেন এবং অসীম লাভ করেছেন,—আবার নবাবের উপর আপনাব আধিপত্য বিস্তার করেছেন। বাম চাটুজ্জের সাতাও দেউনীর অগ্রাধ আচরণকে সহ্য করেন নি। অপবাদিকে বাজা মদন বার কিন্তু পীর মোবাবক গাজীর মহত্বকে বা অলৌকিক ক্ষমতাকে অস্বীকার বোঝে করেন নি বরং অনুগত হযে সেই মহত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লাভবান হযে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আপনাব সেবেস্তার মুসলিম মন্ত্রী ফরিদ নসুবকে যথেষ্ট মর্যাদা না দিবার কোন প্রশ্নই আসে নি।

ৰাজ্য স্বয়ং, পীৰ মোবাবক গাজীৰ অনুবোধে জনহিতকৰ কাজে অগ্ৰসৰ হৈছে। এসেহেন, এমন কি মসজিদ পৰ্য্যন্ত নিৰ্মাণ কৰিছে দিহেহেন।

ঘটনা পৰম্পৰাৰ অনেকগুলি চৰিত্ৰ এই গ্ৰন্থে এসে পড়েছে। দু'একটা বাদে প্ৰায় সবাই সাধাৰণ মানুহৰ চৰিত্ৰ। বাজা, মন্তী, পেৰাদা, গৃহবধু, বামা ও জামা মালুজী, পাটনী, নবাব প্ৰভৃতিৰ মध्ये অতি-মানবিকতাৰ কোন চিহ্ন নেই। মোবাবক গাজী, দেউনী প্ৰভৃতি চৰিত্ৰে কিস্তি ব্যতিক্ৰম দৃষ্ট হয়। গোঁবমোহন সেনেৰ এই গ্ৰন্থে পশু চৰিত্ৰ বলতে কোন পৰিচয় নেই—দুইটি সাদা বাঘেৰ কিছু কথা আছে মাজ। দেউনীৰ চৰিত্ৰ-পৰিচয় মিলিপিবদ্ধ হৈছে অতি সংক্ষেপে।

হজ্জৰত সৈয়দ শাহা মোবাবক গাজী সাহেবেৰ সংক্ষিপ্ত জীবনী

সম্প্ৰতি ( ১৯৭৫ অক্টোবৰ ) 'হজ্জৰত সৈয়দ শাহা মোবাবক গাজী সাহেবেৰ সংক্ষিপ্ত জীবনী' নামক একখানি পাঁচালী আমাৰ হস্তগত হৈছে। এই পাঁচালীৰ ভিতৰেৰে প্ৰতি পৃষ্ঠাৰ লেখা আছে. “হি মোবাবক গাজী ও জেন্দা পীবৰ কেছা”। এব কভাৰ পৃষ্ঠাৰ লেখকেৰ নাম দেওনা আছে নুব মহম্মদ দেওহান ; ৰেজিষ্টাৰ্ড নং ২১০২।

নুব মহম্মদ দেওহান বলেন,—“শেবে মন্ত্ৰ নামক এক কামেল ব্যক্তি, ‘গাজীবাৰ। এন্তেকালেৰ পৰ দুখী দেওহান ও মেহেৰ দেওহান (পীৰ মোবাবক বডৰ্থা গাজীৰ পুত্ৰ) সাহেবেৰ অনুমতি সূত্ৰে ও সহযোগিতাতে এক গ্ৰন্থ বচনা কৰেন। সেই গ্ৰন্থ অবলম্বনে বচিত হব এই গ্ৰন্থ।

জনাৰ নুব মহম্মদেৰ বয়স আনুমানিক ২৬ বৎসৰ। তাঁৰ পিতাৰ নাম মহম্মদ ওয়াহেদ আলি দেওহান। বাস ছুটিয়াবী শৰীফে। এই গ্ৰন্থে লেখক হিসাবে নুব মহম্মদ দেওহানেৰ নাম কভাৰ পৃষ্ঠাৰ ছাপা থাকলেও গ্ৰন্থ-অভ্যন্তৰেৰে ভণিতা থেকে জানা যায় যে, এই কাহিনীৰ মূল বচনিতাৰ নাম ফকিব মহাম্মদ। অবশ্য ফকিব মহাম্মদ বিবচিত সেই মূল কাহিনী সম্বলিত গ্ৰন্থেৰ সন্ধান পাওবা যায় নি। ফকিব মহম্মদেৰ ভণিতামূলক কয়েকটি পংক্তি এইৰূপ :—

এই কেছা যে শুনিবে বিশ্ব। যে পড়িবে।

বালা মুছিবত হইতে নাজাত সে পাবে।

ফকিব মহাম্মদ যে কহে এই বাত।

এলাহি আমাকে যেন করেন নাজাত ।  
ইমান আমান আল্লা বাখে ছালামেতে ।  
পন্নাব ছাডিল্লা এবে লিখি জিপদীতে ॥

মুন্ন মহম্মদ সাহেবের গ্রন্থখানির আকৃতি ৮"×৫"। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০ এবং পৃষ্ঠাগুলি ডান দিক থেকে বাম দিকে সাজানো। এর বিস্তৃতিতে গ্রন্থকার এই গ্রন্থের নকল না করিতে ভারত সবকাবেব আইনগত দণ্ডবিধি উল্লেখ কবেছেন।

পাঁচালীখানি বাংলা ভাষায় রচিত। এতে আববী-ফারসী শব্দের প্রচুর্য বর্তমান। পদ্যছন্দে লিখিত এই পাঁচালী, গদ্যের আকারে লিখিত। এর ভাষা প্রাঞ্জল বাংলা। দ্বিপদ, ত্রিপদ কোথাও বা চতুঃপদে বিবচিত যাব একটি নমুনা নিম্নলিখিত ভূমিতাতে দৃষ্ট হয়—

উপদেশ পাই যত  
নাহি হয় সে মনোমত  
দেখিলাম কত শত  
নানা মত জনে জনে ।  
ফকির মহাম্মদ কহে পবে  
শেষে এই হতে পাবে  
সকল মত একত্র কবে  
জমি কেবল বনে বনে ।      পৃঃ—৫

এই পাঁচালীতে অন্ত্যন্ত পাঁচালীর স্তায় হাম্দ-নাযাত বলে উল্লেখ না থাকলেও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বক্তব্য মূলতঃ তাই। প্রথম পৃষ্ঠার গ্রন্থকার 'বিছমিল্লা বলি নামেতে আল্লাব, শুক কবিলাম . . . ' ইত্যাদি বলে গদ্যের আকারে কষেক পংক্তিতে ভক্তিপূর্ণ ভূমিকা লিখেছেন। গদ্যের আকারে লিখিত এই স্তবকের শেষে স্বাক্ষরের আগের বিনয়-প্রকাশক দুইটি পংক্তি সাজালে গদ্যের আকারে নিম্নকণ দাঁড়ায়—

পীবেব দোন্নায় কি যে লিখিব তাহা নাহি জানি আমি ।  
আপনি লিখিবেন কেছা যেনে নিব আমি ॥

চতুর্থ পৃষ্ঠা থেকে বড় হবফে 'কেছা শুক' শিবোনাম দিবে কাহিনী আবন্ত

হয়েছে। তা শেষ হয়েছে ৬০ নম্বর পৃষ্ঠায় এসে। কেচ্ছাব মধ্যে নিম্নলিখিত উপ-শিরোনামগুলি বিদ্যমান।

- ১। চন্দন শাহা ও বর্গাব লড়াই
- ২। চন্দন শাহার ফকির হইবার বয়ান
- ৩। মোবারক গাজীর ফকির হইবার বয়ান
- ৪। মন্দির রাযের জমিদারী এবং গাজী সাহেবের কারাকদ্ধ হইবার বয়ান
- ৫। পীর মঈনুদ্দিন আসিয়া মোবারক গাজীকে কাবাগাব হইতে খালস কবিবার বয়ান
- ৬। বেলেদর বনে আসিয়া গাজী সাহেব মন্দির রাযকে বর্দোয়া কবিবার বয়ান
- ৭। বিবির চক্ষের আশি ভাল হইবার বয়ান
- ৮। গাজী সাহেবের অপোডা পৃথিবীর সজ্জান এবং বদবের নিকট হাসা জোডা কুস্তীর পাইবার বয়ান
- ৯। গাজী সাহেব নাবায়লীর কাছে থাকিয়া মহেশ ঠাকুরকে বর্দোয়া কবিবার বয়ান
- ১০। বড় পীর সত্বকে খোয়াব দেখার ও মেহেবেব সাদি হইবার বয়ান
- ১১। নবাবের খাজনা বাকীর জন্ত ধরিয়া লইয়া যায় এবং গাজী সাহেব, মদন রায় ও অন্যান্য জমিদারদিগেব উদ্ধার করিবার বয়ান
- ১২। মদন বাহেব জমিদারী ও গাজী সাহেবের মউত
- ১৩। হুখীর কান্দনায় মোবারক গাজী আসিয়া হুখীকে সান্ত্বনা দিখে যায়।

শেষ কভাব পৃষ্ঠাব ভিতরের দিকে বাংলা হবক্ষে উর্দু ভাষায় ১২ গংজিব একটি কবিতায় কিছু দববেশী ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া ২৪ পৃষ্ঠায় ‘স্বপনের সুব’, ২৭ ও ৩০ পৃষ্ঠায় ‘ধুবা’ এবং ৪০ পৃষ্ঠায় ‘গান’ এই নামে ছোট ছোট কবেকটি গান সন্নিবেশিত আছে। ৪০ পৃষ্ঠায় গানের একমাত্র লাইনটি—

আমাব এ দেহ নদী, যতই বাঁধি, ঠিক মানে না বে মন।

গৌরমোহন সেন বচিত “হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি সাহেবের জীবন চবিতাখ্যান” শীর্ষক গ্রন্থখানিতে বর্ণিত কাহিনীর সহিত এই



পাঁচালী কাব্যখানির মূলতঃ বিশেষ পার্থক্য নেই। তবে “জীবন চরিতাখ্যানে” বয়েছে প্রচুর গান এবং বেশ কয়েকখানি চিত্র। “সংক্ষিপ্ত জীবনীতে” গান দু’একটি আছে বটে কিন্তু চিত্র সংখ্যা একেবারেই নেই। ‘জীবন চরিতাখ্যান’ মূলতঃ গদ্যে এবং ‘সংক্ষিপ্ত জীবনী’ মূলতঃ পদ্যে লিখিত। উভয় গ্রন্থে প্রচুর আববী-ফাবসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। উভয় গ্রন্থকার সুফী আদর্শের অনুসারী বলে বোঝা যায়।

সংক্ষিপ্ত জীবনীতে পীরের জন্ম বিবরণ একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা। পীর মইনুদ্দীন আল্লার নিকট এসে চন্দন শাহার ফকির হওয়ার বিবরণ প্রদান করলেন এবং তার পুত্র-কামনার কথা জানালেন। তৎক্ষণাৎ জেববিল-মাধ্যমে বেহেস্তের এক ওলিকে ডাকিলে এনে—

আল্লা কহেন তুন গাজি কহি যে তোমারে ।  
আমাব হকুমে হা হ চন্দনেব ঘরে ॥

গাজি বললেন,—

যদি আল্লা যাব আমি চন্দনেব ঘরে ।  
ওলি আর না পাঠাইবে তুনিরাব পবে ।  
আল্লা বলে গাজি ওলি শোন মন দিয়া ।  
কেতাবে খবর আছে বাইশ আউলিয়া ॥  
এই কথা শুনিয়া গাজি খোশাল হইল ।  
এনুসাল্লা বলিয়া যে মুবশিদে ডাকিল ॥

এবার পীর মইনুদ্দীন বললেন—

এই ফুল দিই আমি তুমি লিয়া যাও ।  
বিবি হাতেতে এই ফুল গিয়া তুমি দাও ॥  
এই ফুল দিলে বিবি লাভকা হইবে ।  
আল্লার দরগাহ মোনাজাত ভেজিবে ॥

পীর মোবারক গাজী সাহেবের এইরূপ জন্ম-কাহিনী অত্যন্ত মজল-কাব্যোৎকৃষ্ট হয়। মনসা, চণ্ডী বা পীর একদলি শাহু কাব্যের প্রভাব এতে সুস্পষ্ট। “বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কণ্ঠাব পুষ্টি” বা মানিক পীর কাব্যের সাথে এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। গাজি-কালু-চম্পাবতী কাব্যে গাজীব ফকির হয়ে যাওয়া

পূৰ্ব মুহূৰ্ত্তে মাতাৰ নিকট থেকে বিদায় নেবার করুণ বর্ণনা এই পাঁচালী ক বো  
বর্ণিত নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্যযুক্ত—

আখিব পুতুল তুমি যত্নেব পবাণ ।  
আমাকে ছাড়িয়া বাবা যাবে কোন স্থান ।  
কেমনে থাকিব আমি না দেখে তোমাকে ।  
মা বলিয়া বল বাবা কে ডাকিবে আমাকে ।  
গাজি বলে লোহার বেড়ি যদি দেও তুমি ।  
কাবার দিয়াছি মাগো ফকিব হব আমি ।  
মা বলে ওবে বাছা ফকিব যদি হলে ।  
বিদায় দিই ডাক একবার মা বলে ।

কবি ফকির মহাম্মদ বাংলা পৌৰ-সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডঃ সুকুমার  
সেন তাঁর ইসলামি বাংলা-সাহিত্যে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে  
(১ম খণ্ড অপবর্ধ) ফকির মহাম্মদের কথা উল্লেখ কবেছেন। ‘ইউসুফ  
জোলেখা’ নামক গ্রন্থেব বচরিতা ফকিব মহাম্মদ এবং ‘হুহি মোবাবক গাজি  
ও জেন্দা পীরের বেচ্ছা’ নামক পাঁচালীর বচরিতা ফকিব মহাম্মদ যদি একই  
ব্যক্তি হন তবে ‘ইউসুফ জোলেখা’ব বচনাকাল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ—এই হিসাবে  
কবিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বেব লোক বলে ধবা ষেতে পাবে।

বডৰ্খা গাজীর পিতার নাম সেকেন্দার শাহ্। দেখা যায় তাঁব রাজত্বকাল  
ছিল ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্য  
এবং কালু-গাজী-চম্পাবতী নাটকে গাজীর পিতার নাম সেকেন্দার শাহ্ বলে  
উল্লেখ আছে। এই কাহিনীতে আবো পাওষা যাব দক্ষিণ বাঘ, মুকুট বাঘ  
ও রামচন্দ্র খাঁব কথা। তাঁদের কাল হল ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ<sup>৫০</sup>।  
উক্ত রামচন্দ্র খাঁ ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নীলাচলে যাত্রাব  
পথে উড়িয়া বাজ্যে ষেতে (ছত্রভোগেব উপব দিবে) সাহায্য কবেছিলেন<sup>৫১</sup>।  
রামচন্দ্র খাঁব কাল কোনটি? রামচন্দ্রেব মূল নাম শান্তিধব। শান্তিধবেব  
বঙ্গাধিপ হুশেন সাহেব নিকট থেকে রামচন্দ্র খাঁ উপাধি পাওযাব কাল হল  
১৪৯০ খৃষ্টাব্দ।<sup>৫২</sup> মুকুট বাঘ ও রামচন্দ্র খাঁ সমসাময়িক। অতএব পৌৰ  
মোবাবক বডৰ্খা গাজীর যুদ্ধকাল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী হবে—এটাই  
স্বাভাবিক। আবাব মুকুট বাঘেব পুত্র কামদেব ওবফে ঠাকুববর সাহেব,

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের যুড়্যর পরও জীবিত ছিলেন। ৩৬ মহাবাজ প্রতাপাদিত্যের কাল হল ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দ। শায়েস্তা খাঁর ঢাকাৰ দববাবে বড়খাঁ গাজী এবং মদন বায়েব গমন কবতে হয়েছিল। শায়েস্তা খাঁর কাল হল ১৬০৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬১৪ খৃষ্টাব্দ। শায়েস্তা খাঁ বাংলাদেশেব শাসন কৰ্তা হব্বে এসেছিলেন ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে। ৫৩ অভএব বড়খাঁ গাজীর জীবৎকাল ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হব্বে এটা খুবই স্বাভাবিক।

একাধিক বড়খাঁ গাজী ছিলেন কিনা এ বিষয়েও আজো কোন হিব সিদ্ধান্তে আসা যাব নি। তবে মোবাবক সাহু গাজী, বড়খাঁ গাজী, ববখান গাজী, মব্ৰা গাজী, গাজী সাহেব ও গাজী বাবা এই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন গ্রন্থে যাব কথা লিখিত হয়েছে তিনি একই বড়খাঁ গাজী—তা পূৰ্বেই বলা হয়েছে।

হাওড়া-হুগলী সীমান্তে ডুবুগুট পেঁডোতে সুফী খাঁ বা ইসমাইল গাজীকে কেন্দ্ৰ করে একটি পীরস্থান গড়ে ওঠে। পববর্তীকালে সুফী খাঁ হব্বেছেন বড়খাঁ। এই বড়খাঁ গাজীকে আশ্রয় কবে ডুবুগুট মান্দাবণে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইসলামি সাহিত্যেব কেন্দ্ৰ গড়ে উঠেছিল। ২ এই বড়খাঁ গাজী ও আমাদেব আলোচ্য বড়খাঁ গাজী একই ব্যক্তি বলে আমাব মনে হব না, যদিও ডাঃ এনামুল হক অনুমান কবেন যে ত্রিবেণী বিজয়েব পব বড় খান গাজী সম্ভবতঃ দক্ষিণাঞ্চল বিজয়ে বর্হিগত হয়ে যশোব, খুলনা ও চব্বিশ পবগণাব ডাটা অঞ্চলে তাঁব বিজবাভিযান পবিচালনা কবেছিলেন। ৬৮

“জাফর খাঁ বা দবাফ খাঁ গাজী ও তাঁর পবিবারবর্গেব যে ইতিহাস পাণ্ডবা যান্ন, তাতে দবাফ খাঁব তৃতীয় পুত্রেব নাম ববখান গাজী (H. Blochman's Notes on Arabic and Persian inscriptions in the Hooghly District: J. A. S. B. XII 280) ত্রবোদশ শতাব্দীৰ শেষভাগে এঁরা ত্রিবেণীতে মুলতান ককুনউদ্দিন কৈকাউসেব সময় আগমন কবেন। হুগলীর বাজা ডুদেবেব সঙ্গে লড়াই কবে বিজয়ী হব্বে গাজী উপাধি গ্রহণ কবেন। জাফব খাঁর পুত্র ববখান গাজীই যে লৌকিক বিশ্বাসেব বড়খাঁ গাজী তা সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর।

আমাব বড়খাঁ গাজী সম্বন্ধে যে তথ্য হিন্দু ও মুসলমান বচবিতাদেব বচনার

পাই তাতে মনে হয় তিনি জাফর খাঁর সমসাময়িক হলেও তাঁর পুত্র নন। এই বিশ্বাসের মূলে দক্ষিণ চব্বিশ পবগণার ভাটি অঞ্চলে বড খাঁর কবর এবং কিংবদন্তীতে তাঁকে সেই অঞ্চলেই পাওয়া যায়, পাণ্ডুরা বা ত্রিবেণীতে নয়। তবে একথা সত্য যে তিনি শুধু ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন, কোন সম্ভ্রান্ত পাঠান আমীর ওয়বাব বংশ-সম্ভূত হবেন, কিন্তু আবর মুফী-দরবেশের সংস্পর্শে এসে সংসাবে বা বাজঘর্মে তাঁর বৈবাগ্য জন্মে।” (বাংলা সাহিত্যের কথা : দ্বিতীয় খণ্ড : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)।

সেকেন্দার শাহের পুত্র বডখাঁ গাজী ব্যতীত ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজীর পুত্র ববখান গাজীর নাম পাওয়া যায়। জাফর খাঁর মসজিদের পারসিক লিপিতে যে তারিখ আছে তাতে ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হয়,—কিন্তু সে সময় বশোহর জেলায় বাজা মুকুট বাঘের আবির্ভাব হয়নি। ৫৩

ঐতিহাসিক আরো লিখেছেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবর একদল গাজী বাংলা দেশে এসে বঙ্গের হোসেন শাহের সহায়তায় হিজলী থেকে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। ববখান বা বডখাঁ গাজী তাঁদেরই অন্যতম। তিনিই মোবারক শাহ। ৫৩

আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে পীর মোবারক গাজীর পিতা ছিলেন পীর গোবার্চাদের শিষ্য পীর হজরত আবদুল্লাহ ওরফে সোন্দলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই মন্তব্যের পক্ষে কোন যুক্তি তিনি উপস্থাপিত করেন নি। পীর গোবার্চাদের আগমন-কাল চতুর্দশ শতাব্দী বলে গৃহীত হলে আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্যকে একেবারেই ভ্রান্ত বলি যায় না। আবাব দেখা যায়, বঙ্গের সুলতান সেকেন্দারের এক পুত্রের নাম বড খাঁ গাজী। সেকেন্দারের রাজত্বকাল ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর আঠারো জন পুত্রের অন্যতম গিয়াসউদ্দীন বাকী সন্তবে জনকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন।

অতএব আমরা এ পর্যন্ত কয়েকজন বডখাঁ গাজীর নাম পাচ্ছি। প্রথমতঃ জাফর খাঁর পুত্র বডখাঁ গাজী। তাঁর কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ। দ্বিতীয়তঃ, সেকেন্দার সাহেব পুত্র বডখাঁ গাজী। তাঁর কাল চতুর্দশ শতাব্দী এবং তৃতীয়তঃ, আবদুল্লাহ ওরফে সোন্দলের পুত্র বডখাঁ গাজী। তাঁর কাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

আমাদের ধারণা উক্ত তৃতীয় বডখ<sup>১</sup>। গাজীই আমাদের আলোচ্য বডখ<sup>২</sup>। গাজী। কারণ,—তাঁর অবস্থিতি কাল আমাদের হিসাবে গৃহীত কালের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ কোন কবিব কাছে তিনি সেকেন্দার শাহের পুত্র, কোন ভক্তের কাছে তিনি চন্দন সাহার পুত্র। কারো মতে তিনি দিল্লীর সুলতানের পুত্র, কারো মতে বঙ্গের সুলতানের পুত্র। তাঁদের বক্তব্য ইতিহাস-ভিত্তিক নয়। তৃতীয়তঃ সেকেন্দার শাহের পুত্র বডখ<sup>৩</sup>। গাজী যে সময়ে নিহত হন, সোন্দলের পুত্র বডখ<sup>৪</sup>। গাজী প্রায় সেই সময়ে আবির্ভূত হন। সুতরাং সুলতান-পুত্র বডখ<sup>৫</sup>। গাজী কপেই সাধক সোন্দল-পুত্র বডখ<sup>৬</sup>। গাজীর পবিত্রিচি-প্রচাবিত হবে এটাই স্বাভাবিক।

কবি কৃষ্ণরাম দাস রচিত ‘বায়মঙ্গল’ কাব্যের রচনাকাল নিয়ে কোন মতভেদ নেই। কবি তাঁর কাব্যের রচনাকাল এইভাবে নির্দেশ করে গেছেন :—

কৃষ্ণরাম বিরচিল বায়ের মঙ্গল ।

বসু শৃঙ্গ ঋতু চন্দ্র সকেব বৎসব ॥

নাট্যকার সতীশচন্দ্র চৌধুরীর নাটকের রচনাকাল ১৩২০ বঙ্গাব্দ। নাট্যকার লিখেছেন,—“এই পুস্তক সন ১৩২০ সালের ৬ই পৌষ ববিবার আবন্ত এবং ৮ই পৌষ মঙ্গলবার সম্পূর্ণ হইল।”

অতএব উপবোক্ত গ্রন্থের বচনাকাল নিয়ে সমস্যা নেই। আবহুব-বহিম সাহেব তাঁর “গাজী-কালু-চম্পাবতী” কাব্যের রচনাকাল লিখে যান নি। উপবোক্ত নামে আরো দুখানি পাঁচালি কাব্যের কথা জানতে পাবা যায়। তাদের রচনাকাল যথাক্রমে ১২৮৫ বঙ্গাব্দ ও ১৩০২ বঙ্গাব্দ। আবহুব-বহিম সাহেবের এই পাঁচালি কাব্যের রচনাকাল আনুমানিক ঊনবিংশ শতাব্দী। এই প্রসঙ্গে বডখ<sup>৭</sup>। গাজীর চবিত্র-সম্বন্ধিত আরো যে কবখানি গ্রন্থের কথা জানতে পাবা যায় সেগুলি হল,—

১। কালু-গাজী-চম্পাবতী, রচয়িতা খন্দকার আহম্মদ আলি। এর রচনাকাল ১২৮৫ সাল।<sup>৩১</sup>

২। কালু-গাজী-চম্পাবতী, রচয়িতা মহম্মদ মুন্সী সাহেব। এর রচনাকাল ১৩০২ সাল।<sup>৩২</sup>

৩। কালু-গাজী-হামিদিয়া। ১৩১

৪। মোবাবক গাজীৰ কেছা ( অষ্টাদশ শতাব্দী ), বচৰিতা ফকিৰ মহান্নদ। ১৩৬

৫। কালু-গাজী-চম্পাবতী ( অষ্টাদশ শতাব্দী ), বচৰিতা আবদুল গফ্ফৰ ( গফ্ফৰ )। ১৩৬ তাঁৰ কাহিনীতে হিন্দু মুসলমান দেবতত্ত্বৰ অদ্ভুত মিশ্ৰণ হৈছে। ডঃ মুকুমাৰ সেনেৰ মতে “প্ৰচুৰ বিকৃতি সত্ত্বেও জনপদ সংস্কৃতিৰ একদিকেৰ ভাল নমুনা হিচাবে এই কাহিনীৰ মূল্য আছে।

৬। বডৰ্থা গাজী ( অষ্টাদশ শতাব্দী ), বচৰিতা সৈয়দ হালুখিয়া। ১৩৬

৭। গাজী বিজয় ( অষ্টাদশ শতাব্দী ), বচৰিতা কবজুল। ১৩৬

৮। গাজীৰ পুথি, বচৰিতা আবদুল বহিম। এই কাহিনীৰ নাযিকার নাম লাবণ্যবতী।

কলেমদী গায়েন কৰ্ত্তক গীত সে গীত মেদনমল্ল পৰগণাৰ ভাষ্যমান ফকিৰ-গণেৰ মুখে মুখে চলিত গীত। কে এবং কবে যে সে গীত বচিত হৈছিল তা আজ অজ্ঞাত। ফকিৰগণেৰ মুখে মুখে ফেৰা গান পৰিবৰ্তিত, পৰিমাৰ্জিত, সংযোজিত, পৰিযোজিত হৈছিল এটাই স্বাভাবিক। যাহোক, নগেন্দ্ৰনাথ বসু মহাশয় গাজী সাহেবেৰ গান ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্ৰকাশ কৰাৰ তা বন্ধ। পেৰেছে। অতএব “গাজী সাহেবেৰ গান” বচনাৰ সঠিক কাল নিৰ্ণীত হয় নি।

গৌৰমোহন সেন মহাশয়েৰ গ্ৰন্থেৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ আমাদেৰ হস্তগত হৈছে। দ্বিতীয় সংস্কৰণেৰ প্ৰকাশকাল ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ। লেখক সেন মহাশয় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্ৰথম ঘৃষ্ণিবাৰী শৰীফে যান এবং পীৰ বডৰ্থা গাজীৰ প্ৰতি ভক্তিৰে তিনি আশ্ৰিত হন। তাৰপৰাই তিনি এই গ্ৰন্থ রচনাৰ হাত দেন। কবে যে সে বচন শেষ হৈছিল তাৰ কোন উল্লেখ নাই। তবে অনুমান কৰা যায় যে এই গ্ৰন্থেৰ প্ৰথম সংস্কৰণ বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰথমার্ধেৰ শেষ বা দ্বিতীয়াৰ্ধেৰ প্ৰথম দিকে প্ৰকাশিত হৈছিল।

‘গাজী-কালু-চম্পাবতী’ কাহিনীতে দেখা যায় বডৰ্থা গাজীৰ জন্মস্থান বৈবাটনগৰ। ‘মোবাবক আলি শাহ সাহেবেৰ জীৱন চৰিতাখ্যানে’ দেখা যায় তাঁৰ জন্মস্থান বেলে আদমপুৰ। ‘বালাভাৰ পীৰ হজ্জৰত গোবাচাঁদ বাজী’ গ্ৰন্থে দেখা যায় যে তিনি হজ্জৰত আবদুল্লাহ্ ৩ৰফে সোন্দল বাজীৰ

পুত্র। হজরত সোন্দল, হজরত গোরার্চাদ রাজীব নির্দেশে বীরভূমে জায়গী ব গ্রহণ কবেন। সেখানেই যোবাবক গাজীর জন্ম হব। বৈরাটনগর যে কোথায় আজো তার হদিস পাওয়া যায় নি। বেলে আদমপুর চকিগ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। সেখান থেকেই তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ‘বালাগুড়ার পীর হজরত গোরার্চাদ বাজী’ গ্রন্থে লিখিত আছে যে যোবাবক গাজীর আস্তানা ঘুটিয়াবী শবীকে। অতএব মেনদমল্ল পরগণার বেলে আদমপুর বা ঘুটিয়াবী নামক গ্রাম থেকে তাঁর প্রকাশ ঘটেছিল তাতে সন্দেহ থাকতে না পারাই স্বাভাবিক।

যোবনের প্রারম্ভেই তিনি বাজসুখ, সংসারসুখ ত্যাগ করে ককিব হয়ে যান। অল্পদিন পরেই তিনি চম্পাবতী নারী কামিনীর আকর্ষণে এবং ঈর্ষপ্রচার আদর্শে ব্রাহ্মণগরের রাজা মুকুট রায়ের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বাঘ-সৈন্য পরিচালনা করে গাজী ব্রাহ্মণগর অভিযুগে বাগ্নার পথে উত্তর চকিগ পরগণার চারঘাট গ্রামের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত যমুনা নদীর যেখানে তিনি পার হয়েছিলেন সেটি আজো ‘বাঘঘাটা’ নামে পরিচিত। অর্থাৎ মেনদমল্ল জঙ্গল থেকে আগনা বহিঃপ্রকাশ নিয়ে গাজী প্রথমে ব্রাহ্মণগরে উপস্থিত হলেন। মারপথে তিনি কোথায় কোথায় অবস্থিতি কবেছিলেন তা বলা যায় না। ব্রাহ্মণগরের যুদ্ধে জয়লাভ কবে চম্পাবতী, কামদেব ও কালু সমভিব্যাহারে গাজী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। প্রথম যে স্থান একটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গে চিহ্নিত হবে আছে সে স্থানের নাম লাব্‌সা। এই গ্রামে চম্পাবতী পরিত্যক্ত হন বা আত্মহত্যা করেন বা সেওতা গাছে ‘পবিত্র হন (রূপকথা), বা এখান থেকে পলায়ন কবে গণ বাজার আশ্রয়লাভ কবেন। লাব্‌সা গ্রামটি খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত। এই গ্রাম আজিও চম্পাবতীর স্মৃতিচিহ্ন ধারণ কবে বিদ্যমান। কামদেব ছিলেন মুকুট রাজার পুত্র। তিনিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবে গাজীর অনুগমন কবেছিলেন,— কিন্তু লাব্‌সা গ্রামে উপনীত হয়ে ভগিনীর তাদৃশ ধর্মমুগ্ধ ঘটনার ব্যথিত চিতে গাজীব সঙ্গ ত্যাগ করেন। কামদেব লাব্‌সা গ্রাম থেকে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হন। প্রথমে তিনি বিশেষভাবে অবস্থিতি কবেন বসিবহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত গাবড়া গ্রামে। সেখানে অধিক বিলম্ব না কবে তিনি উত্তর পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হন এবং ইছামতী নদী পার হয়ে চাবঘাট নামক গ্রামে এসে জায়গীর স্থাপন করেন। কোন কোন কাব্যে আছে যে

চম্পাবতী পুনর্জীবন লাভ করে গাজীব অনুগমন করে বৈরাটনগবে এসেছিলেন। কালু ও গাজীব সঙ্গে বৈরাটনগবে এসেছিলেন বলে কবিব বর্ণনা আছে। কিন্তু চম্পাবতী প্রসঙ্গে পব বাছা মদন রায়েব প্রসঙ্গে এসে কালুব আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কালুব স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত কালুতলা গ্রাম আছে। খুব সম্ভব লাব্‌সা থেকে তিনিও কিছু কালের জুগ গাজীর সঙ্গে ত্যাগ করেন এবং এই গ্রামে এসে অবস্থিতি করেন। এখানে তাঁর নামে দরগাহ আছে। তাঁর নামানুসাবে এই গ্রামের নামও হয় কালুতলা। কালুতলা বসিবহাট মহকুমাব হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত। লাব্‌সা থেকে কালুতলাব দূরত্ব খুব বেশী নহে।

আপনজন একে একে ত্যাগ করার গাজীব মনে বৈবাগ্য ভাব পুনরায় উদ্ভিত হয় এবং তা তীব্র আকার ধারণ করে। তখন তিনি উক্ত লাব্‌সা অঞ্চল থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পশ্চিমাভিমুখে ছুটন্তারীর দিকে অগ্রসর হন। পশ্চিমযো তিনি যে যে স্থানে অবস্থিতি করেছিলেন তাদের কয়েকটি স্থান আজিও চিহ্নিত হয়ে আছে। তাদের মধ্যে বারাসত মহকুমার বারাসত থানাব অন্তর্গত উলা এবং পাথবা-দাদপুব উল্লেখযোগ্য। উক্ত দুটি গ্রামে তাঁর নামাঙ্কিত নজবগাহ আছে। পাথবা-দাদপুব থেকে পশ্চিমাভিমুখে ছুটিবারো বা দাঁশতা বা বেলে আদমপুব অর্থাৎ মেদনমল্ল পবগণাব ব্যবধান খুব বেশী নহে।

পীব মোবারক বড়বাঁ গাজীব অলৌকিক কীর্তিকলাপের উপর উপরোক্ত পুস্তকাদি ছাড়া কিছু গল্পকথা কোন কোন অঞ্চলে শোনা যায়। সেই গল্পকথার কয়েকটি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হল।

### ১। দরবেশ বড়বাঁ গাজী

উক্ত চব্বিশ পবগণাব বারাসত মহকুমাব অন্তর্গত পাথবা নামক গ্রামে পীর বড়বাঁ গাজীব নামে যে নজবগাহটি আছে, সেখানে একটি পুকুর আছে। পুকুরটি পীবপুকুর নামে খ্যাত। গ্রীষ্মকালের দুপূর্ববেলা। চাবিদিকে আগুন বর্ধিত হচ্ছে। ঐ গ্রামেব এক বাখাল বালক তাব পালের গকগুলিকে পীরপুকুরে জল খাওয়ারোতে নিয়ে এল। গকগুলিকে পুকুরে নামিয়ে দিবে পুকুরেব পবপারের দিকে তাকিয়ে সে বিস্মিত হয়ে যাব। পুকুর পাড়ের গাছেব ছাবাব লম্বা হয়ে শুবে ঘুচ্ছে ঐ পুকুরটি কে? কি দাক্ষ লম্বা ঐ



লোকটি। গায়ের বং একেবারে দুধের মতন সাদা। সাদা ধবধবে আলখাল্লা তাঁর পবণে। ইনি কি তবে গল্পে শোনা সেই দরবেশ। রাখাল-বালকটি তার জীবনে এমন দৃশ্য দেখে নি। সে বিমোহিত হয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ ফিরে এল তার সখিঃ। পীরপুকুর থেকে তার বাড়ী খুব দূরে নয়। সে তীব্র বেগে ছুটে গেল বাড়ীতে। সবাইকে জানাল সে হাঁপাতে হাঁপাতে। কেউ বিশ্বাস কবল, কেউ বা বিশ্বাস করল না। রাখাল বালক নাছোড়বান্দা হয়ে দু'একজনকে টেনে নিয়ে এল পীরপুকুরে। কিন্তু হাব। বালক অপ্রতিভ হয়ে দেখল—গাছের সে ছায়াটি আছে কিন্তু সেখানে কেউ নেই। বালকটিকে কেউ উপহাস কবল,—কেউ বা উপহাস করল না। তারা বিস্মিত হল এবং বলল,—ইনিই পীর-মোবাবক বড়খাঁ গাজী। তিনি এখানকার নজরগাহে মাঝে মাঝে আসেন এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে স্থানান্তরে চলে যান।

## ২। গাজীর নামে ঝুটির শাস্তি

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ বারাসত-বসিরহাট অঞ্চলে ‘ঝুটি’ শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। ঝুটি কথাটি ঝড়েবই ভাব-বাহক। গ্রীষ্মের দিনে বিশেষ ভাবে দুপুরবেলা মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি হয়। এই ঝড়ে ধূলো-বালি উড়িবে এমন কি কখন কখন ঘর-বাড়ীর ক্ষতি সাধন কবে। ঘূর্ণি ঝড় বা ঝুটি এতদ্ অঞ্চলেব একটি প্রাকৃতিক ঘটনা।

একদিন দুপুরে প্রচণ্ডভাবে এক ঝুটি এল। সে ঝুটিকে সাধারণ লোকে অসাধারণ বা দৈব ঘটনা বলে মনে কবে এবং সেই কাবণেই যথেষ্ট সঙ্গীহও কবে। কিন্তু, পাথর। দবগাহেব সেবাযেত সোন্দল শাহজীর ভাইপো। মহম্মদ ইলিয়াস শাহজী সে ঝুটিকে তাজিল্য জ্ঞানে বলল,—

ঝুটি এলে যুতে দেবো,

বামন এলে ছড়া দেবো।

এই কটি কথা উচ্চাবশের পর ‘ঝুটি’র সে কি রণমূর্তি। ধূলো-বালিতে তার সামনে প্রাণ অস্ত্রকাব করে ফেলল। প্রচণ্ডবেগে ঘুবপাক খেতে খেতে সে ঝুটি বাড়ীব সামনেব এক মস্ত বড় পাটকাটিব গাদার কাছে গেল এবং সে গাদাটি প্রায় পাঁচ-ছয় হাত উপবে উঠিয়ে নিয়ে ইলিশাসের মাথাব ওপব ফেলে আব কি! সোন্দল উপাযান্তর না দেখে একান্ত মনে বড়খাঁ গাজীব নাম

স্মরণ কৰে বলল,—“হে গাজী ! ইলিয়াসকে তুমি এ বিপদ থেকে রক্ষা কব ।” ইত্যাদি ।

অল্পক্ষণেৰ মধ্যে বুটৰ বেগ প্রশমিত হল । দেখা গেল সেই পাটকাঠিৰ গাদা ইলিয়াসেৰ মাথাৰ উপৰ পড়ল না,—হাডিয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে গেল না,—যেখানকাৰ গাদা সেখানেই এসে পড়ল । ইলিয়াস কোন আঘাত না পাওযাৰ পীর গাজীকে সেলাম জানিয়ে সোন্দল শাহজী ভাইপোর কাছে এলেন । ভাইপো তাৰ অপৰাধেৰ কথা জানাল । সে প্রতিজ্ঞা কৰল—কখনও এমন কটুক্তি সে কৰবে না ।

‘৩। বোলবিঘা পীৰোত্তৰ জমিৰ কথা

পাখৰা-গ্রামে পীর মোবাবক বডৰ্থা গাজীৰ নামে একটি ‘থান’ আজো বিদ্যমান । সেই থান-সংলগ্ন প্রায় বোল বিঘা জমি পীরেৰ নামে উৎসৰ্গ কৰা আছে । কি ভাবে পীৰোত্তৰ হয়েছিল তাৰ চিন্তাকৰ্ষক এক লোককথা এডুঅঞ্চলে প্রচলিত আছে ।

উক্ত পাখৰা নজৰগাহেৰ বৰ্তমান খাদিয় বা সেবানেতের কোন এক পূৰ্বপুৰুষ এক বাতে স্বপ্ন দেখলেন যে কে একজন যেন বল্লেন,—“কাল ভোৱে এ দরগাহে আসবে ।” হঠাৎ তাঁৰ ঘুম ভেঙ্গে গেল, সমস্ত গা যেন হয়ে গেল পাৰাণেৰ মতন ভাৱী । পৰদিন ভোবেই তিনি চলে এলেন আগাহা-পরিবেষ্টিত অল্পখ গাহেৰ তলাষ অবস্থিত তথাকথিত দৰগাহেৰ অতি নিকটে । আৱ এক পাও তাঁৰ এগোবাৰ উপাষ নেই । কি সৰ্বনাশ । সামনে যে বাঘ । এ বাঘ, কে এক ফকিৰ দৰবেশকে ঘিৰে পাহাৰা দিছে । ভয়ে ভো আগন্তকেৰ প্রাণ ঝাঁচা হাডা হওৱাৰ উপক্রম । তিনি পিছু হ’টে এসে পলায়ন কৰতে উদ্যত হতেই সেই ফকিৰ তাঁকে গম্ভীৰ গলাৱ কাছে আসতে বল্লেন । আগন্তকেৰ তখন আৰ এক পাও ওঠাৰাৰ ক্ষমতা নেই । তিনি আন্তে আন্তে সেই ফকিৰেৰ কাছে এগিয়ে যেতে লাগলেন । কি আশ্চৰ্য্য ! বাঘ তাঁকে বিচু বল্ল না । বাঘ-বেষ্টিত সেই ফকিৰই ছিলেন পীর বডৰ্থা গাজী । গাজী সাহেব এ ব্যক্তিকে বল্লেন,—“এইখানে থান তৈৰী কৰে তুমি ধূপ-বাতি দিবে জিহাবত কব্বে । ৱাজী তো ?” সে ব্যক্তি বাজী হলেন ।

তৎক্ষণাৎ গাজী সাহেব উক্ত ব্যক্তিকে আপনাৰ বাঘেৰ গিঠে সওৱাৰ কৰে নিযে পশ্চিম দিকে চল্লেন । বেশ কিছু সময় পথ চলাৰ পৰ তাঁৱা কোন এক

জমিদারী সেবেস্তার উপস্থিত হন। সেই জমিদারী সেবেস্তা থেকে নাকি ঐ ব্যক্তির নামে ষোল বিঘা জমি উক্ত স্থানে পীর্বোত্তর দেওয়া হয়।

### ৪। কে সেই ব্যক্তি

পাথরা-দাদপুত্রের ঘটনা। বড়খাঁ গাজীব নজরগাহেব দক্ষিণ গা ঘেঁষে বাবাসত—বসিরহাট রেল লাইন বিস্তৃত। নজরগাহেব পূর্বপাশে একটি ফটক আছে। ফটক-পাহাবাওলাব বেলকুস্তীও ঐ ফটক সংলগ্ন।

গত ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ফটকের পাহাবাওলা রেল কর্মীদের নাম শ্রীমদন মণ্ডল। সে দিন ছিল যোব অমাবস্তার অন্ধকার। বাজি দ্বিপ্রহরের শেষের দিকে তাঁর কুস্তীর দবজাব সামনে এসে কে যেন নাম ধরে ডাকল। মদন মণ্ডল কুস্তীর বাইরে এলেন। এসেই দেখেন ধপধপে সাদা পোষাক পরা দীর্ঘকায় একটি লোক। মদন মণ্ডল কোন প্রশ্ন কবার আগেই লোকটি তাঁকে অনুসরণ কবতে বললেন। মদন মণ্ডলের মুখ থেকে বাক্য নিঃসরণ হল না। পশ্চাত অনুসরণ কবে এসে উপস্থিত হলেন অন্ধখতলাব সেই থানে। দীর্ঘকায় ব্যক্তি একজন দরবেশ বৈ আব কেউ নন। একটি মোমবাতি, একটি ধূপকাঠি এবং একটি দেশলাই বের করে তিনি মদন মণ্ডলের হাতে দিয়ে বললেন,—“থানের ওপর জ্বালিয়ে দাও।”

মদন মণ্ডল মন্ত্র-মুগ্ধের মতন তাই করলেন। দরবেশ তাঁকে আবার বললেন,—“তুমি এখানে রোজ ধূপ-বাতি দেবে। তোমাব মঙ্গল হবে।”

এই বলে তিনি অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মদন মণ্ডলের সমস্ত শরীর খুব ভারী বোধ হল। পরক্ষণে মনে মনে তিনি যেন কি এক অবর্ণনীয় মনোবল পেলে। তিনি নীরবে ফিরে এলেন কুস্তীতে। প্রশ্ন জাগল মনে,—“কে সেই ব্যক্তি?”

পরদিন সকালে তিনি গ্রামবাসীগণের কাছে রাত্রের ঘটনাগুলি বললেন। তিনি সবেমাত্র কয়েক দিন এখানে কাজে যোগ দিয়েছেন,—এখানকার গাজীর থানের কথা তাঁর জানা ছিল না। গ্রামবাসীগণের কাছে শুনে তিনি সব বুঝতে পাবলেন।

তিনি যতদিন সেখানে ছিলেন ততদিন নিরমিতভাবে উক্ত নজরগাহে ধূপবাতি দিতেন। তিনি কয়েক বাতে এখানে বাঘের গর্জনও শুনেছিলেন।

## ৫। বাঘ-ঘাট।

ব্রাহ্মণ নগরের বাজা মুকুট বাঘের কারাগাবে বন্দী গাজীর সহচর ভাই কালু। কালুর অপরাধ—তিনি গাজীর পক্ষে পাজী হিসাবে মুকুট রাজ-কণ্ঠ্য চপাবতীর জন্ত প্রস্তাব এনেছেন। কালুর বন্দী অবস্থা গাজীর গোচরে এসেছে। কালুব মুক্তির জন্ত গাজী তখনই যাত্রা করলেন,—সঙ্গে তাঁর বাঘ সৈন্য। পথিমধ্যে পডল যমুনা নদী। নদী পার হতে হবে। পাটনী এল। পাছে পাটনী বাঘ দেখে ভয় পায়, তাই আগে থাকতেই তিনি বাঘগুলিকে ভেড়ার কপালবিত্ত কবে রেখেছিলেন। পাটনী অবশ্য তাঁদেরকে পার কবে দেয়, কিন্তু পারানি হিসাবে ভেড়া চাষ। পরিপুষ্ট ভেড়া দেখে ওর খুব লোভ হয়েছিল। গাজী তৎক্ষণাৎ দুটি ভেড়াকপী বাঘ দিয়ে দেন। পাটনী ভেড়া মহা হুশী। বাজী নিয়ে সে খুব যত্ন কবে গোয়ালে রেখে দিল। রাজ্রে সে ভেড়াগুলি বাছ হয়ে যায়।

ভেড়া দুটি দিয়ে কি একটা উপলক্ষ্যে ভাল একটা ভোজ দেবার আনন্দের বয়নায পাটনীর ভেড়া রাজ্রে একরকম ভাল করে খুই হল না। ভোর রাজ্রে সে আর একবার ভেড়া দুটি দেখে আবার তৃপ্তি পাওয়ার আশায় গোয়ালের কাছে আসতেই চমকে উঠল। বাপরে এ যে বাঘ। পাটনীকে দেখে বাঘ দুটো গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই পাটনী দিল ছুট। এয়ারসা ছুট যে পড়ি কি মবি। ভাগ্যে গোয়াল ঘরের দরজা বন্ধ ছিল না,—খোলাই ছিল। বাঘ দুটি দিল দৌড় লেজ পিঠে তুলে। গ্রামবাসীদের যাবা ভোবে উঠেছিল তাবা দুটো বাঘকে গ্রামের মধ্য দিয়ে ছুটতে দেখে হতভম্ব। হুঁচাবজন খুবক লাঠি-সোট। হাতে নিয়ে হৈ হৈ কবে পিছু ধাওয়া কবল। বাঘ দুটি ছুটে যমুনা নদীর ধারে এল এবং সাঁতাব কেটে পার হয়ে চলে গেল উত্তর-পূর্বাভিমুখে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নগরের দিকে, যেদিকে গাজী গমন কবেছিলেন। যেখান দিয়ে যমুনা নদী পার হয়ে গাজীর বাঘ দুটি গিবেছিল, সেখানে পববর্তীকালে মানুষ পারাপাবে ঘাট হয়েছে। কিন্তু যেহেতু বাঘ পার হয়েছিল সেই হেতু এই ঘাটের নামকরণ হয়েছে বাঘ-ঘাট।

## উনবিংশ পরিচ্ছেদ

### বড় গাঁৱ

পীৰ হজ্জবত মহীউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী বাজী, হজ্জবত বড়পীৰ সাহেব নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি সৈয়দ আল্-হাসানী আল্-হোসাইনী নামেও বিখ্যাত। তিনি সকল অলির শ্রেষ্ঠ বলে গণ্যসম্ভাজ্য পীৰান পীৰ দস্তগীৰ নামে খ্যাত। তাঁকে কেবলমাত্র জিলানী নামেও অভিহিত করা হয়। ৪৭০ হিজবীৰ ১লা বয়জান<sup>৪৪</sup> (ইংবাজী ১০৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে) মতান্তবে ৪৭১ হিজবীতে<sup>৪৫</sup> তিনি ইরানের জিলান জেলাৰ নীপ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁৰ পিতাৰ নাম হজ্জবত আবু সাঈদ মুসা জঙ্গী এবং মাতাৰ নাম উম্মুল খায়ের ফাতেমা। তিনি পিতাৰ দিকের ইমাম হাসান এবং মাতাৰ দিকের ইমাম হোসেনেৰ বংশসম্ভূত। ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন ছিলেন হজ্জবত মুহাম্মদের কথা হজ্জবত ফাতেমা যোহাবাৰ পুত্র। দশ বৎসৰ বয়সেই তিনি অলির সম্মান পান। আঠারো বছৰ বয়স পর্য্যন্ত তিনি কঠোৰ দাবিদ্বৈৰ মধ্যে বিদ্যাভ্যাস কৰে বাগদাদে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন।

হজ্জবত বড়পীৰ সাহেব কাদেবীৰা ভবীকা-পছী সুফী মতবাদেৰ প্রবৰ্তক। কথিত আছে তাঁৰ প্রভুত শক্তি, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অপবিসীম গুণগৰিমা ছিল। তাঁৰ সমগ্র জীবনই অলৌকিক কীর্তিকলাপে পৰিপূৰ্ণ। তিনি প্রায় একশত বৎসৰকাল জীবিত ছিলেন। তাঁৰ মহান এন্ডেকাল বা মৃত্যুৰ তাৰিখ ৫৬১ হিজবীৰ ১১ই রবিউল আউবাল (ইংবাজী ১১৬৬ খৃষ্টাব্দ)।

হজ্জবত বড়পীৰ সাহেবেৰ মাজাৰ বোগদাদ শহৰে অবস্থিত। তিনি সম্ভবতঃ বজ্জে আগমন কৰেন নি। তবু এদেশে কয়েকস্থানে তাঁৰ নামে কাল্পনিক দৰগাহ্ প্রতিষ্ঠিত হৈছে। তাঁৰ বংশধৰ কাদেবীয়া ভবীকাৰ সাধক পীৰ আব্দুল কুদ্দুস্ ওবফে পীৰ হজ্জবত শাহ্ মখদুম্ কপোশ ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ থেকে বাজশাহী জেলায় ইসলাম ধৰ্মপ্রচাৰ কৰতে এসেছিলেন।<sup>৪৬</sup>

আঠারো বৎসৰ বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভেৰ জন্তু বাগদাদে গমন

কবেন এবং সেখানে ভাষাতত্ত্ব ও মুসলিম আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি বাগদাদের তদানীন্তন বিখ্যাত সুফী আবুল খইর মোহাম্মদ বিন্ মুসলিম দরবাসের (মৃত্যু ১১৩১ খৃষ্টাব্দে) নিকট তসাউফের শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর বাগদাদের বিখ্যাত হানবলী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ কাজী আবু সা'দ মোবারক আল্-মুখব্বমীর নিকট থেকে 'শিবকা' বা সুফীদের বিশিষ্ট পবিধান লাভ করেন। হযরত আবদুল কাদের জিলানী ধর্ম বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাদের মধ্যে (১) আল্-গুলইস্না-লি-তালিবি তবীক আল্-হক, (২) আল্-ফতহব বক্বানী, (৩) ফুতুহ-উল-খররাত, (৪) জলা-উল-খাভির, (৫) হিজব-বশারের-উল-খর্রাবাত ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই কিতাবগুলিতে হজরত আবদুল কাদের আইনবিদ হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বাগদাদের হানবলী মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদও অলঙ্কৃত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি খানকারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাদ্রাসা এবং খানকাহ উভয়ই ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলগণ কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার সময় বিনষ্ট হয়।

কাদেরীরা তবীকা হযরত আবদুল কাদেরের জীবদ্দশাতেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং তাঁর মৃত্যুর পবে তাঁর শিষ্যরা এই তরীকা সারা মুসলিম জাহানে বিস্তার করে। বর্তমানে আরব, তুরস্ক, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার অগাণ্ড মুসলিম দেশ এবং পাক-ভারত উপমহাদেশ ইত্যাদি সকল এলাকায় কাদেরীরা তরীকা অভ্যন্ত জনপ্রিয়। কাদেরী তরীকার সুফীরা বাগদাদে হযরত আবদুল কাদের জিলানীর দবগাহের খাদেমকে তাঁদের আধ্যাত্মিক নেতা রূপে মান্য করে। বিভিন্ন স্থানের কাদেরী সুফীরা বিভিন্ন জিনিষকে তাঁদের তবীকায় প্রতীকরূপে ব্যবহার করেন। যেমন ডুবকের সুফীরা সবুজ গোলাপ ফুলকে প্রতীক রূপে গ্রহণ করেন। কোন একজন সুবীদ এই তবীকা গ্রহণ কবতে চাইলে এক বৎসর শিষ্টত্ব গ্রহণের পবে তাঁকে একটি ছোট পশমী টুপী আনতে হয়। সুফী বা মুবশাদ এই টুপীর সঙ্গে আঠাবো পাগ্‌ড়ি-বিশিষ্ট একটি সবুজ গোলাপ ফুল যুক্ত কবে দেন। এই টুপীকে তাজ বলা হয়। তাঁরা সবুজ বস্ত্রকে পছন্দ কবলেও অগাণ্ড বস্ত্র ব্যবহার কবতে তাঁদের বিশেষ আপত্তি নেই। মিশরের কাদেরী সুফীরা সাদা বস্ত্র পছন্দ কবেন। পাক-ভারত উপমহাদেশে হযরত আবদুল কাদের জিলানীর স্মরণে ববিউস্-সানি মাসেব এগার তা'বিখে উৎসব পালন করা হয়। পাক-ভারতের বিভিন্ন

স্থানে তাঁর নবল দরগাহ তৈরী করা হয় এবং সেখানে স্থানীয় জনসাধারণ নিয়মিত শিবনী মানত করে থাকে। কাদেরীয়া তরীকার সুফীদের সাধনা পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রচলিত আছে এবং সকলেই দাবী করেন যে, তাঁদের পদ্ধতিই হজবত আবদুল কাদের কর্তৃক আদেশকৃত। হজবত আবদুল কাদের বচিত ‘ফুসুদত-আল-বক্বানীয়া’-গ্রন্থে দেখা যায় যে, কোন লোক কাদেরীয়া তরীকা গ্রহণ করতে চাইলে তাঁকে দিনে রোজা রাখতে এবং রাত্রে আল্লাহর উপাসনায় মশগুল থাকতে আদেশ দেওয়া আছে। এই অবস্থায় তাঁকে চল্লিশ দিন থাকতে হয়। এই সময়ে যদি কেউ এসে তাঁকে বলে, “আমি খোদা,” তার উত্তর দিতে হবে যে,—“না, তুমি আল্লাহর মধ্যে।” যদি শিক্ষানবিশের সভ্যতা প্রমাণের জন্মই এই মূর্তি এসে থাকে তবে তা অদৃশ্য হবে যাবে, আর যদি অদৃশ্য না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, তাঁর শিক্ষানবিশীর কাল শেষ হয়েছে এবং তিনি কাদেরীয়া তরীকার আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাবাসত মহকুমার অন্তর্গত বারাসত থানাধীন খামারপাড়া—খাসপুর গ্রামে অবস্থিত পীর হজরত শফীকুল আলম রাজী মহান্তের পীর ছেকু দেওয়ান রাজীব যে দরগাহ আছে, স্থানীয় জনসাধারণ তাকে হজরত আবদুল কাদের জিলানী ওরফে হজবত বড়পীব সাহেবের কাল্পনিক দরগাহ বলে মনে করেন। অবশ্য একই জায়গায় দুই পীবের দরগাহ থাকার কথা গোবমোহন সেন বচিত “হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি শাহ সাহেবের জীবন-চরিতাখ্যান” গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার খুটিয়াবী শরীফে হজবত বড়পীব এবং পীব বড় ঝাঁ গাজীব দরগাহ অবস্থিত আছে। জনসাধারণ খামারপাড়া-খাসপুরের দরগাহের সেবায়ত্ত। প্রতি বৎসর ২১শে মাঘ তারিখে ওরস এবং প্রায় দশ দিনের মেলায় গড়ে হাজার লোকের সমাবেশ হয়। এই দরগাহ সম্পর্কে আবো বিবরণ পীব হজবত শফীকুল আলম রাজী শীর্ষক আলোচনায় প্রদত্ত হয়েছে।

বাবাসত মহকুমার আমডাঙ্গা থানার অন্তর্গত জিবাট নামক গ্রামে হজরত বড়পীব সাহেবের নামে একটি কাল্পনিক দরগাহ আছে। এই দরগাহের বর্তমান (১৯৭০) সেবাযেতের নাম মুহম্মদ ক্যাপাটান শাহজী, পিতা মবহুম

পাহাড় শাহজী। প্রতি বৎসর ২৫শে ফাল্গুন তারিখে ওরস হয় এবং তিন-দিনেব মেলা বসে। এই মেলায় গড় জমাবেত প্রায় তিন-চার শত জন। এখানকার পীরোত্তর জমির পরিমাণ প্রায় দুই বিঘা। পূর্বে এই মেলায় পীরের গান, পুতুল নাচ, রাত্রা প্রভৃতি হত বলে জানা যায়। সেবায়ত্তবা কিছু কিছু অতিথি সংকাব করে থাকেন এবং প্রত্যহ ধূপ-বাতি প্রদান করেন। এখানকার দরগাহে স্বথাবীতি শিবনি, হাজত ও মানত প্রদত্ত হয়ে থাকে।

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত হরিপুৰ গ্রামে হজরত বড়পীর সাহেবেব একটি কাল্লনিক দরগাহ আছে। বর্তমানে ঐ দরগাহেব সেবাবেত হলেন জনসাধারণ। ইতিপূর্বে তার সেবায়ত্ত ছিলেন মরহুম অন্ন ও মরহুম পন্ন নারী দু'জন মুসলমান মহিলা। ঐ দরগাহটি বুড়ীৰ দরগাহ নামেও পরিচিত। দরগাহ সংলগ্ন জমির পরিমাণ প্রায় ২১৩ বিঘা। মাটিৰ দেওয়াল আৰ খডেব চালে প্রস্তুত দরগাহের সামনেব ময়দানে প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমীর দিনে মেলা বসে। মেলা একাধিক দিন চলে—তাতে কয়েক শত লোকের সমাবেশ হয়। ভক্ত সাধারণ এখানে শিরনি, হাজত ও মানত দিবে থাকেন। এখানে প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয়।

হাড়োয়া থানার শঙ্করপুর গ্রামে অবস্থিত বড় পীবের কাল্লনিক দরগাহে প্রতি বৎসর ২৫শে মাঘ তারিখে ওরস হয় এবং একদিনের মেলা বসে। পূর্বে একাধিক দিনেব মেলা বসত। এই দরগাহেব সেবায়ত্ত হলেন মরহুম দু'দু ফকিরের বংশধরগণ। পূর্বে এখানকার মেলা উপলক্ষ্যে ঘোড়-দৌড়েব প্রতিযোগিতা হত। সেবায়ত্তগণ প্রতি সন্ধ্যায় নিম্নমিতভাবে ধূপ-বাতি প্রদান কবেন।

বাড়ুড়িয়া থানাব অন্তর্গত আটলিয়া গ্রামে একটি কাল্লনিক দরগাহ আছে। এই দরগাহ সৃষ্টিৰ একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে। ইতিহাসটি সংক্ষেপে এইকপ :—

আটলিয়া গ্রামে বিশ্বম্ভরপ্রসন্ন দাস নামে কহিদাস সম্প্রদায়েব এক ব্যক্তিব বসতি ছিল। ফুলমতী দাস তাঁৰ পত্নী। সববে ফুল তুলতে গিবে সববে খেতে একবার ফুলমতীৰ ওপৰ নাকি দৈব 'ভব' হয়। তিনি সেখানে শ্রীশ্রীতাবব-নাথেব নামে একটি স্থান নির্দিষ্ট করে পূজা কবাব স্বপ্নাদেশ পান। তিনি সেই আদেশ মতন একটি 'থান' স্থাপন কবে সেখানে পূজা দিতে আরম্ভ



কৰেন। আশ-পাশেৰ অনেক ভক্ত সেই পূজা অনুষ্ঠানে বোগ দিতে থাকেন। কথিত আছে অনেকে সেখানকাৰ ফুল-মাটি ব্যবহাৰ কৰে বোগে নিৰামৰ লাভ কৰেন। ফুলমতীৰ মৃত্যুৰ পৰ তদীৰ পুত্ৰ মঙ্গল দাস সেই থানে ষথারীতি পূজা দিভেন। মঙ্গল দাসেৰ মৃত্যুৰ পৰ তাঁৰ জী জীবিকা নিৰ্বাহ কৰতে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং জীবিকাৰ সন্ধানে নাৰালক সন্তানগণকে নিষে কদ্রপুৰ নামক গ্রামে চলে যান। গ্রাম ত্যাগেৰ পূৰ্বে মঙ্গলেৰ জী সেই জীতীতাবকনাথের স্থানটি দেখাওনা কৰাৰ জন্ত মেসিয়া গ্রাম নিবাসী মোহাম্মদ এলাহি বক্স নামক এক সজ্জন ফকিরেৰ হাতে ভাৰ অৰ্পণ কৰেন। এলাহি বক্স সাহেব সানন্দে সেই দামিছ নিয়ে পৰবৰ্ত্তীকালে তিনি এই 'থান'-কে বড়পীৰ সাহেবেৰ থান বলে প্রচাৰ কৰেন। কালক্ৰমে সেই থানেৰ উপৰ ইটেৰ তৈয়াৰী সোঁৰ নিৰ্মিত হযেছে। এইটিই অধুনা হজবত বড়পীৰ সাহেবেৰ কাল্লনিক দৰগাহ নামে প্রসিদ্ধ।

মোহাম্মদ এলাহি বক্স ফকিরেৰ কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। মোহাম্মদ মেহের আলি নামক পালক পুত্ৰ তাঁৰ উত্তৰাধিকাৰী হন। এই মেহেৰ আলিৰ বাডী ছিল 'বেনা' নামক গ্রামে। মেহের আলিৰ পালক পুত্ৰ হওযাৰ একটি গল্প আছে। লোককথা-পৰ্কে আমবা তাঁৰ উল্লেখ কৰুব।

আটলিয়া গ্রামেৰ কাল্লনিক দৰগাহ-সোঁধটি বৰ্তমানে (১৯৭০) মাত্ৰ তিন শতক জমিৰ উপৰ অবস্থিত। মুহম্মদ মেহেৰ আলি শাহজোঁৰ বংশধৰগণ উক্ত দৰগাহেৰ সেবায়ত্ত কপে বিদ্যমান। তাঁৰা সেখানে প্রত্যহ ধূপ-বাতি দেন। হজবত বড়পীৰেৰ নামে বোগ নিৰামৰেৰ জন্ত তেল, ওষুধ ও কবচ তাঁৰা ভক্ত সাধাৰণেৰ মধ্যে বিতৰণ কৰেন। অবশ্য এজন্ত দাতা নামমাত্ৰ মূল্যও গ্রহণ কৰেন। উক্ত দৰগাহে প্রতি বৎসৰ আটীশে কাৰ্ত্তিক তাৰিখে ওবস এবং পৰে দুই সপ্তাহেৰ মেলা বসে। প্রথম দিনেৰ মেলাৰ প্রথম শিবনি ও হাজত কেবলমাত্ৰ হিন্দু ভক্তগণই প্রদান কৰেন, দ্বিতীয় দিনে শিবনি ও হাজত কেবলমাত্ৰ মুসলমান ভক্তগণ দেন; তৃতীয় দিন থেকে উক্ত নিমমেৰ কোন কঠোৰতা থাকে না। সেই মেলাৰ গড়ে প্রায় পাঁচ হাজাৰ লোকেৰ সমাবেশ হয়। মেলাৰ যাত্ৰখেলা, মাৰ্কাস বসে এবং যাত্ৰাগান হয। নাৰিকেল-বেড়িয়াৰ কচি মণ্ডল পীৰালি গান কৰতেন। কাদপুৰেৰ মাদাব গাইন নিজে গান বচনা কৰে মণিক পীৰ, মাদাব পীৰ ও পীৰ ঠাকুৰবেৰ গান গাইতেন।

ভাছাড়া কাওবালাী গান গাওয়া হত। ভক্তগণ মনোবাসনা পূরণের আশায় দবগাহেব গানে ইট বেঁধে থাকেন।

হজবত বড়পীর সাহেবেব জীবনী ও আশ্চর্য্য কেবামত বিষয়ক কষেকখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

১. মৌলভী আবদুল মজিদ বচিত হজরত বড়পীরের জীবনী।
২. মৌলভী আজহার আলী বচিত গ্রন্থের নাম হজবত বড়পীরের জীবনী ও আশ্চর্য্য কেবামত।
৩. কাজী আশ্বাক আলী বচিত গ্রন্থের নাম গণস উল আজম বা হজবত বড়পীরের জীবনী।
৪. মুনশী জোনাব আলী মরহুম বচিত হজবত বড়পীরের গুণাবলী নামক পুস্তকখানি আমার হস্তগত হয়নি। কৃষ্ণহরি দাস বিবচিত বডসতাপীর ও সন্ধ্যাবতী কতার পুথি নামক কাব্যের কভার পৃষ্ঠায় এই পুস্তকের নামোল্লেখ আছে।

মৌলভী আবদুল মজিদ সাহেবের জীবনী অজ্ঞাত। তাঁর গ্রন্থেব মধ্যে আত্মপরিচয় পাওয়া যায় না। উক্ত গ্রন্থেব প্রকাশকের নাম কমরুদ্দিন আহম্মদ। ভাজমহল বুক ডিপো, ১১ সি, ম্যাকলিওড স্ট্রীট কলিকাতা-১৬ হইতে প্রকাশিত হয়েছিল। মূল্য মাত্র তিন টাকা। ঐ পুস্তকের মূল্যকের নাম বিভূতিভূষণ কবোড়ী। কলোড়ী প্রেস, ২৭ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬।

পুস্তকখানি ৭"×৪½" আকৃতি বিশিষ্ট। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৯। আভাস বা ছুমিকা, সূচাপত্র ও পরিশিষ্ট ব্যতীত বড়পীর সাহেবের জীবনী-অংশ নিম্নলিখিত প্রধান শিরোনামায় বিভক্ত কবা হয়েছে :—

- ১। প্রাথমিক যুগে ইসলাম
- ২। প্রতিক্রিয়া
- ৩। পিতৃ ও মাতৃকুলেব পরিচয়
- ৪। ক্ষমার অল্পত নিদর্শন
- ৫। হজবত বড়পীরের জন্ম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী
- ৬। „ „ বাল্য জীবনের কেবামত

- ৭। বাল্যের শিক্ষা-দীক্ষা।
- ৮। সুদূরের আহ্বান
- ৯। দুর্গম পথের যাত্রী
- ১০। বাগদাদের শিক্ষা-পীঠে
- ১১। বাগদাদে দুর্ভিক্ষ
- ১২। বড়পীর সাহেবের মহানুভবতা।
- ১৩। শিক্ষা ও সাধনা
- ১৪। সাধনা ও সিদ্ধি
- ১৫। শরতানের ধোকা।
- ১৬। হজরত আবু সৈয়দ মোকাদ্দুররমী (বঃ)
- ১৭। কয়েকটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ও হজরতের মধ্যে তাহার প্রতিজ্ঞা,
- ১৮। নূতন কর্মক্ষেত্রের নব পবিবেশ
- ১৯। পথের সন্ধান
- ২০। খলিফার শিরশ্চেদ
- ২১। ভক্তের অব্যক্ত মনোভব অনুসরণ
- ২২। বড়পীর সাহেবের দূর-ভেদী কণ্ঠ
- ২৩। হজরত বড়পীর সাহেবের মুরীদ ও ছাত্রমণ্ডলী
- ২৪। " " " নৈমিত্তিক কর্মসূচী
- ২৫। " " " সুস্ম ও স্বদল দেহধাবণ
- ২৬। মুবিদানের প্রতি হজরত বড়পীর সাহেবের স্নেহ-গমত।
- ২৭। আলি আল্লাদের অবদান
- ২৮। হজরত বড়পীর সাহেবের বিভিন্ন কেবামত
- ২৯। সংসার জীবন ও পবিবাব-পবিজন
- ৩০। ওফাত

মৌলভী আবদুল মজিদ সাহেব পুস্তকখানি আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যে বচনা করেছেন। কিছু কিছু আববী ও ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হলেও গ্রন্থের ভাষা সবল এবং প্রাঞ্জল। গ্রন্থে তাব বচনাকাল লিখিত নেই।

এই গ্রন্থে আল্লাহুতালায অপার মহিমা হজরত বড়পীর সাহেবের মাহাত্ম্যপূর্ণ জীবন-আলেখ্যের মাধ্যমে প্রচাবিত হযেছে। গ্রন্থকার ভূমিকাব একস্থানে লিখেছেন—“বৎসবের পর বৎসর হজরত বড়পীর সাহেব আল্লাব

এবাদতে আহাৰ, নিদ্ৰা, আৰাম, আবেশ ত্যাগ কৰিয়া। যে কঠোৰ কেশ স্বীকাৰ কৰিগাছেন, তাহাতে এই অনিবাৰ্য্য সাফল্যৰ জন্ম, কাহাবও সে প্ৰশ্ন কবিবাবও সুযোগ থাকে না। তাঁহাৰ জীবনই তাঁহাৰ সাফল্যৰ, ঐশ্বৰ্য্যৰ, অলৌকিকত্বৰ স্বাক্ষৰ। আমাদেৰ লেখা পাঠকগণেৰ জীবনে কিছু প্ৰভাব বিস্তাৰ কৰিবা সঠিক পথৰ সন্ধান দিতে পাবিলেও শ্ৰম এবং অৰ্থব্যয় সাৰ্থক মনে কৰিব।”

মৌলবী আজহাৰ আলী সাহেবেৰ নিবাস ছিল খলিসানি নামক গ্ৰামে। তাঁৰ আৰ কোন পৰিচয় পাওবা যায় না। তাঁৰ পুস্তকেৰ নাম হজ্জবত বড়পীৰেৰ জীবনী। মুদ্ৰিত এই পুস্তকেৰ আকৃতি ৭'×৫" এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৬। আভাস ও সূচীপত্ৰ ব্যতীত হজ্জবত বড়পীৰ সাহেবেৰ জীবন-কথা ও তাঁৰ অলৌকিক কীৰ্ত্তিৰ বিবৰণ অনেকগুলি শিৰোনামাৰ বিভক্ত। তাৰ প্ৰথম প্ৰকাশ কৰে হৰেছিল জ্ঞান। যায় না। ত্ৰয়োদশ মুদ্ৰনকাল সন ১৩৭৪ সাল বলে উল্লেখ আছে। তাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ কবিবৰ শেখ হবিবৰ বহমান সাহিত্যবন্ধ সাহেব কৰ্ত্তক সংশোধিত হৰেছিল বলে উল্লেখ আছে। গ্ৰন্থাবল্ডে হজ্জবত মাওলানা শাহ সুফী হাজী মোহাম্মদ আবুবকৰ সাহেব কৰ্ত্তক সমালোচনা প্ৰদত্ত হৰেছে। তিনি এই গ্ৰন্থ প্ৰকাশে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰেছেন। পুস্তকেৰ প্ৰকাশক যদিবা বুক ডিপো। ৯৮, রবীন্দ্ৰ সৰণী, কলিকাতা-১। মূল্য ৩ টাকা ৫০ পয়সা। পুস্তকেৰ শিৰোনামা পৃষ্ঠাৰ লিখিত আছে :—

আউলিয়া শিবোমনি যিনি বড়পীৰ

সন তাঁৰ কথা মত আমীৰ ফকীৰ।

এই গ্ৰন্থে কিছু আববী-কাবসী শব্দ থাকা সত্ত্বেও বেশ সবল ও প্ৰাঞ্জল গদ্যভাষা সুখপাঠ্য হৰেছে। এতে আল্লাহু তা'আলা-মাহাত্ম্য হজ্জবত বড়পীৰ মাহাত্ম্য-কথা প্ৰচাবেৰ মাধ্যমে প্ৰচাৰিত বলে অনুভব কৰা যায়। লেখক আভাসে লিখেছেন,—“ইহা পাঠে পাঠক উপকৃত ও পবিত্ৰ হইলেই শ্ৰম সাৰ্থক জ্ঞান কৰিব।”

কাজী আশৰাক আলীৰ পৰিচয় হুস্তাপ্য। তাঁৰ পুস্তকেৰ নাম গওসউল আজস বা হজ্জবত বড়পীৰেৰ জীবনী। গ্ৰন্থেৰ পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪। মুখবন্ধ, সূচীপত্ৰ ও জীবনী এই তিনিটি প্ৰধান অঙ্গে বিভক্ত। জীবনী অংশ ৮টি

পৰিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্ৰন্থৰ শেষে বড়পীৰ সাহেবেৰ মাহাত্ম্য জ্ঞাপক তিনিটি কবিতা আছে। ইহা কবে প্ৰথম বচিত হৈছিল তা জানা যায় না। চতুৰ্থ সংস্কৰণ খুব সম্ভব ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে প্ৰকাশিত হৈছে। প্ৰকাশক মোঃ নূৰুল ইসলাম 'ওসমানিয়া' লাইব্ৰেৰী, ৩০ নং মদন-মোহন বসু'ন ষ্ট্ৰীট, মেছুয়া বাজাৰ, কলিকাতা-৭। মূল্য ৩ টাকা ৫০ পয়সা।

আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যে বচিত পুস্তকখানি সুবপাঠ্য। কিছু কিছু আবৰী-ফাবৰী শব্দ থাকে। সত্ত্বেও ভাষা বেশ সবল ও প্ৰাঞ্জল। হজবত বড়পীৰ সাহেবেৰ মাহাত্ম্য বিবৃতিৰ মাধ্যমে আল্লাহ-তালাব অসীম মাহাত্ম্যকথা প্ৰচাৰিত হৈছে। মুখবন্ধে লেখক লিখেছেন,—“বাজাবে হজবত বড়পীৰ সাহেবেৰ যে সব জীবনী চল্টি আছে তাহাতে আমৰা লক্ষ্য কৰিবাছি যে, সব সময়ে গ্ৰন্থকাৰ ঐতিহাসিক সত্যতা বক্ষা কৰেন নাই এবং মনগড়া কাহিনী দাৰ। উক্ত পুস্তকগুলি ভৱিষ্য বাখিৰাছেন। ইহা পাঠকদেবকে বিভ্ৰান্ত কৰিবে এই ভবে আমৰা আমাদেব পুস্তকখানি সম্পূৰ্ণ ঐতিহাসিক সত্যতাৰ উপৰ ভিত্তি কৰিবা প্ৰণয়ন কৰিলাম। ইহা পাঠে পাঠক পবিত্ৰ হইবে এবং উপকৃত হইলে আমৰা আমাদেব শ্ৰম সাৰ্থক মনে কৰিব।”

হজবত বড়পীৰ সাহেবেৰ জীৱনকাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী। তাঁৰ জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় কবে প্ৰথম বচিত হৈছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। আনুমানিক বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰথমার্ধৰ পৰা এইকপ জীবনী-গ্ৰন্থ ৱচনাৰ সূত্ৰপাত হৈছে। হজবত বড়পীৰ সাহেবেৰ অলৌকিক কীৰ্ত্তিকলাপ বিষয়ক অসংখ্য লোককথা আছে। তাৰ কথেকটি মাত্ৰ উপবোদ্ধ গ্ৰন্থে লিপিবদ্ধ হৈছে। লোককথাগুলিৰ লিবে'নামাসমূহেৰ একাটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে প্ৰদত্ত হল :—

ক। মৌলভী আবদুল মজিদ সাহেব বিবচিত হজবত বড়পীৰেৰ জীবনী নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ লোককথা সমূহেৰ তালিকা :—

- ১। অনিবাৰ্য্য মৃত্যু হইতে বক্ষা
- ২। তাইগ্ৰীস নদীৰ উপৰ দিয়া পদব্ৰজে ভ্ৰমণ
- ৩। ভোডাবন্দী মুক্ত হইতে বক্তপাত
- ৪। যোজনেৰ পথ নিমেৰে গমন
- ৫। কহানী শক্তিতে ডাকাডাল নিহত

- ৬। হজ্জৰতেব প্ৰাৰ্থনাৰ বৰ্ষণ বন্ধ
  - ৭। " " উদবী বোগেৰ উপশম
  - ৮। মোবায়ক পীৰহানেব ববকত
  - ৯। নিঃসন্তানেব সন্তানলাভ
  - ১০। নিজ সন্তান অপৰকে দান
  - ১১। তাইগ্ৰীসেব বঢ়া প্ৰতিবোধ
  - ১২। কেতাৰ পৰিবৰ্তন
  - ১৩। ছেনেৰ হস্ত হইতে বালিকা উদ্ধাৰ
  - ১৪। ছব ব্যাধিকে দ্বীভূত হইবাব আদেশ
  - ১৫। আৰ একাটি অত্যাশ্চৰ্য্য ঘটনা
  - ১৬। পায়ব। ও কুমীৰ পাখীৰ কাহিনী
- খ। মৌলবী আজহাব আলী প্ৰণীত হজ্জৰত বড়পীৰেৰ জীবনী ও আশ্চৰ্য্য-  
কেবামত গ্ৰন্থে লিপিবদ্ধ লোককথাসমূহেৰ শিবোনাংমা :-
- ১৭। গৰ্ভে থাকিলা ব্যাভ্ৰকপে লম্পট সংহাৰ
  - ১৮। বড়পীৰ সাহেবেৰ নিকট দস্যুদেব দীক্ষাগ্ৰহণ
  - ১৯। ওযাছেৰ সভাৰ জনৈক স্ত্ৰীলোকেৰ কমাল অদৃশ্য
  - ২০। স্বপ্নে হজ্জৰত আবেসা সিদ্ধিকাৰ স্তম্ভহুত্ৰ পান
  - ২১। হজ্জৰত রসুল (দঃ)কে স্বপ্নে দৰ্শন
  - ২২। শূন্তে ভ্ৰমণকাৰী এক সাধুপুৰুষেৰ শাস্তি
  - ২৩। অলী হইবাব নিদৰ্শন
  - ২৪। ভাজ। ডিম হইতে বাচ্চা বাহিৰ
  - ২৫। সৰ্পকপে এক দৈত্যেৰ ইসলাম ধৰ্মগ্ৰহণ
  - ২৬। এক ব্যক্তিৰ জীৱতকাল ইসা নবীৰ আগমনকাল পৰ্য্যন্ত বৰ্দ্ধিত
  - ২৭। চোৰ হল কোভৰ
  - ২৮। বড়পীৰেৰ কুকুৰ কৰ্তৃক তপস্বীৰ ব্যাভ্ৰ সংহাৰ
  - ২৯। খৃষ্টান দৰ্জিৰ ইসলাম গ্ৰহণ
  - ৩০। ইমনবাসী খৃষ্টানেৰ ইসলাম গ্ৰহণ
  - ৩১। বড়পীৰেৰ প্ৰস্তাব দৰ্শনে চাৰি শত ইহুদীৰ ইসলাম গ্ৰহণ
  - ৩২। খৃষ্টান ও মুসলমানেৰ মধ্যে ধৰ্ম সন্ধে তৰ্ক-বিতৰ্ক

- ৩৩। স্বপ্নযোগে ডাকাডের হাত থেকে সওদাগরের উদ্ধার  
 ৩৪। স্বপ্ন নিষ্ক্ষেপে দস্যু সংহার ও সওদাগর বক্ষা  
 ৩৫। বমণীর সতীত্ব বক্ষা  
 ৩৬। বড়পীরের নিকট দোয়া শিখিলা দৈত্যের প্রাণ বধ  
 ৩৭। কুমবী পার্শ্বী কথা ও পার্শ্বাব ডিম  
 ৩৮। স্বর্ণকপী ছেন ( প্রেতাঙ্গা ) হত্যা কবে ভৃত্য বন্দী  
 ৩৯। দৈব কর্তৃক শয়তান প্রহৃত  
 ৪০। নিমজ্জিত তরীর মৃত বরযাত্রী জীবিত  
 ৪১। বড়পীর সাহেবের উপর ছেন জাতির আধিপত্য  
 ৪২। নামের ভাসিবে ছেন ও শারাভিনের কুদৃষ্টি দূর  
 ৪৩। নজ্জদের বাদশাহ শান্তিভোগ  
 ৪৪। পীর শেখ ছানয়ান (বঃ)-এর তুর্ভোগ  
 ৪৫। " " " সুবা পানে ব্যস্ত  
 ৪৬। নামের গুনে বালকের বোগ মুক্তি  
 ৪৭। বাগদাদ শহরের কলেব। বিনাশ  
 ৪৮। জনৈক জ্বীলোকের মৃত সাত সভান পুনর্জীবিত  
 ৪৯। মোরগ খাইয়া পুনরায় তাহার জীবনদান  
 ৫০। পৃষ্ঠে পৃষ্ঠ ঘর্ষণে পুত্রলাভ  
 ৫১। হজবত সাহাবুদ্দীনের জীবন বৃত্তান্ত  
 ৫২। বিশ জন জ্বীলোকের পুরুষ অস্ত্র প্রাপ্তি  
 ৫৩। জনৈক ব্যক্তিকে সাধুত্ব প্রদান  
 ৫৪। খোদাভক্ত প্রেমোন্মত্ত সাধুপুরুষ  
 ৫৫। ফকিবী কাডিয়া লওয়া  
 ৫৬। মঈনুদ্দিন চিশ্তি ও বক্তাব্বার কাকীর সামান্য বিবরণ  
 ৫৭। বাগদাদের বাদশাকে স্বর্ণীর্ণ ফল ভক্ষণ করিতে দান  
 ৫৮। স্বর্ণমোহর বস্ত্রময়  
 ৫৯। বড়পীরের দান-বস্ত্র পঞ্চাশ বছরেও অপরিবর্তিত  
 ৬০। শয়তানের চাতুরী  
 ৬১। একদিনে সতেরো স্থানে একতাব  
 ৬২। শুষ্ক বৃক্ষে ফল

- ৬৩। এবাণত ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ
- ৬৪। জল-জন্তুগণকে শুণ্ডতন্তু শিক্ষাদান
- ৬৫। বড়পীর সাহেবেব আরবী প্রার্থনা
- ৬৬। ধ্যানযোগে খোদা দর্শন
- ৬৭। বড়পীর সাহেবেব দিকে সকলের অন্তঃকরণ
- ৬৮। বড়পীরেব হাথলি মজহাব ত্যাগেব ইচ্ছা
- ৬৯। হাথলি এমামের জিন্নারত
- ৭০। বড়পীরের সহিত এমাম আবু হানিফার সাক্ষাতকার
- ৭১। বৃক্ষ হইতে আলোক প্রদান
- ৭২। মদিনার বসুলেব সমাধি জিন্নারত
- ৭৩। দোজখে পাখীদেব শান্তি দর্শন
- ৭৪। পীরভক্ত হিন্দুব শব মশানে পুড়িল না
- ৭৫। মহর্ষি নিজামুদ্দীনেব মশারেখ নাম প্রাপ্তি
- ৭৬। সভার হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর আগমন
- ৭৭। সাধুদিগের কক্ষে পীব-পদ স্থাপন
- ৭৮। জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার প্রবচন
- ৭৯। গুনেব ব্যাখ্যা
- ৮০। পৃথিবীর চাতুরী
- ৮১। বড়পীরেব পরিচ্ছদের বিবরণ
- ৮২। " আহাধোব বিবরণ
- ৮৩। " তপস্তাব বিবরণ
- ৮৪। মনকেব নকির বন্দী
- ৮৫। কবর হইতে উঠিয়া তিনশত জনকে মুবিদ কবণ
- ৮৬। মহাপাপীর উদ্ধাব
- ৮৭। শুণ্ডবিদ্যা বিনষ্ট
- ৮৮। নবাবেব নবাবী নষ্ট
- ৮৯। শিশুকালে রোজা
- ৯০। দৈববাণী

উক্ত গ্রন্থের প্রায় সমগ্র রচনাই হজরত বড়পীর সাহেবেব অলৌকিক কীর্তি-কথার পূর্ণ। তার মধ্য থেকে বিশেষ করেকটি উল্লেখ করা হয়েছে।



কাজী আশরাফ আলী সাহেব ঐণীত পুস্তকে লিখিত অনুরূপ বিশেষ লোককথাগুলির শিবোনামা এখানে প্রদত্ত হল। তবে যে লোককথা অতীত পুস্তকে আছে সেগুলির আর পুনরুল্লেখ কথা হল না। বলা বাহুল্য, লোক-কথাগুলি বারংবার বলাতেও মূল বক্তব্যের কোন পার্থক্য না থাকাই বাঞ্ছনীয়, —কিন্তু সকলে সর্বত্র এ নিয়ম মেনে চলেন না। এখানে আমরা মূল বক্তব্য অপরিবর্তিত আছে বলেই ধরে নিয়েছি।

৯১। বড়পীর সাহেবের মজলিসে অদৃশ্য আত্মার আগমন

৯২। পবিত্র কদম ওলীর গ্রীবাদেশে

৯৩। অসাধাবণ বাগ্মী

৯৪। বিজ্ঞান ও তৎকালীন প্রভাব

৯৫। বুদ্ধ বাদ্যকবেব সদৃশতা লাভ

৯৬। আল্লাহুর রহমত ধাবা

৯৭। নির্ভীক প্রতিবাদ

৯৮। কুচক্রী শয়তান

৯৯। শেষ পবিণাম

১০০। অপূর্ব ক্ষমা

১০১। আগামী মাসের সংবাদাদি

১০২। নামাজ পাঠ

১০৩। খলিফাব অভ্যাচার লক্ষ অর্থ

১০৪। এক ব্যক্তির সত্য ঘটনা বর্ণনা

১০৫। আজীবনের খাদ্য

১০৬। একটি চিলেব কাহিনী

১০৭। অভূত শিক্ষাদান

১০৮। অজ্ঞাত বহুস্তোদধাটন

১০৯। হাজীর সৌভাগ্য লাভ

১১০। তুর্কদিগের লিখন পবিবর্তন

১১১। জন্মান্ত ও স্বপ্ন বালকের আরোগ্যলাভ

১১২। একদল শিশুর শিক্ষিত গ্রহণ

১১৩। কামেল যুবকের ক্ষমা প্রাপ্তি

১১৪। সাধু ব্যক্তিদের বস্তুতা স্বীকার

- ১১৫। দববেশেৰ দুৰ্গতি
- ১১৬। অধিক ৰাজিৰ বিন্ধকৰ ঘটনা
- ১১৭। বস্তাব স্রোতেৰ অভ্যুত কীৰ্ত্তি
- ১১৮। কবুতবেৰ কথায় দিব্যজ্ঞান লাভ
- ১১৯। অসঙ্গত দাবীদাবিৰেৰ মৃত্যু
- ১২০। জীনেৰ ইসলাম ধৰ্মগ্রহণ
- ১২১। লাঠি হইতে আলো বিচ্ছুৰণ
- ১২২। দাৰ্শনিক মূৰকেৰ ধৰ্মপথে আগমন
- ১২৩। হাবসী বৃদ্ধাব সহিত বড়পৌৰেৰ সাংস্কাৰ
- ১২৪। খাদেমের দুৰ্গতি
- ১২৫। বিন্দা ব্যতীত কোন মহৎ কাৰ্য্যই হ'ল না
- ১২৬। বহুলোকের প্রাণ বক্ষা
- ১২৭। মূৰিকেৰ শাস্তি
- ১২৮। দানশীলতার নিদৰ্শন
- ১২৯। পাঠ্য জীবনের একটি ঘটনা
- ১৩০। বৃদ্ধাব ক্লেশ লাঘব
- ১৩১। এক ব্যক্তির পুত্ৰ লাভ
- ১৩২। বাদশাব শান্তিভোগ
- ১৩৩। ভূত্যেৰ কাহিনী

বসিবহাট মহকুমাৰ বাদ্ৰিহা থানাৰ অন্তৰ্গত আটলিৰা গ্রামে হজ্বৰত বড়পৌৰ সাহেবেৰ ধৰ্ম কাল্পনিক দবগাহ আছে তাৰ উৎপত্তি এবং দবগাহেৰ সেবাস্থেত ফকিৰ বংশেৰ উৎপত্তি বিষয়ক লোককথা সেই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। দবগাহ উৎপত্তিৰ কথা ইতিপূৰ্বেই বলা হ'বেছে। এখানে দ্বিতীয় লোককথাটি লিপিবদ্ধ কৰা হ'ল।

ক। আটলিৰাব ফকিৰ বংশেৰ উৎপত্তি :—

বালক মেছেৰ আলি। কি এক কঠিন বোগে সে আক্রান্ত হ'বেছে। বাঁচাব কোন আশা নেই। কত বৈদ্য কত ডাক্তাৰ দেখানো হ'বেছে, কিন্তু কিছুতেই আবোগ্য হ'ব নি। মেছেৰ আলিৰ বাডী 'বেনা' নামক গ্রামে। তাৰ ষাশত চেঁচাঁতেও ব্যৰ্থ হ'বে পাগলিনীৰ দ্বাৰা বেনা থেকে মৃত্যুত মৃত্যুত একদিন এসে হাজিৰ হলেন আটলিৰা গ্রামে এবং

হজরত বড়পীর সাহেবের দরগাহের সেবায়ত ফকির এলাহি বস্ত্র-ব-শরণাপন্ন হলেন। অপুত্রক ফকিরের নিকট তিনি পুত্র সমর্পন করে বল্লেন,—“হে ফকির। এই পুত্র আমি তোমাকে দান করুলাম। তুমি এর জীবন দান কর।”

ফকির এলাহি বস্ত্র, হজরত বড়পীর সাহেবের ‘দোস্তান’ মেহের আলির জীবন রক্ষা কবতে সমর্থ হলেন। মেহের আলি সেই সময় থেকে চিরতরে আটলিয়ার ফকির সাহেবের নিকট রয়ে গেলেন। নিঃসন্তান ফকির সাহেবের মৃত্যুর পর উক্ত দরগাহের সেবা-ভার মেহের আলির হাতে আপনা-আপনিই এসে যায়। আটলিয়ার ফকির বংশ উপবোদ্ধ মেহের আলি ফকিরের বংশধর। তাঁরা আজিও (১৯৭১) হজরত বড়পীর সাহেবের দরগাহে সেবায়ত নিযুক্ত আছেন।

হজরত বড়পীর সাহেবের কাল্পনিক দরগাহে হিন্দু-মুসলমান সকল ভক্ত শিরনি, হাজত ও মানত প্রদান করেন। সহস্র সহস্র ভক্ত এখান থেকে তেল, ঘুস ও কবচ ব্যবহার করে বহু দুবারোগ্য ব্যাধি থেকে নিরাময় লাভ করেন বলে শোনা যায়। এখানে হিন্দু আদর্শে পাঁচু ঠাকুর বা ষষ্ঠীদেবীর মন্দিরে ইট বেঁধে সন্তানলাভ করার মতন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। মুসলমানী আদর্শে ওরসের সময় কাওসালী ও ইসলামী ধর্ম সজ্জীত গাইবাব নিয়ম প্রচলিত। তাছাড়া মানিক পীর, মাদাব পীর প্রভৃতি পীরের গান; বাজা, সার্কাস; মৌরগ বা খাসী হাজত দান, দুধ-ফল-মিষ্টি দান প্রভৃতি আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

## বিংশ পরিচ্ছেদ

### বাবন গাঁও

পীর হজবত বাবুব আলী মোল্লা ওবকে বাবন পীৰ চব্বিশ পরগণা জেলার বিশেষভাবে দক্ষিণ-অঞ্চলের প্রসিদ্ধ পীর। ভান্ডড থানার অন্তর্গত বাজার-আটি নামক গ্রামে এক কৃষকের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম-তারিখ অজ্ঞাত। উপবাস্ত থানাদীন শাঁকসহব (সাকুসার) নামক গ্রামে তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। সেখানে প্রতি বছর ওরস উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে এবং প্রায় দশ বাব দিন ব্যাপী মেলা বসে। মেলাটি প্রায় এক শত বছরের প্রাচীন। এখানে ওরস উপলক্ষে যে মেলা পৌষ সংক্রান্তিতে উদ্‌যাপিত হয়, তাতে প্রায় দশ-বারো হাজার নবনারীর সমাগম হয়। এই থানেই তাঁর দরগাহ আছে। তাঁর মৃত্যু-তাবিখও অজ্ঞাত।

বাল্যকাল থেকে তিনি ধর্মপরাশ্রয় ছিলেন। একবার মানিকগাঁও নাকি তাঁকে বোগ নিবাসনকারী মন্ত্রপুত তেল বিভবণের আদেশ দেন। সেই আদেশ অনুসারে তিনি রোগ নিবাসনের জন্য সাধাবণকে মন্ত্রপুত তেল দিতে আরম্ভ করেন এবং এতদ্ অঞ্চলে পবিচিতি লাভ করেন। তিনি প্রায় পৌনে একশত বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁর প্রভাব উক্ত চব্বিশ পরগণা জেলাতেও পবিব্যাপ্ত।

বারাসত মহকুমার দেগঙ্গা থানাদীন দিগবেড়িয়া-মাদবপুৰ নামক গ্রামে বাবন পীরের নামে একটি নজগাহ আছে। এখানকার পীরবাস্তব জমির পবিমাণ প্রায় তিন বিঘা। জমির উপর একশাশে একটি বিশাল অস্থখ গাহ। সেই গাছের নীচে উক্ত নজবগাহ অবস্থিত। নজবগাহটি ইটেব তৈরী। ভক্তগণ সেখানে নিম্নমিত ধূপ-বাতি দিবে থাকেন। পূর্বে মোহাম্মদ মাসেম সবদাব এবং পরে মোহাম্মদ শীতল মণ্ডল প্রমুখ এবে ব্রহ্মণাবেক্ষণের ভাব প্রাপ্ত হন। এখানে প্রতি বৎসর ২২শে পৌষ তাবিখে ৮বস আবস্ত হয় এবং তিন দিন ধবে তা চলে। এই মেলায় গড়ে প্রায় চার হাজার ভক্তের সমাবেশ হয়। সে সময়ে ভক্তগণ এখানে হাজত, মানত ও শিবনি দিবে থাকেন। ভক্তিভাবে এখান

থেকে ভক্তগণ তেল ব্যবহার করে নাকি নানারকম ব্যাধি থেকে মুক্ত হন। ইঙ্গিত ফল লাভের আশায় অনেকে নজবগাহের গায়ে ইট বাঁধেন, কেউ বা সেখানে লুট দিলে থাকেন। মেলায় সময় ফকিবগণ মানিক-স্মীরের গান গেয়ে থাকেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁর ভক্ত।

বাবন পীরের নামে রচিত কিছু কিছু গান পাওয়া যায়। ভাঙ্গড় থানাব-অন্তর্গত মহম্মদ ফরিম মোল্লা (গ্রাম—মরিচা, বয়স ৩২) এবং মোহাম্মদ আবদুল মোল্লা (গ্রাম—বডালী, বয়স ২২) এক জনসমাবেশে গেয়েছিলেন (সাপ্তাহিক সত্যপ্রকাশ, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮/১৬-৫-১৯৭১) :-

সাকসাবেতে এলেন ছজুর বাবন মোল্লা নুরানী।

কর সেজদা কর সেজদা ওহে মুরিদানী।

সাকসারের এই মাটি পবিত্র হল ভাই

আমাদের ভাগ্যগুণে।

আল্লা ও বহুল সাহাতে ভবা

এলেন তিনি এইখানে।

এলেন মোদের দয়ালগুণ মুকিল-আসানী

বিপদ-নাশিনী।

কব সেজদা কর সেজদা ওগো ও মুরিদানী।

বাবুর মোল্লা মোদের হৃদয়মণি

বাবুর মোল্লা মোদের পবনমণি,

উজির নাজির কোথায় ভাই

কোথায় খোদা কোন কাবার,

সমুদ্র চুম্লে সজ্জদ হয়

পচা ব্যাধি আসান হয়,

সে যে মোদের বাবাব দয়াল।

গাজ্জাতন কাওযালে বলে হে জগদান,

গুরু ধরে দেখো ভাই হও আগুয়ান।

সীব খোদা নাহি জুদা কহে কোবাণ

কর সেজদা কব সেজদা হে মুরিদান।

বাবন পীৰ ছিলেন পীৰ মোবারক বডৰ্খা গাজীৰ সমসাময়িক। একটি কাহিনীতে আছে যে পীৰ মোবারক বডৰ্খা গাজীৰ পিতা চন্দন সা, ঢাকার বাদসাব নিকট থেকে বেলে-আদমপুরেৰ একটি জঙ্গলের পাট্টা পেয়ে সেই স্থানে আসেন এবং সেখানকার “বাবন মোল্লা” নামক এক ব্যক্তির উৎসাহে আবাদ করেন। বাবন মোল্লা তখন চন্দন সা’ৰ বাগাখানার উজিরের পদে নিযুক্ত হ’বে কাজ করেন।৩৮

পীর মোবারক বডৰ্খা গাজীর সজ্জানে মৃত্যুব ম্হাব বাবন পীৰেবও সজ্জানে মৃত্যু হয়েছিল। এ সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদটি এইরূপ :—

ফকির বাবন মোল্লাৰ একটি পোষা খাশী ছাগল ছিল। খাশীৰ নধর চেহারা দেখে গ্রামের ছেলেদের খুব লোভ হয়। ফকির ভো তাঁর সংসারের একমাত্র লোক। সুতরাং তাঁৰ মৃত্যুব পৰ যাতে ‘খানা’টি ফসকে না যায় তাঁর জগ্ন ছেলেবা আদ্যাব ধবুল—বৈঁচে থাকতে থাকতে তাদেবকে মরনোত্তর ‘খানা’ খাওযাতে হ’বে।

ফকির বল্লেন—“ভন্ন নেই মৃত্যুব পৰে আমি তোমাদেবকে নিশ্চয়ই ‘খানা’ খাওযাব। আমার কথা মিথ্যা হ’বে না।”

ছেলেবা কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস কবল না। অগত্যা ফকির সেই ‘খানা’ খাওযাবাৰ দিন-ক্ষণ ঠিক ক’বে দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে ধুমধাম করে ছেলেবা ভাত-ভরকাবী বাস। করুল,—সেই সঙ্গে ফকিরেব সেই নধর খাশীৰ মাংসও। ফকির বল্লেন,—“আমি ঘ’বে বইলাম। খানা শেষ ক’বে তবে আমাকে ডাক্বে, তাঁর আগে নথ, আমার এই কথাটি ভোমবা মান্বে।”

ছেলেরা তাতে বাজী হল। ফকির তখন অঙ্কু করে যথাবীতি নামাজ কব্লেন এবং সকলেব অজ্ঞাতসাবে ঘ’বেব মধ্যে গিয়ে চাপ্বে আপাদ-মস্তক ঢেকে শয়ন কব্লেন।

মহানন্দে গ্রামেব ছেলেবা ফকিরেব নধর খাশীৰ মাংসাদি দিয়ে ভোজন পৰ্ব সমাধান করুল। অতঃপৰ তাঁৰ। পূৰ্ব কথাযত এসে ডাকডাকি কব্তে লাগল ফকির বাবন মোল্লাকে। ফকিরেব কোন সাড়া পাওযা গেল না। অবশেষে তাঁরা কুটীৰে প্রবেশ করে ফকিরকে ডেকেও কোন সাড়া পেল না।

ঢাকা-দেওরা চাদর সরিয়ে তারা বিন্ময়ে দেখল ফকির অনেক আগেই  
এশুকাল করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পূজা-পার্বণ (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে আব একটি কিংবদন্তী  
লিখিত আছে। সেটি এইরূপ :—

বাবন পীরের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে কলিকাতাবাসী জনৈক ব্যক্তি তেলপড়া  
সংগ্রহের জন্য তাঁর বাড়ীর উদ্দেশ্যে আসেন। ঐ ব্যক্তি বাবন  
পীরের মৃত্যু-সংবাদ জানতেন না। পথে বাবন পীর তাঁর বৃদ্ধ ফকিরের  
বেশে দেখা দিলে তাঁর কবর স্থানের নিকট তেলপাত্র বেধে প্রার্থনা  
জানাতে উপদেশ দেন এবং পরে ঐ তেল ব্যবহার করতে বলেন।

---

## একবিংশ পরিচ্ছেদ

### মসনদ আলী

দক্ষিণ-পূর্ব মেদিনীপুরেব হিজলী অঞ্চলের যোদ্ধা গীব মসনদ আলি যুদ্ধে নিহত কোন বীর সৈনিক নন। তাঁর ঐতিহাসিক নাম তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চলে হিজলীতে তিনি বাজত্ব করতেন। ধর্মপ্রাণ ও উদার বাজা ছিলেন বলে তিনি গীবরূপে সকলের পূজা পান।

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে মুনশী শেখ বিসমিল্লা সাহিবের লেখা কাঁসী ইতিহাসেব (পাণ্ডুলিপিব) বিবরণ-বস্তব বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কবে লিখেছেন,—

“বাংলাদেশে হুসেন শাহেব বাজত্বকালে উড়িষ্যাব সীমান্তে সমুদ্রের তীরে চণ্ডীভেটি মোজার মনসুব ভূঞা নামে একজন ক্ষমতাশালী মুসলমান জমিদার বাস করতেন। তাঁর দুই পুত্র ছিল—জামাল এবং বহমত। জামাল ছিলেন বিষম-বুদ্ধি সম্পন্ন এবং বহমৎ কুস্তী, শিকার ইত্যাদি নিষে সমগ্র কাটাতে। লোকের কুপারামর্শে বহমতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবে জামাল তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন। জামাল-পত্নী এই ষড়যন্ত্রের কথা বহমতের কাছে প্রকাশ কবে দেন। বহমত শুভগড় পরগণাব সমুদ্রতীরেব অবগ্য-সঙ্কল দীঘল পল্লীতে উপস্থিত হন। সেখানে বাঘ-সিংহাদি হিংস্র বন্যজন্তু বিনাশ কবে তিনি সেই দীঘল পল্লীতে বাস করতে থাকেন এবং পাঁচশত দীঘলকে লাঠিগাল কবে গড়ে তোলেন। দীঘলদেব সাহায্যেই তিনি অবগ্যেব বতকাংশ বাসোপযোগী ও আবাদযোগ্য কবে ঘরবাড়ী তৈরী করেন। এই সময় চাঁদখাঁ নামক এক বণিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বাণিজ্য-স্বাত্রাপথে চাঁদখাঁর সজীব পানীর জল সংগ্রহেব জন্তু হিজলীতে অবতরণ করেন। চাঁদখাঁর কাছ থেকে কিছু ধন লাভ করে তিনি হিজলীেব অবগ্য হাশিল কবে জনপদ স্থাপন করেন এবং একটি দুর্গও নির্মাণ করেন আশ্রয়স্কার জন্ত। ভীমসেন মহাপাত্র তাঁর কর্মচাৰী নিযুক্ত হন। ক্রমে শক্তি ও লোকবল সঞ্চয় কবে তিনি ভোগরাই,



পটীশপুবেব কতকাংশ, অমর্শি, ভুঞামূঠা, সুজামূঠা প্রভৃতি অঞ্চল দখল কবেন। এই স্থানে প্রচুর হিজলগাছ ছিল বলে, তিনি স্থানটির নামকরণ কবেন হিজলী। ভীমসেন মহাপাত্র, দ্বাবকা দাস ও দিবাকর পাণ্ডা—এই কর্মচাষীদের পরামর্শে রহমৎ বাদশাহেব কাছে থেকে জমিদারী সনদ গ্রহণ কর্তে উদ্যোগী হলেন। বাকর খাঁ তখন উড়িষ্যার সুবাদার। রহমৎ তাঁর সঙ্গে দেখা কবে সনদ পান এবং ইখতিয়ার খাঁ উপাধি গ্রহণ কবেন। ইখতিয়ার খাঁর পুত্র দাউদ খাঁ পরে হিজলীর অধিপতি হন। দাউদ খাঁর বহু পুত্র সন্তানের মধ্যে তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা একজন।

আদিনাথ গুরু মংগোল ও স্থানীয় বোদ্ধা পীর মসনদ আলি মিলিত হয়ে মহন্দলী বা মোছবা পীবে পবিত্র হয়েছেন।<sup>৪২</sup>

এখানে আদি নাথ গুরু মংগোল প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

হিজলী অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে মহন্দলীর যে গীত প্রচলিত আছে, তাতে অমিত বিক্রম সিকন্দরের ভাই তাজ খাঁ-ই মসনদ-ই-আলারূপে বর্ণিত হয়েছেন। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকাল বলা যায়।

মসনদ-ই-আলা উপাধি শাঠান আমলের উপাধি। এর অর্থ “স্বাব আসন উচ্চ।” মোগল যুগে তাজ খাঁর নামের সঙ্গে এই উপাধি তাঁর গুণগ্রাহীরা ব্যবহার কবতেন। তাঁর ধর্মপ্রাণতা ও উদারতার কথা আজো হিজলী অঞ্চলের সর্বসাধারণের মুখে মুখে শোনা যায়। আবার শোনা যায়, পটীশপুবেব বিখ্যাত পীর মখদুম শাহেব কাছে দীক্ষা নিয়ে মসনদ-ই-আলা ফকিরি ধর্ম গ্রহণ কবেন। হিজলীর মসজিদ স্থাপন কবে তাজ খাঁ তার সেবা-কার্যের জন্য সেবায়তকে প্রয়োজনীয় জমি লাখেবাজ দান কবেছিলেন। তাঁদের অনেকে আজো সেই লাখেবাজ ভোগ কবেছেন।<sup>৪৩</sup>

মহন্দলী পীরের মাহাত্ম্যকথা কবেকটি পুস্তিকার প্রকাশিত হবোছে। হিজলীর মসনদ-ই-আলা গ্রন্থে মহেন্দ্রনাথ কবণ লিখেছেন যে, মসনদ-ই-আলার গীত বচসিতা জয়নুদ্দিন বা জৈন-উদ্দিনের কোন পবিত্র জ্ঞানবাব উপাধ নেই। এই গীতটি প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে নন্দিগ্রাম স্থানীয় অন্তর্গত জনৈক অধিবাসী কর্তৃক ‘মসন্দলীর গীত’ নামে মুদ্রিত

হয়েছিল। তাতে প্রকাশকের কল্পনা, হবি সাউ-এব কত্থার নাম 'কপবতী' স্থলে 'সত্যবতী'তে পরিবর্তিত করা হয়েছিল। পরে নন্দিগ্রাম থানার অন্তর্গত শেখ বসিরউদ্দিন নামক জনৈক গ্রাম্য কবি সেই গীত রূপান্তরিত করে 'মহন্দলী পুথি' নামক মুসলমানি পুথির আকারে প্রকাশ করেন।<sup>১০</sup>

মহেন্দ্রনাথ করণ, গায়ক ককিরগণের নিকট শুনে অবিকলভাবে 'মহন্দলীর' যে গীত তাঁর পুস্তকে সন্নিবেশিত কবেছেন, তার সংক্ষিপ্ত কাহিনী নিম্নকপ :-

সমুদ্র-বেষ্টিত হিজলীর বাদশাহ্ বাবা মহন্দলী। সেখানে বসেছে নুতন বাজার। কুলাপাড়ার ভেলী হবি সাউ খবর পেয়ে প্রস্তুত হল সেখানে শাবার জন্ম। আশা প্রচুর বেচা-কেনা হবে।

হবি সাউ-এব কত্থা কপবতীর খুব সাধ হিজলীর বাজার দেখতে যায়। সে বাবার কাছে বায়না ধরুল। বাপের মানা সে শুনল না, পিছনে পিছনে চলল। তাকে 'তত্তে বসি মহন্দলী দেখিবারে পার'।

পীর তাব নাম জিজ্ঞাসা করল, জানতে চাইল তাব সাখীর পরিচয়। পরিচয় পেয়ে পীর তাকে বাজারের পূর্বদিকে দোকান বসাতে অনুমতি দিলেন। হবি সাউ দোকান খুলল। পীর বললেন,—

এতদিন মোব বাজার অন্ধকার ছিল,  
হবি সাউ-এব বেটি এসে কবিষাছে আলো।

ভাই সেকেন্দার, পীরের আদেশ মত কামাল ও জামাল নামক দুই জমাদারকে সঙ্গে নিয়ে হবি সাউ-এব নিকট গিয়ে বলল—'তোমাবে লইয়া মাব বাদশাহ হজুরে।'

হবি সাউ দ্বঃখিত হল। কপবতীই যে এর কারণ সে বুঝতে পারল। এবার বুঝি তাব জাত-বুল যায়। হবি সাউ চলল হজুর-সমীপে, সাথে চলল কত্থা কপবতী।

পীর খুসী হয়ে কপবতীকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে হবি সাউ জাতি যাওয়ার আশঙ্কায় দ্বিধাচিন্তা হল। পীর বললেন,—

.. তোব জাতি নাহি যাবে,  
যবনেবে বিভা দিলে আগে জাতি পাবে।

কপবতীর সহিত পীর মহম্মদলীর বিবাহ হল। হবি সাউ পেল প্রচুব ঢাকা। রাধু সাউ ভা দেখে হবি সাউকে নিন্দা কবল।

ধনশালী হবে হবি সাউ প্রতিবেশী সাতশ' তেলীর কাছে নিমন্ত্রণ পাঠালো, কিন্তু প্রতিবেশীগণ সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবল না। হরি সাউ সে ঘটনা মহম্মদলী পীরের গোচরে আনল। পীর বললেন ;—

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন তুমি বসুই করিবে,  
সাত দিনের পচা ভাত তেলীবে খাওমাব,  
তবে তো বাদশাহী কবি হিজলী বলাব।

আহাবেব সামগ্রী পীরের নির্দেশ মত প্রস্তুত হল। মিন্না আশী হাজার বাথ সৈন্য নিষে অভিমান কবলেন। ভাবা ঘিরে ফেলল তেলী পাড়া। বাধু সাউ, হুকু সাউ পডল বাঘের কবলে। মাড়িয়া, ষোদ্ধা, নাগেশ্বর প্রভৃতি নামধারী বাঘের দৌবায়ে ভীত হবে হবি সাউ-এর প্রতিবেশী তেলীগণ আত্মসমর্পণ কবল। ভাবা হবি সাউকে মাঝখানে বসিয়ে আপন আপন বাড়ী থেকে আনা পায়ে মুষ্টি মুষ্টি পাস্তা ভাত আহাব করল।

হবি সাউ জাতি ফিরে পেল। মসন্দলী পীর তখন বাথ সৈন্যসহ প্রত্যাবর্তন করলেন।

মসনদ-ই-আলাব গীত বচয়িতা জয়নুদ্দিনের ভণিতা এইরূপ :—

বন্দি বাবা মসন্দলী না কবিও বাম।  
কদমেতে লিখে বাথ অভাগাব নাম ॥  
আমি জানি তোমাবে আমাবে জানে কে।  
মবিন্না না মবে তোমাব নাম জপে যে ॥

গীতের শেষে আছে :—

পীরের কদম তলে মজ্জাইয়া চিত।  
গাহেন জয়নুদ্দী কবি মসন্দলীর গীত ॥

মহেন্দ্রনাথ কবণও লিখেছেন যে জয়নুদ্দিন কোনও পবিচর জানবাব উপাধ নেই।

জয়নুদ্দি যে কাহিনী পবিবেশন কবেছেন তা সহজ বোধ্য। কিছু কিছু ফাবসী শব্দ থাক। সত্ত্বেও পাঁচালীর ভাবা বেশ প্রাঞ্জল। স্বল্প সংখ্যক চবিত্রে

মূল গল্পটি সন্নিবেশিত হয়েছে। মসনদালী পীবেব মাহাস্ম্য প্রকাশের মধ্যে তৎকালীন রাজা বাদশাহেব কি অসাধারণ প্রভাব ছিল তাব প্রকৃষ্ট পরিচয় এতে পাওয়া যায়।

১৯৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হিজলীর মসনদ-ই আলা বা মসনদ-আলী গীত নামে একখানি পুস্তিকা (পঞ্চম সংস্করণ) পাওয়া গেছে। পুস্তিকাব বচনিতা শ্রীঅবন্তী কুমার মণ্ডল। প্রকাশক শ্রীবাজেন্দ্র প্রসাদ পাত্র। সাং ও পোঃ সফিাবাদ, কাঁথি, মেদিনীপুর। মূল্য ২৫ পবসা। লাইসেন্স নং ১০৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২। মোট ২৪২ পংক্তিতে রচিত।

কবি কর্তৃক বিবৃত মূল কাহিনী জরনুদ্দি বচিত পাঁচালীব কাহিনীর অনুরূপ। বাবো পংক্তি পর্যন্ত পীবেব বন্দনা, তাবপব বিষাক্তিশ পংক্তি পর্যন্ত পীবেব অলৌকিক শক্তি পবিচারক ক্ষুদ্র কাহিনীতে বলা হয়েছে,—

যেখ শূন্য আকাশ দেখে মাঝি চলেছে মাঝদরিয়া বধে। পীবেব খেলালে অকস্মাৎ মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ, উঠল প্রচণ্ড ঝড়। মাঝি বিপদ বুঝে শরণ নিল বাবা মসনদ আলীব। তখন পীবেব ইচ্ছায় নিমেষে নির্মল হল আকাশ। পীবেব নির্দেশে মাঝি পবদিন তাঁব কাছে গিয়ে হাজিব কবল শিবনি।

সেই হেতু দূর দেশে যবে যায় তরী।

পীবেব শিরনি হেতু আগে বাঁবে কডি।

পাঁচালিকার ফাবসী শব্দ সব বাদ দিয়েছেন। মূল ভাব অবিকল বেখে ভাষায় আবো সরলতা দান কবেছেন। মাঝে মাঝে কবিত্ব প্রকাশের প্রচেষ্টা লক্ষ্য কবা যায়। এক স্থানের বর্ণনা এইরূপ :—

গজরাজ গতি কত পশ্চাতে চলিল।

আহা কিবা শোভা কবে নীল নভঃতলে।

স্থানু ত্যজি বিধু বুঝি নেমেছে ভূতলে।

মসনদ আলীর গীত সমাপ্ত কবে পাঁচালীকাব গাইলেন,—

এই গ্রন্থেবা পড়ে সকাল ও সন্ধ্যায়।

বাগ-শোক দুবে যায় আল্লাব দোয়ায়।

পীবেব চরণ তলে মজাইয়া চিত।

অথম পামব-গাহে মসনদ আলীব গীত।

পাঁচালীর শেষাংশে গিবে তিনি আর একটি ক্ষুদ্র কাহিনীতে বিবৃত করেছেন—কেন হিন্দু-মুসলমান সকলে পীরকে ভক্তি করে। তিনি লিখেছেন—হরি সাউ-এব কত্তাব বিবাহের পব কিছু কাল অতিবাহিত হলে দেখা গেল কোন হিন্দু আর হিজলী বাজাবে আসে না। সবেজমিনে কারণ জানবাব জগু পীর স্বয়ং এক ডিক্কুকের পোষাকে দ্বাবে দ্বাবে ডিক্কা করে ফিবতে লাগলেন। দৈবাৎ একস্থানে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনে তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলেন। ব্যাপারখানা এই—

জনৈক হিন্দুবালা মিঠাপানি আনতে গেলে মগদস্যুরা তাকে হরণ করে নিয়ে যায়। সংগে সংগে ‘বে বে বে বে’ ধ্বনি শুঠে। দূবে দাঁড়িয়ে পীর তা অবলোকন করে ভীষণ ভাবে মগ দস্যুদের উপর ক্রুদ্ধ হন। তাঁর অলৌকিক শক্তিতে মগ দস্যুগণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। তখন সেই কত্তা পানি-ভরা কলস নিয়ে খবে ফিবে আসে।

সেইদিন হৈতে পীর পুৰী মাঝখান

খিল দিয়া কপাটেতে হইল অন্তর্ধান ॥

সিদ্ধিগুণে সিদ্ধ পুরুষ হৈল সিদ্ধিদাতা।

মুসলমানে বলে পীর হিন্দুবা দেবতা ॥

মহম্মদী পীর পাঁচালীতে রায় মজল বা গাজি-কালু-চম্পাবতী কাব্যের প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হয়। বিশেষ ভাবে বন্দনা, কাহিনী ও উপসংহারে সাদৃশ্য আছে। তাছাড়া বাঘ সৈন্য সমাবেশ, বাঘগণের নামের তালিকা প্রভৃতি ঐ সব কাব্য ছাড়াও একদিল শাহ কাব্যের সঙ্গে তুলনীয়।

প্রত্যক্ষভাবে মহম্মদী পীরের কাহিনী পীর মসনদ আলীর মাহাত্ম্যকথা হলেও পর্বোক্তভাবে তা ইসলাম ধর্ম প্রচার সহায়ক। বস্তুতঃ পীর মসনদ আলীর অসাধারণ প্রভাব হিন্দুগণকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। অবশী কুমার মণ্ডলের পাঁচালীর শেষাংশ তাই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পীর মহম্মদীর প্রতি হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ প্রদত্ত শিবনি প্রদান হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয় বা পীর সংস্কৃতি অনুসরণের অস্বতম দৃষ্টান্ত।

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

### মাদার গীৰ

মাদার গীৰ বা মাদার শাহেব প্রকৃত নাম গীৰ হজরত বদিউদ্দীন শাহ মাদার। ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে সিরিষায় তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম আবু ইসহাক সামী। কথিত আছে যে, তিনি হজরত মুসা'র ভাই হজরত হাকনেব বংশধর। তিনি এমন সুন্দর ছিলেন যে তাঁকে দেখলে লোক বিচলিত হৃদয়ে ভুলুপ্ত হত। তাই তিনি বোরখায় মুখ আবৃত করে চলাফেরা করতেন। আখবাব-উল-আখইয়ারেব লেখক শেখ আব্দুল হক দেহলভীর মতে মাদার শাহ বারে! বছর পর্যন্ত অনাহারে এবং একবস্ত্রে আধ্যাত্মিক সাধনার মসগল ছিলেন।

মাদার গীৰ গুজবাট, আজমীর, কনোজ, কান্দী, জোনপুর, লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন। শূণ্য পুৰাণে উল্লিখিত দমদাম [বা দমুদামাব] শব্দ থেকে আধুনিক পণ্ডিতের কেহ কেহ মনে করেন যে মাদার গীৰ বঙ্গদেশেও এসেছিলেন।

মাদার গীৰ সুফী তবীকাত্তর অগ্রতম বিভাগ মদারীয়া তবীকাত্তর প্রবর্তক। সম্ভবতঃ তিনি বঙ্গদেশে আগমন করার পর এদেশে তাঁর তবীকাত্তর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। উক্তববঙ্গে “মাদারের বাঁশতোলা” নামক একটি অনুষ্ঠান আড়ম্বরের সহিত পালিত হয়। বিভিন্ন দবগাহেব পুকুরের মাছ বা কচ্ছপ মাদারীকালে এখনও সম্মান পায়। ডঃ এনামুল হক প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর, চট্টগ্রাম জেলার মাদারবাড়ী এবং মাদারিশ। ইত্যাদি এলাকা মাদার গোবের স্মৃতি বহন করছে। ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কানপুর জেলার মকনপুরে (জোনপুরের সুসতান ইব্রাহীম শর্কীর রাজত্বকালে) প্রায় একশত বিশ বছর বয়সে এতকাল করেন।

[ সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ : শেখ শবফুদ্দীনের প্রবন্ধ ]

উক্ত চব্বিশ পরগণা জেলার বাবাসত মহকুমার অন্তর্গত “শাসন” নামক গ্রামের হাটখোলায় মাদার গীৰের একটি কল্পিত দবগাহ আছে। প্রায় তিন

বিষা পীরোত্তর জমির একস্থানে পাঁচিল-বেষ্টিত দবগাহটি ইটের তৈরী। সমাধির উপরে একটি অশ্বখ গাছ আছে। সেবারেতেব নাম ভুলু মন্তল ও মোহাম্মদ মুজিদ আলি। তাঁরা প্রত্যহ সন্ধ্যায় সেখানে ভক্তিবশে ধূপ-বাতি দেন। স্থানীয় জনৈক পরিতোষ পাল উক্ত দবগাহেব এক অংশ পাকা কবে দেন। হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ মাদাব পীরেব দবগাহে শিরনি দেন, মোবগ হাজত দেন এবং ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি মানত দেন। দবগাহ-সীমার মধ্যে জনৈক ফকিরের সমাধি আছে। উক্ত জনসাধারণ তাঁকেও শ্রদ্ধা নিবেদন কবেন ধূপ-বাতি জালিয়ে। তিনি নাকি মাদার পীরের নাম কবে কলেবা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী থেকে গ্রামকে রক্ষা করতেন। পীরেব দরগাহে প্রতি বৎসব অগ্রহায়ণ মাসে বিশেষ অনুষ্ঠান “মিলাদ” হয়।

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত হরিপুর নামক গ্রামেও মাদার শাহের একটি কল্লিত দবগাহ আছে বলে শোনা যায়। দরগাহ স্থানটি বাব্বা এবং নানা গাছে ভর্তি। সেখানকার সেবারেতেব নাম মহম্মদ পাগল গাজী, পিতা মরহুম রহমান গাজী। মতান্তবে মোসাম্মৎ আতুবী বিবি, স্বামী মহম্মদ তাহের। এখানে শিবনি, হাজত, মানত এবং ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয়। তবে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান অধুনা (১৯৭০) হব না। তা ছাড়া বসিরহাট মহকুমার মালঞ্চ নামক গ্রামেও একটি কল্লিত দরগাহ আছে।

মাদাব পীর বা শাহ মাদারেব এক আকর্ষণীয় কাহিনীর কথা জানা যাব : ডঃ মুক্‌দার সেন বচিত ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য’ নামক গ্রন্থে। শাহ মাদারেব সে কাহিনী সংগ্রহ করে ১৩১৭ সালে লিখেছেন ছান্নাদ আলী খোন্দকার। ডঃ সেন সংক্ষেপে সেই কাহিনীর বিবরণ এইভাবে দিয়েছেন :—

আল্লাহ প্রিয় ফেরেস্তা ছিল হাকত আর মাকত। এবা “মত কিছু ভেদ কথা ভাল আর বুবা” আল্লাব দরগায় নিবেদন কবত। একদা এদেব খেয়াল হল, আদম ও হাওয়ার সম্পর্ক কেমন জানতে। এ কোঁড়হলেব প্রশ্ন দিতে আল্লা তাদেরকে নিষেধ করলেন। তাবা আবদাব ছাড়লো না। অবশেষে আল্লাব করমানে ফেবেস্তা দু’জন আশমান থেকে জমিনে পড়ল।

হাকত হইল মবদ মাকত আওবত

দুই জনা জক খছম হইল খুবছুবত।

আওবত মরদের যেমন বেভাব পুসিদার

সেইকপ বেভার করেন দু জনার।

আল্লাৰ হুকুমে মাকুতৰ গৰ্ভ হল কিন্তু তা যোচন আৰ হয় না। তাৰা,  
মুকিলে পড়ে আল্লাৰ নাম কৰে গডাগডি দিতে দিতে কাঁদতে লাগল।

খাৱাৰ হইনু মোৰা আপনাৰ দোষেতে  
দোজখে পড়িৱ। মোদেৰ হইল জলিতে।

তখন আল্লাৰ দয়া হল।

মগবৰেৰ ওস্তে হুকুম হৈল ফেৰেস্তায়  
আচ্চা কৰে বান্ধ কসে মজবুত দোহাৱ।  
তামাম মুছল্লিগণ নামাজ পড়িলে  
সেই ওস্তে বান্ধিবে সে বসি দিয়া গলে।  
মজবুত কবিয়া জিজিৰ হাতে পায়ে দিবে  
তুইজনে একসাতে মডৰা কৰিবে।

বাঁধবাৰ হুকুম শুনে ভৰে মাকুতৰ গৰ্ভপাত হল। নবজাত শিশুকৈ নিৱে  
মাদাৰ গাহেৰ তলাৰ ফেলে রেখে হাকত ও মাকুত গায়েৰ হল।

হজৱত আলী শিকাৱে এসে গাহতলাৰ ৰূপবান ছেলেটিকে পেলেন। তিনি  
তাকে নিৱে গিৰে বিবি ফাতেমাকে মানুষ করতে দিলেন। মাদাৰ তলাৰ  
কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে বলে তাৰ নাম হল মাদাৰ দেওয়ান বা শাহু মাদাৰ।

মাদাৰ শাহেৰ পাঁচ সাত বছৰ বয়স হল। তিনি বাখাল বালকগণেৰ  
সাথে খেলা কৰে বেডান। একদিন বাখাল ছেলেৰা বল্ল যে সেদিন  
বডপীবেৰ শিৰ্ণি হবে। মাদাৰ জিজ্ঞাসা কবলেন যে, বডপীৰ কে। বাখাল  
ছেলেৰা বল্লে,—তাৰ নাম কবতে নেই।

লেণা মায়ে নাম গৰ্দ্দান জুদা যে হইবে।

মাদাৰ, বডপীবেৰ কাছে গিৰে বল্লেন ;—এস, তুমি বড় কি আমি  
বড় পৰীক্ষা হোক।

আচ্চা ভাই এইখানে সিরনি রাখিৱা  
আমরা তকবির কৰি একত্রে মিলিৱ।  
সন্ত একবাৰ তুমি কব মোৰ সাথে  
হাবিলে গৰ্দ্দান জুদা নাহি হবে তাতে।



বড়পীর বললেন ;—

বেশ কি কাম করিবে তুমি বল বোকাইয়া ।  
মাদার বলেন ভাই লুকোচুরি খেল  
বোঝা যাবে এইবার হইলে কামেল ।

বড়পীরের আগে লুকোবাব পালা ।

বড়পীর আখেরেতে আজিজ হইয়া  
নজর হইতে কোথা গেল ছেপাইয়া ।  
দরিয়াতে মাছের যে আগুার ভিতরে  
কুসুমের ভিতরেতে ছেপায় জহরে ।

মাদার ধ্যানে জেনে বড়পীরকে ধরে কেলালেন । তারপর মাদাবের  
পালা । মাদার চোখের সামনে হাওয়াল মিলিয়ে গিয়ে বড়পীরের স্বাসে ঢুকে  
গেলেন । পাহাড়-পর্বত অনুসন্ধান করে মাদাবের সন্ধান না পেয়ে বড়পীর  
বললেন ;—

হাবিনু তোমার কাছে কোথা আছ বল ।

অশরীরী মাদার বললেন,—

হাওয়া ভবে ছেপাইনু নিঃশ্বাস টানিতে  
হাওয়াল সামিলে আছি তোমাব দমেতে ।

তারপর বড়পীরের মুর্দ্ধা ভেদ কবে মাদার বাইবে এলেন ।

আখেরেতে নস্তুক হৈতে খেচিয়া উঠিল  
আজ তক সেই জালগা খালি যে বহিল ।  
ছেবের মর্দ্বিখানে যাকে ব্রহ্মভালু বলে  
দেখিবে খেয়াল করে বলিনু সকলে ।  
লাডকাব মালুম হয় হাড নাই ভায়  
ধুকধুক করে সেথা সদা সর্বদায় ।

খোঁচিয়ে উঠিল মাদার ব্রহ্মভালু হৈতে  
দন মাদাব বলিয়া নাম রহিল হুনিয়াতে ।  
দমেতে খেচিয়া মাদার দন মাদাব হৈল  
কালে কালে সেই নাম জাহের রহিল ।

লুকোচুরি খেলার বড়পীর হেবে গেলে মাদার বললেন,—

আচ্ছা ভাই এই তক হাসেল কালাম  
বগড়া মিটিয়ে সিন্নি কব হে তোমার।  
না পাকিতে যে জন নাম লইবে তোমার  
গবদানের পশম এক কাটিবে তাহার।

কবি বলেছেন যে, এই থেকে দুনিয়াতে লুকোচুরি খেলার চল হল।

লাডকার। আজ তক খেলে লুকোচুরি  
লাডকার মজলেছে ভাই আছে ত আসুরি।

একদিন বাড়ীর বাইবে মাদার খেলা করছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে  
দেপেলের বিকটাকাব সমদুতকে (মালেকল মওত)। মাদার তাকে নাস্তানাবুদ  
করে এক মুতের জান কেড়ে নিলেন। মালেকল মওত শুখন জীবরিলের  
কাছে গিলে মাদারের অভ্যাচারের কথা জানানলেন। জীবরিল এবাবে  
এজবাকিলকে পাঠালেন মাদারের কাছে তাকে বুঝিয়ে বলতে।

তবস্থ যাইবে তুমি না কবিরে হেলা  
বুঝাইয়া বলিবে তুমি বসিয়া নিরালা।

এজবাকিল ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে আল্লাহের নিকট নিবেদন করলেন।  
শুখন মেকাইল ফেরেশতাকে পাঠানো হল। তাঁকে দেখে মাদার আশুনের  
মত জ্বলে উঠে বললেন,—

যাও যাও মেকাইল না শুনিব কথা  
তোমার কি ধার ধারি কাম নাহি হেথা।  
ছামনেতে নাহি কহো বলিনু তোমারে  
যাহার লিখেছি জান সে বুঝিবে মোবে।

তারপর গেলেন আজবাইল। তাঁর দৌত্যও ব্যর্থ হল। তাবপরে গেলেন  
বিবি ফাতেমা, দুই ইমাম যথাক্রমে হাসান ও হোসেন, হজরত আলী ও  
হজরত নবী।

তাবপরে আইল দেখ আপনি ছোবহান।

তখন মাদার তাঁর মনের সংশয় আল্লাকে জানানলেন,—

আবদুল্লা আমিনা কেন দোজখ মাঝাবে।

আল্লা মাদারকে তত্ত্বকথা শোনাতে লাগলেন,—

এক এক করিয়া কত বোঝার খোদায়  
কিস্তিত বুঝিল মাদাব বসিয়া তথায় ।  
মাদার বুঝিয়া তখন খামস হইয়া  
জান লিয়া দিল তখন হাতেতে মুপিয়া ।  
দুই হাত জুড়ে করে আরজ হুজুবে  
বডই করেছি গোনা নাহি চিনে তোরে ।

আল্লা খুশী হয়ে বললেন,—

তোমার কথাষ জেদ বাহাল বাখিরে,  
গোনাগার বান্দ। সবে খালাছ করিয়া,  
আবহুলা আমেন। বাকী যেবা যত আছে  
উন্মত্তের মধ্যে গোনা যে জন কবেছে,  
সকলকে মাফ দিলাম তোমার কথায়  
বেহেস্তে দাখিল আমি করিব নিশ্চয় ।

এই কাহিনীর বর্ণনা অনুযায়ী বোঝা যায়,—মাদার পুরুষও নন,  
স্ত্রীও নন ।

না মরদ আছে না আওরাতের নেসানি ।

মাদারের আহাং নেই, মিলাও নেই । তিনি জিন্দা শাহ-মাদার, ‘দমের  
মাদার ।’]

মাদার পীরের এই কাহিনী সাধারণ মানুষের নিকট খুব আকর্ষণীয় ।  
দুই পীরের ক্ষমতার লড়াই, জেষ্ঠ্যের লড়াই এমন কি স্বয়ং আল্লাহতালার  
সঙ্গে জেদের দৃঢ়তার কথা উৎসাহ-বাহক বটে । এমন চিত্তাকর্ষক কাহিনী  
রসালো করে গ্রামের সাধারণ মানুষের নিকট আকর্ষণ (১৯৭২) পরিবেশিত  
হয় । গ্রামে এইকপ পীরের গানকে ‘মাদার পীরের গান’ বলে । মূল গায়ক  
ছাড়া এতে দুই তিন জন দোহার থাকে । একজন হাবমোনিয়ম, একজন  
ঢোলক, একজন খঞ্জনি বা জুড়ী বাজায় । এই দলে হিন্দু মুসলিম সকলেই  
থাকে । মূল গায়কের পরনে আলখাল্লা, মাথায় টুপী, পাশে নূপুর এবং  
হাতে হাত ঘুঙ্গুর ও চামর থাকে । তিনি নেচে এবং বিভিন্ন ভঙ্গীমায় অনেক  
কথা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে দর্শকগণের মধ্যে বসোৎসাহ সৃষ্টি

কবেন। গানের বন্দনায় হিন্দুৰ দেব-দেবীগণের কথাও উল্লিখিত হয়, মাঝে মাঝে অগ্ন্যস্ত পীরগণের মাহাত্ম্য-কথাও এসে পড়ে। এমন কি জামা সংগীতের মূর এবং কিছু কিছু কথাও ব্যবহৃত হয়।

মাদার পীৰের নামে কিছু লোক কথা প্রচলিত। তাদের মধ্যকার একটা চিত্তাকর্ষক লোক-কথা সংক্ষেপে এইরূপ :—

বসিরহাট মহকুমার মালঞ্চ গ্রামের সাধাবণ ভক্তগণ জনৈক মৌলভী সাহেবের পবামর্শে পীৰ মাদার শাহের প্রতি কোন এক প্রকারে অসম্মান প্রদর্শন করেন। পরের ঘটনা এই যে, মালঞ্চ গ্রামের পার্শ্ববর্তী নদীর তীরে ভীত আকারে ভাঙন দেখা দেয়। শেষে উক্ত গ্রামের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। গ্রামের অধিবাসীগণ এই বিপদের কাবণ অনুসন্ধান করে নাকি সিদ্ধান্তে আসেন যে মাদার পীরের দরগাহে মথাবীতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা দরকার এবং তা করলেই বিপদ থেকে মুক্তি পূর্ণাঙ্গা যাবে। গ্রামবাসী মিলিতভাবে উৎসাহের সহিত পীরের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শুরু করেন। ফলে পরবর্তীকালে গ্রামের ভাঙা অংশ পূরণ হয়ে যায়।

-----

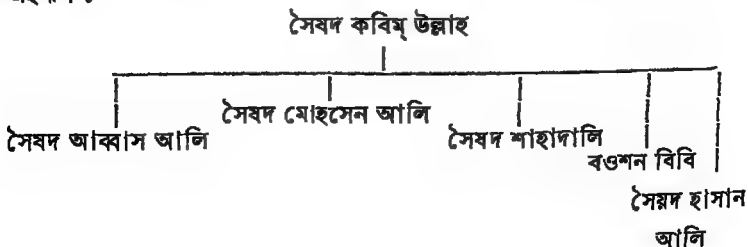
## ত্ৰয়োবিংশ পৰিচ্ছেদ

### বংশ বিবি

হজ্জবত সৈয়দা জয়নাৰ খাতুন ওবকে বংশন বিবি, আৰবেৰ মক্কা নিবাসী হজ্জবত সৈয়দ কবিম উল্লাহেৰ একমাত্ৰ কন্যা। তাঁৰ মাতাৰ নাম বিবি মাৰমুন। সিদ্ধিকা। ৪০ মতান্তৰে মেহেবনেস। ১২৪ তিনি বালাঙাৰ পীৰ হজ্জবত গোৱাচাঁদ বাজীৰ কনিষ্ঠা সহোদৰ। তিনি তাঁৰ অগ্ৰতম সহোদৰ সৈয়দ শাহাদালিৰ সহিত ভাবভবৰ্ষে ইসলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ্থে আগমন কৰেছিলেন। বসিৰহাট মহকুমাৰ বাধুডিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত তাবাণ্ডনিয়া নামক গ্ৰামে ইহামতী নদীৰ পশ্চিম তীৰে তাঁৰ সমাধি আছে। এতদ অঞ্চলে তিনি বংশনাৰ নামেও প্ৰসিদ্ধ। স্থানীয় জনসাধাৰণ তাঁকে বংশন বিবি নামে অভিহিত কৰেন। ৪০

বংশন বিবিৰ মক্কাৰ জন্ম হয় ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে এবং চৌষটি বৎসৰ বয়সে ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে এদেশেই তাঁৰ মৃত্যু হয়। ৩২

তিনি চিৰকুমাৰী ছিলেন। কাবো মতে তিতু মিঞাৰ পূৰ্ব পুৰুষ সৈয়দ সাদাউল্লাহ সজ্জ গোৱা গাজি নিজ ভগিনী বোশন বিবিৰ বিবাহ দিবেছিলেন। ৫ তিনি হজ্জবত সৈয়দ শাহ কবীৰ বাজীৰ মূবিদ ও খলিফাহ হজ্জবত সৈয়দ শাহ হাসান বাজীৰ নিকট বাল্লাত গ্ৰহণ কৰেছিলেন। হজ্জবত শাহ কবীৰ বাজীৰ আদেশে হজ্জবত সৈয়দ শাহ হাসান যখন ভাৰতবৰ্ষে আগমন কৰেন তখন তিনশত ষাট জনেৰ সেই কাফেলাৰ অগ্ৰতম হিসাবে তিনিও এদেশে আগমন কৰেছিলেন। তাঁৰ বংশ পৰিচয় সংক্ষেপে এইৰূপ :-



বংশন বিবির ভক্তগণ ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তাঁর সমাধির উপর এক সুবম্য দবগাহগৃহ নির্মাণ করেছেন। সেই দবগাহেব শবিকদার সেবাযেতগণ প্রতিদিন পালাক্রমে দবগাহ-প্রাক্তণ পরিক্কাব-পবিচ্ছন্ন কবে সমাধির উপর ধূপ-বাতি প্রদান করেন। তাঁর ভক্তগণ কখন কখন মানত হিসাবে বংশন বিবির দবগাহে ফুল, ফল, বাতাসা প্রভৃতি দিবে থাকেন। অনেকে এখানে বনভোজনের স্রাষ সাময়িক আনন্দ-উৎসব কবে থাকেন। কেহ বা হাজত, শিবনি এবং মানত দিবে থাকেন। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসেব কৃষ্ণপক্ষেব জ্যৈষ্ঠদশমীতে ওবস উপলক্ষে দশ-বাৰো দিন ধরে বিবাট মেলা দবগাহ প্রাক্তণে অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় লক্ষাধিক লোকেব সমাগম হয়। মেলায় ব্যাণ্ড-পাৰ্টি বাজনা বাজায়, বাজি পোড়ানো হয়, কাওলালী গায়কগণ এসে গান করেন।

উক্ত দবগাহেব বৰ্তমান ( ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে ) বৰোজ্যেষ্ঠ সেবাযেতের নাম সোকব আলি। তাঁর জন্ম তাবিখ বাংলা ১২৬৬ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ, অৰ্থাৎ তাঁর এখনকার বয়স একশত দশ বৎসর। তিনি বলেন, বাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাঘ নাকি পীবানী বংশনাবাব নামে তিনশত পঁয়ষাট বিঘা জমি পীবোত্তব দান কবেছিলেন। তাব মধ্যকার সামান্য অংশ খাদিমদাবগণেব তত্ত্বাবধানে ববেছে।

প্রতি বছর বাবোই ফাল্গুন তাবিখে হাডোলায় পীব গোবাচাঁদেব দবগাহে ওবসেব সমবে যে অনুষ্ঠান হয়, সেই সমসাময়িককালে তাবাণুনিষাব এই দবগাহেও মেলা বসে। হাডোলায় ওবসেব পব সেখানকার খাদিমদাব কর্তৃক এই স্থানে ফুলেব মালা, মিষ্ট দ্রব্যাদি প্রেবিত হয়। দবগাহে আবোধনাব পব পূতবাৰি ও ফলাদি ভক্তগণেব মধ্যে বিতব্রিত হয়। বহু বমনী সন্তান লাভেব আশায় মানত কবে দবগাহের গাষে ইট ব্দুলিষে বাখেন।

প্রথমে আবোশোল্লাহ গ্রামেব চাঁদ মণ্ডল দবগাহেব খডেব চালেব বদলে কবোগেটেব চাল কবে দেন। মাণ্ডবতি-তাবাণুনিষাব পীবজান মোল্লা সাহেব বৰ্তমানেব সুবম্য দবগাহ-গৃহটি নির্মাণ কবে দিষেছিলেন।

বংশন বিবির নামে বচিত কোন সাহিত্যেব সন্ধান পাওয়া যায় না। আব্দুল গফ্ফর সিদ্দিকী সাহেব, বঙ্গীয় সাহিত্য পবিসদ পত্রিকাৰ যথাক্রমে বাংলা ১৩২৩ এবং ১৩২৫ বর্ষ সংখ্যাৰ দুইটি প্রবন্ধ তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন।

তাছাড়া “তারাগুনিয়া” গ্রাম নিবাসী রাখালদাস নাগ মহাশয় যে পত্র লিখেছিলেন, তা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বাংলা ১৩২৫ বর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া আর কোন স্থানে তাঁর সম্পর্কে কোন লেখা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় নি।

আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেব তাঁর পুঁথি পবিচিতি গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বলে যে ‘গোল রঙশন বিবির পুঁথি’ নামক পুস্তকের উল্লেখ কবেছেন সেই ‘বঙশন বিবি’ ও আমাদের আলোচ্য বঙশন বিবি একই ব্যক্তি কিনা তা জানা যায় নি। আপাততঃ পুস্তকখানি আমাদের হস্তগত হয় নি বলে সে আলোচনা এখানে অসমাপ্ত রইল।

রঙশন বিবির জন্মকাল ১২৭৯ খৃষ্টাব্দ এবং মৃত্যুকাল ১৩৪২ খৃষ্টাব্দ। পীর গোরাচাঁদের জন্মকাল ১২৯২/৯৩ খৃষ্টাব্দ। প্রথমে পীর গোবাচাঁদ ও পরে আবেদা রঙশনারা এদেশে ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। তবে এদেশে জাভা-গুণীবা মঠে সাক্ষাতকাব হইবেছিল কিনা তাঁর কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কেহ বলেন,—“পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সৈয়দ হুসেন শাহ গোড়ের বাদশাহ হলেন। গোবাগাজী বা পীর গোবাচাঁদ, হিজলীবা মুসলমান সেনাপতির পুত্র।...ইছামতী তীরে তাবাগুনিয়া গ্রামে ভিত্তিমিঞার পূর্বপুরুষ সৈয়দ সাদাউল্লাহ নিকট আশ্রয় নিয়ে সে রাজ্য বক্ষা পান। পরে গোবাগাজী উক্ত সাদাউল্লাহ ফকিরের সহিত নিজ ভগিনী রোশন বিবির বিবাহ দিবেছিলেন।” [কুশদহ পত্রিকা : ১৩১৮ : ৩য় বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : পৃষ্ঠা ১১১]

কেহ বলেছেন,—সৈয়দ নিসার আলি ওরফে ভিত্তুমীর ছিলেন পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজীর একজিংশ অধঃস্তন পুরুষ। ৫৬

উপবোধ মত সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য পবিলক্ষিত হয় না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার বাংলা স্বথাক্রমে ১৩২৩ ও ১৩২৫ সালের সংখ্যায় আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব যে দুইটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাব প্রতিবাদে তাবাগুনিয়া নিবাসী রাখাল দাস নাগ মহাশয় একটি পত্র লিখেছিলেন এবং সে পত্র বাংলা ১৩২৫ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাব উত্তবে আব্দুল গফুর সাহেব লিখেছিলেন,—“মৌলভী সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ কবীর সাহেবের লিখিত বিখ্যাত ‘ভাঙ্গ কেবাতল কেবাম’ এবং ‘তাবিখ খেলাফায়ে আরব ও ইসলাম’ নামক পারস্য ভাষার লিখিত দুইখানি ঐতিহাসিক পুস্তক

থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে লিখেছি।” এই উত্তরটিও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বাংলা ১৩২৫ সালে প্রকাশিত হইবেছিল। বলা বাহুল্য, এই জবাবের উপর প্রত্যুত্তরে কোন লেখা প্রকাশিত হয় নি।

ভাবাঙনিয়া অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি লোককথা আছে। সেগুলি এইরূপ :—

### ১। বিচারকের রায়

বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানাবীন শ্রীরামপুর নামক গ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ হবিব রহমান মণ্ডল (৪০) আজ (১৯৬৯) থেকে বহু দশক পূর্বে এক মিথ্যা খুনের মামলার জড়িয়ে পড়েন। মামলার গতি ববাবব তাঁর বিরুদ্ধে চলল। আলিপুর সদরে মামলা শেষ পর্য্যন্ত এমন পর্য্যায়ের এসে গেল যাতে তাঁর অবশ্য শাস্তি পেতে হবে। তাঁর উকিল অনেক দিন ভরসা দিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এক দিন এমন অবস্থায় এলেন যাতে তিনিও হতাশ হয়ে বললেন,—“মামলার রায়ের কি হবে বলা শক্ত। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, দেখি কতদূর কি হয়। তুমি তোমার মতন যথাসাধ্য প্রার্থনাদি কবে এসো।” অর্থাৎ সে মামলার তাঁর দণ্ড হওয়ারই কথা।

হবিব রহমান এতে হতাশ্বাস হয়ে আত্মীয় পরিজনদের নিকট শেষ সাক্ষাত কবাব জন্ম মনস্থ করলেন। তাঁর আত্মীয় পরিজনদের একজনের বাড়ী বাবার পথে একদিন তিনি ইছামতী নদী-তীরস্থ বগশন বিবির দবগাহেব সামনে এসে হাজির হন। বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায়, নদীর জল ছোঁয়া ঠাণ্ডা হাওয়ায়, দাঁড়িয়ে বগশন বিবির দবগাহের দিকে তাকিয়ে তাঁর যেন ভাবান্তর এল। জননীর্ভ নির্ভর স্নেহ স্পর্শ তাঁর সর্ব্বাঙ্গে যেন মুহূর্ত্তেব শিহরণ জাগিয়ে গেল। তিনি অশ্রুট স্ববে দীর্ঘশ্বাসের সংগে আপন মনে বলে উঠলেন—“মা।” আন্তে আন্তে তাঁর সর্ব্বাঙ্গে যেন নেমে এল এক গভীর প্রশান্তি। তিনি বগশন বিবির দবগাহে মানত করলেন,—“আমি যদি এই মামলা থেকে বেহাই পাই, তোমার দবগাহে আমি প্রাণ ভবে মানত দেব।”

কয়েকদিনের মধ্যে মামলাব দিন এসে গেল। খানা খেবে তিনি বিদায় নিলেন বাড়ীর সকলের কাছ থেকে। কি জানি যদি মামলায় মুক্তি না ঘটে। বিদায় নিয়ে তিনি একমাত্র স্মরণ করতে লাগলেন বগশন বিবির নাম।



আলিপুরের আদালত প্রাক্ষণে অগ্ন্যস্ত্র লোক ছাড়া কয়েকজন আত্মীয় স্বজনও উপস্থিত হয়েছিলেন। সকলে “বিচাবকেব বায়” শুনবার জন্য রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করছিল। অবশেষে বিচাবপতি বার দিলেন যাতে হবিবর বহমান হলেন বে-কসুব খালাস। সকলে হাসি মুখে আদালত গৃহ থেকে বাইরে এলেন। হবিবর বহমান বললেন যে বওশন বিবিব দোয়ায় বিচাবপতির বায় বদল হয়েছে,—তাঁর বে-কসুব খালাস পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

উপস্থিত জনতা তখন বওশন বিবিব নামে ধন্য ধন্য কঁবে উঠল। হবিবর বহমান নিজে বার বার বওশন বিবিব নাম উচ্চারণ করতে করতে কপালে হাত ঠেঁকাতে লাগলেন।

## ২। দিবসে তাঁরকা দর্শন

বওশন বিবি তাঁর ভাই হজবত হাসান বাজীর সঙ্গে এদেশে অজ্ঞাত সাধকগণের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে ঘুরতে অনেকদিন অতিবাহিত হল। অবশেষে এগিরে এল তাঁর শেষ দিন। তিনি সাথীদের জানালেন যে, তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ইচ্ছা অমুয়ারী যেন সমাধি প্রদান করা হয়। তাঁর বাসনা এই যে, যে স্থান থেকে তাঁর সাধীগণ দিনের বেলায় তাঁরকা দেখতে পাবে, সেইখানেই যেন তাঁর মৃতদেহকে কবর দেওয়া হয়।

প্রবাদ এই যে বওশন বিবিব মৃত্যুর পর তাঁর সাধীগণ নাকি তাঁর নির্দেশমত ‘তাঁরাগনিয়া’ গ্রামের যে স্থান থেকে দিনের বেলায় তাঁরকা দেখতে পেয়েছিলেন, সেইখানেই তাঁর মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়েছিল। বওশন বিবিব দবগাহ-স্থানই সেই নির্দিষ্ট স্থান।

## ৩। ভাই-ভগিনী সাক্ষাতকার

বহু বৎসর পূর্বেই পীর হজবত গোরাচাঁদ বাজী ও আবেদা বওশনাবা মৃত্যুবরণ করেছেন। তবুও বৎসরের কোন কোন সময়ে নাকি উক্ত ভাই ভগিনী মধ্য সাক্ষাতকার ঘটে। বিশেষ বিশেষ সময়ে পীর গোবাচাঁদ নিজেই বওশন বিবিব দবগাহে আসেন এবং উভয়ের মধ্যে কথোপকথন চলে। স্থানীয় কোন কোন ব্যক্তি নাকি কয়েক বছর পূর্বেও গভীর বাত্রে কথোপকথনের আওরাজ শুনিয়েছিলেন।

পীবানী হজরত 'বগশন বিবি' দবগাহে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ ভক্তিমুখে শিবনি, হাজত ও মানত দিয়ে থাকেন। দবগাহ হতে ওবসেব পর হিন্দুসংস্কারেব আন্ন পূত বাবি অর্থাৎ দুধ-পানি ভক্তগণ গ্রহণ কবেন। যষ্টী ঠাকুবেব বা কালী মন্দিবে যেমন বমনীগণ সন্তান লাভেব আশান্ন ইট বাঁধেন, বগশন বিবি দবগাহেও অনুকপ ইট বাঁধবাব প্রথা প্রচলিত আছে। মুসলমান সংস্কার অনুযায়ী সেখানে শিবনি, হাজত ও মানত দেওরা হয় এবং ধূপ-বাতি তো প্রদত্ত হয়ই। দবগাহেব প্রবেশ স্বাবে কোথাও জবিব কাগজে মোড়া বেলের কাঠ, কোথাও বা তৃতীয়াব চাঁদ-বেষ্টিত তারকার ছাপ।

চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে জ্যৈষ্ঠদশীতে যে দীর্ঘ দিনের মেলা বসে সেই সময়ে 'দবগাহের' উত্তর সীমান্ন অবস্থিত কালীমন্দিবে পূজাও হয়। তার জন্তও বহু লোকেব সমাগম হয়। এই সময়ে হিন্দুব পূজা ও মুসলমানের শিবনি-হাজত-মানত দিবাব অনুষ্ঠানেব মধ্যে ভক্তিব উৎসর্গাবা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। দলে দলে জনসাধারণ সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘুরে বেড়ায়, তখন আর হিন্দু মুসলমানেব কোন বিভেদের কথা কারো মনে থাকে না।

## চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

### লালন শাহ্

পীরগণ মূলতঃ সুফী—একথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম গবেষক মুহম্মদ আবু তালিব তাঁর “লালন শাহ্ ও লালন গীতিকা (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, “মুসলিম বাউলবাও আসলে সুফী। .. ভালো কবে দেখতে গেলে এঁরা ইসলামি সুফীবাদেরই অনুসারী। ... তাঁরা নিজেকেদেরকে যেমন বাউল বলেছেন তেমনি তালিবুল মাওলা বলেছেন। তালিব অর্থে সন্ধানী, তালিবুল মাওলা অর্থে খুদা সন্ধানী। .. সুফীদের মতই তাঁরা বিশ্বাস করেন—আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান বটে তবে তিনি সর্বত্র ব্যাপ্তও বটে। কুল্ল শাইইন কাদিরঃ কুল্ল শাইইন মুহিত। তিনি সব কিছু সৃষ্টি কবেছেন, শুধু তাই নয়, সব কিছুই তাঁর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।”<sup>৭৩</sup>

ববীলুনাথ একালের কবিগুরু, লালন শাহ্ বাউল কবিগুরু। লালন ফকিরকে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন বাউল-কবি।

অবশ্য অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর বক্তব্যে প্রকাশিত যে এঁরা বেশরা অর্থাৎ ঞান্দানী সুফী নন। এঁরা আদর্শ সুফীর লৌকিক সংস্করণ। (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা : ৩য় বর্ষ, ১৯৭৫)।

মুহম্মদ আবু তালিব বলেন,—লালনের বা তাঁর সাক্ষাত অনুসারীদের গানে (যথা পাঙ্কু শাহ্, হুদু শাহ্, পাঁচু সাই প্রমুখ) আমি অন্ততঃ এমন কিছু পাই নি যাতে তাঁকে বেশবা, তাস্তিক বা বাউল মতবাদী বলা যেতে পারে। তাঁরা ছিলেন বিশুদ্ধ সুফীবাদের অনুসারী।<sup>৭৪</sup>

নাট্যকার শ্রীদেবেন নাথ তাঁর সাই সিরাজ বা লালন ফকির নাটকে সিরাজ সাইকে পীর বলে অভিহিত কবেছেন। এক্ষেত্রে বহু শিষ্টেব মৌর্শেদ লালন ফকির, পীর লালন শাহ্ নামে পরিগণিত হবেন এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

বাংলা ১৩৭৯ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত “বাউল বাজার প্রেম” নামক এক আখ্যান-গ্রন্থে শ্রীপৱেশ ভট্টাচার্য্য কবেকটি কথায় যে লালন ককিবেব পবিচৱেব কিছুটা প্রকাশ কবেছেন, সেখানে লালনকে দেখি পীবেব শিবনী প্রদান মানসিকভাৱ আচ্ছন্ন। নিম্নে বৰ্ণিত কথোপকথনটি লক্ষ্য কববাব মতন,—

“লালন বলে,—ভাব্ছি কালই শিবণী দেই। কি বলো ?

সাকিনা বলে,—না, না, দুদিন সময় না থাক্লে যোগাড-মন্তব হবে কি কবে ?”

“ একটু বাদেই চবমোহনপুবেব মোডল বাড়িব লোক জনেবা এসে পৌঁছায়। তাংদেব মুখ থেকেই শুনলো লালন,—মোডল বাড়িব ছোট ছেলের অসুখ কবেছিল, মানত ছিল। মানত ছিল, অসুখ ভালো হলে আসান-পীৱেব শিবনি দেবে। আজই সন্ধ্যাৰ শিবণী দেবাৰ কথা।”

“গতবাজে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছে মোডলবাড়িব কৰ্তা। কে একজন যেন মাথাৰ কাছে দাঁডিৰে বল্ছে, ওবে—তুই শিবনী দিতে যা লালন সাঁই-এব আখডায়।”

“ শিবনী প্রসাদ গ্রহণ কবতে আখডা অঙ্গন-প্রাঙ্গণ জুড়ে বসেছে সবাই।”

“হিন্দু-মুসলমান, নব-নাবী, কোন তফাৎ নেই। শীতল, ভোলাই, পাঁচু সা—এবা সব প্রসাদ বিতবণ কবছে। তদাবক কবছে লালন আৱ কাঙাল হবিনাথ।”

পীবগণেব সহিত বাউলগণেব কবেকটি সাদৃশ্য লক্ষণীয়। পীবগণেব ম্যায় বাউলগণ তাঁংদেব সহজ মতবাদেব কথা প্রচাৰ কবেন। সুফী বা পীবগণেব কথায় আছে মানবতাবাদ,—বাউলগণেব কথায় আছে মানবতাবাদ। পীবগণ তদীৰ মূৰ্শেদগণেৰ অনুগামী মুবিদ,—বাউলগণ তাঁংদেব প্রকাশধাবাৰ তদীৰ মূৰ্শেদগণেৰ অনুগামী শিষ্য। পীবগণ সংসাৰ-জীবনযাপন অপেক্ষা পবার্থে নিজেদেবকে উৎসৰ্গ কবেছেন—বাউলগণও সংসাৰ-জীবনযাপনকে গুৰুত্ব দেন না যতখানি গুৰুত্ব দেন পবেব আধ্যাত্মিক জগতেব ভাববস তৃপ্তি লাভ কবতে সহযোগিতা কবাব। পীবগণেব শিষ্য হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্ৰদায় থেকে

এসেছেন,—বাউলগণের ক্ষেত্রেও তাই। কাবো কাবো মত যে পীর যেমন হজবত বসুল্লাহ (দঃ)-এর থেকে প্রকাশিত,—বাউলও তেমন একই ধারায় প্রকাশিত। পোশাক-পবিচ্ছদের ক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আবু তালিব সাহেব লিখেছেন যে, পীবগণের মত লালন ফকির ও তাঁর সম্প্রদায়ের ধর্মমত এবং আচার-ব্যবহার শরীয়ত পন্থী মুসলিমদের সঙ্গে সর্বাংশে এক বকম না হলেও তাঁদের ধর্মমত ও আচার-ব্যবহার বেশ উদার ও উন্নত। কোন কোন ক্ষেত্রে ভক্তগণ কর্তৃক পীবের স্থান বাউলের মাজাবে ধূপ-বাতি জ্বালানো হবে থাকে। পীরের পাঁচালী বা অগ্ন্যগ্ন গ্রন্থের স্থান বাউল-জীবনীও রচিত হয়েছে।

বঙ্গের অধিকাংশ মুসলিম ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ বা হিন্দু। মুসলিম বাউলগণ মূলতঃ মুসলিমই। বঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু নিম্নবর্ণীয়,—পীবভক্ত হিন্দু বা বাউলভক্ত হিন্দুগণ প্রধানতঃ নিম্নবর্ণীয় এবং মূলতঃ হিন্দুই। পীবগণ প্রচার কবেছিলেন ইসলামের আদর্শ,—বাউলগণও প্রচার কবেছিলেন ইসলামেরই আদর্শ। এই সব মৌলিক কয়েকটি সাদৃশ্যের পবিপ্রেক্ষিতে লালন ফকির তথা বাউল সম্প্রদায়কে সুফী বা পীর পর্যায়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। লালন ফকির সম্পর্কে বেশ কয়েকখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং আবে কাজ চলছে। সুতরাং বাংলা পীব-সাহিত্যের কথা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে বাউলগণের লালন ফকির সম্বন্ধে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পীবগণের সহিত বাউলগণের কয়েকটি বৈসাদৃশ্যও আছে। পীবগণ মানব কল্যাণের জন্ত সচেষ্টঃ বিশেষতঃ ঐতিহাসিক পীবগণের অনেকে তাঁদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ কবে শহীদ হয়েছেন কিন্তু বাউলগণের লক্ষ্য মনেব-মানুষ ঋদ্ধি কেবাব আনন্দের সন্ধান দেওয়া এবং এর জন্ত তাঁদের শহীদ হওয়ার কোন প্রশ্ন এতে জড়িত নেই। পীবগণ মহৎ কাজের পবিচয় রেখেছেন তাঁদের কাজের মধ্যে,—বাউলগণের পরিচয় তাঁদের বচিত বা গীত গানের মাধ্যমে মতখানি তাঁদের কাজের মাধ্যমে ততখানি নব। পীবের স্থান বাউলের মাজাবে হাজত, মানত এবং শিবনী দিবার বীতি প্রচলিত নেই। পীরের স্থান বাউলের নামে কোন দরগাহ বা নজবগাহ থাকে না।

এক কালে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বৌদ্ধ ধর্মাদর্শের দিকট পবাত্ত হওয়াব পর পুনরায় যখন বৌদ্ধগণের অস্তিত্ব ক্রমশঃ অবলুপ্তিব পথে অগ্রসর হচ্ছিল এবং ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য প্রবল হচ্ছিল তখন মুসলিম মিশনারীর সাম্যাদর্শ বিশেষতঃ সুফী বা পীরদেব মহত্ব এবং মরমী হৃদয়ের সংস্পর্শ ও সেই সাথে তুর্কীগণের বিজয় অভিযান বৌদ্ধগণকে ইসলামের পডাকাতলে সমবেত করে। ফলে, এ দেশের মুণ্ডিত-মন্তক বৌদ্ধগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নেড়ে (নেড়া থেকে) মুসলমান নামে অভিহিত হন। এই মুসলিমগণই ইসলামের কঠোর আচার-বিচারের অনুশাসন সঠিকভাবে অনুসরণ না করার অজ্ঞান-লালিত সহজ ধর্মের গডডালিকা প্রবাহে বেশ কিছুটা ভেসে যান। সুফীবাদ এদিকে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ থেকে সবে আসা সাধারণ মানুষের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করল। তাতে মুসলিম ও হিন্দুর মধ্যে সংযোগ ও মিশ্রণের সেতু গড়ে উঠল।

In fact it was through Sufism that Islam really found a point of contact with Hinduism and an effective entrance to Hindu hearts.<sup>১৫</sup>

বক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদীর বিকল্পে বিদ্রোহ কবে অভ্যুদয় হব যে বৌদ্ধ ধর্মের সোনারেও দেখা যায় সুফী গুরুবাদের সঙ্গে সহজিয়া বৌদ্ধদেব গুরুবাদের মিল রয়েছে। সহজিয়া বৌদ্ধদেব মত সবহৃদ্যদেব দোহাষ আছে,—তিনি চিত্তামণি, তাঁকে প্রণাম কব। তিনি ইচ্ছাকল প্রদান করেন। চর্য্যায় আছে—

দিত্ত কবিত্ত মহাসুহপবিমাণ।

লুই ভগই গুরু পুচ্ছিত্ত জান ॥—লুইপাদ।

বাংলা তজ্জমা :— দিত্ত কবি মহাসুখ কব পরিমাণ

লুই ভগে গুরুকে পুচ্ছিত্ত ইহা জান ॥

অর্থাৎ সোজা কথায় গুরুকে জিজ্ঞাসা কবে জেনে নাও।

সুফীদেবও মতে,—

The first requirement for one desiring to follow the life of a Sufi, is to place himself under a guide who is called a Shykh or Pir, both words mean an 'elder' or a Murshid i.e., leader.<sup>১৬</sup>

বাউলদের কাছে কারা-সাধন এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রক্রিয়া। কবি আলাওল বলছেন,—

“কোরানে কহিছে প্রভু জপ মোর নাম”

মূল ইসলামে ‘জিকির’ অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ করার বিধান আছে। মুফীদের কাছেও আল্লাহের নাম জপের বিচিত্র রূপ দেখা যায়। তাঁরা মনে করেন যে প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে আল্লাহের নাম জপ চলছে। বাংলার বাউলদের সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থে লিখেছেন,—

“প্রতি প্রশ্বাসের সঙ্গে লা-ইলাহ। এবং প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে ‘ইল্লা-লা’ জপ চলে।” ৭৬

বাউলগণক লালন ককিরের প্রতি বাউলগণের ভক্তির পরাকাষ্ঠা অতুলনীয়। অসামান্য মানুষের কাছে তাঁর স্থান হয়ত পীরের সমতুল্য নয়। তবে তাঁদের প্রতি প্রকৃষ্ট অজ্ঞানতার পবিত্রতা হ্রাস না। বিশেষ করে বাউলগণের ভাবমোহক জ্ঞান বা দেশাত্মবোধক গান, বচনিত। বা গায়কের প্রতি আপনা আপনিই সমীহভাব জাগিবে তোলে।

পীরগণ যেভাবে মানুষের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, বাউলের তুলনায় সেই ভাববোধক ধারার প্রকাশ যেন অল্পকণ।

পীরগণ সামাজিক ভাবে নির্যাতিত মানুষের মুক্তি দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। বাউলগণ মানুষের মধ্যে বিভেদের প্রাচীরকে ধূলিসাৎ কবতে এসেছিলেন। লালন গাইলেন,—

আমি কোন জন জানি না সন্ধান।

সব লোকে কল্প লালন ককির

হিন্দু কি মুসলমান।

লালন বলে আমার আমি

না জানি সন্ধান ॥

একই ঘাটে যাওয়া আসা

একই পাটনী দিচ্ছে খেঁষা

কেউ স্বামি না কাবো ছোঁয়া

বিভিন্ন জল কে কোথাব পান ॥

লালন ককিরের জন্ম ও বংশাদির পবিত্র দিবে এক গবেষক লিখেছেন যে,—লালন ককির, লালন শাহ নামেও প্রসিদ্ধ। তাঁর বাড়ি ছিল মশোহর

জলাব বিনাইদহ মহকুমাব অন্তৰ্গত হবিনাকুণ্ড থানার অধীন হরিষপুৰ নামক-  
গ্রামে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মতান্তবে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তাঁর  
পিতার নাম দবীবুল্লাহ দেওরান, মাতাব নাম আমিনা খাতুন এবং দাদার  
নাম গোলাম কাদির। তাঁরা চাৰ ভাই যথাক্রমে—কলম, আলম, লালন এবং  
চলম। তাঁব মোর্শেদ বা গুরু নাম পীর সিৰাজ শাহ। লালন ফকির অল্প  
বয়সেই বাপ-মা হারান। ভাইদেব সংসাৰেব স্বচ্ছলতা ছিল না। লেখাপড়া  
শেখার তেমন সুযোগ তাঁব হয় নি। গক চরানো নিয়ে মাঠে মাঠে তাঁব  
ছোটবেলাব দিনগুলি কেটেছে। এই সময়ে গ্রামবাসী সিৰাজ সাঁই (সিৰাজ  
বেহারা) -এৰ সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। উক্ত সিৰাজ বেহারাই ছিলেন  
প্রসিদ্ধ পীর সিৰাজ সাঁই বা সিৰাজ শাহ। লালন তাঁব কাছেই দীক্ষা নেন।  
লালন তাঁব গুরুৰ এত অনুগত ছিলেন যে তিনি গুরুৰ পাক্কী-বহন পেশাও  
গ্রহণ কৰেছিলেন। তিনি যে ব্রাহ্মণ সম্ভান ছিলেন এবং পৰে মুসলিম হয়ে  
গিয়েছিলেন একুপ ধাবশা কল্পনা-প্রসূত।<sup>৭৬</sup>

লালন ফকিব ছিলেন পীর সিৰাজ সাঁই-এৰ প্রত্যক্ষ শিষ্য এবং সিৰাজ  
সাঁই ছিলেন—ভাবত তথা পৃথিবী বিখ্যাত পীর নিজামুদ্দীন আউলিয়াব  
নবম-স্থানীয় শিষ্য।

লালন শাহ ছিলেন তাত্ত্বিক কবি। গান হল তাঁব তত্ত্ব প্রচাৰেব বাহন  
মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন জীবন বসেব বসিক। সুফী লালন ফকিব  
বুঝি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যেব কমী ছিলেন। তাঁব বাউল গান  
মূলতঃ ‘সিমা’ নামক সংগীতেব বিকৃত বা বিকল্প। সিল-সিল। অর্থাৎ নিষামী  
ফকিবগণেব গজল গান ছিল তাঁদেব অধ্যাত্ম সাধনাৰ অঙ্গ বিশেষ। বৈষ্ণব,  
শাক্ত প্রভৃতি অ-মুসলিম সাধকগণ বাউল গানে আকৃষ্ট হযে গানকে ধর্ম  
সাধনাৰ সঙ্গে মিলিয়ে নিবেছিলেন। তাই কেউ কেউ এইকুপ বাউল বা  
বিকৃত ‘সিমা’ সংগীতকে বাউল গান না বলে ভাবগান বা মাৰেফতী গান  
নামে অভিহিত কৰেছেন। তাঁদেব মতে লালন ফকিবেব গান হল বিগুচ্ছ  
সুফীবাদ অনুসারী গান।<sup>৭৭</sup>

তাত্ত্বিক কবি, জীবন বসেব বসিক কবি, পল্লী বাংলাৰ সাধাৰণ মানুষে-  
মবমিলা গায়ক এবং সুফী ফকিব পীর লালন শাহ জীবনেব শেষ দিকে কুষ্টিয়া  
অন্তৰ্গত হেঁউডে নামক গ্রামে আখড়া নির্মাণ কৰে বহু শিষ্যসহ দিনাতিপা



করেন এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

### ১। বাউল রাজার প্রেম

‘বাউল রাজার প্রেম’ নামক আধ্যাত্মিক গ্রন্থের রচয়িতার নাম শ্রীপবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তাঁর নিবাস বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রামে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩৭৯ বঙ্গাব্দেব ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১ পৃষ্ঠা সংখ্যা—১১২। ঋগ্গণপুত্র মিলন মন্দির পুস্তক নম্বর ৪৬৩৫ ক্রমিক নম্বর ১৩৬৭।

লেখক এই গ্রন্থে লালন ফকিরের সরস কাহিনী বিবৃত করেছেন। ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, প্রকাশভঙ্গী তেমনি চিত্তাকর্ষক। তবে লেখক মুখবন্ধে বলেছেন ;—

“লালন ফকির এমন একজন মানুষ, যাঁব তুলনা তিনি নিজে। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন-কথা কোথাও পাওয়া যায় না। কিংবদন্তীর মতই নানা কাহিনী তাঁর জীবন নিয়ে। আমার এ কাহিনীকে কেউ যেন তথ্যবহুল জীবন-কথা বলে গ্রহণ না করেন। এ কাহিনী এক কিংবদন্তী-নির্ভর বেখা চিত্র—যার মধ্যে আমি সেই বাউল রাজার জীবনকে দেখতে চেষ্টাছি।”

লেখকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই গ্রন্থ ঐতিহাসিক নীরস-সরস তথ্য দিয়ে মস্তিষ্ক-জ্বরের উপযোগী নয়,—একটা ঘটনা-ভিত্তিক আকর্ষণীয় জীবন কাহিনী,—অতএব তা বস-সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

### ২। সাঁই সিরাজ বা লালন ফকির

সাঁই সিবাজ বা লালন ফকির নামক গ্রন্থখানি একটি নাটক। নাট্যকারের নাম শ্রীদেবেন নাথ। নাট্যকারের বসতি বসিরহাটে। তিনি আরো নাটকের রচয়িতা এবং একজন সু-অভিনেতাও বটে। নাটকের কভার পৃষ্ঠায় সিবাজ সাঁই এর নাম বড় হরফে এবং লালন ফকিরের নাম ছোট হরফে থাকলেও নাটকখানি পাঠকালে সহজেই বোঝা যায় যে মূলতঃ ভাঙে, লালন ফকিরের কথাই বিশেষভাবে বিবৃত হয়েছে। শ্রীপবেশ ভট্টাচার্য্যের বাউল-রাজার প্রেম গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বনে যে এই নাটক লেখা হয়েছে তা নাট্যকারের দেওয়া ভূমিকা থেকে বোঝা যায়। নাট্যকার এই নাটকখানিকে উৎসর্গও করেছেন ‘বাউল রাজার প্রেম’ রচয়িতাকে। নাটকটির প্রকাশকাল ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।

ইহা কলিকাতার নট কোম্পানী কর্তৃক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীতও হয়েছে। মহেন্দ্ৰ গুপ্ত প্রমুখ এৰ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সাঁই সিৰাজ নাটকখানি পঞ্চ অঙ্কে রচিত। প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে চাবটি কবে, তৃতীয় অঙ্কে পাঁচটি এবং পঞ্চম অঙ্কে একটি দৃশ্য আছে।

হিন্দু-মুসলিম মিলিয়ে প্রায় বিশটি চৰিত্ৰ এতে স্থান পেয়েছে। চাবটি নাবী চৰিত্ৰেৰ দুইটি মুসলিম রমণীৰ।

সাকিনা নামী মুসলিম বমণী কর্তৃক গাওয়া একটি গীত, নালন ফকিরের বিখ্যাত দু'খানি গীত এ নাটকের ভূষণ-স্বরূপ।

লালন ফকিরেৰ নামে বহুল প্রচারিত এবং বহুজনের জানা জীবন-কথা বিবৃত কবাব প্রয়োজন আপাততঃ নেই। তবে এতে সাঁই সিৰাজ বা লালন ফকিরের মাহাত্ম্য কথা যত প্রচারিত তাৰ চেবে অনেক বেশী প্রচারিত হয়েছে—‘মানবতা’ৰ কথা। সেখানে হিন্দুৰ কথা নেই, নেই শুধু মুসলমান নামধারীৰ কথা। ধৰ্মেৰ নাম কবে অধৰ্মেৰ কাদ। হোঁড়াত্ৰুতিতে বুঝি বিদ্ভুত হৰে লালনেৰ প্রতিবেশী দীন বলেছে,—(আসছে) বিদ্রোহীৰ দল। যারা এই গোটা জাতকে চাবুক মেৰে বুঝিয়ে দেবে, ধৰ্ম বড় নয়—জাত বড় নয়, সকলের চেনে বড় হল মানুষ।

সিৰাজ সাঁই তাই স্বার্থান্বেষীকে তিরস্কাৰ কবে বলেছেন,—মানুষ জাতটা যে কত বড়—শালাদেব তা বোবান হয় নি বে। মোল্লা আৰ সমাজপতিরা এদের ঠকিয়ে এতকাল শুধু নিজেদের কাজ গুছিয়েছে…….। ঐচৈতন্য,—জগাই-মাধাইকে কোল দিল, হজরত মহম্মদ—আল্লাহুতালার দূত হয়ে কত শিকার বাণী ছড়াল, বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ছোট জাতের মানুষগুলোকে নিয়ে মাথান্ন তুলে নাচল—তবু শালাৰ জাতের চোখ ফুটল না।

নাট্যকারও নিজে বলেছেন তাঁৰ ভূমিকাতে—মানুষ কোথায়?… ক্যাপা বুজে ফেবে মানুষ। শুকনো গাছে ফুল ফোটাতে চাব। মরা সাহাবার আনতে চায় জীবনেৰ জোয়াৰ। কিন্তু? পাষে পাষে কাঁটা। মানুষ জানোয়ারেৰ বিৰাজ নখ চলাব পথকে করে দেয় ক্ষত-বিক্ষত। তাই জাত-ধৰ্মেৰ গভী ভেঙে ক্যাপা চাব শুধু অবক্ষয়ী সমাজেৰ অবহেলিত কষেকটি মানুষ, যাবা মাটিকে সাজিয়ে মা—স্বৰ্গ আর বেহস্তকে টেনে আনবে এই মাটির বুকে।

তবে কি ধর্মে-কর্মে লালন ফকিবের কোন আস্থা ছিল না। এ সম্পর্কে লালন এক স্থানে গেয়েছেন ;—

না হলে মন সরলা কি ফল ফলে কোথা খুঁড়ে  
হাটে হাটে বেড়াই মিছে ভগবা পড়ে ।  
মক্কা-মদিনা যাবি ধাক্কা খাবি মন না যুড়ে ।  
হাজি নাম পড়ছে লোকে তাই দেখি বে ॥  
মুখে যে পড়ে কালাম তাইবি সুনাম হজুব বাড়ে  
মন খাঁটি নয় বললে কি হয় নামায পড়ে ।  
খোদা তাতে নাবাজ নয় রে লালন ভেড়ে ॥

পীর-সাহিত্যের কথা এসঙ্গে লালন ফকিবের কথা কিছু আলোচনা করা হল মাত্র। বাউল সম্প্রদায়ের সংখ্যা বঙ্গে নগণ্য নয়। তাঁদের গুরু লালন ফকিরসহ অন্যান্যের কথা ও তাঁদের সকলের গান বিষয়ে বিস্তৃতভাবে গবেষণার অপেক্ষা রাখে। সুতরাং এখানে আরো অধিক কিছু আলোচিত হওয়ার প্রয়োজন আপাততঃ নেই।

---

## পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

### শফীকুল আলম

পীর হজরত শফীকুল আলম বাজী এদেশে বিশেষতঃ উত্তর চব্বিশা পবগণার বাবাসত অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে হজরত শফীকুল আলম বাজীক পবিত্র রওজা শরীফ বাবাসত থানার কেমিরা-খামারপাড়া নামক গ্রামে বিদ্যমান। হজরত শফীকুল আলম অনেকের নিকট “হেকু দেওয়ান” নামে অভিহিত।

কবি মহম্মদ এবাহুন্নাই একস্থানে লিখেছেন,—

এইকপে গোবাচাঁদ আসিল চলিবা,  
কিছু দিনে হিন্দুস্তানে পৌছিল আসিয়া।  
হোন্দলের সহ গোবা চলিতে চলিতে,  
একদল পীর সঙ্গে দেখা দিল পথে।  
গোবাই জিজ্ঞাসা কবে সকলের ভবে,  
কোথায় চলেছ ভাই কহ দেখি মোবে।  
হেকু দেওয়ান কহে মোব জাইগীর,  
খামারপাড়া নগরে দিবাছে কাদিব।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে হজরত শাহজালাল রাজী ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে কয়েকটি ধর্ম প্রচারক দল বঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তাদের মধ্য হতে বাইশ জন আউলিয়ার একটি দল দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ইসলাম প্রচারের ভাব পান। গফুর সিদ্দিকী সাহেব আবার লিখেছেন যে, হজরত শাহ জালাল রাজী নিজে ৩০১ জনের এক কাফেলা বা ধর্মপ্রচারক দল সহ মক্কা থেকে দিল্লীতে উপনীত হওয়ার পর তাতে আরো ৯ জন মুজাহিদ যোগদান করেন। পরে আসামের গ্রীহটে আগমনের পথে আরো ৫১ জন মুজাহিদ যোগদান করেন। তিনি-উক্ত মোট ৩৬১ জনের দলকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে ভাবভেব বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ

করেন। তাদের মহাকায় একটি দল হজরত গোবর্চাঁদ রাজীব নেতৃত্বে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে আসেন, যে দলে উক্ত শফীকুল আলমও ছিলেন।

কেমিন্দ্রা-খামারপাড়া গ্রাম-সংলগ্ন মাঠে উক্ত শফীকুল আলম রাজীব দরগাহটিকে স্থানীয় অধিবাসীগণের অনেকেই হজরত বড়পীর সাহেবের দরগাহ বলে অভিহিত করেন।

কেমিন্দ্রা-খামারপাড়ার দরগাহ-গৃহটি ইটের তৈরী, ছাউনী টালীৰ। দরগাহ-স্থানের জমির পরিমাণ প্রায় দুই বিঘা। এই জমির মধ্যে কয়েকটি গাছ-গাছালি আছে, আছে ছোট একটি পুকুর। পুকুরটি পীব-পুকুর নামে অভিহিত। পার্শ্ববর্তী গ্রাম নবাবপুরের অধিবাসী মোহম্মদ আদীর আলী শাহজী উক্ত দরগাহের বর্তমান সেবায়ত্ত। তাঁর বরস প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর। তাঁর পিতার নাম মহম্মদ বিলায়েত আলি শাহজী। বংশানুক্রমে তাঁরা এই দরগাহের সেবায়ত্ত।

উক্ত জনসাধারণ এই দরগাহে হজরত বড়পীরের নামে হাজত, মানত ও শিরনি দিগ্লে থাকেন। প্রতি বৎসব এবুশে মাঘ তাবিখে উরস আরম্ভ হয় এবং সেই উপলক্ষ্যে মেলা বসে। সাত-আটদিন ধরে মেলা চলে। মেলায় গড়ে প্রতিদিন প্রায় তিন-চারি হাজার লোকের সমাবেশ হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল উক্ত নব-নাবীর মিলনস্থল বলে এই দরগাহ স্থানটিও বিশেষত্ব অর্জন করেছে।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব, কবি মহম্মদ এবাদোজ্জা এবং স্থানীয় জনমন্ডের মধ্যে পীর হজরত শফীকুল আলম রাজীব সম্পর্কিত বক্তব্যে যে ঐবসাদৃশ্য দেখা যায় সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে শফীকুল আলম এসেছিলেন আসামের শ্রীহট থেকে পীব গোবর্চাঁদের নেতৃত্বাধীন কাফেলাব সঙ্গে। কবি এবাদোজ্জা সাহেব লিখেছেন যে বালাঙা পবগনার আগমনের পথে পীর গোবর্চাঁদ বদন্তে পান (ছেকু দেওয়ান) শফীকুল আলমকে।

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব একাদশখানি প্রাচীন পুঁথির প্রামাণ্য সূত্র ধরে তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। কবি মহম্মদ এবাদোজ্জা পারশী ভাষায় লিখিত পুঁথির অনুবাদেব নকল

থেকে নিজে কাব্যখানি লিখেছেন। অনুবাদের নকল থেকে গৃহীত কাহিনীর নির্দিষ্ট উক্ত শফীকুল আলম ( ছেকু দেওবান ) সম্পর্কিত বক্তব্যকে সঠিক বলে কতখানি গ্রহণীয় সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে বোঝা যায় আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে পীর হজরত গোবার্চাদ রাজী তথা পীর হজরত শফীকুল আলম রাজী দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। আর পীর মোবারক বড়খাঁ গাজী উক্ত অঞ্চলে আগমন করেছিলেন আনুমানিক বোডশ-সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে। বড়খাঁ গাজীর পবিত্র মাজার শবীফ ঘুটিয়ারী গ্রামে অবস্থিত। স্বয়ং বড়খাঁ গাজী, হজরত বড়পীর সাহেবেব নজরগাহ প্রতিষ্ঠা করে ভক্তগণকে সেখানে জ্ঞান নিবেদন করার উৎসাহ সৃষ্টি করে গেছেন। স্বাভাবিকভাবে প্রায় দুই-তিন শত বৎসর পরে শফীকুল আলম রাজীর নিম্নত অবস্থিতির উপর বড়খাঁ গাজী দ্বারা অনুসৃত হজরত বড়পীর সাহেবেব প্রভাব বিস্তৃত হবে থাকতে পারে।

---

## ষট্‌বিংশ পটভেদ

### শাহ্ সুফী সুলতান

হজরত শাহ্ সুফী সুলতান রাজীব কথা শ্রবণ করেছেন ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কপরাম চক্রবর্তী। পৈঁডো বা পাণ্ডুয়ায় ভূতি খাঁ বা শাহ্ সুফী দ্বিপরী বা দ্বিবেনী'র দরগাহ খাঁ বা দফর খাঁ গাজীর ভাগিনের বলে কথিত। ৫৯ ৭৯৬ হিজরীতে সুলতান গিহাসুদ্দীন প্রেরিত ওলিগনের অন্ততম শাহ্ সুফী সুলতান এক দল পবাক্রমশালী সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডুয়াতে আধিপত্য বিস্তার-কল্পে আগমন করেন। মতান্তরে শাহ্ সুফী সুলতান ১২৯০ খৃষ্টাব্দে আগমন করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত অলি-আব্বাহ্ বুআলী কলন্দবেব অন্ততম প্রধান শিষ্য। কথিত তিনি বাঙলায় সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহেব আখীর ছিলেন। ২৪ “দিল্লীর তথ্যে তখন ফীরোজ-শাহ আসীন। অভিযোগ শুনে তার ভাইপো। শাহ সুফীকে পাঠালেন ফৌজ দিয়ে পাণ্ডুরায়।” ২ পাণ্ডু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি পাণ্ডুয়াতে আজীবন ছিলেন। শামসুর বহমান চৌধুরী লিখেছেন যে ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামের রাজা ভুদেবের সহিত যুদ্ধে মৃত্যুবরণ। বিজয়ী হলেও শাহ্ সুফী সুলতান রণাঙ্গনেই শাহাদাৎ বরণ করেন। ২৪

হুগলী জেলায় পাণ্ডুয়ায় গৌর হজরত শাহ্ সুফী সুলতানের মাজার বিদ্যমান। মাজারটি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড-এর ধারে অবস্থিত। ইট-নির্মিত গৃহের মধ্যে বড়ী বস্ত্র-দ্রাব্য আবৃত সে মাজার। এটাই শাহ্ সুফী সুলতানের দরগাহ। দরগাহের সামনে মসজিদ—টালি দিবে ছাওয়া। তার বাম দিকে ইমৎ জঙ্গল, সামনে বাম দিকে হজরত শাহ্ সুফী সুলতান হিফ্জ মাদ্রাসা। উক্ত মাদ্রাসা ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এখানেই আছে আঞ্জুমানে খেদমাতুল ইসলাম। প্রধান কার্যালয়—সিনেমাভলা, পাণ্ডুয়া। স্থাপিত ১৩৭৪ বাংলা সাল। দরগাহ ও মসজিদ সংলগ্ন স্থানে রয়েছে কবরখানা। আম ও অন্যান্য গাছে ছায়াচ্ছন্ন স্থানটি বেশ মনোবহু।

শাহ সুফী সুলতানের দবগাহের বর্তমান সেবাবেত জানাচ্ছেন যে,—তাঁর নাম সৈয়দ আমীর আলি। তাঁর পিতার নাম মরহুম খোদা নেওয়াজ। তাঁর বয়স আনুমানিক ৫৫ বৎসর ( ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে )। তাঁরা স্থানীয় লোক। শাহ সুফী সুলতান এতদ্ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে এলে তাঁদের পূর্ব পুরুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা সেই সময় থেকেই পীর শাহ সুফী সুলতানের দবগাহে খাদিম বা সেবাবেত হবে আছেন।

প্রতি বৎসর পরমা মাঘ থেকে এখানে এক মাসের মেলা আরম্ভ হয়। সতেবই মাঘ পৌষের অন্ত্যকালের দিন। ঐ দিনে উরুস অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সংঘে মিলাদ হয়, কোবান শরীফ থেকে পাঠ হয় এবং অতিথি সেবা হয়। এখানে রোজ সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি দিবে জিন্নারত করা হয়ে থাকে।

হিন্দু ও মুসলিম ভক্তগণ পীর শাহ সুফী সুলতানের দবগাহে হাজত দিবে থাকেন। এখানে মোবগ এবং ছাগল হাজত দেওয়া হয়। ভক্তগণ মান্ত হিসাবে দুধ, বাতাসা, ফল, পরসা ইত্যাদি দেন। তাছাড়া শিবনিও প্রদত্ত হবে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে এখানে কোন প্রকারে গোমাংস ব্যবহার নিষিদ্ধ।

পীর শাহ সুফী সুলতান, ভক্তগণের নিকট পীরবাবা নামেও সমধিক প্রসিদ্ধ। সন্তোষিত বিশ্বাসে ভক্তগণ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে বাবাব মাকুবাবা ধৌত কবতঃ অর্থাৎ সমাধি স্নান করিয়ে সেই 'পানি' গ্রহণ করেন। তাতে নাকি বহু ভক্তের নানাবিধ বোগ নিবাস্য হয়ে থাকে। ভক্তগণ ন্যঃ। বেদনা, কান পাক। ইত্যাদি নানাবিধ বোগ নিবাস্যের কারণেও এই দবগাহ থেকে তেল-পড়া নিয়ে ব্যবহার করেন। মুসলিমগণ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক হিন্দু পীরবাবাকে ভক্তি করেন।

বাজপথেব অপব পার্শ্বে রয়েছে সুউচ্চ মিনার। ইহা শাহ সুফী সুলতানের বিজয়-স্তম্ভ। তার ভিতরে কোন খোদিত মূর্তি চিহ্ন নেই। পার্শ্বেব মন্দির আছে পাণ্ডু বাজার প্রাসাদ ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ। উক্ত মিনারের কাণ্ডেব রঙের বিবীট আকারেব স্তম্ভ এবং দেওয়ালের অবস্থিতি দেখে তার বিশেষ সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার সুযোগ থাকে না। মিনার এবং অর্ধাঙ্গ ধ্বংসাবশেষ সবকারেব প্রস্তর বিভাগেব তত্ত্বাবধানে সুবক্ষিত। এর অভ্যন্তরে প্রবেশের মুখে বাম দিকে একটি বিবীটাকার পাণ্ডের স্তম্ভ আছে। তার মূর্তি খোদিত ছিল বলে অনুমিত হয়। তার বিশেষ বিশেষ স্থান আছে।



ভেঙেছে, যা থেকে কোনটির মূর্তিচিহ্ন নির্দিষ্টকরণ হুঃসাধ্য বলে মনে হয়। অনুরূপ স্তম্ভ পাশে মাঠে গড়ে থাকতে দেখা যায়। পৌরবাবার দরগাহের সেবারেত সৈয়দ আমীর আলী জানান যে, তিনি যখন কিশোর বয়সী, সেই সময় ওই স্তম্ভটি মিনারের অভ্যন্তর মুখে এনে বসানো হয়েছিল।

শান্তিপুর সুলতান বা পাণ্ডুরার কেছ।

মহীউদ্দিন ওস্তাগর বিরচিত পাণ্ডুরার কেছ। সম্পর্কে আচার্য্য ডঃ মুকুন্দ সেন যা লিখেছেন তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তিনি লিখেছেন যে,— ত্রিবেণী অঞ্চলের মুসলমান-আধিপত্য বিষয়ক জনশ্রুতির উপর জোব্দা রঙ বুলিয়ে শান্তিপুর নিবাসী মহীউদ্দিন ওস্তাগর কর্তৃক এই কেছ। রচিত, যাব মূলে কোন হিন্দী বা উর্দু কেতাবের প্রভাব আছে।

শান্তিপুর নিবাসী মহীউদ্দিন ওস্তাগর রচিত পাণ্ডুরার যে কাহিনী পাওয়া যায় তার সংক্ষিপ্ত রূপ ;—

পাণ্ডুরা নগরের রাজা পাণ্ডু। রাজবাটীর অভ্যন্তরে ছিল পবিত্র জলের কুণ্ড, যাতে তেজস্বী কোটি দেবতার অধিষ্ঠান। সে কুণ্ডের জলস্পর্শে যত ব্যক্তি জীবিত হত।

তার রাজত্বে পাণ্ডুরার ছিল মাত্র পাঁচ ঘর মুসলমান।

কাকেরের কাছেতে মোমিন মোহলমান

বাঘের নিকটে রইত বকরির সমান।

এছলামের কারবার করিতে নারিত

করিলে পাণ্ডব-রাজা সাজা দেলাইত।

দারুণ হুঃখিত হয়ে মুসলমানগণ পাণ্ডু রাজ্যের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গোপনে আল্লাহ নিকট প্রার্থনা জানালেন।

একদিন এক মুসলিম-প্রজা তদীয় পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে গোবধ কবলেন। প্রতিবেশী হিন্দুরা এই ঘটনার কথা জানতে পেলে ঐ মুসলিমের পুত্রকে হত্যা কবলেন। তিনি রাজার নিকট অভিযোগ করলেন। রাজা সে অভিযোগ গ্রাহ্য করলেন না। তিনি তখন চললেন দিল্লীতে পুত্রের যতদেহ নিয়ে। ইচ্ছা এই যে,—

আনিব সঙ্গেতে করি পাণ্ডব-শহরে

জড়িয়া পাণ্ডব-রাজ্যে দিব ছাবখাবে।

দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ অভিযোগ শুনে ভাইপো শাহ সুফীকে ফৌজ দিয়ে পাঠালেন পাণ্ডুয়ার। সফোজ শাহ সুফী বালুহাটার এসে তাঁর ফেললেন। আবস্ত হল যুদ্ধ। যুদ্ধ আর শেষ হয় না। জীৱত-কুণ্ডেব প্রভাবে বাজাব সব নিহত সৈন্য জীবন ফিরে পায়। শাহ সুফী বাজাব সঙ্গে পেরে ওঠেন না। এক বছর যুদ্ধ কবে শাহ সুফী হতাশ হয়ে দিল্লীতে ফিরবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় নগর ঘোষ নামক এক গোমাল-প্রজা তাঁর কাছে এসে জীৱত-কুণ্ডেব রহস্য প্রকাশ করল। নগর ঘোষ নিজে মুসলমান হল এবং যোগীর ছদ্মবেশে রাজার অন্তর মহলে গোপনে গিয়ে জীৱত-কুণ্ডে গোমাংস নিক্ষেপ করল। এবার জীৱত-কুণ্ডেব জীবন প্রত্যাৰ্পন-মাহাত্ম্য বিনষ্ট হয়ে গেল। বাজাসৈন্য নিহত হলে সে আর জীবন ফিরে না পাওয়ার রাজা প্রমাদ গণলেন। কোন উপায় না দেখে রাজা এবং রাজমন্ত্রী সপরিবারে জিবেণীতে গঙ্গার ডুবে মৃত্যু বরণ করলেন। পাণ্ডুরা মুসলিম ফৌজের অধিকারে এল। শাহ সুফী এক বিরাট মসজিদ নির্মান করে সেখানেই রয়ে গেলেন আজীবন।

কাহিনী দুইটো স্পষ্টে বুঝা যায় যে এতে ইসলাম ধর্মের অভিযানের জরগোরব প্রকাশিত হয়েছে। এই অভিযানের স্থানীয় পরিচালক শাহ সুফী সুলতানের মাহাত্ম্য-কথাও প্রচাৰিত হয়েছে।

পাণ্ডুরাৰ কেছাৰ বৰ্ণিত জীৱত-কুণ্ডেৰ অলৌকিক ক্ষমতাৰ তুলনা যথাক্রমে গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্য ও পীৰ গোবাৰ্চাঁদ কাব্যে পাওয়া যায়। পাণ্ডুরাৰ রাজা ও রাজমন্ত্রীগণেৰ সপৰিবাৰে জলে ডুবে আত্মহত্যা কৰাৰ ঘটনাৰ তুলনা পাওবা যায় পীৰ গোবাৰ্চাঁদ কাব্যে, ঠাকুৰবৰ সাহেবেৰ কাহিনীতে, শাহ সুলতান বলখীৰ কাহিনী এবং আৰো বনেন্দ্ৰ কাহিনীতে।

মহীউদ্দিন ওস্তাগৰ পাণ্ডুৰাৰ রাজা পাণ্ডুৰ নাম উল্লেখ কৰেছেন। এ প্ৰসঙ্গে শামসুৰ রহমান চৌধুৰী লিখেছেন ভূদেব নামক রাজাৰ নাম। ২০ অথচ রাজা ভূদেবেৰ সঙ্গে সংঘৰ্ষ হৈছিল জাকৰ খাঁৰ পুত্ৰ অগওয়ান নামে ; —তাতে ভূদেব নিহত হন। ৫৯ আনৰা দুইটি পাণ্ডুৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। তাৰা যথাক্রমে জিবেণী-পাণ্ডুৰা এবং ভূবন্ত-পাণ্ডুৰা। এখানে জিবেণী-পাণ্ডুৰা বা ছোট পৈত্ৰৰ কথা বলা হৈছে। পশ্চিমবঙ্গৰ সংস্কৃতি নামক গ্ৰন্থে লিখা ঘোষ লিখেছেন, —“ভূবন্তে পাণ্ডু নামে এক রাজা ছিলেন—তিনি ছিলেন

কান্নস্থ রাজা পাণ্ডু দাস। এই কাষস্থ রাজা ও জিবেশী-পাণ্ডুয়ার পাণ্ডু রাজার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।” আবার ফুবফুরার ইতিহাস, ও আদর্শ-জীবনী গ্রন্থে গোলাম ইয়াছিন লিখেছেন,—“হজরত শাহ্ ছুফি সোলতান সাহেব সৈয়দলকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন, তিনি স্বয়ং একদল সৈয়দসহ পাণ্ডুয়া অভিযুখে যাত্রা করেন। অকদলকে সেনাপতি হজরত শাহ্ হোছেন বোখারির নেতৃত্বে “বালিগা-বাসন্তী” অভিযুখে প্রেবণ করেন।” উক্ত হোছেন বোখারি সঙ্গে বাগদী রাজার সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এখানেও বাগদী রাজার ‘জীরত-কুণ্ডের’ কথা আছে। অতএব মহীউদ্দিন ওস্তাগর উল্লিখিত জিবেশী-পাণ্ডুয়ার রাজার অস্তিত্ব ঐতিহাসিক হলেও সেই রাজার নাম বিষয়ে প্রশ্নের সম্ভাবজনক সিদ্ধান্ত পাওয়া যাব না।

পাঁড়ুয়ার কেছ। প্রসঙ্গে ডঃ মুকুমার সেন লিখেছেন,—“উত্তরবঙ্গে মহাস্থানের ঐতিহ্য নিয়ে আবদুল মজিদ লিখেছিলেন ‘ছোলতান বলখি’। বঙ্গ বাহুল্য, শাহ্ সুফী সুলতান এবং শাহ্ সুলতান বলখি এক ব্যক্তি নন। ফুবফুরা শরীফের ইতিহাস অংশে দেখা যায় তিনি সুলতান গিবামুদ্দীনের অভিলিখ-ক্রমে শাহ্ সুফী সুলতানের সহিত এতদঅঞ্চলে আগমন করেন এবং বালিগা-বাসন্তীপুরের বাগদী রাজার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন। আবার শামসুর রহমান চৌধুরীর বক্তব্যে শাহ্ সুলতান বলখি প্রাচীন পৌণ্ড বর্দ্ধন বাজোব° বাজধানী পৌণ্ড নগর (বর্তমান নাগ মহাস্থান) নামক জায়গায় কিংবদন্তী অনুযায়ী বলাখের বাজ-সিংহাসন ত্যাগ করে সাধকের জীবন গ্রহণ করেন।

আবদুল মজিদ সাহেবের গ্রন্থ ‘ছোলতান বলখি’ দৃষ্টান্ত্য।

-----

## সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

### শাহ চাঁদ

পীর হজরত ইলিয়াস রাজী ওরফে পীর শাহ চাঁদ বাজী এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে এসেছিলেন। তিনি পীর হজরত গোরচাঁদ রাজীর নেতৃত্বাধীন কাফেলার সহিত সিলহেটের দেশ বিখ্যাত পীর হজরত শাহ জালাল বাজীর অনুমতিক্রমে বসিবহাট মহকুমার অন্তর্গত বাহুড়িয়া থানাধীন আঁধাবমানিক গ্রামে জারগীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।\*

পীর হজরত ইলিয়াস বাজী কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তা জানা যায় না, তাঁর বংশেবও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী মনে হয় তিনি আবব বা পারুল বা ঐ অঞ্চলের কোন স্থান থেকে আগমন করেছিলেন। আঁধাবমানিক গ্রামেই তিনি এতকাল বা স্থায়বরণ করেন। এই গ্রামেই তাঁর রওজা শবীফ বিদ্যমান। তাঁর সেই সমাধির উপর ভক্তগণ এক সুবয়্য সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন। সেই দবগাহেব সেবাবেতগণের অত্যন্ত কাঙ্গী গোলাম বহমান সাহেবের কাছ থেকে জানা যায় যে উক্ত পীর এতদ্ অঞ্চলে পীর হজরত শাহ চাঁদ বাজী নামেই প্রসিদ্ধ। বাহুড়িয়া, হাবড়া, বসিবহাট প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর প্রভাব বিস্তৃত। পৌষ সংক্রান্তিতে তাঁর স্মৃতি উপলক্ষে ওবস হয়। এতে মনে হয় ঐ দিনই তাঁর মৃত্যু ব দিন; কিন্তু কোন্ সালে তাঁর মৃত্যু হইয়াছিল তা জানা যায় না।

পীর হজরত শাহ চাঁদ রাজীর পবিত্র বওজা শবীফের উপর সেবাবেত ও অসংখ্য ভক্তগণ ইটক নির্মিত যে সুশৃঙ্খল দরগাহ-গৃহটি নির্মাণ করিয়াছেন তা প্রায় দশ বিঘা পৌরোস্তব জমির মধ্যকার একস্থানে অবস্থিত। সেবাবেতগণ প্রতিদিন দবগাহে ধূপ-বাতি দিবে থাকেন। প্রতি শুক্রবার সেখানে বহু ভক্ত-যাত্রীর সমাগম হয়। তাঁরা শিবনি হাজত ও মানত দিবে থাকেন। ভক্তগণ বোগমুক্তির আশায় ফুল, তেল, মাটি ও পানি গ্রহণ করেন। তাঁরা গাহেব প্রথম ফল, গাভীর প্রথম দুধ, মিষ্টি প্রভৃতি পীরের দবগাহে দান করেন। প্রতি

পৌষ সংক্রান্তিতে ওরসের সময় দশ-বারো দিন ধরে গড়ে প্রায় দুই হাজার জনসমাবেশ হয়। এই সময়ে এখানে মেলা হয়। সেই মেলার অত্যন্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে কাওরালী গান হয়। উৎসবের এই সময়েও বহু ভক্ত লুট দেন। বহু বহু নারী সন্তান লাভের আশার দরগাহের গারে ইট ঝুলিয়ে থাকেন এবং ইঙ্গিত ফল লাভের পর জাঁক-জমকের সাথে দরগাহে এসে, মানত দান করেন এবং সেই বদলানো ইট ঝুলে দিয়ে যান।

পীর হজরত শাহ্ চাঁদ রাজার জীবনী ভিত্তিক কোন সাহিত্যের সম্বন্ধ পাওয়া যায় না।

পীর শাহচাঁদ রাজার যেহেতু পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজার সঙ্গে এই অঞ্চলে এসেছিলেন, তাতে অনুমান করা যেতে পারে যে তিনি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর ধর্মপ্রচারক।

অধারমানিক গ্রামে মাটির নীচে বহু পুরানো কালের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এই ভগ্নাবশেষ থেকে অনুমিত হয় যে এখানে কোন ঐতিহাসিক তথ্য অবশ্যই নিহিত আছে।

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত হবিগুব গ্রামের পীর হজরত হাসান রাজার নামের অপভ্রংশে ব্যবহৃত ‘সাসান’ বা শাহচাঁদ আর অধারমানিক গ্রামের শাহচাঁদ যে একই ব্যক্তি তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব তাঁর গ্রন্থে ঐ দুই স্থানের দুই পীরকে একই ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেন নি।

শাহ চাঁদ নামধারী আর একজন বিখ্যাত আউলিয়ার নাম পাওয়া যায়। তাঁর মাজার শরীফ আছে চট্টগ্রাম জেলায় ‘পট্টরা’ থানার নিকটবর্তী জীমতি খালের ভীরে। কথিত আছে যে, তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং দিল্লীতে আত্মগোপন করে বাস করতেন। ঘটনাক্রমে তাঁর কেবামত বা অলৌকিক শক্তির কথা প্রকাশ পায়। জর্নৈক শাহজাদী তাঁকে বিয়ে করতে চান। তখন দরবেশ শাহচাঁদ পালিয়ে চট্টগ্রামে আসেন। কিছুদিন পরে শাহজাদীও লোকজনসহ চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। তারপর হঠাৎ একদিন সেই দরবেশ ইন্তেকাল করেন। তিনি যোল শতকে জীবিত ছিলেন। ৩১

শাহচাঁদ দিল্লী থেকে চট্টগ্রামে যাবার পথে অধারমানিক নামক গ্রামে অবস্থিতি করেছিলেন কিনা জানা যায় না। অথবা উক্ত দুই শাহ চাঁদ একই

ব্যক্তি কিন। তাবও কোন প্রমাণ নেই। শেষোক্ত শাহ চাঁদের সমাধি এই গ্রামে আছে বলে মনে হয় না। চট্টগ্রামের পীর শাহ চাঁদ ষোড়শ শতাব্দীর লোক হওয়ায় পীর গোবাচাঁদ ও সমকালীন পীর শাহ চাঁদের চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যকার ব্যবধানকে উপেক্ষা করা যায় না। অতএব কেবলমাত্র নামের মিলগত ভিত্তিতে উক্ত দুই পীরকে একই ব্যক্তি বলে মনে করার কোন কারণ নেই। তবে যদি চট্টগ্রাম বা বসিরহাটের অধিবাসনিক গ্রামের যে কোন একটি পীরস্থানের পক্ষে কাল্পনিক পীরস্থান বলে প্রমাণিত হওয়ার মত তথ্য পাওয়া যায়, তবে উভয় পীরকে এক ব্যক্তি বলে মনে করার কোন বাধা নেই।

নোয়াখালি জেলার উত্তর হাতিঘাটে জৈনক হজরত চাঁদশাহ সাহেবের মাজার শরীফ আছে বলেও জানা যায়। ৩১

পীর হজরত শাহ চাঁদ রাজীব কর্তিকলাপ বিষয়ক জীবনী না পাওয়া গেলেও এতদ্ অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি লোককথা থেকে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। সে লোককথাগুলি নিম্নকপ,—

### ১। রাজমনির দহ

অধিবাসনিক নামক গ্রামের পাশ দিয়ে স্রোতধিনী ইচ্ছামতী প্রবাহিত। ঐ গ্রাম সংলগ্ন ইচ্ছামতীর এক শাখা এই স্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে। এই গ্রামে বাস করতেন এক ব্রাহ্মণ রাজা। এই অঞ্চলে পীর শাহ চাঁদ ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে আগমন করলে রাজা তাঁকে সুনজরে দেখেন নি। ক্রমান্বয়ে প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে উক্ত রাজার সঙ্গে পীর শাহ চাঁদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অধিবাসনিক অঞ্চলের রাজা ছিলেন দক্ষিণের আঠারো ভাটীর রাজা দক্ষিণ রায়েব ভক্ত। তিনি দক্ষিণ রায়েব সহায়তার ভূত-প্রেতকে পীরের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেন। পীরের পক্ষেও ছিল তাঁর বাহন বাঘ ও কুম্বীব। বাঘ ও কুম্বীব সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। উভয় পক্ষে ভূমূল যুদ্ধ হয়। কিন্তু পীরের অলৌকিক শক্তিবলে রাজার পবাক্সর ঘটে। রাজা তখন আত্মসম্মান বক্ষার্থে সপরিবারে গ্রামসংলগ্ন ইচ্ছামতীর শাখা নদীর মধ্যস্থ বাওডের জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন। বাঘ উপাধিধারী সেই রাজার নাম অনুসারে ঐ বাওডের দহেব নামকরণ হয়েছে রাজমনির দহ।

## ২। নাটাম ফাটাম

পীর শাহ্‌চাঁদ একজন সাধারণ ফকিরের রূপ ধরে এতদ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন প্রাতঃকালে তিনি অসাধারণ শ্রমের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। চলতে চলতে দেখতে পান যে একজন চাষী ভাব ক্ষেতে চাষ কাজে ব্যস্ত আছে। সেই চাষী সেখানকার জমিতে কি ফসল কববে পাবে তা জানবার কৌতুহল হল। তিনি জিজ্ঞাসা কবলেন,—“কিসের বীজ বুনছ ভাই?”

কৃষকটি ফকির সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখল। সামান্য একটা ফকিরের এত খোঁজ নেওয়া কেন। সে তাকিয়া ভবে বলল,—“নাটাম-ফাটাম”।

‘নাটাম-ফাটাম’ হল একজাতীয় বগ্ন কাঁটা-গুল্ম,—যা মানুষের কোন কাজে লাগে না,—বরং ফসল কবাব সময় এগুলি উৎখাত করতে বড়ই কষ্ট হয়।

তাকে অবহেলার ভাব পীর শাহ্‌ চাঁদ বুঝতে পাবলেন। তিনি কোন বিবক্তির ভাব প্রকাশ কবলেন না। মনে মনে ঈর্ষা হেসে বললেন,—“তাই হোক!” এই বলে তিনি সেই স্থান ত্যাগ কবলেন।

যথা সময়ে বীজ থেকে যখন চাষা বেব হল, ছোট ছোট চাষা দেখে সেই চাষী তখনও বুঝতে পাবে নি ব্যাপারখানা কি। কয়েকদিন পরে সে দেখল যে, সে চাষাগুলি ‘নাটাম-ফাটামের’ চারা ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং সমস্ত জমিতে তা নিবিড়ভাবে ছেয়ে ফেলেছে।

## ৩। অসাধারণ শ্রমিক

অসাধারণ শ্রমিক গ্রামের বার উপাধিকারী ব্রাহ্মণ রাজার সঙ্গে পীর শাহ্‌ চাঁদ রাজার দ্বন্দ্ব দেখা দিলে প্রথম অবস্থায় রাজা পীর সাহেবকে কাবাগাবের সঙ্গে কক্ষে অবরুদ্ধ কবে বেখেছিলেন তা ছিল অন্ধকার-আচ্ছন্ন। প্রবাদ,—পীর অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ থাকার অনুকূপ অন্ধকার নেমে এসেছিল এই গ্রামে। অকস্মাৎ গ্রাম অন্ধকার-আচ্ছন্ন হওয়ার গ্রামবাসী বিস্মিত হল। কোন কারণ বুঝতে না পেলে তারা হার হার কবে উঠল। সাতদিন ধরে গ্রামখানি অসাধাবে ঢেকে বইল।

পীর শাহ্‌ চাঁদের ভক্তগণ তখন স্মরণ কবলেন তাঁকে। সেই আকুতিতে

সাড়া দিলে পীৰ সাহেব জনৈক ভক্তকে স্বপ্নে বল্লেন,—“আল্লাহ্ তালাব নাম স্মরণ কৰে ফু দাও, আলো ফুটে উঠবে।”

নিদ্রাভঙ্গে সেই ভক্ত, ঘটনাটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। জনসাধারণ অবহিত হলেন এবং পীৰেব নির্দেশ মত ফু দিতেই দেখা গেল পীৰ যে অঁধার কাবাগাৰে অবকদ্ধ আছেন সেখানকাৰ সামান্য একটা ছিদ্র পথ বেয়ে উজ্জ্বল আলোৰ বশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই আলোৰ বশ্মিৰ আভাসে গ্রামে যেন ভোৰ এগিষে এসেছে।

সেই অভূতপূৰ্ব ঘটনাৰ কথাৰ সকলে বিস্মিত হলেন। বাণীও বাজপ্রাসাদের ছাদ থেকে সেই বিচ্ছুরিত আলোৰ বশ্মি দেখে বিমুগ্ধ হয়ে যান। পীৰেব অলৌকিক শক্তিৰ পরিচয় পেয়ে বাণী তৎক্ষণাৎ পীৰ সাহেবকে কাবাগাৰ থেকে মুক্ত কৰাব আদেশ দিলেন। প্রহৰী ছুটে গিলে কাবাগাৰেৰ দ্বাৰ মুক্ত কৰে দিল; কিন্তু হাৰ। পীৰ তো সেখানে নেই,—তিনি অনেক আগেই অন্তৰ্হিত হয়েছেন।

পীৰ শাহ চাঁদেব অঁধাৰ কাবাগৃহে অবস্থানকালে সেখানে মাণিকের দ্বাৰ উজ্জ্বল আলো দেখা গিবেছিল বলে এই গ্রামেব নামকরণ হয়েছিল ‘অঁধাৰ মানিক’।

পীৰ হজবত শাহ চাঁদ বাজীৰ নামে হিন্দু-মুসলমান সকলেই অসীম ভক্তাসহকাৰে দৰগাহে শিবনি, হাজত এবং মানত দিলে থাকেন। এখানে হবিলুটেব দ্বাৰ পীৰেব লুট প্রদত্ত হয়। জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলেই সন্তান কামনাৰ ভক্তিসহকাৰে তাঁৰ দৰগাহে ইট ঝুলিষে দেন এবং ঈঙ্গিত ফললাভের পৰ সেই দৰগাহে এসে সাউদৰে মানত প্রদান কৰে যান।



## অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

### সাভরন গাঁও

পীর হজরত সাভরন রাজীব মাজার বা দবগাহ উত্তর চব্বিশ পরগনা বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ নামক গ্রামে অবস্থিত। তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় না। আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে হিঙ্গলগঞ্জ (জ নহে, শু) নামক স্থানে হজরত মোহাম্মদ ফাজিল রাজী নামক এক দববেশ ইসলাম ধর্ম প্রচারকজ্ঞে আগমন কবেছিলেন। হিঙ্গলগঞ্জ নামটি হিঙ্গলগঞ্জ নামের অপভ্রংশ কিনা প্রমাণ সাপেক্ষ।

পীর হজরত সাভরন রাজীব দরগাহটি ইটের তৈয়ারী। দরগাহটি প্রাচীর বেষ্টিত। চারিপাশে গুলতায় সমাকীর্ণ। দরগাহ-সংলগ্ন জমির পরিমাণ প্রায় দুই-তিন বিঘা। দবগাহের পাশে পূর্বে এবং পতিত জমিতে বিবাটাকার কয়েকটি গম্বুজাকৃতি পাথর আছে। পাথরের বড় কালো এবং তাতে কারুকর্ম করা। দবগাহের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন ইটের তৈরী ধ্বংসাবশেষ। ধ্বংসাবশেষটিকে মন্দির বলে অনুভূত হয়। এম গায়ে কিছু কিছু কারুকর্ম দৃষ্ট হয়। লতা পাতা ফুল অঙ্কিত কারুকর্ম দেখে মন্দিরের গায়ে ইসলামি আদর্শে মূর্তিবিহীন উক্ত প্রতীক চিত্রের সন্নিবেশ হয়েছিল বলে মনে হয়। স্থানটি গবেষণা সাপেক্ষ।

উক্ত দরগাহের সেবাযেত মহম্মদ হারাম আলি শাহজী (৬০) জানান যে, তাঁরা বংশ পূর্বপুরুষ পীর হজরত সাভরন রাজীর উক্ত মাজার-শরীফে ধূপ-বাতি দিবে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে জিয়ারত কবে আসছেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শেষ শুক্রবারে সেখানে এক দিনের বিশেষ উৎসব হয় এবং মেলা বসে। সে মেলায় প্রায় হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। তাছাড়া প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে উৎসব সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলিম উত্তরণ হাজত, মানত ও শিবনি দিবার প্রতীক-প্রতিজ্ঞা স্বরূপ ইট বাঁধেন।

পীর হজরত সাভরন রাজীব আলৌকিক কীর্তিকলাপ সম্পর্কিত কয়েকটি লোক কথা হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

### ৩। বালক সে নয় সামান্য

হিজলগঞ্জৰ পূৰ্ব সীমান্ত দিৱে শ্ৰোতৱতী ইছামতী মতান্তৰে কালিন্দী প্ৰবাহিত। পীৰ সাভৰন একদিল ভ্ৰমণ কৰতে কৰতে নদীৰ তীৰে উপবেশন কৰেন। তখন তাঁকে একজন সাধাৰণ বালকৰূপে দেখা গেল। তিনি বসে বসে নৌকাৰ আনাগোনা লক্ষ্য কৰেছিলেন।

এক সওদাগৰ তাঁৰ সওদা বোঝাই বজ্জৰা নিযে যাচ্ছিলেন উত্তৰাভিমুখে। বজ্জৰাটি তাঁৰ কাছাকাছি এল। বালক পীৰ সাভৰন হৈঁকে তাকে জিজ্ঞাসা কৰলেন,—“মাঝি ভাই। তোমাৰ নৌকায় কি আছে?”

মাঝি অবহেলা ভবে বালককে প্ৰশ্নৰ কোন জবাব দিল না। বালক আবার প্ৰশ্ন কৰলেন। সওদাগৰ বিবস্ত্ৰ হৰে জবাব দিলেন,—“লতা-পাতা আছে।”

সওদা বোঝাই বজ্জৰা সেই বালককে অবজ্ঞা কৰে এগিৰে চলল। কিয়দূৰ যাওঁবাৰ পৰ জটনক মাঝিৰ নজৰে পড়ল যে নৌকায় যে সব মাল-পত্ৰ ছিল তা নেই,—সেই সব জাহগায় আছে শুধু লতা-পাতা। সংবাদ গেল সওদাগৰেৰ কানে। সওদাগৰ হলেন বিস্মিত, হলেন নিৰ্ব্বাক। তিনি বুৰতে পান্হলেন, প্ৰশ্নকৰ্তা সেই বালক সাধাৰণ বালক নহ। সওদাগৰ বজ্জৰা ফেৰাতে নিৰ্দ্দেশ দিলেন। কিৰে এল নৌকা হিজলগঞ্জে। নদীৰ তীৰে অনুসন্ধান কৰলেন সেই বালককে। কোথাও তাঁৰ সন্ধান পাওঁবা গেল না। সওদাগৰ বজ্জৰা থেকে নেমে প্ৰবেশ কৰলেন গ্ৰামে,—জিজ্ঞাসা কৰলেন সামনেৰ গ্ৰামবাসীকে। গ্ৰামবাসী অনুমান কৰলেন—এ বালক নিশ্চয় জাগ্ৰত পীৰ সাভৰন। লোকেৰ পৰামৰ্শক্ৰমে সওদাগৰ গেলেন পীৰেৰ আন্তানায়। পীৰকে প্ৰণতি জানালেন, প্ৰাৰ্থনা কৰলেন মাজৰ্ণা। প্ৰতিজ্ঞা কৰলেন,—আৰ কখনও সামান্যকে সামান্য-জ্ঞান কৰবেন না,—অসামান্যকপেই সন্মান কৰবেন। পীৰ সাভৰন আন্তোষ। সওদাগৰকে তিনি মাজৰ্ণা কৰলেন। বজ্জৰাৰ লতা-পাতা কপান্তৰিত হল যথাযথ পণ্যসম্ভাবে। সওদাগৰ পুনৰাৰ পীৰকে প্ৰণতি জানিয়ে প্ৰত্যাবৰ্তন কৰলেন।

### ২। হীৰা-জিৱা

হিজলগঞ্জে নাকি এক কালে বাস কৰত দুই জন বাঁৰবগিতা। নাম তাদেৰ যথাক্ৰমে হীৰা ও জিৰা। তাৰা বড় দান্তিক। সাধাৰণতঃ তাৰা পুৰুষ

মানুষকে অবজ্ঞা করত। ফকির বেশধারী আত্মভোলা পীর সাভরনকেও তারা মান্য কবত না।

একবার পীর সাহেব আপন মনে বাস্তাব ধারে বসেছিলেন। হীবা ও জিরা সেই পথে কোথায যেন যাচ্ছিল। পীরের দিকে ফিবে তাবা নানকপ কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গী কবছিল। এদের মধ্যে একজন মন্তব্য কবল পীর সাভরনকে লক্ষ্য করে,—“হিজড়ে” অর্থাৎ নপুংসক।

পীর সাহেব তাদের দিকে তাকালেন না কিন্তু অবজ্ঞা-সূচক মন্তব্য শুনে ক্ষুব্ধ হলেন এবং দৃঢ়চিহ্নের পুরুষ হিসাবে তাদের পথ এমন ভাবে অববোধ কবলেন যাতে তারা তাদের গুরুতর অপরাধের কথা বুঝতে পেবে লজ্জিত হল। তারা ভৎক্ষণাৎ পীরের নিকট অবনত মস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা কবল।

পীর সাভরন আশুতোষ। তিনি ক্ষোভ সংবরণ কবলেন এবং ক্ষমা করলেন।

পরবর্তী জীবনে হীবা ও জিরা তাদের জীবনধারা পরিবর্তন কবে এবং আজীবন পীরের সন্নিধানে পবিত্রভাবে জীবন যাপনের সাধনার আত্মনিয়োগ করে।

হীবা ও জিরা কবব স্থান আজো এই গ্রামেই পবিত্রস্থ হই।

### ৩। পীরের তৈজস পত্র

হিজলগঞ্জ গ্রামে সাভরনের নামে একটি পুকুর আছে। অনেক দিন আগেব কথা। পুকুরে নাকি অনেক তৈজসপত্র, যেমন—খাল, বাসন, হাঁড়ি, কড়াই, হাতা, খুন্টি, জগ, ডেকটি প্রভৃতি ছিল। পুকুরের কোন এক গুপ্তস্থানে সে সব থাকত।

গ্রামবাসী কারো বাড়ীতে বা বাবোয়ানবী কোন অনুষ্ঠানে যখন উক্তকপ তৈজসপত্রের প্রয়োজন হত তখন গৃহকর্তা অথবা পাড়ার মোডল বা নেতা শুদ্ধ বসনে, শুদ্ধ মনে সন্ধ্যায় পীরপুকুরের ধারে একাকী আসতেন এবং পীরকে উক্ত অনুষ্ঠানের সফলতার আশীর্বাদ লাভের জন্য ভক্তিপূর্ণ নিমন্ত্রণ জানাতেন। সেই সাথে তিনি অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রের প্রার্থনা কবতেন।

পর দিন প্রাতঃকালে গুচি-স্নিগ্ধ হয়ে কিছু লোক পুকুরের ধারে যেত এবং তারা সেখানে প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র প্রাপ্ত হত। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে সে সব তৈজসপত্র পবিত্রাব-পরিচ্ছন্ন করে সন্ধ্যাকালে পীর পুকুরের জলে ডুবিয়ে বেধে আসতে হত।

পৰবৰ্তীকালে কোন্ এক ব্যক্তিৰ অশোচ আচৰণেৰ কাৰণে সে সৰ তৈজসপত্ৰ নাকি আৰ পাওয়। য়ায় না।

৪। একেৰ পাশে দশেৰ সাজ।

এক মদ্যপায়ী উন্নত অবস্থায় একটা খালি মদেৰ বোতল নিক্ষেপ কৰে হিংস্ৰগঞ্জৰ পীৰপুকুৰে। পুকুৰেৰ পানি হয়ৈ য়ায় অপবিত্ৰ। গ্রামেৰ লোক অজ্ঞান্তে সেই পুকুৰেৰ পানি ব্যবহাৰ কৰে ব্যাপকভাবে আক্ৰান্ত হয় কলেবা বোগে। তেবো জন লোকেব মৃত্যুও ঘটৈ তাতে।

গ্রামবাসী হতচকিত হল। তাবা অসহায়বোধে পীৰেৰ নিকট গেল। পৌৰ জ্ঞানালেন সেই মদ্যপায়ী কর্তৃক পুকুৰেৰ পানিতে নিক্ষিপ্ত মদেৰ খালি বোতলেৰ কথা।

তখন মদ্যপায়ী গ্রামবাসী কর্তৃক ভৎসিত হল। তাৰা শবণ নিজ পীয়েৰ : তাবা একপ গৰ্হিত কাজ আৰ না কবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে পীৰ আপনাৰ অলৌকিক শক্তিতে পুকুৰেৰ পবিত্ৰতা ফিবিৰে আনেন,—ফিবে আসে গ্রামেৰ শান্তি।



## উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

### সাহান্দী সাহেব

পীর হজরত সাহান্দী বাজীর আস্তানা উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলাব নসিরহাট মহকুমাব হিজলগঞ্জ থানাব অন্তর্গত বাঁকড়া নামক গ্রামে। তাঁব জন্ম তাবিখ, জন্মস্থান, মৃত্যু তাবিখ প্রভৃতি অজ্ঞাত। তাঁব কর্মধাবার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁব প্রভাবাধীন এলাকা বেশ অনেকদূর পর্যন্ত পৰিব্যাপ্ত।

পীরেব দরগাহ-গৃহেব দেওয়াল ইটের তৈরী, উপবে খড়ের চালের আচ্ছাদন। স্থানটি দেখতে একটি ছোট তপোবনের মতন। ছোট কয়েকটি বাঁশ বাড় বয়েছে এক পাশে। দরগাহটি বহুবাটুল, অশ্বখ, জাম, গাব, শিবিষ প্রভৃতি গাছেব ছায়ায় আচ্ছন্ন। দরগাহ সংলগ্ন পীরোস্তব বলে কথিত জমিব পরিমাণ প্রায় তিন-চাব বিঘা। দরগাহেব সমাধি বলে চিহ্নিত বিস্তৃত ভূমিব গায়ে বেশ কয়েকটি গর্ত বয়েছে। তাব মধ্যে নাকি আছে বিষধ সাপ। দরগাহেব দক্ষিণাংশে বয়েছে বনবিবিব 'থান' এবং উত্তরাংশেব মাজারটি পীর হজরত সাহান্দী বাজীর ছোট ভাই-এব মাজার বলে কথিত। এখানেই আছে সাহান্দী পীরেব নামে একটি পুকুরও।

দরগাহেব অত্যন্ত সেবাযেত মোহাম্মদ হাবিল সবদাবেব (৬০) কাছ থেকে জ্ঞান। যাৰ তাঁব বহুপুত্র পূর্বেব 'ভ্রমব' কিংবা 'সদাই' নামক জনৈক ব্যক্তি বাঁকড়া নামক উক্ত গ্রামে এসে বসতি স্থাপন কবেন। তখন এখানে ছিল গভীর জঙ্গল। তিনি জঙ্গল কেটে আবাদ কবতে গিবে এই মাজার বা কবরস্থান দেখতে পান। সেই দিন শেষে বাত্রে স্বপ্নে পীরেব পৰিচয় পেবে পরেব দিন থেকে দরগাহেব সেবাৰ ভাব গ্রহণ কবেন। তাঁদেব বংশ তালিকাৰ সদাই সবদাব, দুর্লভ সবদাব প্রভৃতি নাম থেকে অনুমিত হয় যে ঐরা মূলতঃ হিন্দু ছিলেন। কবে কিভাবে তাঁব মুসলিম হয়েছিলেন তা জানা যায় না। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর সত্তর শতকে এই বাঁকড়া গ্রামে তাঁদেব নবম পুত্র চলছে। অতএব পীর সাহান্দী সাহেবেব মাজার শরীফটি যে প্রায়

দুই শত বছরের বেশী প্রাচীন ভাতে সন্দেহ নেই। সেবাবেতগণ প্রতিদিন নিম্নমিতভাবে পীবেব মাজ্জাবে হুগ-বাতি দিয়ে জিয়ারত করেন। হিন্দু-মুসলমান ভক্তগণ পীবেব দরগাহে দুধ, ডাব, ফল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি মানত প্রদান করেন। বোগমুক্তি বা মঙ্গল কামনার ভক্তগণ ঐ সব মানত কবে থাকেন। তাছাড়া হাজত এবং শিবনিও প্রদত্ত হবে থাকে। অনেক রুমণী সন্তান কামনা করে দরগাহের চালে ই-ট বাঁধেন। অনেকে ইঙ্গিত ফল লাভ কবে পীবেব 'থানে' 'হত্যা'—দিয়ে থাকেন। হত্যা-দানকারীগণকে সেবাবেতগণ সেবা গুস্ত্রা করেন।

প্রতি শুক্রবারে সাহান্দী সাহেবের দরগাহে বহু ভক্তের সমাগম হয়। ঐ দিন তাঁরা হাজত, মানত বা শিরনি প্রদান করেন। ইদ্দজ্জোহা, বকরুদ্দীন, ফাতেহা ইরাজদহম্ প্রভৃতি অনুষ্ঠান এখানে ষথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। তখন প্রতি অনুষ্ঠানে প্রায় চার-পাঁচ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। তাছাড়া প্রতি বৎসর পরলা মাঘ তারিখে পীরের উরস উপলক্ষে বিশেষ উৎসব ও মেলা হয়। বিশেষ অনুষ্ঠানে মুসলিম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকেন।

পীর সাহান্দী সাহেবের দরগাহে যে সব উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান-রীতিটি উল্লেখযোগ্য :—

### ১। ফুলের পডন—পীরের দয়া

পীবেব দয়া যে লাভ করবে তার মতন ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী আর কে আছে। ঈঙ্গিত ফল লাভ কবতে তাই পীরের দয়া আগে চাই। পীরের দয়া পাওয়া গেল কিনা আগে বুঝতে গেলে দয়াপ্রার্থীকে কিছু কৃচ্ছসাধন করতে হয়।

প্রতি শুক্রবার একটি বিশেষ দিন। দয়াপ্রার্থী ভক্ত ঐ দিন দরগাহে উপস্থিত হবে তার মনোবাসনা সেবাবেতের নিকট ব্যক্ত করেন। ভক্তকে ফুল ও পবিচ্ছন্ন কলা-পাতা আনতে হয়। হুপুরের দিকে বহু ভক্তের সমাগম হয়। ভক্তগণকে সাধাৰণতঃ 'ষাজী' বলে। সেবাবেত হুপুবে উপস্থিত হবে পীরের সমাধিস্থানের একপাশে একটি ইটের উপর কলা-পাতা রাখেন। সেই কলা-পাতার উপর রাখেন ষাজীর দেওয়া ফুল। সে ফুলের ওপর আবার একটা কলা-পাতা দেওয়া হয়। সর্বশেষে সে পাতাটিও আর একখানি ইটের দ্বারা চাপা দেন। পাশেই ষাজী আপনার কাপড়ের আঁচল বিছিয়ে বসে থাকেন

পীরের দয়ার ঐতীক চিহ্ন সেই চাপা দেওয়া ফুল পাওয়ার জন্য। এবার  
 স্বামীকে বৈর্য পরীক্ষা দিতে হয়।

যাব ভাগ্য সত্ত্বব সুগ্রসন্ন হয় তাব ফুল ভাডাতাড়িই পড়ে। কখন বা দু'দিন  
 ঘন্টাও দেবী হয়। পীবেব আলৌকিক শক্তিতে সেই চাপা-দেওয়া ফুল  
 ইটের ওপৰ থেকে গড়িয়ে নীচে এসে পড়ে। স্বামীগণ তখন উৎফুল্ল হ'বে ওঠে।  
 সেবাযেত ফুলটি স্বামীর আঁচলে দিয়ে দেন। স্বামী ফুলটি তখন পবয়  
 ভক্তিভাবে নিষে মাথায় ঠেকিয়ে আঁচলে বেঁধে নেব। ফুল ধুয়ে সেই পানি  
 গ্রহণ করলে ঈশ্বিত ফল যথা,—বোগমুক্তি, সন্তানলাভ প্রভৃতি লাভ হয় বলে  
 অনেকের বিশ্বাস। প্রথম দিন ফুল না পড়লে স্বামীকে পববর্তী অনুষ্ঠান-  
 দিবসে ঠিক একই ভাবে অপেক্ষা করতে হয়।

পীৰ সাহান্দী সাহেব সম্পর্কিত কয়েকটি আশ্চর্য্য লোককথা বাকডা-  
 হিন্দলগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

### ১। ফকিরের গাছভলা

স্থানীয় এক ধনবান ব্যক্তি। নাম তাঁব গোলাম বহমান। জীবনে তিনি  
 অনেক কাজ করেছেন। যে ভাবেই হোক লোকে তাঁব নাম করে।  
 মৃতরাং পীর সাহান্দী সাহেবের নামে কিছু ধমবাতি তো ক'বা চাই। তাই  
 তিনি ঘোষণা কবলেন যে পীবেব সমাধি সংস্কার কবে দেবেন।

পীরের সমাধিটি আছে গাছেব তলায়। সামান্য খুঁটিব ওপৰ খড়ের  
 চালের নামমাত্র আচ্ছাদন। গোলাম বহমান খুব করলেন যে দবখাহটি  
 পাকা করে প্রাসাদের মতন কবে দেবেন।

বাজমিস্ত্রী নির্দিষ্ট ক'বা হল। ঠিক ক'বা হল তাব সহযোগী মজুব।  
 যথোপযোগী ইট সংগ্রহীত হল। ঘটনাটি গ্রামে গ্রামে রটনা হ'বে গেল।  
 নির্দিষ্ট দিনে বাজমিস্ত্রী এল, এল তাব সহযোগী আব এল গ্রামেব অনেক  
 ভক্ত সেই কাজে সহায়তা কবতে। কাজ আবস্ত ক'বার উদ্যোগ নিতে গিয়ে  
 ঘটে গেল আব একটি অন্ত্যুত ঘটনা।

গোলাম বহমান ছুটতে ছুটতে দরগাহে এসে প্রথম কথা বললেন,—“বন্ধ

কি ব্যাপার ! গোলাম রহমান গতবাজে স্বপ্নে দেখা বৃত্তান্ত সকলকে শোনালেন । পীর স্বপ্নে তাঁকে বলেছেন,—“আমি খোদার সেবক, আমি ফকিব, ঐশ্বর্য্য আমার জন্ম নয় । কুঁড়ে ঘর গাছেব তলাই আমার উপযুক্ত স্থান ।”

পীরেব কথা গোলাম রহমানের কাছে শুনে সকলে বিস্মিত হল । সত্যই তো, পীর কত মহান ।

পীর সাহান্দী সাহেবেব দরগাহ তাই গাছতলাব কুঁড়ে ঘবেই আছে,—  
প্রাসাদ আব হল না ।

## ২ । সওগত গাজী

বাঁকড়া গ্রামের সওগত গাজীকে ঐ গ্রামের লোক ব্যতীত করজনে চিন্ত । সে চেনা হয়ে গেল একটা ঘটনায় ।

সওগত গাজী তাব মাকে মোটেই শ্রদ্ধা করত না । এমন কি মাঝে মাঝে মাকে প্রহাব করত । একদিন কি একটা ঘটনায় তার মাথায় খুন চেপে যায় । মারুতে মারুতে শেষ পর্য্যন্ত সে তার মাকে মেবেই ফেলে । চাবদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল ।

কিছুদিন যেতে না যেতে সওগত কি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হল । কত কবিরাজ, কত ডাক্তারেব শরণ নিল সে । সবাই জবাব দিলে দিলেন,—  
অস্ত্র জাযগাব দেখ, দেখ তোমার ভাগ্য ।

সওগতেব মন বলছে, এ তাব মাতৃ-হত্যার শাস্তি । লোকে বলছে—পীর সাহান্দী সাহেবেব জায়গীবেব মধ্যে এত বড় অস্ত্রের কাজ । এ শাস্তি কমা নেই ।

রোগ যন্ত্রণাব সওগত কাতর । উঃ ! এ যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যুও ভাল । পীরেব কাছে সে কোন্ মুখে কমা প্রার্থনা করবে ।

না, আব পাবা যায় না, আর সহ করা যায় না । সে কাদতে কাদতে, চীৎকার করুতে করুতে ছুটে দরগাহ এসে আছাড় খেয়ে বল্ল,—‘হে পীর, আমার মৃত্যু দাও, আমার কমা কর, আমার মার্জনা কর, ইত্যাদি ।



দিন গেল, রাত গেল, আবার দিন গেল, রাত গেল। কত কাকুতি-মিনতির পর পীর স্বপ্নযোগে বললেন,—“তোব মায়ের কবর ধৌত কবে সেই পানি কিছু খাবি।”

সুগত গাজী ভক্তি ভাবে তাই করল। কিছুদিন পরে সে রোগমুক্ত হল বটে কিন্তু সে অল্পদিনেই মৃত্যুমুখে পতিত হল।

৩। সাপ, না মাগুর মাছ

কে একজন হুরাবোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। পীরের প্রতি তার বিশ্বাস তেমন নয়। ডাক্তার, কবিরাজের শরণাপন্ন হল সে। কিছু তো তাতে হল না। গেল হাসপাতালে এবং তেমন কিছু উপকার হচ্ছে না দেখে এল পালিবে। এবার শুধু পীরের দরগাহে যেতে বাকী।

পীরের দরগাহের কোন ঔষধ একবার খেবে দেখলে হত। কত লোক নাকি উপকার লাভ করে। একবার দেখা-ই থাক না কেন,—সে মনে মনে বলল।

একদিন ভোবে, তখনও কিছু অঁধার আছে। ঐ ব্যক্তি পীরের নাম স্মরণ করে একায়ে মনে গেল দরগাহে। তখন তার মনে কি এক অলৌকিক শক্তি ভর করেছে। দরগাহে যা পাবে তা এনে সে পীরের নাম স্মরণ কবে খেলে তার রোগ সেরে যাবেই যাবে—এমন দৃঢ় ধারণা হল।

সে কি! দরগাহের উপর একটা ছোট সাপ ঘোরাঘুরি করছে। দোহাই পীর সাহেব। যা থাকে কপালে। তীক্ষ্ণ মনোবল নিয়ে সে ধবে ফেলল সাপটি। তাকে আনুল বাড়ীতে। এটিই সে রান্না কবে খাবে। চাপা দিয়ে রাখল চুপড়ীর দ্বারা।

দুপুরে সেই সাপ কাটবার জন্য চুপড়ী খুলে তো অবাক! কোথায় গেল সাপ। এ যে মাগুর মাছ।

উক্ত ব্যক্তি সেই মাগুর মাছ তরকারিরূপে ভাতের সঙ্গে খেবে সম্পূর্ণরূপে বোগমুক্ত হয়েছিল।

পীর সাহান্দী সাহেবের দরগাহে শ্রদ্ধা নিবেদন পদ্ধতিতে হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণ কিভাবে হয়েছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে। যথা,—

- ১। গাজনের সময় শিবের মাথাৰ ফুল দান করার ঠায় দরগাহে ফুল দানের প্রথা আছে। শিব-ভক্তগণের ঠায় পীর ভক্তগণ ভক্তিভাবে ফুলধোয়। জল ব্যবহার করেন।
  - ২। তাবেকেশ্বৰ-শিব বা অন্যান্য হিন্দু সংস্কৃতির ঠায় পীরের দরগাহে 'হত্যা' বা 'ধৰ্মা' দিবাব প্রথা প্রচলিত।
  - ৩। কালী মন্দিরের বা শীতলা মন্দিরের ঠায় এই দরগাহে ইট বা ঢেলা বীধার প্রথা আছে। সাধাবশতঃ সন্তান কামনার ঐক্লপ কৰা হলে থাকে।
-

## ঐশ্বৰ্য্য পৰিচয়

### হাসান গাঁৱ

পীৰ হজৰত হাসান বাজী বাইশ আউলিয়াৰ একজন হৈছে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰতে এসেছিলেন। পীৰ গোৱাচাঁদ এই ধৰ্মপ্ৰচাৰক দলেৰ নেতৃত্ব দিষেছিলেন। পীৰ হাসান ইসলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰেৰ দানিত পান বসিবহাট মহকুমাৰ হাসনাবাদ অঞ্চলে। হাসনাবাদ গ্ৰাম সংলগ্ন হবিপুৰ নামক গ্ৰামেই বৰেছে তাঁৰ মাজাৰ বা দৰগাহ। তাঁৰ সম্পৰ্কে বিস্তৃত বিবৰণ পাওযা যায় না।

হবিপুৰ গ্ৰামে অবস্থিত পীৰ হাসান বাজীৰ দৰগাহেৰ অন্ততম সেবাস্থত মোহাম্মদ আজিবৰ মোল্লা জানালেন যে সেখানকাৰ পীৰেৰ নাম “সাসান পীৰ”। কেহ মন্তব্য কবলেন ‘শাহ চাঁদ’ পীৰ। মনে হব ‘হাসান’ শব্দটি উচ্চাৰণ-ভাংগে ‘সাসান’ হৰেছে। তিনিই এতদ্ অঞ্চলে পীৰ ঠাকুৰ নামে সমধিক পৰিচিত।

পীৰ ঠাকুৰেৰ মাজাৰ সংলগ্ন প্ৰায় আট বিঘা জমি পীৰোস্তব আছে। সমাধিৰ উপৰ ইটেৰ তৈৰী দৰগাহ-গৃহ। মোহাম্মদ আবেদ মোল্লা প্ৰমুখ দৰগাহেৰ সেবাস্থত কৰ্তৃক এখানে নিষমিত ধূপ-বাতি প্ৰদত্ত হয়। প্ৰতি বৎসৰ মাঘ মাসেৰ প্ৰথম দিকে উবস উপলক্ষে মেলা বসে। পীৰোস্তব জমিৰ উপলক্ষ ফসলেৰ অৰ্থে জনসাধাৰণেৰ মধ্যে মিঠাই বিতৰণ কৰা হয়। হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ পীৰ ঠাকুৰেৰ দৰগাহে হাজত, মানত ও শিৰিনি দিৰে থাকেন। পীৰেৰ নামে গ্ৰামেৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়েৰ নামকৰণ কৰা হৰেছে।

পীৰ হাসান, কি পীৰ সাসান, কি পীৰ শাহ চাঁদ, কি পীৰ ঠাকুৰ—এ নিৰে অনেক মতেৰ মধ্যে আক্ষুণ্ণ গম্ভীৰ সিদ্ধিকী সাহেবেৰ বক্তব্য নিৰে কিছু আলোচনা কৰা যায়। সিদ্ধিকী সাহেব, পীৰ হাসানকে হাসনাবাদেৰ পীৰ বলেছেন। অনেক অনুসন্ধানও হাসনাবাদে পীৰ হাসানেৰ কোন স্থিতি চিহ্ন পাওযা গেল না। হবিপুৰ গ্ৰামটি একেবাবেই হাসনাবাদ গ্ৰাম সংলগ্ন। এককালে যে হবিপুৰ ছিল হাসনাবাদেৰই অংশ এমন অনুমান একেবাবে

ভ্রান্ত নয়। তা ছাড়া হরিপুর তো হাসনাবাদ থানারই অন্তর্ভুক্ত। সিদ্দিকী সাহেব যখন ঐতিহাসিক তথ্য পৰিবেশন করছেন বলে দাবী করেন তখন তাঁর ঐতিহাসিক পুস্তককে নস্যাৎ করা যায় না।

পীর ঠাকুর সম্পর্কে কয়েকটি লোক কথা উক্ত অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। তাদের মধ্যে দুটি লোককথা এইরূপ ;—

### ১। বাঁকা মুখী

একবার একদল ‘বেদে’ অর্থাৎ শাখাবর এল হবিপুর গ্রামে। তাবা তাঁরু ফেল্পে দরগাহের অস্থখ তলার। সেখানে তাদের দ্বারা অশৌচ আচরণও হয়। পীর তা সহ্য করেন। কোন ভক্ত তাদেরকে সেকপ করতে মানা কবেছিল। বেদের মান। তাবা শোনেনি। ফলে একবার একটা গুৰুতব ঘটনা ঘটল।

এক বেদেনীৰ খুব নেশা তামাক পোড়ার গুড়া মুখে নেওয়া। তামাক পুড়িয়ে এবং সেই সাথে অস্থ গাছেব পাতা পুড়িয়ে দুটে এক সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার কবতে হয়। বেদেনীৰ তামাকপোড়া বাখাব পাড়াটি ছোট। তাব তামাক পোড়ার গুড়া কিছু বেশী হয়েছে। বেশী গুড়া রাখার জন্য অস্থখ গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ল সেই বেদেনী। আব যাবে কোথাব। পীরেব কোপ পড়ল তাব ওপর। সেই পাতার গুড়া নিয়ে যেই সে মুখে দিল অমনি বঁেকে গেল তাব মুখ। তাব সে কি নিদাকণ কষ্ট। হট্ফট্ কবে বেড়াতে লাগল সে।

গ্রামবাসী একজন এসে শুনলেন সব বৃত্তান্ত। তিনি বল্লেন,—“কেন, তোমবা তো পীরকে গ্রাহ্য কব না। এবাব বোঝ ঠালাখানা।”

বেদেনী, বেদেনীৰ স্বামী, বেদেরেব সবদার আছাড় খেয়ে পড়ল পীরের দরগায়। অনেক কানাকাটি করল, ক্ষমা প্রার্থনা কবল তার। মাপ চাইল তাবা সকলের কাছে।

পীরের দয়া হল তাদের ওপর। কয়েক দিনেব মধ্যে বেদিনী নিবাময় হল। তাবা পীরেব খানে শিরনি দিবে সদলে স্থানান্তরে চলে গেল। তাই সেই বেদিনী সকলের নিকট ‘বাঁকা মুখী’ নামে সমধিক পৰিচিত।

শুধু উক্ত বেদিনী নয়। হবিপুর গ্রামেব জনৈক মহম্মদ আক্কাছ আলি ঐ ধবণেব অপবাদের জন্য শান্তি পায় এবং শেষে ক্ষমা প্রার্থনা কবায পীরের দয়ার নিষ্কৃতি লাভ কবে।

## ২। কবরের কলিকার আগুনের শিখা

পীর ঠাকুরের দবগার ধূপ বাতি দিবে' প্রতিদিন জিলাবত কবা হয় । এখানে বাতি জ্বালাবার একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে । ভক্তগণ প্রদীপ জ্বালিয়ে বাতি দেন । জ্বলন্ত প্রদীপ মাজাবের উপর রাখা নিষেধ । শুধু কলিকার উপর প্রদীপ বসিয়ে সেটি সবশুদ্ধ কবরের উপর বসানো যেতে পাবে ।

ভক্তগণ প্রদত্ত সেইকপ অনেক প্রদীপ সেখানে জমা হয় । আশ্চর্য ঘটনা এই যে মাঝে মাঝে পড়ে থাকা সেই কলিকার আকস্মিকভাবে আপনিই আগুন জ্বলে ওঠে । এইরূপ আগুন জ্বলে ওঠার অর্থ নাকি জাগ্রত পীরের নিদর্শন শিখা ।

---

## একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

### হায়দর গীর

পীর হজরত হায়দর রাজার আস্তানা ছিল উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার হাবড়া থানারীন একটি গ্রামে। খাঁটুরা-গোবরডাঙ্গার নিকটবর্তী উক্ত গ্রামের নাম হায়দাদপুর। মেদিয়া নামক গ্রাম-বেষ্টিত কঙ্কনা-বাঁওড়ের দক্ষিণ-পূর্বে হায়দাদপুরে পীর হায়দরের দরগাহ চিহ্নিত স্থান আজো বিদ্যমান।

পীরের দরগাহ-স্থানে কয়েকটি গুলত আছে। পণ্ডিত জারগার পরিমাণ প্রাচীণ বিদ্যাক্ষেত্র। অনেক ভক্ত সেখানে হাজত, যানত ও শিরনি দেন। উক্ত পীরের দরগাহে নাকি পূর্বে ধূপ-বাতি প্রদত্ত হত।

কঙ্কনা-বাঁওড় মূলতঃ যমুনা নদীর অবরুদ্ধ অংশ বিশেষ। কঙ্কনা-বেষ্টিত ভূভাগেব রাজা ছিলেন রক্তেশ্বর রায়। পীর হাযদর ইসলামের আদর্শ প্রচাৰের সময় রাজা রক্তেশ্বর রায় কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। কলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সংঘর্ষের শেষ পৰিণতিতে রাজা রক্তেশ্বর পরাজিত হন। পলায়ন ব্যতীত উপায় নেই দেখে রাজা যতদূর সম্ভব ধনবদ্ধ নিবে জলপথে বাজ্য ত্যাগে মনস্থ করেন। কিন্তু কঙ্কনার সঙ্গে তখন কোন নদীর যোগ ছিল না। উপায় না দেখে রাজা বিলম্ব না কবে কঙ্কনা থেকে যমুনা পর্য্যন্ত খাল কাটিয়ে নিলেন এবং সেই পথেই নৌকাযোগে প্রস্থান কবলেন। শোনা যায় তিনি নাকি সপরিবারে জগন্নাথ ক্ষেত্রেই গিয়েছিলেন। রাজা রক্তেশ্বর রায় কাটিয়েছিলেন বলে উক্ত খালের নাম হযেছিল রত্নাখালির খাল। কারো মতে রাজা রক্তেশ্বর কঙ্কনা-বেষ্টিত বাজ্যের রক্তসম্ভার শূন্য করে নিবে যে খাল দিয়ে দেশত্যাগ কবেছিলেন সে খালের নাম হযেছে বত্নাখালির খাল।

কঙ্কনা নামকবণের অনুকপ আরো প্রবাদ প্রচলিত আছে। রাজ্যের রাণীর হাতের কঙ্কন স্নানকালে বা নৌ-বিহারকালে ঐ জলাশয়ে পড়াব জন্য কঙ্কনা

নাম হযেছে। মতান্তরে কঙ্কনের ত্যায় বাঁওড়টি গোলাকৃতি বলে তাব নাম হযেছে কঙ্কনা।

পীর হাযদব কোথা থেকে আগমন কবেছিলেন তা নিশ্চিত কবে কোথাও বলা হয়নি। কাবো কাবো বক্তব্যে মনে হয় বর্গীদলের অভ্যাচাবে বাজা বক্তেশ্বর দেশত্যাগ কবতে বাধ্য হন। পীব হাযদব নাকি বাজার দেশত্যাগেব কথা শুনে তাঁকে দেশত্যাগ না কবতে অনুরোধ জানান এবং স্বাত্রাপথ পবিবর্তন কবে স্বদেশে ফিরে আসতে বলেন।

পীব হাযদব বা হৈদব প্রসঙ্গে একস্থানে বলা হযেছে, বাজা বক্তেশ্বরকে উপসঙ্গ কবে পীব হৈদব আপন ক্ষমতা জাহিব কবেন। জনশ্রুতি যে,— কঙ্কনা হ্রদ বেষ্টিত ‘মেদিয়া’ গ্রামেব বাজার নাম ছিল বক্তেশ্বর বাব। সম্ভবতঃ রাজা বক্তেশ্বর ও পীব হৈদাবেব মধ্যে কোন বিষয়ে মতান্তর ও বাদ-বিসম্বাদ হয বে জন্ত ঐ পীবের সঙ্গে বক্তেশ্বর আপোষে মীমাংসা কবার পক্ষপাতী হন নাই এবং গোপনে ষড়ুন। নদীব সঙ্গে কঙ্কনাব যোগাযোগেব জন্ত খাল কাটিবে ঐ জলপথে মেদিয়া পরিত্যাগ কবেন। ৯

---

# বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা

দ্বিতীয় ভাগ

[ কাল্পনিক পীর ]





## ছাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

### ওলাবিবি

ওলাবিবি এক কাল্পনিক পীবানী। হিন্দু-মুসলিম সকল ভক্ত তাঁকে শ্রদ্ধা কবেন, অর্ঘ্য নিবেদন করেন। পীবগণকে যে ভাবে সাধাবণ মানুষ মাগ্ন করেন, হাজত, মানত বা শিবনি প্রদান কবেন, ওলাবিবিও অনুকপভাবে সাধাবণ মানুষের মানসিক অন্তঃস্থল থেকে ভক্তি-অর্ঘ্য পেয়ে থাকেন। ওলাবিবি তাই পীবানী বিশেষ।

ওলাবিবি হিন্দুদেব নিকট এক লৌকিক দেবী বিশেষ। শুধু দক্ষিণ চব্বিশ পবগণার নন্ন, উত্তর চব্বিশ পবগণা, কলিকাতা, নদীয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া, বীরভূম প্রভৃতি স্থানেও ওলাবিবি পূজিতা হন। আহমদ শবীফ বলেন যে ওলাবিবি মূলতঃ হিন্দু দেবতাবই প্রতিকল্প। তাঁর মতে ওলাদেবী থেকে ওলাবিবি হয়েছে। শাসক-শাসিতের তথা হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলন, সম্ভাব ও প্রীতির ভিত্তিতে এ সব লৌকিক তথা কাল্পনিক পীব সৃষ্ট। জীবন ও জীবিকার এবং পীড়ন ও নিরাপত্তার অভিন্নতাবোধ থেকেই এই প্রীতি ও মিলন প্রস্রাসের জন্ম। ২৬

যিনি ওলাবিবি তিনিই ওলাইচণ্ডী নামে অভিহিত। ওলাবিবি মুসলিম সংস্করণ এবং ওলাইচণ্ডী হিন্দু সংস্করণ মাত্র। গ্রামের সাধারণ ভক্তগণ তাঁকে বিবিমা নামেও অভিহিত কবেন। ওলাবিবি নামটির প্রচলন সর্বাধিক। তাঁর পূবা নাম ওলাউঠা চণ্ডী বা ওলাউঠা বিবি হতে পারে কিন্তু ঐ নামে কেউ তাঁকে অভিহিত করেন না। ওলা অর্থে নাশা বা দাস্ত হওয়া এবং উঠা অর্থে বসি হওয়া থেকে এই শব্দ-সংযোগ হয়ে থাকবে। ওলাবিবি বলতে তাই ওলাউঠা বা কলেবার অধিষ্ঠাত্রীকে বুঝায়।

ওলাবিবির মূর্তি আছে। মূর্তি দুই প্রকাব। সুদর্শন। ওলাবিবির মূর্তি হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে একরূপ, মুসলমান প্রধান অঞ্চলে ভিন্নরূপ। হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে এঁর আকৃতি একেবারে লক্ষ্মী-সবস্থতীর মত। তাঁর বং ঘন হলুদ,

চোখ দুটি (কোন কোন জারগার তিনটি) টানা টানা, নাক, কান, ঠোঁট বেশ সুন্দর, হাত দুটি প্রসাবিত (মুদ্রার স্থিতি নেই), কখনও দণ্ডায়মান, কখন শিশু সন্তান কোলে কোবে আসনে উপবিষ্ট। সারা দেহে নানা বকম গহনা, —বাজু, গোট, মাকড়ি, চুড়ি, নখ, হাব, চিক ইত্যাদি। কোথাও মাথায় মুকুট পরেন, অগ্ন্যত্র এলোকেশী। বাহন বা এহরণ কিছু নেই। সাধারণতঃ নীল শাড়ী পরেন।

মুসলিম প্রধান অঞ্চলে ওলাবিবির মূর্তি খানদানী ঘরের মুসলমান কিশোরীর মতন। গায়ে পিরান, পাজামা, টুপি, ওড়না নানা রকম গহনা—টিকরি, রুমকো, টায়রা, হামুলি, নাকচাবি, বাউটি, গোট প্রভৃতি, পায়ে নাগরা জুতো, কোন কোন ক্ষেত্রে মোজাও পরেন, এক হাতে আশাদণ্ড। ৩৮

পল্লীর নানা জারগার ওলাবিবির স্থান বা থান আছে। ওলাবিবির সাধারণতঃ গৃহদেবী নন। গ্রামের মধ্যে বা গ্রাম সমীপবর্তী স্থানের বৃক্ষতলে এঁর থান দৃষ্ট হয়। অশ্বখ, বট, নিম প্রভৃতি বৃক্ষতলে পল্লীবাসীগণ ওলাবিবির থান-কল্পনায় হাজত-মানতাদি দিবে থাকেন। কোথাও ঈশ্বর উচ্চ মাটির টিপি কোথাও বা মাটির তৈরী বা ইটের দ্বারা অনুচ্চ আসনটিকে থান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কেহ বা মূর্তি স্থাপন কবে পূজা দেন, কেহ বা মূর্তি স্থাপন না কবে হাজত-মানত-শিবনি দিয়ে থাকেন। ইষ্টক নির্মিত মন্দিরে ইনি প্রতিষ্ঠিত হন না বলে অনেকে মনে কবেন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এইকণ দেখা যায় না। ইষ্টক নির্মিত মন্দিরেও ওলাবিবি পূজিত হন। আমি এ প্রসঙ্গে এখানে আবে আলোচনা কবেছি।

বহু পল্লীতে ওলাবিবির স্থান আছে। অগ্ন্যত্র অনেক স্থানে তিনি তাঁব ভগিনীদের সঙ্গে থাকেন বলে সেখানে তিনি একক নন। তাঁব সাত ভগিনী আছে বলে কথিত। “এঁদের সকলের নাম যথাক্রমে—ওলাবিবি, আসানবিবি, ঝোলাবিবি, আজগৈবিবি, চাঁদবিবি, বাহডবিবি ও ঝেটুনেবিবি। কোন কোন গবেষকের মত ম্বে, এই সাত বিবি সম্ভবতঃ শাস্ত্রীয় মতে পূজিতা সপ্ত-মাতৃকা—ব্রাহ্মী, মহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বরাহী, ইন্দ্রানী প্রভৃতি। সপ্ত-মাতৃকাব সঙ্গে উক্ত সাত বিবির কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না; কিন্তু বাঁবুড়া ও বাঁবড়ম অঞ্চলের সাত-বউনী বা সাত বনদেবী যথাক্রমে,—চমকিনী, সাতকিনী, স্কন্ধিনী প্রভৃতি এবং জঙ্গল-মহলেব জামমালা দেবীর সাত ভগিনী যথাক্রমে,—

বিলাসিনী, কাজিজাম, বাঙলি, চণ্ডী প্রভৃতির সঙ্গে আকৃতি ও পূজা-পদ্ধতিতে সাদৃশ্য দেখা যায়।<sup>৩৮</sup>

উপবোক্ত বনদেবীগণ দক্ষিণ-বঙ্গে মুসলমান আমলে সাতবিবি নামে অভিহিত হন বলে শ্রীবিনয় ঘোষ অভিমত প্রকাশ করেছেন। যেখানে ওলাবিবি তাঁর অগব হয় ভগিনীর সঙ্গে অবস্থান করেন বলে লোকের কল্পনা সেই স্থানকে সাতবিবির থান বলা হয়। সেখানে ওলাবিবি প্রধান। তিনি পূজা পান এবং অগব ভগিনীগণ সে পূজায় ভাগ পান। তবে ঐ ভগিনীগণের মর্যাদা ওলাবিবি হতে কোন অংশে কম নয় বলে ভক্তগণের বিশ্বাস। ওলাবিবি এসঙ্গে সাত বিবির সঙ্গে অনেক দেবীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ঐগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়ে লিখেছেন,—দক্ষিণ ভারতের গ্রাম্য দেবী সপ্তকানিংগেস এবং মীনাক্ষী ও তাঁর ছয় ভগ্নীর কয়েকটি দিক থেকে উক্ত সাত বিবির মিল দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের মাঝামাঝি আনবান্মা ও উড়িষ্যার যোগিনা দেবী কলেবাব দেবীরূপে পূজিতা। তাঁদের পূজা-পদ্ধতিও ওলাবিবির অনুরূপ। মধ্যযুগে সাতবিবির মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে ‘সাতবিবির গান’ নামে কাব্য রচিত হয়েছিল।<sup>৩৯</sup>

কাবো মতে সপ্তমাতৃকা পববর্তীকালে সাত-বউনী ও মুসলিম আমলে সাতবিবি হয়েছেন। সাতবিবির পূজা-প্রথা প্রাগৈতিহাসিক যুগেও প্রচলিত ছিল বলে শ্রীবসু মনে করেন। মহেঞ্জোদাড়ো থেকে প্রাপ্ত স্মরণ ফলকে দণ্ডায়মান সাতটি নারী মূর্ত্তিকে Mr. Earnest Makay শীতলা ও তাঁর ছয় ভগিনীর দেবী মূর্ত্তি বলে মনে করেন। এই এসঙ্গে Sunderlal Hora-এর বক্তব্য স্মরণীয়। Sunderlal Hora লিখেছেন :—

Ola and Jhola are believed to be two sisters, the former presides over the disease of cholera and the latter that of small pox.

ওলাবিবির কোন কোন থানে নিত্য পূজা হয়। আবার কোন কোন থানে নিত্য পূজা হয় না। নিত্য পূজার আড়ম্বর নেই। ভক্ত নিজে বা পুৰোহিত দিয়ে অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ঐ সব থানেব পুৰোহিত ব্রাহ্মণেতব জাতি। পূজান্তে ভক্তগণ নৈবেদ্য ভক্ষণ করেন।

অনেকে রোগমুক্তি কামনার বা বিশেষ মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়ার আশায়  
 ওলাবিবির মন্দিরের জানালার বা পার্শ্বস্থ বৃক্ষে ইটের টুকু বা বেঁধে দেন এবং  
 মনস্কামনা সিদ্ধ হলে ভক্ত তা বিশেষ পূজা দিবার পর খুলে দিবে যান। অনেকে  
 ওলাবিবির পূজার হলন অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি যথা ওলাবিবির মূর্তি, ঘোড়া  
 বা হাতীর মূর্তি থানে বা থানের পাশে বা কক্ষের বাহিরে স্থাপন করেন।  
 অনেক স্থানে পল্লীর গায়েনগণ ওলাবিবির মাহাত্ম্য-স্কাপক গান সাবা রান্ধি  
 ব্যাপী করে থাকেন। ওলাবিবির পূজার আতপ চাউল, পাটালী, পান-  
 সুগারি, সন্দেশ, বাতাসা প্রভৃতি নৈবেদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ফুল, ফল, দুধ,  
 চাল, পয়সা প্রভৃতি ভক্তি-অর্ঘ্যরূপে প্রদত্ত হতে দেখা যায়। ধূপ-বাতি  
 আনুষঙ্গিক হিসাবেও অনেকেই দিবে থাকেন। গ্রামে কলেরার প্রাধুর্ভাব  
 হলে গ্রামবাসীগণ বিশেষভাবে ওলাবিবির পূজা দেন। গ্রামে কলেরা  
 প্রাধুর্ভাবকে গ্রাম্যভাষায় 'গ্রাম গরম হাওয়া' বলে। প্রতি বৎসর নিম্নমিতভাবে  
 নির্দিষ্ট দিনে বিশেষ পূজা, মেলা, গান-বাঁজনা প্রভৃতি বিশেষ অনুষ্ঠান বাবাসত  
 মহকুমার হাবডা থানাধীন গৈপুৰ গ্রামের খালের ধারের ওলাবিবির মন্দিরে  
 উদ্‌যাপিত হত। একটি মাঝারি ধরণের অটোন গাছের নীচে অবস্থিত ওলাবিবির  
 এই ইষ্টক-নির্মিত মন্দিরের মধ্যে তিনটি অনুচ্চ মাটির টিপি ছিল, কোন  
 মূর্তি ছিল না। প্রতি বৎসর পরমা চৈত্র হিন্দু-মুসলিম উভয়দেব মধ্য থেকে  
 সেখানে বিশেষ ভক্তি নিবেদন করা হত। এতদ্ উপলক্ষে সেখানে তিন  
 দিনের মেলা বসত এবং তাতে শত শত ভক্ত সমবেত হতেন। হিন্দু-মুসলিম  
 উভয়ধর্ম হাজত, মানত ও শিরনি প্রদান করতেন। উক্ত মন্দিরের শেষ  
 মুসলিম সেবারেত ছিলেন ভদ্র ফকির ওবকে ভদ্র ফকির। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের  
 পর অর্থাৎ দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে ঐ অঞ্চল থেকে বহু মুসলিম  
 স্থানান্তরে যাওয়ার ওলাবিবির থানের কোন তত্ত্বাবধায়ক ছিল না। হিন্দু  
 বাজ্তহারাগণ কর্তৃক অধ্যুষিত হওয়ার প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর পূর্ববঙ্গ  
 থেকে আগত স্রীমতী ঠাণ্ডাবালা রায় নানী এক মহিলা স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে  
 ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উক্ত ওলাবিবির থানটির তিনটি অনুচ্চ  
 টিপির স্থলে ঘট স্থাপনা করে ওলাইচণ্ডীর পূজা-আর্চনার সূত্রপাত করেন।  
 সেইদিন থেকে গৈপুৰের ওলাবিবির কল্পিত দরগাহ ওলাইচণ্ডীর মন্দিরে  
 রূপান্তরিত হয়েছে।

ওলাবিবি সাধারণতঃ সর্কসাধারণের পিবানী বা দেবী। তবে কোন কোন

মন্দিরের নির্দিষ্ট সেবাযেত থাকেন কিন্তু পূজা দানের সময়ে সাধাবশে সমান অধিকারে অংশ গ্রহণ করেন। গ্রামের সকলে মিলে ওলাবিবির পূজাব সমস্ত ব্যবস্থা করেন। কোন গ্রামে সেই গ্রামের মোড়লের নেতৃত্বে পূজা-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মোড়ল গ্রামের প্রতিনিধিকপে পূজাও করেন। কোথাও বা নাবীগণ পূজা করেন। বিশেষ পূজাব সময় গ্রামের মোড়ল সমস্ত দাষিদ্ধ নিয়ে পূজা-উপচার এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ কবে গ্রামবাসীগণের পক্ষে ওলাবিবির পূজা সম্পাদন করিষে ‘গ্রাম ঠাণ্ডা’ করার দাষিদ্ধ পালন কবেন। গ্রামের ককিব গ্রাম গবম হলে ঠাণ্ডা কবার জন্ত গ্রামবন্ধন কবেন গ্রামের অধিবাসীদের অনুবোধে। তাঁরা গ্রামের চারি কোনে চারটি খুঁটি পুঁতে তাৰ মাথাৰ বৰেং-লেখা মাটিৰ নতুন ছোট সব-দড়ি দিষে ঝুলিষে দেন। কেউ কেউ পথেৰ ত্রিমোহনার ঐকপ কবেন।

ধর্মীয় আচার-আচরণের ওপর সংস্কৃতির প্রভাব যে কতখানি প্রবল হতে পারে তাৰ এক অভ্যাসচার্য্য নিদর্শন পাওষা যাৰ জয়নগরের বক্তাৰ্থী পল্লীর ওলাবিবির বিবরণে। শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখেছেন যে,—ঐ থানে ওলাবিবির কোন মূর্তি নেই। পূজা কক্ষের মধ্যে হুটি ক্ষুদ্রাকৃতি সমাধি আছে। তন্মধ্যে একটি ওলাবিবির প্রতীকরূপে পূজিত হয়, অপৰ সমাধিটি ওলাহাবী আন্দোলনের অন্যতম বক্তাৰ্থী গাজীৰ বলে অনুমিত হয়। ৩৮

ওলাবিবির থানে পূজা দিতে গিষে, কে জানে, কেউ ভক্তির আধিক্যে উক্ত বক্তাৰ্থী গাজীৰ সমাধিতেও পূজার্ধ অর্পণ কবেন কিনা।

## দ্রাঘ্যাক্রিংশ পরিচ্ছদ

### খুঁড়ি বিবি

খুঁড়ি বিবি এক কাল্পনিক পীবানী। খুঁড়ি বিবি নামটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। খোঁড়া বাঘ, খোঁড়া কুমীর এবং অন্যান্য খোঁড়া জীব-জন্তুগণের অধিষ্ঠাত্রী পীবানী বলে তাঁর এই নামকরণ। তিনি নিজে খোঁড়া ছিলেন বলে খুঁড়ি বিবি রূপে পবিচিতি লাভ করেন—এমন একটা অনুমান একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। খুঁড়ি বিবির কোন মূল নাম ছিল কিনা আজো অজ্ঞাত। তাঁর কোন মূর্তি নেই। খুঁড়ি বিবির নামে যে দরগাহ আছে এবং দরগাহের মধ্যে যে সমাধি বা কবরস্থান রয়েছে তা থেকে তাঁকে ঐতিহাসিক পীবানী বলে মনে হতে পারে। বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার অন্তর্গত কেন্দুয়া নামক গ্রামে এক সুরমা দরগাহ-গৃহের মধ্যে উক্ত মাজার দৃষ্ট হয়। স্থানীয় অধিবাসী এবং উক্ত দরগাহের সেবায়োতগণ খুঁড়ি বিবির ঐতিহাসিকতা বা কাল্পনিকতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিযুক্ত দিতে পাবেন না। ঐতিহাসিক পীবানী হিসাবে তাঁকে নিঃসন্দান কোণ ধর্মপ্রাণ মুসলিম-মহিলা বলে মনে হতে পারে।

খুঁড়ি বিবিকে দেবী পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। তাঁর কোন ‘ধান’ নেই। হাজত, মানত ও শিবনি ব্যতীত কোন পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত নেই। নির্দিষ্ট দিনে ওরস হয়, ধর্মসভা হয়, বনভোজন হয়, এঘন্ট হয় লুট, হয় মেলা। ওরস হয় পৌষ সংক্রান্তিতে, মেলা হয় পখলা মাঘ তাবিখে। প্রায় হাজার লোক সমবেত হন। হয় হিন্দু-মুসলিমের সমাবেশ। ভক্তজন ফল, দুধ, মিক্সড্রব্য মানত দেন। তাঁরা শিবনিও দেন। অনেকে দেন হাজত। এই দরগাহে পূর্বের সেবায়োত ছিলেন ফকির নামক এক ব্যক্তি। বর্তমান সেবায়োতের নাম মহম্মদ মজলজান ফকির (৪০) প্রমুখ। এঁরা দরগাহে বাৎসরিক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাছাড়া তাঁরা প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি প্রদান করেন। খুঁড়ি বিবির অসংখ্য ভক্ত। ভক্তেরা প্রায় প্রতিদিনই দরগাহে দুধ দিয়ে যায়। সে দুধ গ্রহণ করার জন্য দরগাহে একটি নির্দিষ্ট পাত্র আছে। এই পীবানীর নামে প্রায় বাইশ বিঘা জমি পীবোত্তর আছে বলে সেবায়োতগণ

জানান। পীরোত্তর জমির মধ্যেই সুদৃশ্য দরগাহ-গৃহ অবস্থিত। দরগাহটি ইষ্টক-নির্মিত। এ সবই উক্তগণের শ্রদ্ধাৰ দান বটে।

খুঁড়ি বিবির আবির্ভাব কাল সম্পর্কে সেবাবেতগণ কিছু বলতে পাবেন না। ভাটি বা সুন্দরনন অঞ্চলে বনবিবি, ওলাবিবির স্থায় নারী পীর খুঁড়ি বিবির উত্তর খুবই স্বাভাবিক বটে। কল্পিত বনবিবি বা ওলাবিবির স্থায় কাল্পনিক পীরানী খুঁড়ি বিবির আবির্ভাব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব, বলে অনুমান করা যায়।

এখানে উদ্ঘাপিত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে বনভোজন দু'খণ্ড খুবই চিত্তাকর্ষক। গত ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তাবিখে আমি স্বয়ং উপস্থিত থেকে যে বনভোজন পর্ব সমাধা হতে দেখি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপঃ—

খুঁড়ি বিবির দরগাহ সংলগ্ন জমির কয়েক গজ ব্যবধানের মধ্যে একটি উঁচু জমি এবং তাতে দু'একটি বৃক্ষও আছে। এই উঁচু জমি সংলগ্ন স্থানে আছে একটি মাঝারি আকারের পুকুর। উক্ত জমি ও পুকুরটি খুঁড়ি বিবির দরগাহের সন্মুখভাগে অবস্থিত।

বেলা তখন প্রায় বাবোটা। উক্ত খোলা জমিতে জমায়েত হয়েছেন প্রায় জনা পঞ্চাশ লোক। তাতে নারী, বৃদ্ধ, বালক-বালিকা, শিশু প্রভৃতিও আছে। এক পাশে কয়েকটি জারগাষ 'ভিগুড়ি' অর্থাৎ ছোট গর্তের পাশে ইট দিয়ে বামার উপযোগী উনানে ভাত-ভরকারী পাক হচ্ছে। কেউ পাক করছে, কেউ বা কলাই এব ডিস, গ্লাস প্রভৃতি নিয়ে আহাবের জন্ত অপেক্ষা করছে। সেখানে উপস্থিত শ্রীমুকুমার সবকার (৩০) এবং শ্রীবিহাবীলাল দাস (৪৫) হাশরকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে তাঁরা অর্থাৎ হিন্দুবা খুঁড়ি বিবির নামে এই বনভোজন-উৎসব পালন করছেন। বামার সামগ্রী প্রথমে খুঁড়ি বিবির নামে উৎসর্গ করেন এবং পরে তাঁরা নিজেবাই সানন্দে ভাগ কবে আহার করেন। তাঁরা কেন্দুয়া গ্রামেরই অধিবাসী। প্রতি বৎসরই তাঁরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এটা তাঁদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এইরূপ করলে খুঁড়ি বিবির প্রতি-ভক্তি প্রদর্শন করা হয় এবং তাতে তাঁদের সমূহ মজল হয় বলে বিশ্বাস। এই অনুষ্ঠানে পার্শ্ববর্তী চৈতা নামক গ্রামের অধিবাসীও যোগদান করেন।



হিন্দু ভক্তগণের সেই বনভোজন-স্থল থেকে অদূরে অর্থাৎ দরগাহ স্থান থেকে আরো সামান্য দূরে দেখা গেল প্রায় জনা পঞ্চাশেক লোক বড় বড় ‘ডেগ্‌চী’, ও কড়ায় করে কিছু সামগ্রী পাক করছেন। অনুসন্ধান জানতে পেলাম যে সেটা মুসলিম ভক্তগণের বনভোজন উৎসব। মুসলিম ভক্তগণও খুঁড়ি বিবির নামে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করছেন। তাঁদের অনুষ্ঠানেও যথেষ্ট আড্ডার বশেছে। সেখানে উপস্থিত জহিমদ্দিন বিশ্বাস (৬০), কালু মণ্ডল (৭৫), এসারত মণ্ডল (৫০), আজিবর বহমান (৬৫), ইউনুছ বিশ্বাস (৫০) প্রমুখ জানানেন যে তাঁরা পীরানী খুঁড়ি বিবির দরগাহে তাঁর প্রতি ভক্তি নিবেদন করতে এইরূপ হাজত বা বনভোজন অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেন। প্রতি বৎসর তাঁরা এইরূপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করেন। লক্ষণীয় যে, হিন্দুগণ, মুসলিমগণ অপেক্ষা অধিকতর দরগাহ সমীপবর্তীস্থানে এই অনুষ্ঠান করেন। তবে দেখা গেল হিন্দুগণের বনভোজনস্থলে মুসলিমগণ এবং মুসলিমগণের বনভোজনের স্থলে হিন্দুগণ অবাধ গমনাগমন করছেন।

খুঁড়ি বিবি সম্পর্কে কিছু লোককথা এতদ্ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে যেটি বহুল প্রচলিত, সংক্ষেপে সেটি এইরূপ ;—

একবার এক সরকারী আমিন জমি জরিপের কাজে এতদ্ অঞ্চলে এসেছিলেন। খুঁড়ি বিবির দরগাহ-সংলগ্ন পৌবোত্তর জমির পরিমাণ সম্পর্কে তাঁর খুব সামান্যই ধারণা ছিল। জমি জরিপের কাজে তিনি জমির বিবরণ নিতে গিয়ে জমির মালিকের নাম জানতে চান। তিনি যে জমির কথাই জিজ্ঞাসা করেন সেটিই খুঁড়ি বিবির নামের জমি। আমিন কিঞ্চিৎ বিবস্ত্র হন। তিনি অবাক হয়ে ভাবেন,—কি কবে সম্ভব যে এত সব জমি খুঁড়ি বিবির। ঐশ্বর্য্যহারা হয়ে সে দিনের মতন তিনি জমি মাপা শিকল ভ্যাগ করেন।

সে রাতে তিনি স্থানীয় অধিবাসী বিপিনবিহারী সবকাবের দহলিজে শয়ন করেন। খুঁড়ি বিবির অসাধারণ প্রভাবের কথায় বিস্মিত হয়ে চিন্তা করতে করতে তিনি নিদ্রাভিভূত হন। মাঝ রাতে সেই দহলিজে অকস্মাৎ এক বিশালকাষ বাঘের আগমন ঘটে। আমিন বারু তা অবলোকন করে

কিংকর্তব্য বিমুঢ় হন। হঠাৎ তাঁর স্মরণ হয় পীরানী খুঁড়ি বিবির কথা। তিনি তৎক্ষণাৎ খুঁড়ি বিবি নাম জপ করতে থাকেন। দেখা গেল অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই বাঘ কোনকণ আক্রমণ না করে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

পবদিন আমিনবাবু যত্ন সহকায়ে এতদ্ অঞ্চলে জরীপের কাজ সমাপ্ত করেন এবং গত বাতের অলৌকিক ঘটনার কথা ব্যক্ত করেন। শেষ পর্যন্ত আমিন বাবু খুঁড়ি বিবি প্রতি এতখানি শ্রদ্ধাবনত হন যে সর্বসাধারণের নিকট পীরানীর দবগাহে হাজত, মানত, শিরনি দেওয়া উচিত কর্তব্য বলে তিনি অভিযত প্রকাশ করে যান।

---

## চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

### ত্রৈলোক্য গীৰ

পূৰ্ববৰ্ত্তে মৎস্যেন্দ্রনাথ, গৌৰক্ষনাথ ও সত্যনাৰায়ণ—এই তিনি মিলে ত্রিনাথ অথবা ত্রৈলোক্য পীৰ হয়েছেন। স্কটব্যঃ শ্রী ১৪৬ ( লিপিকাল ১২০১ ), ২৪৭, ২৪৮ ( মনোহব সেনেব ), ৪২৩, ৪৩৫ ( কৃষ্ণদাসেব )। বাংলা প্রাচীন পুঁথিব বিবরণ ১-১ পৃঃ ২৪, ৯৪-৮৫। দুইটিতে লেখকেব নাম আছে, হবিনাৰায়ণ ( অথবা হৰিবাম ) দাস ও ‘দ্বিজ’ রামগঙ্গ। ( অথবা বামগঙ্গা দাস )। ৪১

হবিনাৰায়ণ অথবা হৰিবাম দাস এবং দ্বিজ রামগঙ্গ। অথবা রামগঙ্গ। দাস বিবচিত পাঁচালীদ্বয়কে ডঃ সুকুমাৰ সেন অত্যন্ত নিরর্থ ও তুচ্ছ বচনা বলে অভিযত ব্যক্ত করেছেন। হৰিনাৰায়ণ দাসেব পাঁচালীতে ত্রৈলোক্য পীবেব সাথে মোচবা পীবেব উদ্ভট সম্পর্কেব কথা এইভাবে লিখিত হয়েছে,—

মোচবা পীৰে কহে কথা সত্যপীবেব ঠাই

ত্রৈলোক্য পীৰ আছে মোব জ্যেষ্ঠ ভাই।

মোচবা পীৰ ( আদি নাথ গুৰু মৎস্যেন্দ্রনাথ ও স্থানীৰ যোদ্ধাপীৰ মসনদ আলি মিলিত হবে মহম্মদী পীৰ বা মোছবা পীবে পরিণত হয়েছেন ), ত্রৈলোক্য পীৰকে আপনাৰ জ্যেষ্ঠ ভাই বলেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে ত্রৈলোক্য পীৰকে ‘একজন’ পীৰ হিসাবে গ্রহণ কৰা হয়েছে।

ত্রৈলোক্য পীবেব নামে কোন দরগাহ বা নজবগাহ ( কল্লিত দবগাহ ) বা স্থায়ী ‘থান’ নেই। ত্রৈলোক্য পীবেব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন-পদ্ধতি অত্যন্ত পীৰেব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। কেবলমাত্র সত্যনাৰায়ণ পূজা বা সত্যপীৰেব পূজাৰ সঙ্গে তাৰ কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।

সাধাৰণতঃ পূৰ্ণিমা তিথিতে ত্রৈলোক্য পীৰ বা ত্রিনাথেব পূজানুষ্ঠান হয়। কোন ভক্তেব বাড়ীৰ উঠানে বা বাৰান্দাৰ বা কোন কক্ষেব একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এই পীৰেব পূজা উপলক্ষে ঘট স্থাপন কৰা হয়।

ভক্ত সেখানে ধূপ-বাতি জ্বালিষে দেন। ভক্তগণ বাতাসা, ফুল, পান, তেল, গঞ্জিকা প্রভৃতি নিবেদন করেন। রোগ নিরাময় বা কোন সুফল লাভের আশায় লোকে তাঁর নামে মানসিক কবে এবং আশানুকূপ ফল লাভের পৰ ত্রিনাথের পূজাব আৰোহণ কৰে। বৈষ্ণৱ সহজিয়া সাধু, যাঁৰা গোঁসাঁই নামে সময়িক পৰিচিত, তাঁৰাই বিশেষভাবে এই অনুষ্ঠানে যোগদান কৰেন।

ঘট স্থাপনার পৰ থেকে গোঁসাঁইগণ ডুগী, একতাৰা ও জুড়ী সহযোগে সেখানে দেহতাত্ত্বিক বা ভাবগান পৰিবেশন কৰেন এবং মাঝে মাঝে পীৰকে প্রস্তুত গঞ্জিকাৰ কলিক। নিবেদন কৰে নিজেৰা সেৱন কৰেন। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে সাধাবশৰ মধ্যে মিষ্টান্নাদি বিতৰণ কৰা হয়। এই অনুষ্ঠান ত্রিনাথের মেলা নামে অভিহিত। ত্রিনাথের মেলা উপলক্ষে ত্ৰৈলোক্য পীৰেৰ মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক পাঁচালী পাঠ কৰা হয়। সম্প্রতি (১৯৭০) শ্রীমহেশচন্দ্র দাস বিবচিত যে ত্রিনাথের পাঁচালীখানি পাওৰা গেছে তাতে মুসলমানী কোন ভাব দৃষ্ট হয় না। পুস্তিকাখানি ৭" X ৫ আকৃতি বিশিষ্ট। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪। এব প্রথমে ত্রিপদী ছন্দে বিষ্ণুৰ বন্দনা আছে।

ত্রিনাথ কেশব নমঃ, তুমি হে পুৰুষোত্তম,

চতুৰ্ভুজ গরুড বাহন।

জলদ-বরণ ঘটা, হৃদবে কোমল হটা,

বনমালা গলে মুশোভন। ইত্যাদি।

ত্রিনাথের আবিৰ্ভাবের কাবণ দৰ্শাতে গিষে তিনি লিখেছেন,—

কলির আবস্ত কালে দেব নাবাষণ।

নবদীপে গৌৰাঙ্গরূপ কবেন ধাবণ ॥

ছাবে ছারে ঘবে ঘরে নাম সংকীৰ্ত্তন।

হবিবোল বিনা আব নাহিক বচন ॥

তবু নাহি কলির নবের পাপ শাষ।

দেখিষা কি কবে হবি ভাবেন উগায় ॥

নবদীপে ত্রিনাথরূপ কবেন ধারণ। -ইত্যাদি।

এখানে জিনাথ এক অবতার-স্বরূপ। আপনার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য যে ঘটনা সংঘটিত হয় তা এই পাঁচালী কাব্যের মূল কাহিনী।

সংক্ষেপে কাহিনীটি এইরূপ :—

নবদ্বীপের জৈনক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। গাভী পালন কবে তাঁর জীবিকা নির্বাহ হয়। একদিন তাঁর গাভীটি গেল হাবিষে। গাভীর শোকে ক্রন্দনবত ব্রাহ্মণ সবোববে ডুবে আত্মহননে উদ্ভত হলে দেব নারায়ণ দৈববাণী দিলেন,—

জিনাথে কবহ পূজা অবোধ ব্রাহ্মণ ॥

গাভীর কারণে কেন জীবন ত্যজিবে।

পূর্ণবার ধন-বড় গাভী তব পাবে ॥

দেব নারায়ণের আবেশ নির্দেশ অনুযায়ী তিনি গান, গাঁজা ও তেল সংগ্রহ করতে দোকানে গেলেন। তেল নেবার পাড় তাঁর নেই। তিনি হুঃখিত হলেন। আবার দৈববাণী হল,—‘তেল আন বস্ত্রমধ্যে কবিত্তা বহন।

বস্ত্রমধ্যে তেল নেবার কথাই দোকানী তাঁকে উদ্ভাস বুলে এবং তেল দেওয়ার মধ্যে প্রতারণা করলে। তখন গদাধর সেই মুদীর তেলের কলসী হরণ করলেন। এই ঘটনায় দোকানীর সন্ত্রস্ত ফিবে এল। সে ব্রাহ্মণকে দেবতাজ্ঞানে পা জড়িষ ধরুল। ব্রাহ্মণ তাকে জিনাথের পূজা মানতে পৰামর্শ দিলেন। পূজা মানত কবে মুদি ফিবে পেল তেলের কলসী।

ব্রাহ্মণ ফিরে এলেন গৃহে। তিনি জিনাথের নামে ঘট স্থাপনা কবে পূজার আয়োজন করলেন। নিবিষ্ট মনে তিনি বসলেন পূজার। এমন সময় ব্রাহ্মণের গুরু এসে শিষ্যকে ডাকলেন। ধ্যানমগ্ন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে গুরু ক্রুদ্ধ হলেন এবং লাথি মেবে ঘট দিলেন ভেঙে। ক্রুদ্ধ গুরু তৎক্ষণাৎ অভিমানে ফিবে এলেন ঘরে। ততক্ষণে তাঁর “স্ত্রী-পুত্র মবেছে তিনজনে।” মনের হুঃখে জলে ডুবে তিনি আত্মহত্যা কবতে উদ্ভত হলে আবার আকাশবাণী হল। আকাশবাণীর নির্দেশমত তিনি শিষ্যগৃহে এসে শিষ্য-সমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন এবং প্রতিকার প্রার্থনা করলেন। ব্রাহ্মণ বললেন,—

বিধিমতে কব তুমি জিনাথ পূজন।

গুৰু এবাৰ জিনাথেৰ পূজা মানত কবলেন,—শিষ্যেৰ কাছ থেকে কোন্সে পোতা ভয় এনে স্ত্রী-পুত্ৰেৰ অঙ্গে মাখালেন। স্ত্রী-পুত্ৰ জীবন পেলা ফিৰে। গুৰুও জিনাথেৰ পূজা দিৰে যনে পুত্ৰে লক্ষ্মী লাভ কবলেন। এর পর থেকে জিনাথেৰ পূজা প্রচলন হল।

সৰ্বশেষে কবি তাঁৰ ভণিতায় গেষেছেন,—

হবি হবি বল সবে যত বন্ধুগণ।

মহেশচন্দ্র দাস ভনে শুন উক্তগণ ॥

কবি মহেশচন্দ্র দাস নিজেৰ কোন পৰিচয় লিপিবদ্ধ কবেন নি। এই ধৰণেই পাঁচালীতে অধুনা আৰু কবিৰ বিবৰণ প্রদত্ত হয় না। এই সব পাঁচালী বাজাবে বিক্ৰয় কৰে লেখক ও বিক্ৰেতা। আংশিক জীৱিকা অৰ্জন করেন মাত্ৰ। তাই কাব্য হিসাবে গুৰুত্বহীন এতদ্ভাৱীয়া পাঁচালীকাবগণেৰ বিষয় জনসাধৰণেৰ সম্মুখে আনবাৰ বেওৰাৰু কমে গেছে।

জিনাথেৰ পাঁচালীৰ কাহিনী সম্পূৰ্ণ কাল্পনিক। ব্ৰাহ্মণ্য আদৰ্শ থেকে এহু উৎপত্তি। জিনাথ এখানে লৌকিক দেবতা বিশেষ। এই ধৰণেৰ পাঁচালী সম্পূৰ্ণৰূপে হিন্দুৰ ব্ৰতকথা জাতীয় পাঁচালী।

কবে থেকে জিনাথেৰ পূজা পদ্ধতি প্রচলিত হৰেছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় কৰা যায় না। তবে অনুমান কৰা যায় যে বৈষ্ণব-সহজিয়া গোঁসাই বা ফৰিৰ দৰবেশগণেৰ মধ্যে প্রচলিত জিনাথেৰ মেলা উদ্‌যাপনেৰ ঘটনা পঞ্চদশ শতাব্দীৰ শেষভাগ বা ষোড়শ শতাব্দীৰ যে কোন সময় থেকে সূত্ৰপাত হয়। পাঁচালীকাৰ মহেশচন্দ্র দাসেৰ কাহিনী-আৱন্তে প্রদত্ত বক্তব্য থেকে এব কিছু আভাস পাওৱা যায় মাত্ৰ।

## পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

### পাগল গাঁৱ

হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্ত উভয় তরফের প্রচেষ্টা-প্রতিক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবে মধ্যস্থতা করার সহায়ক হিসাবে মধ্যযুগে কিছু কাল্পনিক মিশ্র-দেবতার আবির্ভাব প্রবোজন হয়েছিল। তেমনি একজন কাল্পনিক মিশ্র পীৰ হলেন পাগল পীৰ। পাগল অৰ্থে বিকৃত মস্তিষ্ক নয়, পাগল এখানে আত্মভোলা। শিব এই অৰ্থে ব্যবহৃত এবং পীৰ অৰ্থে ইসলাম প্রচারক শাস্তিৰ দূত স্বৰূপ সুকী ককিব। মিশ্রব শিব ও সংসাৰ ত্যাগী দরবেশ বুঝি মিলিত হ'য়ে হ'য়েছেন পাগল পীৰ। এ যেন পীৰ ও নাবাৰণেৰ একাত্মৰূপ। ককিব-বেশী ধৰ্মঠাকুৰ যেমন পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ধীৰে ধীৰে সত্যপাৰে মিশে গৈছে—সংসাৰ-ত্যাগী গুণানবাসী মহাদেব তেমনি ধীৰে ধীৰে ককিবৰূপে পাগল পীৰে মিশে গৈছে। পীৰ বড়ৰ্থা গাজীৰ কাহিনীতে বিবৃত দুই ধৰ্মের বিবোধের মতন পাগল পীৰেৰ কোন 'বিবোধ-কাহিনী নেই।

কয়েকটি অঞ্চলে পাগল পীৰের দরগাহ দেখা যায়। তাঁৰ প্রভাবও কম নয়। কোথাও তিনি পাগল পীৰ, কোথাও বা পাগলা পীৰ, কোথাও বা পাগল বাবা নামে অভিহিত। আবার কোথাও তিনি পাগলা গাজী নামে পৰিচিত। বারাসত মহকুমার ঝালগাছি গ্রামে পাগল গাজীৰ নামে থান আছে। প্রতি বৎসৰ জামুয়ারী মাসে সেখানে ওরস হয় এবং একদিনেৰ মেলা বসে। বসিবহাট মহকুমার বেনিষাবৌ গ্রামেৰ পাগল পীৰেৰ দরগাহটি উল্লেখযোগ্য। দরগাহটি ইচ্ছক নির্মিত। বৰ্তমান (১৯৬৮ খৃঃ) সেবাস্থেতৰ নাম বাবিতুল্লাহ ককিব প্রমুখ। লক্ষ্য কৰাবৰ বিষয় যে পীৰেৰ দরগাহেৰ সমস্ত সেবাস্থেতই ককিব বেশধাৰী বা উপাধিধাৰী। কেহ কেহ শাহজী উপাধিতেও ভূষিত। সেবাস্থেতগণ পাগল পীৰেৰ দরগাহে প্রতি সন্ধ্যায় নিষণ্ণিতভাবে ধূপ-বাতি প্রদান করেন। এ যেন লৌকিক জাগাৰে তুলসী ভাষা নিত্য সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়া। দরগাহ-গৃহেৰ মধ্যে

খেৰেতে সামান্য উঁচু মাটিৰ পিঁড়িতে একপাশে সোলাৰ টোপৰ। অনুৰূপ টোপৰ বিবাহেৰ সময় বৰকৰ্তৃক মন্ত্ৰকে গৃহীত হয়। পিঁড়িৰ চাৰকোণে চাৰটি ত্ৰিশূল প্ৰোথিত ৰয়েছে। পিঁড়িটোৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় দুই হাত এবং প্ৰস্থ এক হাত। ত্ৰিশূল চাৰটি লোহা নিৰ্মিত। এ ত্ৰিশূল দেবাদিদেব মহাদেব-বৰষত কল্পিত ত্ৰিশূল। চিত্ৰখানি এনে যে কোন এক দেব বা দেবীমূৰ্ত্তি উক্ত পিঁড়িৰ উপৰ বসালে তা হিন্দুৰ পূজা বেদীতে পৰিণত হতে পাৰে। পাগল পীৰেৰ আবিৰ্ভাব কিৰূপে হল এ সম্পৰ্কে একটী লোককথা এতদু অঞ্চলে প্ৰচাৰিত আছে। লোককথাটি এইৰূপ,—

মহম্মদ একসৰ আলি বাস কৰতেন বাত্ৰডিয়া থানাত্ৰ অন্তৰ্গত সৰফৰাজপুৰ গ্ৰামে। তাঁৰ কোন এক পূৰ্ব-পুৰুষ এক বাত্ৰে স্বপ্নাদেশ পান। কে যেন বসুছেন,—আমি বেনিধাবৌ গ্ৰামে আছি। আমি মহাদেব, আমি ভাৱকনাথ, আমি ভোলানাথ। তুমি অবিলম্বে বেনিধাবৌ গ্ৰামে এসে আমার সেবার আৰোজন কৰ।

স্বপ্নাদেশ পেয়ে সেই ব্যক্তি চলে এলেন বেনিধাবৌ গ্ৰামে এবং একটী ‘থান’ কল্পন। কৰে মহাদেবেৰ আসন স্বৰূপ পিঁড়ি নিৰ্মান কৰেন এবং চাৰটি ত্ৰিশূল চাৰ কোনে বসিৰে সেৱাৰ আৰোজন কৰেন। তিনি তো মুসলিম,—কিভাবে তিনি মূৰ্ত্তি কল্পনায় পূজা কৰবেন। তাই সেখানে মুসলিম আদৰ্শে কোন মূৰ্ত্তি স্থাপনা কৰলেন না। সেইদিন থেকে সেখানে ধূপবাতি দেওৱা শুক হল। পৰে ভক্তগণ হাজ্জত, মানত ও শিবনি দেওৱা প্ৰচলন কৰেন।

পাগল পীৰেৰ থানে দুধ, ফল, বাতাসা, পৰসা, অগ্ৰাণ্ড মিষ্টদ্রব্যও ভক্তগণ কৰ্তৃক প্ৰদত্ত হয়। বহু বৰণী সন্তান কামনায় দৰগাহে ইট বাঁধেন। ইঙ্গিত ফল লাভ হলে তাঁৰা ইট খুলে দেন,—অনেকে যথেষ্ট মিষ্টান্ন বিতৰণ কৰেন,—এমন কি সন্তান ওজনে মিষ্টদ্রব্যাদি সমবেত লোকেৰ মৰ্য্যে বিতৰণ কৰে দেবাৰ ব্যবস্থা কৰেন। প্ৰতি বছৰ ফাল্গুন মাসে পাগল পীৰেৰ বিশেষ পূজা অনুষ্ঠান হয়। সে সময় আট-দশ দিনেৰ বিৰাট মেলা বসে। সেখানে হাজ্জাব হাজ্জাব হিন্দু-মুসলিম নব-নবীৰ সন্মিলন হয়। স্থানীয় লোকে এই মেলাকে বলেন ‘পাগলেৰ মেলা’।

পাগল পীৰেৰ দৰগাহেৰ প্ৰতিষ্ঠাতা মহম্মদ একসৰ আলি একখানি ‘আশাবাতি’ ব্যবহাৰ কৰতেন। সেই আশাবাতি নাকি অলৌকিক শক্তি-



সম্পন্ন ছিল। তিনি আশাবাড়ির সাহায্যে জুতে পাওয়া বোগীকে নিবাস্য করতেন। কোন স্থান থেকে বোগী দেখার জন্য 'ডাক' এলে তিনি আশাবাড়ি হাতে নিয়ে বুঝতে পারতেন যে সেই স্থানে যাওয়া উচিত কিনা। আশাবাড়ি হাতে নিয়ে তিনি নিরুদ্বেগে পথ চলতেন।

পূর্বে দরগাহে মেলা উপলক্ষ্যে গান বাজনা হত। ভিন্ন মতাবলম্বী মুসলিমগণের আপত্তিতে দরগাহস্থানে আব মেলা বসে না। অন্যতদূর্বে আবো একটি 'খান' স্থাপিত হয়েছে; সেখানে বেশ কয়েক বছর ধবে ফাঙ্কনের সংক্রান্তি থেকে মেলা বসে। সর্বশেষ স্থাপিত পাগল পীরের 'খান' অর্থাৎ মন্দিরটি তৃতীয় 'খান'। প্রথম দরগাহেব ধ্বংসাবশেষ-মাত্র অবশিষ্ট আছে। দ্বিতীয় দরগাহটি ইস্টক-নির্দিষ্ট হওয়ার মূলে প্রচলিত লোক-কথাটি এইরূপ :—

পানিতর গ্রামের জনৈক ব্যক্তি একবার স্বপ্নাকাশ রোগে আক্রান্ত হন। তিনি চিকিৎসার জন্যে গেলেন নি,—তার আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল। ডাক্তার, কবিরাজ, হেকিম কেউ যখন কোনকপ উপায় দর্শাতে পারলেন না, তখন তিনি হতাশায় ভেঙে পড়লেন। জীবনের আশা তিনি একপ্রকার ত্যাগই করলেন। এমনত অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি তাঁকে পাগল পীরের খানে গিয়ে পীরের শরণাগত হতে বললেন। তিনি শেষ আশা নিয়ে পাগল পীরের খানে এলেন এবং সেবাসেবকের কথায় খানের মাটি এবং সেবাসেবক-প্রদত্ত তেল ব্যবহার করিতে লাগলেন। অল্পদিন মধ্যে তিনি আবোগ্যলাভ করলেন।

উক্ত ব্যক্তি আবোগ্য লাভ কবে ভক্তি-অবনত হবে কাঁচা মাটির দরগাহটি পাকা করিতে মনস্থ করবেন এবং কিছুকালের মধ্যে ঐ দরগাহটি পাকাগৃহে পরিণত হয়।

গাছাগ্রামে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পাগল পীর পাগল ঠাকুর নামে পবিত্রতা লাভ করছেন। পাগল ঠাকুরের মন্দিরের পরিচালককপে ক্রীসত্যোযকুমার ঘোষ মহাশয় ১৪।১।১৯৭৫ তারিখে যে জবানবন্দী দিয়েছেন তা এইরূপ—

তারিখ বিশ বছর ধবে গাছা মৌজার ১৪৬৬ দাগ নম্বর জমিতে স্থাপিত পাগল ঠাকুরের উৎসবের পবিত্রতালাভ ভাব বহন করছেন। এই উপলক্ষ্যে প্রতি ফাঙ্কন মাসের শেষে সংক্রান্তি থেকে সাতাই চৈত্র পর্যন্ত এখানে মেলা বসে।

সেবাবেত শ্ৰীকালিপদ বোৰ (ককিব) ; বয়স আনুমানিক ষাট বৎসর। পূৰ্বা  
হিন্দুমতে পাগল ঠাকুৰেৰ মন্দিৰে পূজা হয়। এখানে পূজাব সময় বাজনা  
বাজে, বেলপাতা, ফুল-বাতাসাদি অৰ্ঘ্য হিসাবে প্রদত্ত হয়। অনেকে বল,  
বাতাসাদি মানত হিসাবে দিৱে থাকেন। বাৎসৱিক অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রতি  
শনিবাৰ ও মঙ্গলবাৰে এখানে পূজা অনুষ্ঠান হৱে থাকে।

মুসলিমের শৰীয়তী মতে বাধা হওৱাৰ বৰদাকান্ত ঘোষেৰ উদ্যোগে  
উক্ত নতুন স্থান তৈৰী কৰা হয় এবং পাগল পীৰেৰ দৰগাহটি পাগল ঠাকুৰেৰ  
মন্দিৰ নামে অভিহিত হয়। উক্ত মন্দিৰে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

---

## ষট্‌ত্ৰিংশ পৰিচ্ছেদ

### বনবিবি

মুনশী মোহম্মদ খাত্তেব সাহেব তাঁৰ বোন বিবি জহুবা নামক গৃহে লিখেছেন,—বেবাহিম (ইব্রাহিম) নামে জনৈক ফকিব মক্কা শহৰে বাস করতেন। তাঁৰ ওঁবসে গোলাল বিবির গৰ্ভে এক বনে বনবিবি এবং শা জঙ্গলিৰ জন্ম হয়। বনবিবি ও শাজঙ্গলি বৰঃপ্রাপ্ত হয়ে মদিনা শৰীফে এলেন এবং সেখানে হাসেনের আওলাদেৰ কাছে মুবিদ হয়ে বাজা কবলেন হিন্দুস্তান অভিমুখে।

বোনবিবি ও শা জঙ্গলি আগে বেহেস্তে ছিলেন। আল্লাব হুকুমে তাঁদেবকে নেবাহিমের ঘৰে জন্ম নিভে হয়। কাবণ, আঠাবো ভাটিতে তাঁদেব জহুবা হবে।

আরব থেকে বওনা হয়ে প্রথমে তাঁবা এলেন বঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলে,—ভাঙ্গড প'বেৰ নিকট।

কহেন ভাঙ্গড শাহা শুন দিহ। মন।

এই তো ভাটিব দেশ আইলে এখন ॥ ইত্যাদি

মোহম্মদ মুনশী সাহেবও বনবিবির পৰিচয় দিতে গিল্লৈ তাঁব বনবিবি জহুবা নামক গৃহে অনুকূপ বক্তব্য বেখেছেন।

তাঁদেব মত অনুযায়ী বনবিবিকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে গ্রহণ কৰতে হয়। তবে তাঁদেব বক্তব্যেৰ সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওরা যায় না। অধিকাংশ গবেষকেৰ বক্তব্য এই যে বনবিবি মূলতঃ হিন্দু দেবী বনদেবীৰ মুসলিম সংস্কৰণ। বনবিবি হিন্দু-মুসলমান ধৰ্মচিন্তাৰ সমন্বিত অৱগমদেবী। আদিম যুগে হিংস্র জীৱ-জন্তুৰ ভবে কে না ভীত ছিল। তখন মানুহ আধুনাকালেৰ প্রহৰণ আবিষ্কাৰ কৰে নি। ঐ সব হিংস্র জীৱ-জন্তুৰ হাত থেকে বক্ষা পাওৱাৰ জন্তু কল্পিত অৰিষ্ঠাত্ৰী দেবীৰ পূজা প্রবৰ্ত্তিত হওৱাই স্বাভাবিক। বনবিবি বনেৰ জীৱ-জন্তুৰ এমনই এক অৰিষ্ঠাত্ৰী দেবী। সুতবাং বনবিবি এক কাল্পনিক পীৰানী হিসাবে গ্রহীতব্য। বনবিবি যদিও

হিন্দু বনদেবীর মুসলমানী সংস্কার বলে কথিত, তথাপি জুনা বনবিবি কেবল মুসলিমের নন, তিনি হিন্দু-মুসলিম সকলের।

বনবিবির প্রভাব প্রধানতঃ সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে বনস্বরনাঞ্চলে ব্যাপ্ত। সুন্দরবনে যাঁরাই প্রবেশ করেন তাঁরাই হিংস্র জীবজন্তুর কবল থেকে মুক্ত থাকার প্রার্থনা করেন বনবিবির নিকট,—বনবিবির থানে পূজা অর্পণ করেন কিংবা মানত করে বনে প্রবেশ করেন কিংবা প্রত্যাবর্তন কালে নিদিষ্ট ‘থানে’ পূজা অর্পণ করেন। এই সব লোক যাঁরা সুন্দরবনে প্রবেশকারী প্রধানতঃ তাঁরা কাঠ সংগ্রহকারী, মধু সংগ্রহকারী (চৌল), শিকারী প্রভৃতি।

সাধারণের ধারণা বনবিবি দয়ালু। এক শ্রেণীর ফকির দেখা যায় যঁরা হস্তেব সাহায্যে বাঘকে নাকি বশীভূত করতে পারেন। এই ফকিরগণ ওয়া বলেও কথিত। বাঘকে বশীভূত করার বাঘবন্ধন বলা হয়।

বনবিবির দু’বকম মূর্ত্তি দেখা যায়। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে বনবিবি হন কিশোরী মুসলিম বালিকার দ্বাৰা—মাথায় লতাপাতা আঁক টুপে,—মাথায় চুলের বিন্দু, টুকলী,—গলায় নানারকম হার, বনফুলের মালা,—পবনে পিরান বা ঘাঘা পাঙ্কামা, পায়ে জুতা-মোজা,—গায়ে পাতলা ওড়না। কোন স্থানে তাঁর হাতে আশাদণ্ড এবং ঝাণ্ডা। তাঁর বাহন মূবগী বা বাঘ। তাঁর কোলে বালক মূর্ত্তি। অনেকেব ধারণা সেটি দক্ষিণ রাঘ, মতান্তরে বনবিবি পাঁচালীতে বর্ণিত দুখে নামক কাঠবিষ্য বালক। বনবিবির জয়গায় মুসলিম ফকিরগণ শিরনী হাজত, মানত প্রদানে কর্তৃত্ব করেন। সেখানে মূবগী জবাই হয়, মস্ত পাঠ হয় না। কেহ বা কোরাণের দু’একটি বসেত মনে মনে আবৃত্তি করেন। হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে বনবিবির গলায় হার, বনফুলের মালা,—মাথায় মূবুট,—সর্ব অঙ্গে নানাকপ অলঙ্কার,—হাতে আশাদণ্ড থাকে না,—কোলে একটি শিশু, বাঘের উপর উপবিষ্ট। ৩৮

বর্ষ ব্রাহ্মণ বনবিবির পৌৰহিত্য করেন না, করেন অনুন্নত সমাজের হিন্দুবা। পূজা আচারে লোকাবৃত্ত বিধান অনুসৃত হয়। পুরোহিতগণ বনবিবিকে বনচণ্ডী জ্ঞানে নিবাসিষ নৈবেদ্য দিখে পূজা করেন,—বলি ওদন্ত হয় না। বনবিবি যে আদিতে বনদেবী ছিলেন তা তাঁর মূর্ত্তি ভালভাবে

নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায়। এখনও আকৃতি ও বেশভূষায় অবগ্য-বনবিবির বৈশিষ্ট্য লোপ পায়নি। ৬৮

বনবিবির নামে শিবনী দিবার প্রচলন কোন কোন স্থানে দেখা যায় না, যা অধিকাংশ পবিত্র দবগাহে দিতে দেখা যায়। তাঁর নামে হাজত দিতে অধিকাংশ স্থানে মোবগ জ্বাই হয় না, বনে বনবিবির নামে ছেড়ে দেওয়া হয়। একে বলা হয় ‘হাজত-খলবাত’। ঐ সব মোবগ বা মুবগীকে বনবিবির মোবগ-মুবগী বলে। অগ্রে সে মুবগী পালনের জন্তে নিষে যায়। মুবগী বনে ছেড়ে দেওয়ার মানসিকতাকে অনেকে গৌদ্ধ ধর্মান্দর্শ প্রভাবিত বলে মনে করেন। আবার অনেকে মনে করেন যে মা বনবিবি বা বিবিমা অত্যন্ত দয়াবতী। তাঁর ভক্ত বগ-সন্তানকে হত্যা না করার সন্তান-বৎসল মানসিকতা থেকে এই প্রথা উদ্ভব।

বনবিবির থান সাধারণতঃ নদ-নদী খাল-বিলের তীরে, গ্রাম পার্শ্বস্থ মাঠের ধারে বট, অশ্রু বা অশ্রু যে কোন বৃক্ষের তলায় অবস্থিত। থানে মাটির চিপির উপর মুক্তি স্থাপিত হয়। সেখানে সাধারণ ঘট বা চিত্রিত ঘট থাকে। অনেক স্থানে বনবিবির ছান পোবোত্তব থাকে। অধিকাংশস্থলে সেই থান সরকারী বেকর্ডভুক্ত না থাকলেও ন্যূনপক্ষে এককাঠা জমি ছাড় থাকে। দবগাহ ‘থান’ উন্মুক্ত স্থানেই থাকে। তবে থানের সম্মুখভাগ প্রাচীর দিবাও আবৃত থাকে না। লোকের বিশ্বাস যে তাঁর থানে গভীর বাত্রে বাঘ নিশ্চেষ্টে সালাম জানাতে আসে,—দেবীও গ্রাম প্রদক্ষিণ করে ঐ ‘থানে’ একবার আসেন এবং ভক্ত পণ্ডুলের প্রণতি নিয়ে যান। বসিবহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত ভুর্কুণ্ডা নামক স্থানে বনবিবির নামাঙ্কিত এবং কাব্য-খ্যাত এইরূপ একটি ‘থান’ আছে। থানটি ইছামতী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। সেখানেই নাকি বনবিবির আপনার আসন। কাব্যে আছে,—

বহু দেখে বনবিবি বওয়ানা হইল,  
ভুবকুণ্ডায় আপনার আসনে বসিল।

বনবিবির নামে কয়েকখানি মুদ্রিত পাঁচালী কাব্য, কয়েকখানি অমুদ্রিত নাটক আছে। মুদ্রিত কাব্যগুলি লিখেছেন বরনন্দিন, মুনশী মোহাম্মদ খাতের ও মোহাম্মদ মুনশী সাহেব। উহাদের বচনার ভেতন মৌলিক পার্থক্য

দুট হব না। কাব্যের নাম বোনবিবি জহুর নাম। এতে দুটি কাহিনী আছে। একটি নারায়ণীর জঙ্গ (জঙ্গ অর্থে বৃদ্ধ) এবং অপরটি ধোনা-হুথের পাল। মোহাম্মদ মুনশী সাহেব প্রণীত গাঁচালীর বিবরণ এইরূপ ;—

কবি আত্মপরিচয় দিয়ে লিখেছেন—

কহে মোহাম্মদ মুনশী জোনাবে সবার,  
ভুবমুট কানপুরে বসতি আমার।  
শেক দাওয়াজতুল্লা জান আমার ওহালেদ,  
আল্লাতাল। পূরা করে দেলের মকহেদ।

এই কাব্যের মধ্যে অল্প অংশে অল্প কবির ভণিতা পাওয়া যায়। যথা:—  
বনবিবি ও সা জঙ্গলি মদিনা থেকে বনে আসার কাহিনী-অংশের শেষে আছে,—

বোনবিবি সেথা হইতে বিদায় হইল,  
অধম ছাদেক মুনশী পয়ারে বচিল।

আবার, নারায়ণী বনবিবির তাঁবেদারী করবার বয়ানে আছে :—

শোন এবে ধোনা মৌলে কাহিনী হুথের।  
কহে শোন আছিবদ্দিন জোনাবে সবার,  
চব্বিশ পবগণা বিচে বসতি বাহার।

এ থেকে অনুমান করা যায় যে কাব্যখানিতে বিভিন্ন কবির হস্তাবলম্ব আছে। তবে মুনশী মোহাম্মদ খাতের প্রণীত কাব্যে একপ ভিন্ন কবির হস্তাবলম্ব আছে বলে কোন ভণিতা নেই। মোহাম্মদ খাতের আপনার পরিচয়ে দিবে বলেছেন—

মোহাম্মদ খাতের কহে আছি কবি সাব,  
হাবডা জেলার বিচে বসতি বাহার।  
বালিঙ্গা গোবিন্দপুরে কহিমি মোকাম,  
মোহাম্মদ হুছামুদ্দিন বাবাজীর নাম।

তিনি কেন এই কাব্য লিখলেন তার ব্যাখ্যায় লিখেছেন;—

লিখিতে কাহিনী কেজ্জ। নাস্তিক আছিল ইচ্ছ।

কি করিব জেদ কবে সবে ।

পূর্বদেশ বাদাবন সেথা হৈতে লোকজন

আইসে যাব। কেতাৰ লইতে ।

হামেসা খাবেস বাখে জেদ কোরে কহে মোকে

এই পুথি বচনা করিতে ।

কহে সকলেতে ইহ। বোনবিবি কেছা যাহ।

বিবচিষা ছাপ যদি ডাই ।

সে হইলে দেশে পুথি গোবা অনারাসে

সকলেতে যবে বসে পাই ।

গুনিয়া এষছাই কথা। দেলেতে পাইয়া ব্যথা।

ভেবে গুনে আখেবে তখন ।

বোনবিবি কেছা যাহ। আওয়াল আখেবে তাহ।

একে একে কৈনু বিবচণ ।

মোহম্মদ মুনশী সাহেব একপ কোন কৈফিয়ৎ দেন নি। কাব্যখানি  
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে লিখিত। কবি লিখেছেন :—

“ভেবশো পাঁচ সাল বারই ফান্তনে।

কলমে বিদায় কবিলাম ভেবে গুণে ।

মোহম্মদ মুনশী সাহেব বিবচিত্ত বনবিবি জহুরানামা কাব্যের কাহিনীর  
সংক্ষিপ্ত রূপ :—

মক্কা সহবে আল্লাব এক ফকির ছিলেন,—নাম তার বহিম। তাঁর পত্নী  
নাম ফুলবিবি। তাঁরা নিঃসন্তান। সন্তানের জন্ত তাঁরা আল্লার দরগাহ  
এবং পরে বসুলেব গোরে প্রার্থনা জানালেন। বসুল বেহেস্তে গিয়ে  
জিবিলকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

লাভক। নাহি হয় বেরাহিম ফকিরের

এ কাবণে আইনু আমি নজদিকে তোমার।

হবে কি না হবে দেখে আইস একবার—

জিবরিল তখন খোদাব আবশেব নীচের কেতাৰ দেখে এসে বসুলকে  
জানালেন। বসুল তা জেনে তখনই কিরে এসে তাঁদেরকে বললেন যে

ফুলবিবির পেটে ছেলে হবে না। দ্বিতীয় বিবাহ করলে ভাব গভে বেটা ও বেটি হবে। ফুলবিবি দুঃখে কাতর হলেন। ফকির দ্বিতীয় বিবাহ করতে চান। কপাল মন্দ বুঝে ফুলবিবি একটি ইচ্ছা পূরণের সর্তে সে বিবাহে অনুমতি দিলেন।

বেবাহিম ফকির এবার শাহা জলিলের চোদ্দ বছর বয়সের কন্যা গুলাল বিবিকে বিবাহ করে নিয়ে এলেন।

বোনবিবি জঙ্গলি বেহেস্তে আছিল,  
তাহাদিগে আল্লা তাল। হুকুম কবিল।  
পষদা হও গিষা গুলাল বিবির সেকমে,

বনবিবি ও সা জঙ্গলি বাজী হলেন,—‘খোদাই মদদ যোবা চাহি হব বাতে।’  
গুলালবিবির গর্ভ হল। দিনে দিনে দশ মাস পূর্ণ হয়ে এল। ফুলবিবি এবার ফকিরকে তাঁর সর্ত পূরণের জন্য গুলালবিবিকে বনবাস দিতে বললেন।  
ফকির শিরে কবাসাত করে বললেন,—

কেমনে এ হালে তাকে বনবাস দিব।  
খোদার হজ্বরে কোন মুখ দেখাইব।....  
মাফ কব বিবি আব কিছু চাহ তুমি।

ফুলবিবি বাজী হলেন না। অগত্যা ফকির এক ফন্দি স্থির করলেন। তিনি গুলালবিবিকে বললেন যে,—আমার এমন কেহ নাই যে খালাসের দিন তোমার দুঃখের কেউ শবিক হয়। ‘ফুলবিবি তেবা পরে আছে ত বেজাব।’ এখন উচিত কাজ এই যে,—‘তেবা মা বাপের ঘবে দিই পৌঁছাইয়া।’

গুলালবিবি বাজী হলেন। কিছুদূর গিয়ে বেবাহিম বনের পথ ধরলেন। গুলালবিবি জিজ্ঞাসা কবলেন,—বাস্তা ভুলে এ তুমি এলে কোথায়?  
বেবাহিম বললেন,—

সাদীর আগেতে ছিল মান্নাত আমাব,  
কবিলা আমাব যবে হবে বাবদাব,  
জিযাবতে যাব হজবন্ত আলীর বওজার  
নজদিগে পৌঁছিলে হবে মান্নাত আদার।

কিছুদূর গিয়ে ক্লান্ত গুলাল শুয়ে পড়লেন এক গাছতলায়। মুহম্মদ



হাওয়ার তিনি ঘুমিয়ে পড়লে বেবাহিম তিন বাব ডাকলেন বিবিকে। ঘুমন্ত বিবি উত্তর না দেওয়ার বেবাহিম

কহে আল্লা নাহি এতে অজাব ছওয়ার,  
তিনবাব ডাকিলাম না দিল জওয়ার।

এটাই বেবাহিমের একটা সুযোগ। তিনি গুলালবিবিকে সেখানে ফেলে  
ঘবে ফিরে এলেন।

গুলাল বিবি ঘুম ভেঙে দেখেন বেবাহিম নেই। তিনি কেঁদে উঠলেন।  
বললেন,—

বুঝি এ হুনিয়াতে কেহ কাব নর,  
আল্লা ছেওয়া আর কেহ নাই দরামর।

তিনি হাত ভুলে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাব দবগাষ খোনা জাত করলেন এবং  
বেহুশ হয়ে পড়লেন। তখন আল্লার হুকুমে চার জন ছর এসে তাঁকে সান্না  
দিলেন,—আল্লার কজল হবে তোমার উপর।

যথাসময়ে তিনি এক ছেলে এক মেয়ে প্রসব করলেন। দু'থ ভুলে তিনি  
বেটা-বেটি কোলে নিলেন। দুটি শিশুকে পালন করা কঠিন ভেবে তিনি  
বেটাকে হায়াতেব উপর ভবসায় বনে ফেলে বেটাকে কোলে নিয়ে অকৃত্র  
গেলেন। বনের এক হরিণা সেই বেটিকে পালন করতে লাগল।

বেটার নাম সা জঙ্গলি ও বেটির নাম বনবিবি। তারা দিনে দিনে বড়  
হতে লাগল। সাত বছর পর,—হুকুম কবিল দোহে খালেক কিববিরা।

বাদাবনে যাও দোহে ভাটীর সহরে।

ফুলবিবি ইচ্ছা পূরণ হয়ে গেল। বেবাহিম এবার চললেন গুলালবিবির  
সন্ধানে। জঙ্গলের ভিতর তাদের সাক্ষাত হল বেবাহিম তাঁকে ঘবে কিবতে  
অনুরোধ করলেন।

বিবি বলে চাড়ুরি করিতে কেন আইলে।  
আমি খুব জানি বাহা আছে তেরা দেলে।  
লইয়া আল্লাব নাম জঙ্গলে রহিব।  
জেন্দেবী থাকিতে নাহি আলাপ কবিব।

বিবি শেষে ঘবে ফিবতে বাজী হলেন। পথে দেখা বনবিবির সাথে।  
বনবিবি এবাব,— সা জঙ্গলিকে হেঁকে বলে কোথা যাও ভাই।

মা-বাপের সাথে যাওয়া আবশ্যক নাই ॥ -  
আঠাৰো ভাটিতে যেতে হবে আমাদের।  
খোদাব হুকুম এরুছা আমাদের পৰে ॥  
আমাদের জহুরা জাহেব সেথা হবে।...

সা জঙ্গলি তখনই বনবিবির আছানে সাজা দিবে মাতার কোল থেকে  
নাহলেন। বনবিবি, মাতা ও পিতাকে সাজুনা দিবে বিদায় নিলেন।  
বেবাহিম ও গুলালবিবি দুঃখিত মনে ফিবে এলেন।

বনবিবি ও সা জঙ্গলি প্রথমে এলেন মদিনাতে। নবীর এক আওলাদেব  
নিকট মুবিদ (শিষ্য) হলেন। পবে তাঁরা ফাতেমাব বওজাহ গিবে জিন্নাবত  
কবলেন। তাঁরা প্রার্থনা কবলেন নবীর বওজাহ গিবে।

তাহা বাদে বোনবিবি ভাই-বহিনেতে।  
খেলাসত চাহিতে লাগিল নবী হইতে ॥  
গায়ের থাকিবা খেলবা টুপি দোহে দিল।  
চুমিয়া সে এনায়েত হাতে তুলে লিল ॥

মদিনা শহর ত্যাগ কবে কতদিন পর তাঁরা হিন্দুস্থানে এলেন। গজা পার-  
হলে এসে সাক্ষাত পেলেন ভান্ড-সাহাব। ভান্ড সাহা তাঁদের পরিচয় পেয়ে  
বললেন,— এই ত ভাটিব দেশ আইলে এখন ॥

নাগেতে দক্ষিণা বাস ইশ্বর ভাটিব।  
এ সব জঙ্গল জান তাহাব জায়গীর।...  
চান্দখালি বান্স-জঙ্গল শিবদাহ আর।  
প্রথমে এসব ঠাই কব এস্তিবার ॥  
তা বাদে জুড়িতে গিয়া আসন করিবে।  
সেথা হইতে খববদার আগে না বাড়িবে ॥

সা জঙ্গলিকে নিষে বনবিবি বাদা-বন দখল কবতে চললেন। প্রথমে  
জুড়িতে পৌঁছে তাঁরা নামাজে বসলেন। আজ্ঞানের সে আওলাজ শুনে দক্ষিণ  
রাস বীর সনাতনকে ডেকে বললেন,—

কিসেব আওলাজ এলছ। বাদল গবজে ষেলছ।

জেনে আইস গিন্না বাদা-বনে ।

বডখান বন্ধু আইলে হাঁকে নাহি কোন কালে

আসিরাছে দোসব। যে আব ।

ভাগাইবা দেহ তাকে কোথা হইতে এসে হাঁকে

নাহি জানে সীমান। আযাব ।

বাগ্নের ছকুম নিয়ে সনাতন বনে গিষে দেখে যে দুজনে নামাজের আসনে বসে আছেন। তাঁদের শিবে টুপী গাবে জুঝা। তাঁরা সামনে এক ঝাণ্ডা পুঁতে তছবি জপছেন। ভব পেযে সনাতন ফিরে এসে রাগকে বল্লে,—

এক মর্দ এক বিবি কি সব দোছবা ছবি,

রূপে বন হয়েছে উজালা ।

বদনে মলেছে থাক, বন্ধ কবে দুই আঁখ,

তছবি হাতে বলে আল্লা আল্লা ।

এ কথা শুনে দক্ষিণ বায় ক্রোধান্বিত হবে সদলে সজ্জিত হলেন যবনকে ভাগিষে দিতে। এমন সময় তাঁব মাতা নারায়ণী এসে বল্লেন যে,— আওবাতের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলে তাঁব অধ্যাতি হবে। অতএব নারায়ণী নিজে যাবেন যুদ্ধে ।

নারায়ণী যুদ্ধ সাজে সজ্জিত। হলেন। তাঁব সাথে চল্ল ভূত, প্রেত, ডাকিনী-যোগিনী, দেও-দানো। বনবিবি তা দেখতে পেযে সা জঙ্গলিকে জ্ঞাবে আজান দিতে বল্লেন। নামাজের আওবাজে ভূত-প্রেত পলায়ন করল। পলায়ন কবল ডাকিনী-যোগিনী। নারায়ণী ভীত। হলেন। তবু যুদ্ধ হল। তিনি নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ কবলেন তাঁদের দিকে কিন্তু তাঁদের বিপদ অপসারিত হল না। অবশেষে নারায়ণী আত্মসমর্পণ কবলেন এবং আপনাব মোকামে ফিরে গেলেন ।

বনবিবি এবাব বেকলেন জহর। করতে। একে একে সব ভাটি ভ্রমণ করে ভুরকুণ্ডা মোকামে এসে আস্তানা কবলেন। দক্ষিণ বায়কে বনবিবি দিলেন কৌদোখালি অঞ্চল ।

আছিল যতক সেই বনের প্রধান ।  
বাটওয়াব। কবিশ। সবাবে কবে দেন ।  
যাব যে সবহদ্ধ লিষ। খুসিতে রহিল ।  
কেহ কাৰে। সীমান। না হবণ কবিল ॥

বনবিবি পাঁচালী কাব্যের অপব কাহিনী এইরূপ,—

ববিহুটি গ্রামে ছিল ধোনাই মৌলে অর্থাৎ মধু সংগ্রহকারী । তারা দুই ভাই । ছোট ভাই-এর নাম ধোনাই । ধোনাই-এর বাসনা মোম-মধু সংগ্রহ কববে, বাদাষ যাবে । ধোনাইকে বল্ল সাত ডিঙ্গ। তৈবী করিবে দিতে । ধোনাই বাধ। দিবে বল্লে যে,—তাদের যবে তো অভাব নেই, তবে কেন বাদাবনে বাঘের মুখে প্রাণ হাবাতে যাবে । ধোনাই বল্লে,—বসিষ। খাইলে টুটে বাজাব ভাণ্ডাব ।

নাছোড়বান্দ। ধোনাই অবশেষে সেই গ্রামের দুখে নামক এক গৰীবের ছেলেকে তাদের দুঃখ অবসানের আশ্বাস দিবে, সাধী কবে নিল । দুখেব মাভাব অদুখ মনকে বুঝ দিবে, অবশেষে দুখেব বিবাহেব ব্যবস্থা করাব আশ্বাস দিবে তবে ডিঙ্গি ভাসালো । তাদের ডিঙ্গি বরণহাটি, সন্তোষপুৰ, ধুলে প্রভৃতি অঙ্গল,—বাষমঙ্গল, মাভল। প্রভৃতি নদী এবং আৰো অনেক জাষণ। ছেড়ে এসে পৌঁছিল গডখালি নামক বাদাষ । দুখেকে সে ডিঙ্গির মধ্যে ছুঁশিয়ার থাকতে বলে নিজে মোম-মধু সংগ্রহে বনের ভিতর গেল ।

খাতি থেকে দক্ষিণ বাষ দেখলেন ধোনাই মৌলে দুখেকে পূজায় নববলি দিবে মোম-মধু পেতে চাষ । বাগানিত হধে তিনি সমস্ত মৌচাকের মধু হবণ কবলেন । মধু সংগ্রহ কবতে গিবে ধোনাই তো অবাক্ । “চাকের ভিতর নাহি মধুব ভাণ্ডাব ।” তিন দিন বনে যুবে যুবে হববান হধে সে কাঁদতে লাগল । কিস্তিতে ফিবে খানা-পিনা না। গেয়ে শুধে বইল । দক্ষিণ বাঘ তাকে স্বপ্নে বল্লেন,—

বাদাবনে মোম-মধু আশাবই সৃজন ।  
নববলি পূজ। যদি দিতে পাব তুনি ।  
মোম মধু সাত ডিঙ্গ। দিব তোবে আনি ॥

ধোনাই হুগুখিত হল,—এ প্রস্তাবে রংগী হল ন । দক্ষিণ বাঘ বল্লেন,—

‘দেখি বেটা কেমনেতে যাও দেশে ফিরে।’ ধোনাই ভয় পেল। সে বুঝল  
হুখেৰ উপব রান্নেৰ নজ্বৰ। অগত্যা সে বাজী হল।

ধোনাই একপে রান্নে স্বপনে কহিল।

চেতনে আছিল হুখে তামাম শুনিল ॥

হুখে শুনে হুংখিত হল,—মনে পড়ল তাৰ দুখিনী মাতাৰ কথা। নিকপাষ  
হুখে স্মরণ কবল বনবিবিকে। বনবিবি সে ককণ আহবানে আসনে থাকতে  
পারলেন না। হুখেৰ নিকট এসে আপনাৰ পৰিচয় দিবে সমস্ত বিবরণ  
শুনলেন। বনবিবি এবাৰ হুখেৰে কোলে নিবে,—

কহিতে লাগিল তুমি কবজন্ম কাহাৰ ॥

ধোনাই তোমাকে বাৰে দে যাৰে মখন।

তুমি মোবে মা বলিল। ডাকিও তখন ॥

পলকেৰ বিচে আমি আসিবা। পৌছিব।

দক্ষিণা বায়েৰ হাত হইতে ছাড়াইব ॥

পূৰ্ব-সৰ্ত মতন ধোনাই সাত ডিঙ্গা নিষে এল কেদোখালি নামক জাহগাষ।  
রান্নে রাষ স্বপ্নে বল্লেন যে মধু ভাঙাৰ আগে যেন সে তাঁৰ নাম নেৰ এবং  
মধু নিষে যাৰাৰ আগে যেন হুখেৰে দিবে যাষ। পৰদিন হুখেৰে নোকাষ  
বান্ধা কবে বাখাৰ আদেশ দিবে ধোনাই জঙ্গলে গেল। সেখানে দক্ষিণ  
রান্নেৰ অনুচৰগণেৰ সহায়তাৰ সাত ডিঙ্গা মোম-মধুতে পূৰ্ণ হল। যাষ  
বল্লেন—মধু সব নদীতে ফেলে দাও। মধু কেলে দেওয়া হল। সেখানকাৰ  
পানি হল মিঠা,—সে গাঙেৰ নাম হল মধুখালি। এদিকে হুখে তো ভিজ্জে  
কাঠে বান্ধা কবতে না পেবে স্মরণ কবল বনবিবিকে। বনবিবিৰ দোয়ায  
বেগৰ আঙনে খানা তৈৰী হল। সে বাতে সকলে খানা-পিনা খেবে শুয়ে  
বইল।

পৰদিন ডিঙ্গা খুলবাৰ আগে কাঠ সংগ্ৰহেৰ ঔলোজ্ঞন হল। ধোনাই  
আদেশ দিল হুখেৰে কাঠ সংগ্ৰহ কবতে। হুখে বল্লল,—কেদোখালিৰ  
চৰে আমাৰ ফেলে যেও না; শোকে আমাৰ মা মাৰা যাৰে।

ধোনাই কোন কথা শুনল না—তাকে কৌশলে সেখানেই নাহিলে দিলে  
চলে গেল।

নরমাংস লোভী বাঘমণি খাতি থেকে দুখে থেকে দেখে বাঘের আকৃতি-  
থবে তাব দিকে অগ্রসব হল।

দেখিয়া দুখেব গেল পবাণ উড়িয়া।

বলে বনবিবি মাগো গেহ উদ্ধাবিয়া ॥ ..

পলকেতে ভাই বহিন পৌছিল সেথায় ॥

দেখে দুখে পড়ে আছে হুস হাবাইয়া।

দুখেকে লইল বিবি কোলে উঠাইয়া ॥ ..

সা-জঙ্গলিকে বোনবিবি কহে গোস্থ্য ভরে।

খাওযাব গকর মাংস বাক্সস বেটাবে ॥

বনবিবির আদেশে সা-জঙ্গলি, চড মাবল বাঘের মাথায। তখন দক্ষিণ-  
বাঘ পলারন কবতে লাগলেন। সা-জঙ্গলি তাঁকে অনুসরণ করলেন।  
পথিমধ্যে পড়ল আজিম দবিষা। নিজেব মহিমায বায় সে নদী পার হলেন।  
সা-জঙ্গলি আল্লাব নাম নিষে নদীতে নামলেন। হাঁটু সমান হল জল।  
দক্ষিণ রায় তা দেখে ভীত হলেন। তিনি তাঁর হাঁকর-কুমীবকে আদেশ-  
করলেন সা-জঙ্গলিকে গ্রাস কবতে। পা বাড়ি দিষে সে সব মেবে ফেলে।  
সা-জঙ্গলি নদী পার হলেন। ভষে বাঘ দৌড়ে গেলেন গাজীব কাছে—  
“এ বিপদে গাজি ভাই কবহ উদ্ধাব।” সব শুনে গাজী বললেন,—

বনবিবি নাম তাব ভাটিব প্রধান ॥

খোদার বহম আছে উপবে তাদেব।

রায়কে অনুসরণ কবে সা-জঙ্গলি এসে হাজিব হলেন সেখানে। গাজির-  
সহিত দক্ষিণ বাঘের বন্ধুত্ব দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। গাজি সকলকে সঙ্গে-  
নিষে গেলেন বনবিবির নিকট। গাজিব পবিচয পেষে বনবিবি বললেন,—

ভুমি এখানেতে আছ ওলি এলাহিব।

মানুষ ধরিয় খায় বাক্সস বে-পিব ॥

বনবিবিকে সালাম জানিষে গাজী বললেন,—মানুষ ধরে খায় তা তো-  
আমি জানিনে। হে জননী এখন তাকে ক্ষমা কব। দক্ষিণা রায়ের  
ভুমি তো সই-মা। কাবণ ইনি নাবাযণীর পুত্র। দক্ষিণা বাঘ বনবিবির  
পদে পতিত হলেন। বনবিবির বাগ দ্বব হল। তিনি বললেন,—‘এখন যেন

তিন বেটা হইল আমার ।’ গাজি, সা-জঙ্গলি ও দুখে এই তিন ভাই-এর মিলন হল । গাজি, দুখেকে সাত জালা বন দিতে চাইলেন । দক্ষিণ রাস্তা ভাকে আঠাবো ভাটবি মধ্য থেকে মোম-মধু চাওয়া মাত্র পৌঁছে দিতে চাইলেন । তারপরে গাজী ও বার বিদায় হলেন । বনবিবি দুখেকে কোলে নিয়ে—

“আঠার ভাটিতে সব ভ্রমণ কবিল ।”

আপনা আসনে বিবি বসিল খুসিতে ।

দুখের কপাল কেবে বনবিবি হইতে ॥

এদিকে ধোনাই মৌলে সাত ডিঙ্গা ভর্তি মোম-মধু নিয়ে ঘবে ফিৰতে সহবে সে খবর ছড়িয়ে পড়ল । দুখের মা খবর পেয়ে এসে হাজির ধোনাই-এর বাড়ী :—

কোথায় আমার দুখে কহ বে ধোনাই ।

চাঁদমুখ দেখে ভাব পরাণ জুড়াই ॥

ধোনাই মাথা নিচু করে বলল :—

কাঠ কাটিবারে দুখে গেল জঙ্গলেতে ।

কেদোখালিৰ চরে খায় ধরিয়া বাঘেতে ॥

দুখের মা একথা শুনে কঁদে আকুল হল । তা “ভুরকুণ্ডার বনবিবি পারিল জানিতে ।” বনবিবি দুখেবে বললেন,—

“মাহ বাবা ঘবে আপনার ।

বুড়ী মাতা কান্দে তোব হরে জাবে জাব ॥ ..

দুখে বলে মা জননী :—

কি করিব দেশে গিবা কি আছে আমার ।

তোমা হেন দরাবতী কেবা আছে আব ॥

বনবিবি বলে বেটা না কব ভাবনা ।

আমি তোব পিঠ পবে আছি পোস্ত পানা ॥

যখন মিয়ান ভুমি কবিলে আমার ।

মুহুর্তে যাইয়া দেখা দিইব তোমার ॥

অনেক সাত্বনা ও সাহস দিয়ে তিনি দুখেকে সেকো কুমীরের পিঠে চড়িয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেন ।

দুখে এসে পৌঁছুল নিজেব গ্রামে। কুমীরের পীঠ থেকে নদীর কিনাবার উঠল  
এসে এবং কাতরভাবে মা মা করে ডাক্তে ডাক্তে ফিরে এল ঘরে। দেখল তার  
মা, কানা ও কাল। অবস্থায় অচেতন হয়ে পড়ে আছে। দুখে ভৎক্ষণাৎ স্মরণ  
করুল বনবিবিকে। বনবিবি এসে বললেন,—

লইয়া আল্লার নাম চক্ষু ও কানেতে।  
হাত ফিরাইয়া দেহ পাইবে দেখিতে।  
গুনিতে পাইবে হৃদ হইবে বহাল।...  
একথা বলিয়া বিবি গায়ের হইল ॥

দুখে ও তার মাতার আনন্দ-করণ মিলন হল। ছেলের কাছে বনবিবির  
দয়ার কথা শুনে—

বুড়ী বলে বাঁচাইল তোর পাকজাত।  
বনবিবির নামেতে স্মীর করহ স্বরবাত ॥

মাধব কথা মত দুখে গলে কুড়ালি বেঁধে সাত গ্রামে ভিক্ষা করে এবং  
বনবিবির মহিমা প্রচার করে বেড়ালো। গ্রামের ছেলেরদেব ডেকে এনে  
বনবিবির নামে স্বরবাত দিল। তারপর দুখে বলল, ধোনাই-এব জন্ত এত  
দুঃখ,—অতএব তার বিচার চাই। বুড়ী বললে, না, তার সাথে লড়াই হবে  
কাজ নেই। দুখে স্মরণ করল বডখাঁ গাজীকে এবং প্রতিশ্রুতি মতন সাত জাড়ি  
খন-দৌলত চাইল ঘর-বাড়ী নির্মাণ করবার জন্ত। দুখে সে খন অনারাসে  
পেল। তারপর স্মরণ করল দক্ষিণ রান্নকে এবং তাঁকে পূর্ব প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি  
পালন করতে অনুবোধ করল। দক্ষিণ রান্ন ভৎক্ষণাৎ অনুচরদের সহায়তায়  
দুখের বাড়িতে পর্বত-প্রমাণ কাঠ আনিবে দিলেন। দুখে মজুর মিল্লিব  
অভাবে হুশিয়ারগুস্ত হয়ে স্মরণ করল বনবিবিকে। বনবিবির স্বপ্নাদেশে যত  
রান্ন পরদিন প্রাতে গিবে দুখের নিকট উপস্থিত হল।

যত রান্ন দুখের ছকুমে মাতা লিয়া।  
দরকার মাফিক লোকজন মাঙ্গাইয়া ॥  
ফরমাইস মোতাবেক বানাইয়া দিল  
যেখানে যা আবশ্যক সকলি কবিল ॥



এবার দুখের বাদশাই ঠাট-বাট হল। “খোদার মেহেরে দুখে বাদশাই পাইল।” বনবিবির নির্দেশে দুখে, যত রান্নাকে দেওয়ান করল।

‘একদিন দুখে কাছারিতে বসে সকলকে তলব করুল। সকলে এসে সালাম করে গেল,—এল না কেবল ধোনাই মৌলে। দুখে সাহা পিন্নাদা পাঠিয়ে তাকে দরবারে আনালে। ধোনাই এবাব দুখেকে সালাম জানিয়ে মাথা নীচু করল। দুখের পায়ে ধরে সে মাফ চাইল। আবে সকলের অনুরোধে দুখে তাকে মাফ কবে দিল। ধোনাই বাড়ী ফিরে ভাবল—

কেন্দোখালির কথা যখন মনেতে পড়িবে।

দুখে, গোন্ধা হইয়া তখনি আমাকে বোলাইবে ॥...

সাত পাঁচ ভাবে দেলে ইরাদ হইল।

কাতর হইয়া বনবিবিকে ডাকিল ॥

দন্নাবতী বনবিবি বললেন—

শোন বে-আক্কেল ধোনা কহি যে তোমার ॥

দুখের হাতে প্রাণ যদি বাঁচাইতে চাহ।

দুখের সাথে আপনার বেটী বেহা দেহ ॥

বনবিবি সেইমত দুখেকেও নির্দেশ দিলেন। ধোনাই বিবাহের প্রস্তাব নিলে এল। দুখে তাতে সম্মত হল।

“বেটার সাদীর বাতে আছলাদ বুড়ীর।

চলিল দুখের বাড়ী তুফান খুসির ॥ ..

গরীব কাজাল খুব নেহাল হইল।

বনবিবির নামে খুব খয়বাত কবিল ॥ .

কাতরেতে ডাকিতে লাগিল মা বলিষা।

বনবিবি বিষানেতে জানিতে পারিষা ॥

শ্বেত মক্ষি হইষা দুখেব কাছেতে পৌছিল।

কেন বাছা ডাকিলে কহিতে লাগিল ॥

দুখে বলে মা জননী তোমার কৃপার।

চৌধুরী কবিল তুমি দিষাছ আমায় ॥

তোমাব কৃপার মোর হইল কোঠাবাড়ী।

বিবাহ দিলেন মোবে ধোনাষেব বাড়ী ॥ .

বহু দেখে যাহ মাতা আসনে আপন ।

বিপদে রাখিও পদে করিলে স্মরণ ॥

বহু দেখে বনবিবি বগ্লানা হইল ।

ভুবকুণ্ডায় আপনাব আসনে বসিল ॥

মোহম্মদ মুনশী সাহেব বিবচিত কাব্যখানি ১০"×৬½" আকৃতিবিশিষ্ট । পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮ । হামদো-নাত, কাহিনী ও সুচীপত্র । প্রধানতঃ এই তিনটি ভাগে বিভক্ত । বাবোটি শিবোনামা আছে । দ্বিপদী ও ত্রিপদী পন্নাবে রচিত । প্রথম পংক্তির শেষে দুই দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে তারকা চিহ্ন । ভণিতাব নমুনা এইরূপ :—

খোদার-দবগাব ভেজে হাজার শোকবানা ।

কহে মুনশী মোহম্মদ ডাবিষা বব্বানা ॥ (পৃঃ ৬)

অথবা,

কহে হীন কবিকাব ডাবিষা বব্বানা ॥ (পৃঃ ১৪)

এ কাব্যেরও পৃষ্ঠাগুলি ডাইন দিক থেকে বাম দিকে সজোনে অর্থাৎ ডাইন দিক থেকে পড়ে বাম দিকে যেতে হয় । ভাষা দাক্ষিণ বঙ্গের বিশেষতঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার । প্রচুর আববী-কাবসী শব্দ ব্যবহৃত হইবে । বহু অগুচ্ছ বর্ণ আছে । তবে ভাষা বেশ সবল । গ্রাম্যের সাধারণ মানুষের দ্বাবাব পক্ষে বটেই ।

প্রত্যক্ষভাবে বনবিবির মাহাত্ম্য-কথা হলেও পর্বোক্তভাবে আঞ্জাহু তালাব মাহাত্ম্য-কথা বিবৃত হইবে । কবি, কাহিনীব আবঙে লিখেছেন,—

দস্তবক্ষ মুনি মৈলে পুত্র বাজ্য পাইল ।

দক্ষিণা বায়েব নাম প্রকাশ পাইল ॥

হিন্দুতে দিইত পূজা দেবতা বলিষা ।

অত্যাচার কবে ঋষ মানুষ ষবিষা ॥

বাদাবনে মানুষেব দেখা যদি পাষ ।

বাঘেব ছুবত হইষা পাকডিষা খাষ ॥

বাক্সেব জাত মানুষ বাইতে লাগিল ।

কেহ তাব প্রতিকাব কবিতে নাবিল ॥

আদম জাতের পবে আঞ্জা নেধেবান ।

আলোমল গায়েব তিনি বহিম বহমান ।

বনবিবি সাজ্জলিকে ভেঙ্গে ছনিষাতে ।

হুকুম হইল যাও আঠারো ভাটিতে ।

আল্লাহ্ তাল। কেন বনবিবি ও সা-জ্জলিকে আঠারো ভাটিতে পাঠালেন, আঠারো ভাটিতে এসে তাঁবা কি কবুলেন—এই নিয়ে কাহিনী হলেও—এ সবই যে মানবীয় প্রযোজনে সংঘটিত হয়েছে তা সুস্পষ্ট। অবতাবদ্ধ প্রতিষ্ঠাব জন্ত নর বা পূজা ও চলনের জন্ত বনবিবিকে মর্তে পাঠানো হয় নি। তবে বনবিবির প্রভাব যে জনমানসে বিশেষভাবে পড়েছে তা কবি বিকৃত না কবেই লিখেছেন। বনবিবির দযাষ দুখে অবশ্যস্তাবী বিপদ থেকে বেহাই পেরে—

“চাল চিনি ও দুধ এনে কীব পাকাইল ।

গ্রামের ছেলে সব আনে বোলায়।

বনবিবির নাম লিখা দিল খেলাইয়া ।

দুধ চিনি কিবের হাজত সেই হৈতে ।

শুক হৈল, আদাষ কবেন সকলেতে ।

বনবিবি কাব্যের কাহিনীর আবস্ত আরবে এবং সমাপ্তি আঠারো ভাটিতে। কবি যদিও নাবায়ণা জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা বলেছেন,—অশ্রুত শুধু তিনি ধোনা মৌলে ও দুঃখের পালা বলে উল্লেখ কবেছেন। বনবিবি জুছবা নামায় অশ্রু নামকরণও তিনি কবেছেন—“বনবিবি কেবামতি ।”

বনবিবি কাব্যের দুটি কাহিনী পৃথক হলেও উভয়ের সঙ্গে সঙ্গতি বক্ষিত হয়েছে। দুটি কাহিনীই মিলনান্ত। নাটকে কপ দিবাব খুবই উপযোগী, এবং তা হয়েছেও। গল্পের আকর্ষণী শক্তি প্রবল।

পাঁচালী কাব্যখানি নর, নাবী, দেবতা, দানব প্রভৃতি চরিত্র সমন্বিত। বনবিবিকে কেন্দ্র করে সমগ্র কাহিনী গড়ে উঠেছে, সুতরাং কাব্যের নামকরণ সার্থক হয়ে উঠেছে। কাহিনী থেকে বোঝা যায় যে ভাটি-অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বড়বা গাজীর সঙ্গে দক্ষিণ বায়ের যে সংঘর্ষ হয়েছিল,—বনবিবির সংগে তাঁব সংঘর্ষের কাণও ঠিক তাই। তবে দক্ষিণ বায়কে মুসলিম বিদ্রোহীরূপেই দেখা যায়। শক্তিতে পেবে

না। ওঠায বনবিবির সহিতও তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হইতেন। বডখাঁ গাজীৰ সহিত সংঘর্ষে কবি কৃষ্ণবাম দাসেৰ “বামমঙ্গল” কাব্যে দক্ষিণ রাঘেব হীন পবাজয়েৰ চিত্র নেই।

মুসলিমের বঙ্গ-অভিযান সফল হইছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্থানীয় অধিপতিৰ পবাজয় বরণ করতে হইছিল—এ কথাও ঐতিহাসিক সত্য। স্থানীয় অধিপতিদের অগ্রতম দক্ষিণ বাঘেৰ পবাজয় হইছিল—একথা অসত্য নহ। তাঁকে পবাজয়েৰ গ্লানি থেকে মুক্ত করার জন্য কাল্পনিক মিত্র দেবতাৰ আবির্ভাব প্রয়োজন হইতে থাকতে পারে। কবির কল্পনাৰ বাজেত। সম্ভব—কিন্তু পবাজয়কে পবাত্ত কৰে বডখাঁ গাজী তথা বনবিবিৰ আধিপত্য বক্ষাৰ উপর কোন প্রভাব দক্ষিণ বাঘ বিস্তার করতে পারেন নি। তাঁকে পবাজয়েৰ মাধ্যমেই সহাবস্থানেৰ পৰিস্থিতিতে আসতে হইছিল। তবে একথাও সত্য যে তৎকালীন মুসলিম শাসকগণ বুঝেছিলেন, নিজেদেরকে স্থায়ী কৰতে গেলে স্থানীয়দেরকে চিৰ-বিরোধী কৰে বাখা চলে না। অতএব স্থানীয় অধিবাসীগণের সংস্কৃতিতে আঘাত যতখানি সম্ভব না কবাই উচিত এইরূপ হুত ধারণা কৰেছিলেন।

মুনশী সাহেবেৰ এই কাব্যের সহিত মোহাম্মদ খাত্তেরের কাব্যখানিৰ কাহিনীগত মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। ভাষাৰ অবস্থা কিছু কিছু পার্থক্য আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দগুলি ছবছ ব্যবহৃত হইছে। মুনশী সাহেবেৰ কাব্যে যে একাধিক কবির হস্তক্ষেপ হইছে তা বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন ভণিতা থেকে বোঝা যায়। যেমন :—

বোনবিবি সেখা হইতে বিদায় হইল।

অধম ছাদেক মুনশী পরাবে বচিল।

অথবা, কহে হীন আছিবদ্দীন জোনাবে সবাৰ।

চবিশ পরগণা বিচে বসত বাহাব।

লক্ষ্যনীর যে কবি তাঁৰ ভণিতায়, “হীন” “অধম” এই সব শব্দ ব্যবহার কৰেছেন। বৈষ্ণব মূলভ দীন, দাগ প্রভৃতিৰ শ্রায় হীন, অধম শব্দ ব্যবহার কৰে কবি তাঁৰ ভক্তমনেৰ পৰিচয় দিইছেন। বনবিবি কাব্যে দয়াবন্তী মা বনবিবিৰ নিকট সন্তানের যে ভক্তি বা সন্তানের প্রতি মাতার যে স্নেহ তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইছে।

নারীর সহিত নারীর মুক্ত বিবরণ শুধু এই কাব্যের কাহিনীতে নয়, সমগ্র পাব সাহিত্যে এক নব সংযোজন। দুরাচাবী ধোনা মৌলেব শাস্তি বিধান এবং ভক্ত হৃথের ভক্তিব পুৰস্কার প্রদান বনবিবি চবিত্ৰকে মহিমায়িত করেছে। দক্ষিণ বাথকে বাক্ষস-কপেই চিত্ৰিত কৰা হযেছে। তিনি এবং তদীয় মাতা নারায়ণী বিক্রমশালী। তাঁরা দৈব বলে বলীমান নন। নানাবিধ বাণ নিজে তাঁরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হযেছেন,—কিন্তু বনবিবি ও সাংজঙ্গলির আছে কিছু অস্ত্ৰ ছাড়াও আল্লাব কুদরত। হৃথের হৃথিনী মাতাব মাতৃ হৃদযেব যে পরিচয পাওয়া যায় তা জীবন্ত হযে উঠেছে। এক স্থানে আছে—

বিদেশে তোমাকে আমি যেতে নাহি দিব।  
মুষ্টি ভিক্ষা মেঙে আমি তোবে খাওযাব।  
তোমার বোজগাবে মোব না আছে দরকাব।  
যবে বসে থাক বাব। নজরে আমার।

এই উক্তি থেকে প্রকৃত বাঙালী মাতৃহৃদযের পরিচয পাওয়া যায়। মাযের অঁচলেব তলায থাকাব বাঙালী-সুন্দর মনোভাব এতে সুস্পষ্ট। তবে সব ক্ষেত্রে বাঙালী সন্তান মাযের অঁচলেব তলায থাকে না।—

হৃথ বলে মাতা তুমি না পাব বুঝিতে।  
বিদেশেতে যায় লোক উপায় করিতে।  
জওয়ান হইনু অবশেষে কি হইবে।  
তুমি বাদে ভিক্ষা মেঙে কে যাবে খাওযাবে।  
নছিবে কি লিখিযাছে—আল্লা পরওয়ান।  
আজ্ঞমাযেস কবিষ। আমি দেখিব একবাব।

বনবিবি কাব্যে দক্ষিণ বজ্জের বিবরণ প্রসঙ্গে কিছু কিছু ভৌগোলিক তথ্য পাওয়া যায়। ধোনাই—হৃথের পালায় সুন্দরবন বিশেষতঃ দক্ষিণ চব্বিশ পৰগণাব সুন্দরবন অঞ্চলের চিত্র পাই। বকণহাটি, সন্তোষপুর, বাথমঙ্গল, মাতলা, হেড ভাঙ্গড, ফুলতলি, গডখালি, কেদোখালি, ভুবকুণ্ডা, হাসনাবাদ প্রভৃতি স্থান মানচিত্রে শুধু দৃষ্ট হয় তাই নয়, ভুবকুণ্ডায় বনবিবির যে স্থায়ী আসন ছিল তা আজো বিদ্যমান। এই ভুবকুণ্ডা হল হাসনাবাদেব কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ইচ্ছামতীৰ পূৰ্ব্ব কূলে অবস্থিত। তার জে, এল নং ৭৬। ডক্টব সুকুমার

সেন তাঁর ইসলামি বাংলা সাহিত্যে ভূরুগু নামক স্থানটি বর্ধমান—হুগলী সীমান্তে তিরোল গ্রামের কাছে মুড়াই নদীর ধারে বলে উল্লেখ করেছেন। তবে দেখিনেব বাদাবন, হাসনাবাদের সন্নিকটস্থ এবং আঠাবো ভাটি অঞ্চল বলতে হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত উক্ত ভূরুগুকেই বুঝায়। ব্যক্তি হিসাবে দক্ষিণ বাঘ, বড়বাঁ। গাজী, ভাস্কর শাহ প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তির কথা এতে আছে। সুন্দরবনের কুমীর বাঘ-হরিণ প্রভৃতি জীবজন্তু, কাঠ-মোম-মধু প্রভৃতি বনজ সম্পদের পরিচয় এই কাব্যে পাওয়া যায়। কবি এখানে সুন্দরবনের মনুষ্য ভক্ষণকাণ্ডী বাকস চবিত্র অঙ্কন করে বুঝি তৎকালীন বিবরণ দিতে চেয়েছেন।

বনবিবির কাহিনী ভিত্তিক কয়েকখানি নাটক লিখিত হয়েছিল। নাটকগুলির মূলিত রূপ আজিও পাওয়া যায় না, কিন্তু বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনেও এই নাটক গ্রামাঞ্চলে অভিনীত হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ কতই না আনন্দ লাভ করছে, বাজি জাগরণে তা দর্শন-শ্রবণ করে। এইরূপ একখানি নাটকের পবিচয় এইরূপ :—

নাটকের নাম বনবিবি। রচয়িতা সতীশচন্দ্র চৌধুরী। বচনাকাল বাংলা ১৩১৬ সালের ঠা। মাঘ সোমবার থেকে ৯ই মাঘ শনিবারের মধ্যে। নাট্যকাব্যের পবিচয় “বড়বাঁ। গাজী” অংশে প্রদত্ত হয়েছে। নাটকের আকৃতি ১৩ই “×৮”। নাটকখানি সাধারণ সাদা বস্ত্রের কাগজে লেখা।

নাট্যকাহিনী পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭। প্রতি অঙ্কে আছে পাঁচটি কবে দৃশ্য। অবশ্য দৃশ্যগুলি সংক্ষিপ্ত। নাটকখানির পাঁচটি অঙ্ক স্বাধীন,—বন্দনা, ভূমিকা, আবহন-গীতি, পাত্র-পাত্রী পরিচয় ও নাট্যকাহিনী। বন্দনা ও ভূমিকা পর্বার ছন্দে রচিত। নাটকের আরম্ভে আছে “শ্রীশ্রীহক নাম।” পর্বারে প্রতি পংক্তিতে ছাব্বিশটি অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। একস্থানে আছে “শ্রীশ্রীএলাহি ভবসা। ব্রাহ্মণ হিন্দু নাট্যকাব্যের পক্ষে “শ্রীশ্রীহক নাম” বা “শ্রীশ্রীএলাহি ভবসা” লেখার এলাহি বা হকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। নাট্যকাব্য উল্লেখ করেছেন যে নাটকের সংযোগহীন আবহ ও ভাবভাব।

নাটকখানিতে সর্বমোট ঊনপঞ্চাশটি গীত আছে। তন্মধ্যে প্রথম ও শেষ

গান দুখানি বন্দনাগীতি। আবাহন গীতিতে নাট্যকারের ভণিতা আছে।  
আছে সাতখানি কোবাস গান। ভূমিকার মধ্যে কাহিনীর চূষক প্রদত্ত হয়েছে।  
নাট্যকারের বাসস্থান ছিল বাবাসতে। সুতবাং এ নাটকে স্থানীয় ভাষার  
পরিচয় আছে। একস্থানে ধোনাই বলছে :—

ধোনাই—বলবে কি ভাই, আমাব আব ভাল লাগচে না। যাহোক  
আমরা লিখতে পড়তে শিখিচি, হিসেব কিতাব রাখতে জানি—  
বাগ-দাদাব পেশা ছাড়ি কেন? চোৎমাস এলো, মৌচাকে  
অসমোর মধু।

[ দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য ]

অথবা,

মফিজদ্দি—হালিমা—দিলজানি। যোরে খুসী মনে হাসি মুখে মহলে  
যেতে হুকুম কব। ভোগা কান্না দেখলে মুই যাব কেমন করে  
হালিমা। একে তো আমার পা বাড়াতি মন সরচে না। কি  
করি বল মোনাই বড়িড ধবেচে। [ ৩য় অংক ১ম দৃশ্য ]

কয়েকটি স্থানীয় শব্দ :—

গুচকে সুচকে লে	অর্থ	গুছিরে নিষে
চলব্যানি	অর্থ	চলবে'খন
চল্লুম	অর্থ	চললাম
ফিরুতি	অর্থ	ফেরার বা ফিরুবাব
তোম্‌গা	অর্থ	তোমাদেব
চুব'গে	অর্থ	চুবিরে ; ইত্যাদি।

আব্বী, ফারসী, হিন্দী প্রভৃতি বেশ কিছু শব্দ এতে ব্যবহৃত হয়েছে।  
তাছাড়া কয়েকটি প্রবাদও আছে। যেমন—

- ১। জোর যার মুল্লুক তাব।
- ২। হাতেব লক্ষী পায়ের ঠেলা।
- ৩। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।
- ৪। বসে খেলে রাজার ভাঁড়ারও খালি হয়ে যায়। ইত্যাদি।

নাট্যকারের ভণিতায় যে ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে তা লক্ষ্যণীয়। বন্দনা

অংশে তিনি লিখেছেন,—

আব যত পীব ফেবেস্তা আছে ত্রিভুবন ।

নতশিবে আজি দীন কবে আবাহন ॥

অথবা অধম সতীশে বলে,

বনবিবি কৃপা বলে,

অসম্ভব হইল সম্ভব ॥ [ ভূমিকা ]

অথবা, বনবিবি জহুবা এখন শুন সর্বজন ।

(মা) আঠার ভাটিতে আসি পাতিলা আসন ॥

কাঙালের মা দয়ামবী আমাদের সর্বজ্বয়ী

থাকে না তার কোনও ভয় যে লয় স্মরণ ।

তাই বলি মান একিন দেলে ডাক মা বনবিবি বলে

যাবে দুঃখ-দৈত্য চলে পূজ তাঁর চরণ ।

দীন সতীশ বলে কুতূহলে মা বলে ডাক বে মন ॥

[ আবাহন গীতি ]

নাট্যকার হিন্দুর দেবতা বা মুসলিমের পীর বলে ভক্তি অর্পণে কোন  
তাল্লভ্য পোষণ করেন নি,—এ ভণিতা তাবই নিদর্শন । বলা বাহুল্য, নাট্যকার  
ব্রাহ্মণ বংশীয় সন্তান ।

নাট্যকার যদিও লিখেছেন,—

দোজখ হইতে যদি পরিজ্ঞান পাবি ।

প্রাণ ভবি' ডাক মন এরাহিম নবী ॥ [ বন্দনা ]

তবু তিনি দেবী-মাহাত্ম্য ও চারবেদ স্মারক বনবিবি-মাহাত্ম্যই বচনা করেছেন ।  
ভূমিকার তাই আছে,—

সব দুখ দুব হল দুখে কিবে ঘরে এল

ভিক্ষা মাগি মাগেবে পুজিল ।

পায় বহু মন মান অকাতবে করে দান

মাষেব জহুবা ওচাবিত ॥

বনবিবি নাটকের কাহিনী, মোহাম্মদ মুন্শী বা মোহাম্মদ খাতের সাহেব  
বিরচিত “বনবিবির জহুবা” কাব্যেবই অনুসারী । তবে এতে আছে,—



হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের সুস্পষ্ট আদর্শ; বনবিবি, বনাঞ্চলের কর্ত্রী বা দেবী, —তিনি রাণী বা সাম্রাজ্ঞী নন। অস্বাভাবিক কাব্য অপেক্ষা এখানে কয়েকটি অতিরিক্ত চরিত্র পাই। যেমন,—দক্ষিণ বাংলার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষম রায় ও বরজ্জহাট গ্রামের বণিক মোনাই মৌলেব মাতুল মফিজুদ্দিন।

নাটক খানির গীতগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নাট্যকার এই নাটককে তাই “গীতাভিনয়” বলে উল্লেখ করেছেন। এতে ব্যবহৃত হয়েছে স্থানীয় কথা ভাষা। গানগুলি কি সুবে গের তার উল্লেখ নেই। প্রত্যেকটি গান হয় পংক্তিতে সীমাবদ্ধ। এতে স্বদেশ প্রেমান্বক ভাব আছে, উচ্চ ভাবাদর্শ প্রায় ক্ষেত্রেই নেই। কাহিনীই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গানের অঙ্গ। কয়েকটি গান হাস্যরসাত্মক। একক ও কোরাস উভয় প্রকার সংগীত এতে আছে। বনবিবি নাটকে সর্বশেষ দৃশ্যের সমাপ্তিতে পুনবার সমন্বয়ে “জয় মা বনবিবির জয়”—ধ্বনির সাথে নিয়মিত স্ততি আছে :—

বলি মাতঃ বনবিবি বিপদবাবিনী।

আশীষ যাচে মা দীন তাপিত তাবিনী ॥

মুচুমতি হীনগতি,

না জানি মা স্ততি নতি,

(ওমা) দাসে দবা দান সতী জগৎ-জননী।

(দীন) সতীশ সভয়ে স্মরে মহিমা বাখানী ॥

বনবিবি মাহাত্ম্য-স্ফাপক প্রাচীন কাব্য হয়ত বরনুদ্দিন বচিত ‘বনবিবির জহুরনামা’। এই কাব্যের বচন-কাল বাংলা ১২৮৪ সাল (ইং ১৮৭৭-৭৮ সাল) ১১ মতান্তরে এব রচনাকাল ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে। ১২ মুনশী মোহম্মদ খাতের সাহেবের কাব্যের বচনাকাল বাংলা ১২৮৭ সালের ৭ই কার্তিক (ইং ১৮৮১ সাল)। মোহম্মদ মুনশী সাহেব প্রণীত কাব্যের বচনাকাল বাংলা ১৩০৫ সালের ১২ই ফাল্গুন ইং ১৮৯৯ সাল)। নাট্যকার সতীশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নাটকের বচনাকাল বাংলা ১৩১৩ সালের ৪ঠা মাঘ সোমবার (ইং ১৯০৭ সাল)। নাটকখানির দুইট কপিই প্রতিলিপি মাত্র। প্রথম কপির লিপিকাল ইং ২১-১২-১৯১৭ সাল; লিপিকর শ্রীমঙ্গলচন্দ্র চৌধুরী। এবং দ্বিতীয় কপির লিপিকাল ইং ৮-৭-১৯৩৯; লিপিকর শ্রীঅমবনাথ চৌধুরী। প্রথম কপির অবস্থা জরাজীর্ণ।

## সপ্তদ্বিংশ পরিচ্ছেদ

### বিবি বরকত্

বিবি বরকত্ একজন কাল্পনিক পীবাণী। তাঁর আর কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

পীবাণী বরকত্ বিবির নামে বসিবহাট মহকুমার হিজলগঞ্জ থানার অন্তর্গত কাটাখালি নামক গ্রামে একটি কাল্পনিক দবগাহ আছে। দবগাহ স্থানটির পবিমাণ আনুমানিক এক কাঠ। সেখানে আছে শুধু ঝোপ, অর্থাৎ পণ্ডিত জমি। দবগাহের সেবাযেত ছিলেন মবহম আব্বাস আলি গাজী প্রমুখ। তাঁরা ঐ দবগাহে সকাল সন্ধ্যার ধূপ-বাতি দান কবতেন। বর্তমানে তেমন নিয়মিতভাবে ধূপ-বাতি দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু স্থানীয় বহু ভক্ত সেখানে হুধ, বাতাসা' ফল প্রভৃতি মানত দিবে থাকেন। সেখানে বাৎসরিক কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা মেলা হয় না।

বিবি বরকত্ মা বরকত্ নামে অনেকের নিকট অভিহিত হন। তাঁর নামে রচিত একাধিক সাহিত্য গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। মুহম্মদ আলিমুদ্দিন সাহেব রচিত “মা বরকতের মেজমানি”<sup>২৬</sup> নামক যে কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় তাব কিবদংশের উদ্ধৃতি এইরূপ :—

#### বরকত্ রহস্য

ফুলী দাসী বলে বাত জননী আমার  
হাসারত হইল আজ মরদান মাঝার।  
সোমাব নাহিক লোকেব কিবা চমৎকার  
দাঁড়াইয়া আছে সব চাঁদের বাজাব।  
বসিবার জগে তাবা শোরশার করে  
বসাইব কিসে মাগো বল না আমারে।  
বিছাওয়ানা যে নাহি মাগো কি কবি উপায়  
বসাইব কিসে মাগো বলনা আমারে।

মেজমানি করেছে তুমি ফকিরেব বি  
 বিছওয়ানা যে নাহি তোমার বসিতে দিব কি ।  
 তাহার উপায় এখন বলে গো জননী  
 অকাষণ হয় বুঝি সাধেব মেজমানি ।  
 এখন বলি যে মাগো আবজ্জ মেব। লও  
 বসিবার জায়গা এখন জলদি এনে দাও ।  
 এ বাত শুনিয়া বরকত মহলেতে যার  
 নামাজেব পাটি এনে ফুলিব হাতে দেয় ।  
 পাটি দেখে ফুলি বলে বলি মা তোমাবে  
 একপাটি লয়ে আমি বসাইব কাবে ।  
 ফুলি তখন বলে বাত আর কিছু আছে  
 এই পাটি লয়ে আমি দিব কার কাছে ।  
 বেশোয়ার লোক সেথা আছে সমুদর  
 এই পাটি লয়ে আমি বসাইব কার ।  
 বরকত বলেন ফুলি আমার কথা লও  
 এলাহি ভাবিয়া পাটি মজলিসেতে দেও ।  
 বরকত বলিয়া পাটি জমিনেতে ডালিবে  
 বসিবে তামাস লোক নজরে দেখিবে ।  
 এ বাত শুনিয়া ফুলি দেলে খুশী হয়  
 পাটি লয়ে দৌড়াদৌড়ি মহলেতে যার ।  
 সেখানেতে গিয়া ফুলি ভাবে আপন মনে  
 মজলিসেতে পাটি আমি ডালিব কেমনে ।  
 মায়ের কাছেতে আমি হামেশা বেড়াই  
 আর নামেতে জারি কিছু হবে নাই ।  
 বরকতের কাছে আমি থাকি সর্বক্ষণ  
 আমার নামেতে পাটি ডালিব এখন ।  
 ইহা বলে ফুলি দাসী পাটি যে ডালিল  
 দুই হাত ছিল পাটি এক হাত হইল ।  
 কমে যদি গেল পাটি হইল অস্থির  
 হায় আল্লা বারিভাল। কি করি ফিকির ।

ইহা বলে ফুলি তখন ভাবিতে লাগিল  
 এমন মতলব আমার কি জন্মেতে হইল ।  
 বরকতের কাছে আমি সবমেন্দা হইব  
 কেমন করে মায়ের কাছে মুখ দেখাইব ।  
 ভাবিয়া অস্থির ফুলি দেল পেরেশান  
 এবাব বুঝি বরকতের না বহিবে মান ।  
 ভাবিয়া অস্থির ফুলি ভাবে সোবহান  
 দয়া যদি কর বারি রহিম রহমান ।  
 তোমা বিনা দয়াবান আর কেহ নাই  
 দয়াময় নাম তোব জানেন সবাই ।  
 সৃজন পালন আব আপন কৃপায়  
 দয়া কব অধীনেবে আপে দয়াময় ।  
 তুমি না কবিলে দয়া কি হবে উপায়  
 মুক্তিগে পড়িবা তোমার দাসী মাঝে যায় ।  
 কত যে ককণ করে আপনার মনে  
 রহম হইল বাবি পাক নিবন্ধনে ।  
 বহম হইল যবে আপে দয়াময়  
 গানের আওয়ারাজ ফুলি ভনিবারে পায় ।  
 হকুম হইল এয়াছ। পাক নিবন্ধনে  
 বরকতের নামে পাটি ভাল না এক্ষণে ।  
 আওয়ারাজ পাইবা ফুলি দেলে খুশী হইল  
 বরকত বলিল। পাটি জমিনে ডালিল ।  
 বরকতের খুব এয়াছ। বলা নাহি যায  
 বিছাইয়া পাটি ফুলি দিশ। নাহি পায় ।  
 এসেছিল যত লোক তামাম বসিল  
 এক হাত পাটি তার বাকি যে বহিল ।  
 ফুলি দেখে বলে বাত জননী আমার  
 সকলি কবিতে পাব যায় বোঝা ভাব ।  
 হাসাতে কাঁদাতে পাব জননী সবায়  
 দেল খুশী হয় মোব দেখিলে তোমায় । (পৃঃ ১৮-১৯)

মুহম্মদ আলিযুদ্দিন রচিত ‘মা বরকতের মেজমানি,’ নামক কাব্যগ্রন্থখানি আমাদের হস্তগত হয় নি। তা’র বচনাকাল বা অন্ত্যস্থ পরিচয় আপাততঃ প্রাপ্তব্য নয়। কবির বচন দৃষ্টে এই কাব্যের বচনাকাল আধুনিক যুগের নয় বলে অনুমান করা যায়। ভাষায় কিছু আরবী-ফারসী শব্দ থাকলেও মুখপাঠ্য এবং গল্পের মধ্যে সবলগতি আছে।

বিবি বরকত সম্বন্ধীয় কোন উল্লেখযোগ্য লোককথা হিজলগঞ্জ থানার উপরোক্ত কাটাখালি অঞ্চলে বা অন্য কোথাও প্রচলিত দেখা যায় না। অবশ্য সেখানকার অর্থাৎ কাটাখালি গ্রামে কল্পিত দরগাহে হিন্দু-মুসলমান অনেক ভক্ত মানত প্রদান করে থাকেন।

---

## অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

### মানিক গীর

সত্যপীর যেমন জোড়াতালি ( Composite ) দেবতা, মানিক পীর ঠিক তেমন নন। মানিক সুফীদের স্বীকৃত পীর। তিনি অনেকটা যীশুর স্থানীয়। কখনও কখনও তিনি যীশুর ( ইসা নবী ) সঙ্গে অভিন্ন। মানিক পীরের নামে মানিক ( মানিক্য ) শব্দের কোন সংস্পর্শ নেই। এটা এসেছে মানিকী ( Manichee, গ্রীক Manikhaio ) হতে। ইনি ইরানের লোক ছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দে জবখুশত্রী ও খ্রীষ্ট ধর্মের সংমিশ্রণে নূতন ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। সুফীরা মানিকীকে পীর বলে—এবং যীশুর মত দয়ালু ও ব্যাধি-নিবারক মহাপুরুষ বলে গ্রহণ করেছিল।<sup>৪১</sup>

মুনশী মোহম্মদ শিজিবদ্দীন তাঁর মানিক পীরের কেছা নামক পাঁচালি কাব্যে লিখেছেন,—

এলাহির চাহা, কমবদ্দিন সাহা,  
যে ছুবাতে গোজাবিল । ..  
আল্লাব দোষায়, দুই লাডকা হয,  
শাহা কমবদ্দিন হবে । ..  
গজ মানিক নাম, দিছে ছোবহান,  
বাডে ভাবা দিনে দিনে ॥

ফকির মোহম্মদ তাঁর “মানিক পীরের গীত” নামক পাঁচালিতে লিখেছেন,—

বাতুনে মানিক ছিল এলাহি মাজাব্যা নিল  
ব্যাধি সোঁপিষা দিল তারে ।  
ব্যাধিগণ লয্যা যত তাহা বা কহিব কত  
যান দেওবান দুনিয়ার উপরে ॥

কেহ বলেন মানিক পীর হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর পিতার নাম মনোহর সওদাগর।<sup>৪২</sup>

বসিরহাট উত্তরাঞ্চলের কাবো কাবো মুখে প্রচলিত প্রবাদ যে,—মানিক ও মাদার নামে দুই ভাই আল্লাব নির্দেশে তাঁর মাহাত্ম্য প্রচাৰ কবতে ফকির-বেশে বেবিশেষছিলেন।

সুফীদের স্বীকৃত ঐতিহাসিক এই মানিক পীব ইবানের লোক হলেও বঙ্গে তিনি কল্পিত নানান কাহিনীর মাধ্যমে বাঙালীর মানসে যে ভাবে স্থান লাভ কবেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় ঊনবিংশ শতাব্দে চব্বিশ পরগনা ও ঝাশোহর জেলার পশ্চিম ভাগে প্রচলিত ছড়াগানে—

পুৰা : মানিকপীর, ভবপারে যাবাব লা।

জয়নাল ফিকির নেলে, ফেনি খালে না।

[ জামাই বারিক : দীনবন্ধু গিড়, ওয় অঙ্ক ]

অগ্রজ আছে,— মানিকের নামে তোমরা হেলা কবো না।

মানিকের নামে থাকলে বিপদ হবে না।

মানিকের নামে চাল-পয়সা যে কবিরে দান।

গইলে হবে গরু-বাছুর ক্ষেতে ফলবে ধান।

[ সংগ্রহ : সত্যেন্দ্রনাথ বার ]

মানিক পীব বঙ্গে একজন লৌকিক দেবতা বিশেষ। মানিক পীরের স্মৃতি বিরল। তাঁর প্রতীক-সমাধি বা ক্ষুদ্র স্তূপই বেশী ক্ষেত্রে দেখা যায়। মানিক পীরের আকৃতি অতি সুন্দর। দেহের বর্ণ স্বেত, হৃৎক স্থানে মেঘের মত। মাথার বাবরী চুলের ওপর ছোট তাজ পাগড়ী। চোখ দুটি বিশাল। পোষাক পরিচ্ছদ কোন কোন স্থানে হিন্দু পৌরাণিক দেবতার মত। হৃৎক পল্লিতে কালো রঙের আলখাল্লা ও টুপী দেখা যায় ;—তবে উভয় স্থানেই তাঁর এক হাতে আশাদণ্ড এবং অপর হাতে তসবী বা জপমালা থাকে।

মানিক পীরের পূজা হাজতের কর্ত। খাদেম সব ক্ষেত্রেই মুসলমান ফকিররাই হন।<sup>৩৮</sup>

মানিক পীর সাধারণভাবেই গোসম্পদ বা পণ্ড সম্পদ-বক্ষক দেবতা স্থানীয় বলে কল্পিত। মানিক পীরের দরগাহ-স্থানে ভক্তগণ নিয়মিত ধূপ-বাতি প্রদান করেন ; হাজত, মানত ও শিরনি দেন। অগ্রাশ্র পীরের দরগাহের সাথেও তাঁর দরগাহ দেখা যায়। বড়বা গাজীর সূঁটিরার দরগাহস্থানে যেমন

বড়পীৰেৰ দৰগাহ আছে, অনুকণভাবে বড়খুঁ গাজী পীৰেৰ পাথবা-  
দাদপুৰ গ্ৰামেৰ দৰগাহেৰ স্থানে মানিক পীৰেৰ দৰগাহ আছে ।

গাভীৰ প্ৰথম দুখ প্ৰাৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰথমেই মানিক পীৰেৰ দৰগাহে প্ৰদত্ত হয় ।  
অনেক স্থানে স্থানীৰ পীৰেৰ দৰগাহে যে কোন প্ৰথম উৎপন্ন দ্ৰব্য যেমন দুধ,  
ফল, পাটালী গুড প্ৰভৃতি ভক্তগণ দিবে থাকেন । মানিক পীৰেৰ নামে অনেকে  
গৰুও উৎসৰ্গ কৰে মাঠে ছেড়ে দেন । অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতে  
সম্প্ৰতি ( ১৯৭৫ ) এইকপ গোসম্পদ উৎসৰ্গ কৰাৰ ঘটনা বিৰল । সাৰা  
বৎসৰেৰ যে কোন সমৰে অথবা বৎসৰে একবাৰ মানিক পীৰেৰ নাগে  
মেলা বসে । চব্বিশ পৰগণাৰ বাবাসত মহকুমাৰ কষেকটি গ্ৰামে মানিক  
পীৰেৰ কল্লিত দৰগাহ আছে । তাৰে কষেকটিৰ নাম যথাক্ৰমে,—  
ওটনভাঙ্গা, আবিফুল্লাপুৰ, সিৰাজপুৰ, বামনগাছি, ছোটজাগুলিয়া, উলা,  
শিমুলগাছি, কদমগাছি, আটিশাড। পাথবা, বদৰপুৰ, ইছাপুৰ, পাকদহ  
প্ৰভৃতি । গ্ৰামে গোমড়ক দেখা দিলে মানিক পীৰেৰ সেৱক ফকিৰগণ  
গৰুৰ বোণ নিবামৰেৰ জন্ত গাছ-গাছতা বা টোটক। ওখৰ দিবে থাকেন ।  
অনেকে জলপতা, তেলপতাও দিবে থাকেন । হিন্দু এবং মুসলিম উভয় ভৰফ  
থেকে এইকপ গোবৰ্দ্ধি গ্ৰামে দৃষ্ট হয় । যে সৰ ভ্ৰাম্যমাণ ফকিৰ বাজী বাজী  
মানিক পীৰেৰ গান গেৰে চাল-পহৰা ভিক্ষা কৰে বেডান তাঁদেৰ একজন  
১৯৬৯ খৃষ্টাব্দেৰ ২৮ মাৰ্চ তাৰিখেৰ সকালে আমাৰ বাবাসভেৰ গ্ৰামেৰ  
বাসাৰ এসে যে গান শুনিবে গিৰেছিলেন তাৰ কিয়দংশ উদ্ধৃত কৰ্ছি :—

মানিক পীৰেৰ মেলা দেখে যে কবিৰে হেলা ;

দুই পাৰে চম্পাইবালা চক্ষে লাগুক ঢেলা ॥

আইল আইলৰে পীৰ আইল লহববান ।

শ্যামসুন্দৰ পীৰ মুখে চম্পা দাডি ।

ভ্ৰমিতে ভ্ৰমিতে আইল গওলাৰ বাডি ॥...

এব পৰ সেই ফকিৰ সংক্ষেপে বললেন,—

গোৰালা বধূৰ নিকট দুখ চেৰে না পাওৱাৰ অভিশাপ দিবে পীৰ  
ঢলে গেলেন । অভিশাপে গৰু বাহুব সৰ মবল । পীৰেৰ দয়াৰ পুনৰায় তান্না  
প্ৰাণ পেল ।



এবার ফকির আবার গাইলেন ;—

পূর্ব-দখিনে ঘরখালি মা বেউর বাঁশের রুগ্না ।  
 পীর নামে দান কর মা চাল-পরসা দিখা ॥  
 তোমার বাড়ীর সিঁথে নিষে অগ্নের বাড়ী হাই ।  
 তোমার বাড়ীর মানুষ-গরু বাখিবে ভালাই ॥  
 গরুর মাথাষ শিং গো মা মানুষের মাথাষ কেশ ।  
 মানিক পীরেব কৃপা হতে পালা কবলাম শেষ ॥

ফকির তাঁর নাম বলতে চান না। তিনি প্রোঁচ, বং স্মারদ্বর্ণ, মাথাষ সাদা টুপী, পরশে লুঙ্গি, গানে তালি দেওয়া নানা রংএর ফড়ুয়া, হাতে চামচ ও চিমুটা। তিনি আমাদের পরিবারেব মঙ্গলের জন্ত তিনটি জিনিষ দিলে যান। সেগুলি এবং সেগুলি ব্যবহার যথাক্রমে,—১। কয়েকটি কালো সুতোর টুকরো। এগুলি এক একটি পরিবারের এতোকের হাতে বাঁধবে।

২। এক গ্লাস জল যাতে লাল কালিতে লেখা এক টুকরো কাগজ বেলে দেন। ঐ জল বাড়ীর মানুষ-পশুপক্ষী সকলেই গ্রহণ করবে। এবং

৩। উক্ত কাগজ টুকরো বা কবচটি গ্লাসের জল থেকে তুলে নিয়ে ঘরের দরজার উপরে অঁঠা দিখে লাগিবে রাখতে হবে।

কিছু চাল-পরসা দিলে তিনি হাসি মুখেই চলে যান।

মানিক পীরেব মাহাজ্য-গীতি পবোক্ষভাবেও অনেক ফকির গেয়ে থাকেন। সে গানে বিশেষভাবে আছে গোসম্পদের মঙ্গল-কথা। সেইকণ একটি মঙ্গল-গীতির পরিচয় দিচ্ছি :—

ধূম্রা— আমার মনে মনে বালা গাষ ।  
 মানিক জেন্দাব নাম ॥  
 সকালেতে ছড়া-ঝাঁঠ সন্ধ্যাকালে বাড়ি,  
 লক্ষ্মী বলেন তাহার ঘরে আমার বসতি ।  
 সকালেতে সাফাই করে সাঁঝেতে সাজাল,  
 সেই গোহালেতে রাখলে গরু হবে না নাকাল ।  
 যে গোহালে নিত্য সাঁঝে না পড়ে সাজাল,  
 সারাবাতে দাপায় গরু সকালে কিমাষ,  
 আম্বু কমে তারই সাথে দুগ্ধ বুমে যায় ।

গো-সম্পদেৰ মজলৈৰ জন্তু মানিক পৰেব বোৰাৰ চৌষট্টি দাঁওয়াই  
পাওয়াৰ বিবরণ বিবৃত হ'ব এইভাবে—

চৌষট্টি বেষাৰি গৰুৰ চৌষট্টি দাঁওয়াই,  
মানিকেৰ দোৱা হলে ভবে পাৰ পাই।  
মাৰে মাৰে গৰুৰ ঘটে ছোট ছোট বোগ,  
মানিকেৰ দোৱা মাৰি শোনেন মুক্তিযোগ।  
জিহ্বাতে হইলে কাটা গলাৰ হইলে কোলা,  
হাতেতে লবণ লইয়। দিবেন তাতে ডলা।  
বৰ্ষাতে কাদাৰ গৰুৰ পায়েতে হ'ব এঁশে,  
শুকনে। ঠাৰে ৰাখবেন আৰ ফেনাইল দিবেন ঘৰে।  
পেট ফাঁপে ছাড়াৰ গৰু, সিমুলে ব্যামো কৰ,  
ৰাঁশেৰ পাভ। শুকনে। ভুৰ খাইতে দিতে হয়।  
জব আইলে কম্প দিয়া। তাৰে 'খোৱ' বলি,  
গাঁজাৰ সাথে শুকনে। কিঙা আৰ হেঁড়া চুলি।  
মুখ চাপিবা নাক দিয়া। ধোঁৱা দিলে পৰে,  
ভাল হইবা উঠবে গৰু ছাতি মাৰে জৰে।  
ইহা ছাভা গলা ফুলা। মাৰে কৰ পশ্চিমে,  
ঈশেন মূল, মৰিচ ছকোৰ জলে ৰাইবে কুমে।  
এই তিন গ্ৰন্থ ভাই নিবেন শিলে বেঁটে,  
হ। কৰাইবা ঢালি দিবেন বিল নাহি ঘটে।  
মানুষেৰ যেমন দাদ তেমনি গৰুৰ কাঁধেৰ কাঁড়,  
জল দিয়া দিবেন ধুলে টৰ্চেৰ পুৱানে। মশলাৰ ১০০

ধুৱা—

মানিক ৰাষ মানিক ৰাষ গে।  
কানু ঘোৰেৰ বাঙী মানিক ৰাষ।

এৰ পৰ ফকিৰ গাইলেন শুণু দুহুৰতী গাভীৰ কথা—

কথাৰ বলে গাই গৰুৰ মুখে দুহু ৱয়,  
বেশী কইবে খাইলে গাই বেশী দুহু দেখ।  
চুৰ্ণি ভুৰি খইল-বিচালি ভেলীগুড় আৰ,

কাঁচা ঘাসে গাইয়ের পেঁচাই করে দিলাম সার ।  
 লাউ কলাই ফ্যানে ভাতে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়,  
 দুগ্ধ বাড়ে বাছুর সারে শুনের মহাশয় ।  
 শীতেতে পবাবেন জামা ছেঁড়া চট দিয়া,  
 গবমেতে চান কবাবেন পুকুরেতে নিয়া ।  
 স্বাস্থ্য-আলা স্বাঁড় অথবা নকল পালের বীজে  
 গোশনের বৃদ্ধি হবে ভাই কষে দিলাম ও যে ।  
 যেমন তেমন দুই ভাই আব দুই গাই যদি থাকে,  
 সংসাবেতে চিন্তা নাহি কহি যে সবাকৈ ।  
 গকর সেবার তুষ্ট হবেন আপনি ভগবান,  
 স্বাঁর কৃপায় ছোট কালে বাঁচে বাচ্চাব প্রাণ ।  
 পুবাণ-মহাভারতেতে জানি গোশন বড় কর,  
 এই ধনে স্বল্প নিলে পবমাই বৃদ্ধি হয় ।  
 কথায় বলে দুগ্ধ যদি থাকে আগে পাছে,  
 কিবা ফল করে ভাই শাকে আর মাছে ।  
 যেঠাই বল মণ্ডা বল দুগ্ধ ছাড়া নয়,  
 দুগ্ধ-যিতে শক্তি বাড়ে ব্যামো দূর হয় ।  
 মানিক পীরের চরণ বন্দি পালা শেষ করি ।  
 মুসলমানে আমিন বলেন, হিন্দুবা বলেন হবি ॥

[ মানিক পীরের গান : সত্যেন বায় ]

মানিক পীরের গান গ্রামাঞ্চলে এতখানি বহুল প্রচাৰিত যে, তাঁর প্রতি গ্রামের হিন্দু-মুসলিম কৃষক এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষ অনেক সময় গায়ক ফকিরকে যেন মানিকপীরের প্রতিনিধিকূপে কল্পনা করে এবং তাঁকে চাণ-পল্লস দান করে । সেই ফকিরও তেমন মানিক পীরের প্রতি ভক্তি অৰ্পণ করতে সকলকে আহ্বান জানান,—

মানিকের নামে ভোমবা হেলা করো না,  
 মানিকের নামে থাকলে বিপদ হবে না ।  
 ভক্তির ভগবান তিনি অভক্তের নয়,  
 ভক্তিভাবে যেনা ডাকে তাঁর বাজী যায় ।

মানিকেব নামে চাল-পষসা যে কবিবে দান,  
গইলে হবে গক-বাছুব ক্ষেতে ফলবে থান।

বেশ কয়েকজন কবি মানিক পৌৰেব পাঁচালী লিখেছেন। ফকির মহাম্মদ লিখেছেন—মানিক পৌৰেব গীত। মুনশী মোহাম্মদ পিজিরদীন লিখেছেন—মানিক পৌৰেব কেছ। জব্বদ্দিন লিখেছেন—মানিক পৌৰেব জহুবা নামা। নসর শহাদ লিখেছেন—মানিক পৌৰেব গান। তা ছাড়া ববনদ্দিন, খোদা-নেওয়াজ প্রমুখও মানিক পৌৰেব গান বচনা কবেছেন।

পাঁচালিকাব কবি মুনশী মোহাম্মদ পিজিরদীন সাহেব তাঁৰ পৰিচয় দিবেছেন অতি সংক্ষেপে। এক স্থানে তিনি লিখেছেন,—

আল্লা আল্লা বল সবে হবে এক মন।  
অধীনেব বসতি বানায় কদিমী মকান ॥ (পৃঃ ২১)

কবি অল্প বয়সে মাতাপিতাহীন হন। পঞ্চম বছৰ পৰ তিনি কিছু শিক্ষা লাভ কবেন। তাঁৰ ওস্তাদ পৌৰেব বসতি কুমাবহাটে। তিনি লিখেছেন :—

জেলা বাকইপুৰেব থান।  
তাহাব দক্ষিণে বাণ।  
মোকাম এই জানিবেন সবাই ॥  
এক। আমি সংসাবে,  
মা বাপ গিহাছে মবে,  
ভাই বন্ধু আৰ কেহ নাই ॥

অতি অল্প বয়সে কবি মাতাপিতাহীন হৰে কতখানি অসহায় বোধ কবেছিলেন তা নিম্নলিখিত অংশ থেকে বুঝা যায় :—

মা বাপ কেমন চীজ দুনিয়াৰ পৰে।  
জানিতে পাবিলাম নাহি নছিবের ফেবে ॥  
বয়স বৎসৰ চাবি বখন হইল।  
মা বাপের তবে আল্লা উঠাইয়া নিল ॥  
পিতা মাতা সকলেতে গেলেন চলিয়া।  
মাটির পিজিৰা বহে দুনিয়াৰ পড়িয়া ॥

অবশেষে ভেবে দেখি আপনার মনে ।  
 দুনিয়াতে কেহ নাই সেই আল্লা বিনে ॥  
 শেষকালে দাদি মেবা ছিল দুনিয়ায় ।  
 লালন পালন কবে আল্লাকে ঈয়ায় ॥  
 তাবপবে আল্লা নবী হুকুম কবিল ।  
 দেখিতে ২ দাদি ফওত হইল ।  
 যখন আরশে দাদি গেলেন চলিয়া ।  
 পুতুবেতে পান। যেমছ। বেডায় ভাসিয়া ॥

এ ছাড়া কবির আব কোন পবিচয় পাওয়া যায় না ।

মুনসী মোহাম্মদ শিজিবদ্দীন সাহেব প্রণীত গওসিয়া লাইব্রেরীর  
 আদি ও আসল মানিক পাবেব কেছা, কলিকাতায় ৩০নং মেছুয়া বাজার  
 স্ট্রীট হতে নুরদ্দীন আহম্মদ কর্তৃক প্রকাশিত । আকৃতি ৯"×৬" । পৃষ্ঠা সংখ্যা  
 ৩০ । পৃষ্ঠাগুলি বাম থেকে ডাইনে সজ্জিত । হামদ-নাত, কেছা ও সুচীপত্র  
 এই তিন অঙ্গে বিভক্ত । কেছায় ১৬টি উপবিভাগ আছে । প্রতি প্রথম চরণের  
 শেষে দুই দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় চবণের শেষে তাবকা-চিহ্ন । কোথাও দ্বিপদী  
 কোথাও ত্রিপদী পষার । দ্বিপদী পষারে সাধারণতঃ চৌদ্দ অক্ষর । পর পর  
 দুইটি একই শব্দের স্থলে একটি শব্দ ও পববর্তী শব্দের বদলে "২" ব্যবহৃত  
 হযেছে । কেছাটিতে মূলতঃ দুইটি পৃথক কাহিনী বয়েছে ।

আল্লাব দোবায় কমকদ্দীন শাহাব পন্নী দুধবিবির গর্ভে গজ ও মানিক  
 নামে দুই পুত্র হয় ।

হীবে দাসী কষ,                      শুন ওগো জায  
 হেন ছেলে নাহি কারে ।  
 ফিরি কত ঠাই                      এমন দেখি নাই  
 মোম বাতি জ্বলে ঘরে ॥

অহঙ্কারী দুধবিবি তার উত্তবে বল্লেন,—

হু'জন। থাকিলে                      কত লাড়কা মিলে  
 শুন দাসী কহি তোবে ।  
 বাজ না বোপিলে                      কিসে বাত্র ফলে  
 দেলে দেখ বিচার কবে ॥

এ কথা শুনে নিরঞ্জন আবেশেতে বেজাৰ হলেন। তিনি জিবৰিল-এর  
মারফত হুধবিবিকে আজ্ঞা পাঠালেন। বাত্রে অকস্মাৎ আজাবেৰ চাপে  
বিবি অচেতন হ'বে পড়লেন,—গিপা সায় বুক হল শুক। পবদিন কমরদিন  
খবৰ পেয়ে এলেন। বিবিৰ এইকপ অবস্থা দেখে তিনি হায় হায় কৰে  
উঠলেন।

লাডকাকে দেখিবা শাহা কান্দিতে লাগিল।

দিনেতে হুনিয়া যেন অন্ধকাৰ হ'ল ॥

দ্রুত হ'বে কমরদিন শাহা বললেন,—

আজাব দূৰেতে দিব পয়জাৰ য়াৰিবা।

এ কথাও আল্লা শুনতে পেলেন। অহঙ্কাৰীকে সাজা দিবার নিমিত্ত আল্লা  
বললেন জিবৰিলকে—

যেমন বড়াই শাহা কৰিল এখন।

আজাব ভেজিয়া দেহ উচিত যতন ॥ ...

গায়ে জব মাথা ব্যথা পৌছিল তখন ॥

আল্লাব হুকুমে শাহা যান গড়াগড়ি।

পতি-পত্নী বিপন্ন হ'বে পড়লেন। কমরদিন বললেন,—

শুন দাসী এইবাবে জানু বৃথি যায়।

মরিলে এ দোন লাডক। মৰিবে কোথায় ॥

একজনে বাখ দাসী যতন কৰিবা।

হুইজনে মৰিবে কেন কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

অগত্যা দাসী একটা ছেলে পেল, কিন্তু সেই দাসী ছেলেকে নিষে চলল  
বিক্ৰী কৰতে। পথে ভাৱ দেখা বদর জেন্দাৰ সান্ধে। দাসীৰ অভিপ্ৰায়  
জেনে বদর জেন্দা। নিজেই দশ টাক। দিবে সেই পুত্ৰটিকে কিনে নিলেন।

দু'মাস কেটে গেলে বোগাক্ৰান্ত কমরদিন শাহা কোন প্ৰকাৰে উঠে  
বসলেন।

টলমল কৰে অঙ্গ বাহে চলে যায়।

শাহাকে দেখিবা শবতান আইল তথায় ॥

শবতান বলল—সবাব খাও—সেবে যাবে। শাহা ও বিবি দুজনেই খেলেন  
সন্ধ্যাৰ।

খন-দৌলত যত কিছু কমবদ্বিষ ছিল ।

একে একে মাল-মাস্তা লুটাইয়া দিল ॥

বদর শাহ ক্রীত পুত্রকে গৃহকর্ত্রী ছুরত বিবিব কোলে এনে দিলেন ।  
নিঃসন্তান সুবত বিবিব কোলে সেই পুত্রকে এনে দিতে বিবি যেন হাতে  
চাঁদ পেলেন । পরে বদর শাহ বললেন,—

দিন কত মোব তবে কর না বিদায় । ..

জাহিব কাবণে যাব... ..

বদর শাহ বিদেশে রওনা হয়ে গেলেন ।

বিদেশে তাঁর বাবো বছর কেটে গেল । ভতদিনে তিনি পালিত পুত্র  
মানিকের কথা গেলেন ভুলে ।

জাহির সেবে অনেক দিন পর বদর শাহা ফিরে এলেন মহলে । তখন—

মায় বেটা দুইজনে নিয়া যার খুশী মনে,

মানিকেরে চিনিতে না পারে ।

না বুঝে বদর মিয়া, কত শত গালি দিয়া,

ছুবতেবে যার কাটিবাবে ॥

মানিক চেঁচা করলেন বদর শাহাকে বোঝাতে । বদর অবুঝ । তিনি  
মানিককে সিঙ্কে ভরে ছালিয়ে দিতে চান । কাঁদতে কাঁদতে মানিক, আল্লাব  
দরবাবে মোনাজাত করলেন । আল্লা বললেন,—

থাক তুমি এইখানে খোসাল হইবা ।

মুক্তিলে পড়িলে তুঝে লিব ত্বরাইয়া ॥

মানিককে সিঙ্কে ভবে, কুঞ্জি তালা লাগিয়ে তিন দিন ধবে আগুন দিবে  
জ্বালানো হল । ছুবত বিবি কেঁদে কেঁদে হয়ে গেলেন অজ্ঞান ।

আল্লাব দোয়ায় সে আগুন হবে গেল পানি । সকালে সিঙ্কের কুলুপ  
খুলতে মানিক অক্ষত দেহে বাইরে এসে বদরকে সালাম জানালেন । তিনি  
বললেন,—আল্লাব দোয়ায় আমি রক্ষা পেয়েছি । এবার আমার বিদায়  
দিন । এবাব বদর মিয়া আপনার ভুল বুঝতে পাবে কেঁদে ফেললেন । কিন্তু  
শেষ পর্যন্ত বদর শাহা ও ছুবত বিবিকে “সালাম করিয়া মানিক যার  
নিকালিয়া ।”

এলাহি বল্লেনে জিবিলকে—“চৌষট্টি বেদেৰ ভাব দেহ মানিকেবে।”  
জিবিল এলেন মানিকেৰ কাছে। বল্লেন,—

শুন শুন মানিক জেদ্দা শুন দস্তগিৰ।  
দেবাগ শহুৱে গিৱা কব না জাহিৰ ॥

এই নিৰ্দেশ পেলে মানিক এলেন ভাই গজ্জের সাথে সাক্ষাত  
কৰুতে। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে তিনি বাহিৰ হব পড়লেন  
ফকিৰেৰ বেশে,—হাতে আশাবাতি, গলে তছবি, পায়ে খডম, অজে  
হেঁড়া কুলি, মাথায় পাগতি। তিনি আৱে নিলেন জাহিল। সেই জাহিলেৰ  
সাহায্যে আল্লাৰ দোৱাৰ বিশাল নদী পাৰ হৱে তিনি এলেন দেৱাগ সহবেৰ  
‘কালে শাহাব’ বাতীতে।

প্ৰবল প্ৰতিপত্তি এবং প্ৰতাপশালী বাদশা কালে শাহা—কিন্তু “ফৰজন্দ  
বিহনে ছিল সকলি আশ্বাস।” আল্লাৰ প্ৰতি তাঁৰ মতি নেই,—ফকিৰ দেখলে  
আশ্বাসেৰ মতন স্বলে ওঠেন।

মানিক পীৰ এলেন কালে শাহাব দৱজাব। বল্লেন,—

আসিবাছে ওগো মাতা তোমাৰ বাতীতে।  
খোড়া খান। দেহ মাতা আল্লাৰ নামেতে ॥  
এক দানা খন্নবাত দিলে পাবে হাজাৰ দানা।  
খোদাৰ দোয়াতে সেই পাবে বেহেস্ত খান।।  
এলাহিৰ দোৱা আছে একিন জানিবে।  
খোদাৰ দোয়াতে এক লাভক। পন্নদ। হবে ॥

জুইন নারী দাসী ফকিৰবৰেৰ উপস্থিতিৰ কথা কালে শাহাব পত্নী ৰজনা  
বিবিকে জানাল। বিবি কিছু চাউল ভিক্ষা পাঠালেন। মানিক সে ভিক্ষা  
নিলেন না;—তিনি বিবিৰ সাক্ষাৎ প্ৰাৰ্থী। ৰজনা বিবি এলেন মানিক পীৰেৰ  
হজুৱে। মানিক পীৰ বিবিকে আশ্বাস দিলেন যে আল্লাৰ দোৱাৰ তাঁৰ পুত্ৰ  
হবে। বিবি সে কথাৰ শুকত্ব দিলেন না। বল্লেন,—

পাগলেৰ মত তোমায় দেখি যে নবনে।  
দূৰ হব যানে বেটা আমাৰ সাহনে ॥



বহুদিন এক ফকির এসেছিল হেথা ।  
 কহিল। গিষাছে তিনি ঐ সব কথা ॥  
 সেই সব কথা যদি তোমাব মুখে পাই ।  
 ভক্তি কবে হান দিব আল্লাব দোহাই ॥  
 সেই কথা না মিলিলে বোলা কেড়ে লিব ।  
 হাতে পারে বেড়ি দিবে করেদে বাখিব ॥

বিবি আরো গালি দিলেন । তাতে খোদা অসন্তুষ্ট হলেন,—ক্রুদ্ধ হলেন  
 স্বয়ং মানিক পীর । পীর অভিশাপ দিলেন :—

এই দোরা কবি আমি যদি হই পীর ।  
 ভ্রমণ করিবে তুমি আমার খাতিব ॥  
 এই বাত কহি আমি যেতে হবে বনে ।  
 বার বৎসর ছয় মাস দুবিবে কাননে ॥  
 পশুদের মত তুমি থাকিবে জঙ্গলে ।  
 আহাব না পাবে মাতা জঙ্গলে ঢুড়িলে ॥  
 খোদার দোরাতে তুমি নগর না পাবে ।  
 পক্ষির। যেমন থাকে তেমনি কাটাবে ॥

এ সব কথা শুনে বিবি অন্দর মহলে গিয়ে দাসী জুইনকে বল্লে,—ফকিরদ্বয়কে  
 মেবে ভাগাও এখান থেকে । দাসী ছুটে এসে তববাবিব আঘাত করতে  
 গেল কিন্তু সে আঘাত ফকিরেব পাবে লাগল না—নিজেব দেহে লাগতে নিজে  
 দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং মৃত্যু বরণ করল । অগ্ন দাসীর কাছে দাসীর মৃত্যুব  
 খবর পেয়ে রাণী তো বাদশার ভয়ে ভীত। হলেন । বিবি, দাসীকে  
 বল্লেন,—

কত্তু না বাদশাব কাছে এই বাত কও ।  
 নেমকেব দাসী তোরা মোব ছের খাও ॥

সভা-অন্তে বাদশা ঘবে ফিরলেন । জোড় হাত কবে মায়ের কদমে সালাম  
 জানিবে তিনি বাগিজে বাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ।

কোমেব কথা কিছু বলি গো তোমায়ে ।  
 আপনা জানিরা তাবে রাখিবে নজরে ॥

তোমাৰ লুকুম যদি বজায় না কৰে ।  
বসন পবানে দিবে জঙ্ঘল মাৰাৰে ॥

কালে শাহা লোক-লঙ্ঘবে সুসজ্জিত হয়ে আল্লাৰ নাম স্মৰণ কৰে  
বাণিজ্য-যাত্ৰা কৰলেন।

পীৰ এক দিন নামাজ পড়ে আল্লাৰ দোষা প্ৰাৰ্থনা কৰলেন। আল্লা  
পাঠালেন জিবিলকে—“বিবাট নগৰে ওকে দিবে যে ভেজিয়া।” জিবিলেৰ  
কাছে নিৰ্দেশ পেয়ে পীৰ এলেন বিবাট নগৰেৰ কিন্ন ঘোষ ও কান্ন ঘোষেৰ  
বাড়ী।

গৃহস্থ ঘোষ ভাইদেব ভালই অবস্থা। ধন-দৌলত, গৰু-বাছুব গ্ৰুচুৰ।  
“কত দুধ-দধি আছে ঘৰেতে তাহাৰ”। আৰ আছে চাঁদেৰ সমান এক  
ছেলে।

পীৰ দোৱ-গোড়াৰ এসে ‘মা মা’ বলে ডেকে ডিফ্কা প্ৰাৰ্থনা কৰলেন :—

সাত ৰোজ খানা পানি না হয় আমাৰ ॥  
খোডা দুধ দেহ মাতা আমাৰ তৰেতে ।  
এলাহিব দোষা আছে জানিবে মনেতে ॥

গোৱালিনী বলল,—কিছু মাজ দুধ নাহি কি দিব তোমাৰে ।

পীৰ বললেন—দশ মন দুধ আছে দেখি তেবা ঘৰে ।  
ঝুটা বাত কহ তুমি আমাদেৰ তৰে ॥

গোৱালিনী সে কথাৰ গুৰুত্ব দিল না। গাষেবেৰ কথা যে ফকিৰ জানে,  
যাৱ এত গুণ, সে কেন ডিফ্কা কৰে খাষ । সে এক ৰাজা গাভীকে দেখিয়ে  
বলল,—

যত পাৰ ওবে ফকিৰ খাওনা দুইবা ।  
কেমন সত্যবাদী তোমবা দেখিব বুঝিয়া ॥

পীৰ মনে মনে আল্লাকে বললেন,—

“মুঞ্চিলে পড়েছি আমি দ্ববাও এইবাবে ,”...  
জনম ভোব বৎসহীন আছে দুনিয়াতে ।  
কেমেনে দোহন আমি কৰি এফ্ফনেতে ॥

আল্লাহর হুকুমে জিবরিল মনুবাস নামক বাছুর নিয়ে অদৃশ্যভাবে সেখানে এলেন। খুসি হয়ে মানিক পীৰ সেই গোয়ালিনী বুড়িকে দুধ দোওয়া একটি ভাঁড় আনতে বললেন। বুড়ি এনে দিল সহস্র হিঙ্গ এক ভাঁড়। একে একে সাত ঘড়া দুধে ভরে গেল। গোয়ালিনী সব দুধ খাবে এনে বলল,—ফকির বেটা যাহু জানে। সে ঘরের দুধ বাইরে নিবেছে নিশ্চয়। তাব পুত্রবধু সনকা বলল,—“মাতা অতিথি যাবে ফিরে।” সে কিছু দুধ এনে ফকিরকে দিল, ফকির বললেন ;—

জন্মাবধি থাক তুমি এষো জ্বী হইয়া ।

যেই মাত্র মানিক জন্ম। মাথায হাত দিল ।

দেখিয়া সে গোয়ালিনী বড় গোশ্বা হইল ॥

বুড়ি তৎক্ষণাৎ কিনু কানুর কাছে গিয়ে বলল,—“কত রঙ্গ করে ফকির-দুই সনকার সাথে।”

ঘোষ তো একথা শুনে বাকদেব মত জ্বলে উঠল। সে দ্রুত এসে পীরের মাথায় মারল—‘ভেগ’। পীৰ অন্তর্হিত হলেন। তাঁর মাথায মোহরা পড়ল মাটিতে। মোহরা কাল-সাপ কপে দংশন কবল কিনুকে। সকলে হাস হাস কবে উঠল।

সনকা বসির। তখন আল্লাকে বিষায় ॥

সনকার মোনাজাত আল্লা কবিল করুল ।...

সেখানে এক ব্রাহ্মণের রূপ ধবে মানিক পীর এলেন ।

বুড়ি বলে ওবে বাছা বাছায গেলে আমি ।

আমার যত ধন আছে অর্ধেক পাবে তুমি ॥

মানিক তখন আল্লাব নাম নিয়ে কিনুর পায়ে ফু দিতে সব বিষ হসে গেল পানি। কিনু জীবন পেল। অর্ধেক ধন দিবার ভয়ে বুড়ি কপট মুর্ছ। গেল। মানিক স্মরণ করুলেন আল্লাকে ।

ঘরে মৈল গোয়ালিনী বাইবে মৈল গাই ।

কতক বাছুর মৈল লেখা-জোখা নাই ॥

সনকা বলে আমি কি বলিব আর ।

মানিকের তল্লাসেতে যাই এইবার ॥

সন্ধ্যা, পীৰেৰ আগমন, দুখ ভিক্ষা চাওবা, পীৰকে গালি দেওৱা। ইত্যাদি সব ঘটনা বলতে,—কিনু ঘোৰ চললো পীৰেৰ সন্ধানত। সাত দিন সাত বাত সন্ধান কৰে অবশেষে মানিকেৰ দৰাৰ সৈ সাক্ষাত পেল মানিকে। দু'পাৰে জড়িৰে ধৰে আনুকূল্য প্ৰাৰ্থনা কৰতে মানিক পীৰ সদয় হৰে কিনুৰ বাড়ী এলেন। এলাহিব নাম স্মৰণ কৰে তিনি দোষা পডলেন। আত্মাৰ ছকুমে সব গৰু বাছৰ বেঁচে উঠল। তখন কিনু ঘৰ থেকে দশ মণ দুধ এনে খেতে দিল পীৰকে। আৰো দিল এক গাভী আৰ দশ বিঘা জমি। মানিক বললেন—এ সবই তোমাৰ বইল।

যে সমেতে গাভী দোহন কৰিবে আপনে।

আত্মাৰ নামেতে দুখ দিবে যে জমিতে ॥

এই বলে মানিক পীৰ আপনাৰ আশ্তানাৰ ফিৰে গেলেন।

বাদশা কালে শাহ। ততদিনে বাগিছা-জাহাজ নিষে আমিৰাবাদেৰ 'ঘাটে পৌছে গেলেন। নিজিত সেই বাদশাৰ শিৰেৰে গিৰে হাজিৰ হলেন গজ ও মানিক। মানিক বললেন—

হইবেক লাডক। তেরা বিবিৰ উদৰে ॥

সেই লাডক। হৈতে তোমাৰ বাডিৰে ধনেতে।

লাল মানিক পাবে কত হাসিতে খুশীতে ॥

কালে শাহ। সেই বাজে মানিক-হাঁস পাখীৰ পিঠে চড়ে এলেন বিবি বজ্জনান নিকট, তিনি নিজেৰ কাছেৰ চাৰিৰ সাহায্যে কুলূপ খুলে বিবিৰ কাছে গেলেন এবং বাজি শেষ না হতেই সাক্ষাতকাৰ শেষ কৰে ফিৰে এলেন জাহাজে। মানিক পীৰ বললেন,—কোন চিন্তা কৰো না,—ভাট্টাৰ টানে টানে বাও জাহাজ নিৰে। পাবে বহুত মাল, বসে খাবে চিবকাল আৰ এলাহিব নাম কৰবে।

পৰদিন বাদশা কালে শাহ। সকালে সদলে বওয়ান। হলেন এবং আৱে। এগিৰে চললেন।

এদিকে দেবাণ সহৰে কালে শাহাৰ মাত। আবেমন। বিবি সকালে ঘুম থেকে উঠে দাসীকে বললেন পুত্ৰবধু বজ্জন। বিবিৰ খবৰ নিতে। দাসী এসে

জানালো যে দরজার কুলুপ খোলা, দরজা খোলা, বেহুস হয়ে বিবি পালঙ্কে শুয়ে আছে। বুড়ি বললেন,—

এতদিন পাবে তুই কালি দিলি কুলে ॥

ক্রুদ্ধ বুড়ি দাসীকে দিখে বজ্রনা। বিবির গায়ের অলঙ্কার খুলিয়ে নিলেন, তার বদলে—পবালেন চট। তারপর তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন বনবাসে আমীর-জঙ্গলে।

রঞ্জনা বিবির সোনার বরণ দেহ বনে বনে ঘুরে ঘুরে হল মলিন বরণ। তিনি শুধুই কাঁদেন আর স্মরণ করেন আল্লাকে। নব আস পব তিনি বনে দেখতে পেলেন দীনু নামক এক ফকিরের কুঁড়ে ঘর। রঞ্জনা গিয়ে তাঁকে সব কথা বললেন। সব শুনে ফকির তাঁকে আশ্রয় দিলেন।

সেদিন দীনু ফকির গ্রামে গেছেন ভিক্ষায়। বজ্রনা প্রসব হয়ে বসে আছে ঘরে। ঘবে ঢুকে চাঁদ স্বরূপ পুত্রকে দেখে ফকির তো খুব যুগ্ম। দাইকে আনালেন সহর থেকে। দাই বললে,—লাডকা খুবই বেমাৰ। কমিন! সহরে শাহা হবিবের নিকট নিয়ে যাও—তিনি ভাল কবে দেবেন। ফকির, লাডকা লাল মানিককে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। শাহা হবিব বললেন,—

দাওয়াই খাওয়াই পাছে লাড়কা মারা যান ॥

ফকির ফিরে এলেন ঘরে। দাই দু টাকা নিয়ে ফিরে গেল। শাহা হবিব ডেকে আনালেন উজিরকে। বললেন,—দীনু ফকিরের ঘরের ছেলেকে চুরি করে এনে দাও,—অনেক টাকা পাবে। উজির এক দাসীর সাহায্যে যাহুব জোরে লাল মানিককে এনে দিল হবিবের কাছে।

সকালে উঠে রঞ্জনা বিবি পুত্রকে না পেয়ে কঁদে উঠলেন। খবর শুনে ফকিরের মাথাষ ঘেন আকাশ ভেঙ্গে গড়ল।

লাল মানিকের সন্ধানে বাবো বছর কেটে গেল। মানিক পীর এবার এসে তাদের সঙ্গে দেখা দিলেন এবং আপন পরিচয় দিলেন। বিবি তখন পীরের পা জড়িয়ে ধরলেন। পীরের দশা হল। বিবিকে পীর পরামর্শ দিলেন রাজ-দরবারে নালিশ করতে। বিবি নালিশ কবলেন বাজার নিকট। রাজা সে নালিশ নিলেন না, বরং তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন।

পুত্র বিরহে বিবি রাস্তায় বসে কাঁদেন। পুত্র বোজ় সেই পথ দিখে বিদ্যালয়ে

যায়। নিজেৰ পুত্ৰ বলে চিনতে পেরে বিবি আৰো কাঁদতে লাগলেন।  
লাল মানিক একদিন বলল,—তুমি কাঁদ কেন? বিবি সব কথা বললেন।  
পুত্ৰেৰ হৃদয় সেই হৃৎথে গলে গেল।

অনাহাৰে কুশকাৰ। মাতাৰ জন্তু লাল মানিক আপনাৰ আহাৰেৰ অংশ  
এনে দিলে বিবি বললেন,—

যদি সত্য মেবা লাভকা হও বাপু তুমি।  
কেমনেভে ঐ ভাত খাব ভেবা আমি ॥

শাহাৰ উপৰ লাল মানিকেৰ সন্দেহ হওম্বাৰ বলল,—

এক বাত কহি বাবা তোমায় ছজুবে ॥  
ছেবে মেবা এক হাত দেহ উঠাইবা।  
বলিব সকল কথা বহান কবিয়া ॥

শাহা তখনই তাৰ মাথায় হাত দিতে লাল মানিকেৰ আৰো সন্দেহ  
ঘনীভূত হল। মনে মনে সে ভাবল—

পিতা মাতা হইলে পৰে বেটাৰ ছেবেভে।  
কোন মতে হাত তাবা না পাবে তুলিতে ॥

মানিক পীৰ এবাৰ বজ্ঞনাকে সঙ্গে নিষে ৰাজ দৰবাৰে গেলেন। তিনি  
লাভকা চুবিৰ বিবৰণ বাজ্ঞাকে বললেন। ৰাজা ডেকে পাঠালেন শাহা  
হবিবকে। হবিব বললে : ছেলে আমাৰ। বাজ্ঞা মনে মনে বললেন,—কি কৰি  
এখন।

মানিক পীৰ বলেন লাভকাৰ মুখে সাত জোড়া পটি বাঁধা হোক।

“সাত পাঁচিল ভেদ কৰে দুধ বাবে যাব।  
তাৰ সঙ্গে দাবি-দাওয়া কিছু নাহি কাৰ ॥

বাজ্ঞাৰ ছকুমে শাহা হবিব, দাসীকে আপন স্তন হতে দুধ দিতে বললেন।  
দাসীৰ স্তন হতে দুধ তো বেব হ’লই না, যন্ত্ৰণায় সে কেঁদে ফেলল। জন্ম-বাজ্ঞাৰ  
দুধ—সে কি সম্ভব। অপৰ পক্ষে বিবিৰ স্তন হতে এমন দুধেৰ প্ৰবাহ এল যে  
সাত পুৰু কাপড তিজি গেল।

দুধ দেখে বাজ্ঞা তখন বেহুস হল।

বিবি লাল মানিককে পেলেন । মানিক পীরকে তিনি সালাম জানালেন ।

“সালাম কবিন্না বেওয়া জোড হাতে কর ।

কহ বাবা লাডকা লগ্নে যাইব কোথায় ॥”

মানিক বললেন,—লাডকা নিগ্নে নদীর ধারে যাও । তাঁরা নদীর ধারে গেলেন । পীরের পবামর্শে লাল মানিক পথ চলতি যাব সাক্ষাত পেল, তিনিই কালে শাহা । সে কালে শাহাকে বললে,—বাজ্জাব হুকুম আছে, তাঁর কাছে যেতে হবে । অন্যথায় সব ধন এখানে দিবে আপনাব ঘরে ফিরে যাও ।

কালে শাহা চিহ্নিত হয়ে অবশেষে গেলেন বাজ্জাব কাছে । তিনি লাল মানিকের নামে পাণ্টা নাশিশ কবলেন । লাল মানিককে আনা হল দববাবে । লাল চান্দ বললে,—

বার বছর মাতা মেরা ফেবে বনে বনে ।

পিতাব অশ্রেষণ আমি না পাই জাহানে ॥

বঞ্চনা আমার মাতা দেবাগ সহব ।

সত্য কবে বল দেখি কে হুয তোমাব ॥

যেই মাত্র লাল চান্দ এই কথা বলে ।

আপনাব লাডকা বলি তুলে নিল কোলে ॥

বুকেতে রাখিল তাবে মুখে চুমা দিষা ।

কান্দিতে লাগিল শাহা বিবিকে দেখিয়া ॥

লাল শাহা বলল—

মানিক পীর হইতে মোবা আছি যে বাঁচিয়া ।

নহে ত জননী মেবা যাইত মরিষা ॥

শাহা এবাব মানিক পীরের জন্ত আকুল হলেন । দরলাল পীর সেই আকুতিতে সাড়া দিলেন,—আল্লাকে ভেবে পীর সেখানে এলেন । শাহা বললেন—“শাহা চাহ তাহা দিব কহিনু তোমাবে ।” মানিক পীর বললেন,—“আপনাব দেশে যাহ ধনে কাজ নাই ॥”

কালে শাহা বলে আমবা যাইব পশ্চাতে ।

শ্বরবাত কবিব কিছু মানিকের নামেতে ॥

কালে শাহা দেশে দেশে সে খবৰাভের খবৰ পাঠালেন এবং মানিকেব নামে খয়রাত জাকাত দিবে সকলে মিলে আপনাব মোকামে কিবে গেলেন।

কাহিনীর আৰম্ভে কবি ভণিতায় বলেছেন—

হীন লাচার কয়                      সবাكار, পায়

আমি বড় গুণাগাব।

নহিবেৰ কেবে                      বাপ গেছে ম'বে

ফেলে হুনিয়া মাঝার ॥

মানিক পীৰ পাঁচালী কাব্যে বিভিন্ন কাহিনী-অংশে শৈশবকালে মাতাপিতাব স্নেহবন্ধনাব কৰণ চিত্র যেন কবিৰ অসহায় জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অঙ্কিত হয়েছে।

কমবকিন শাহাৰ পুত্র মানিকেব বালাজীবনে নেমে এল দুঃখের ভার। মানিক বিক্রীত হল বদর শাহাৰ কাছে মাত্র পশু টাকার বিনিময়ে। তিনি ছন্নত বিবির কোলে মানুষ হতে লাগলেন। পালক পিতা বদর শাহা বাণিজ্য থেকে কিরে এসে অকাৰণ সন্দেহে তার কঠোর শাস্তি স্বরূপ পরীক্ষাব বিধান করল। তাকে সিদ্ধকে বদ্ধ কবে আঙনে জালানো হল। উপবোক্ত ঘটনাব পরিপ্ৰেক্ষিতে সে দুঃখে কবি বললেন,—

মানিকের দুঃখ যত                      আমি তাহা কব কত

মুখ দেখে ছাতি কেটে যায় ॥

অন্য কাহিনী অংশে রঞ্জনা বিবির পুত্র লাল মানিকেব এক জন্মলৈ অসহায় অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং সেখান থেকে দুই ব্যক্তিব কবলে পড়ে শৈশবে দুর্দশা ভোগ কবাব কথায় কবিৰ ভণিতাব আছে—

খোড়াই বয়সে ভাই                      বাখিয়াছে আন্তা মাই

পিতা মাতা গেছেন মরিয়া।

পঞ্চম বছর পবে                      মবিয়া ওস্তাদ পীবে

শিক্ষা করি এলাহি ভাবিয়া ॥

বহুত কচ্ছেলা কবে                      শিখাইল মোর ভবে



কুমার হাটে বসতি তাহার ।...

একা আছি এ সংসারে      মা বাপ গিন্নাছে মরে  
ভাই বন্ধু আর কেহ নাই ।

বাল্যকালে লাল মানিক পালিতা মাতার নিকট নিষ্ঠুর ব্যবহার পেয়েছিল,—মা কবির হৃদয়কে স্পর্শ করেছে । অদ্ভুত মাতার দ্বংখে তাই লাল মানিক আপনার আহারের অংশ এনে দান কবতে মাতৃ-হৃদয়ে যে বাৎসল্য-ভাব জাগ্রিত হয় তার বর্ণনায় কবি লিখেছেন,—

বজ্রনা বলেন বাবা ভাত কোথা গেলে ।  
কি কপেতে এই ভাত এখানে আনিলে ॥

লাডকা বলে ওগো বেগুনা কহিগো তোমারে ।  
দুই দিন তেরা লাগি আছি অনাহারে ॥

একথা শুনে রজনী বিবি দুঃখ দ্বিগুণ হল । আহা ! ভোব বুখে ভাত কি করে খাব ! তাতে ভো ভোবই শরীবের জোর কমে যাবে । লাল মানিক সেই মধুর বচন শুনে সত্যই এবার মাতৃস্নেহের স্পর্শ পেল । সে কেঁদে উঠল । কিন্তু বাভীতে ফিরে এসে পালিতা মাতার কাছে দাক্ষণ ক্ষুধার কথা বলতে তিনি অল্পই ভাত দিলেন । তাতে উভয়ের মধ্যে দেখা দিল অসন্তোষ এবং শেষ পর্যন্ত—

একথা শুনিয়া বিবি জলিয়া উঠিল ।  
সাদগান রাখিয়া তারে চাপড মাবিল ॥  
এলহা জোবে মাবে সেই লাডকাব বুখেতে ।  
সামালিতে নাহি পারে গিবে জমিনেতে ॥  
কতক্ষণ বাদে লাডকা হুস কিছু হইল ।

কবি তার ভণিতায় বাব বার যেভাবে নিজেই হীন, অধম, লাচাব, গোনাপার প্রভৃতি শব্দ দিয়ে আখ্যাত করেছেন তাতে পীরের প্রতি তাঁর অবিচল ভক্তির সাথে নিজেই সম্পূর্ণরূপে পরম প্রেমের নিকট আত্ম সমর্পণের কথাই প্রকাশ পেয়েছে । এই কাব্যেও প্রত্যক্ষভাবে পীরের প্রতি এবং পরোক্ষভাবে আল্লাহ প্রতি লক্ষ্য বেখে তাঁদের মাহাত্ম্য—কথাই বিরূত হয়েছে ।

মানিক পীৰ ভক্তেৰ ভক্তিতে সহজেই সন্তুষ্ট হন। সাত ঘড়া দুধ দোহন কৰে দিলেন মানিক অথচ সব দুধ ঘৰে বেখে সামান্য একটু এনে দিল কিনুৱ পত্নী সনকা। পীৰ তাতেও খুসী হৱে দোৱা কবলেন সনকাকে। আবার এৰোজনে পীৰ ক্লান্ত হৱে অভিশাপও দিতে পশ্চাৎপদ হন না। ৰঞ্জনা বিবিব ক্লান্ত ব্যবহাৰে পীৰ ক্লান্ত হৱে বললেন—

খানাপিনা নাহি দিলে আমাৰ ভৱতে ।  
 এলাহি কবেন যেন শাইবে বনেতে ।  
 এই দোৱা কবি আমি যদি হই পীৰ ।  
 ভ্ৰমণ কবিবে তুমি আমাৰ খাতিৰ ।  
 পণ্ডদেব মত তুমি থাকিবে জঙ্গলে ।  
 আহাৰ না পাবে মাতা জঙ্গলে ঢুঙিলে ॥ ইত্যাদি ।

কাব্য ৰচনাৰ কবি আপন দুৰ্বলতা সম্বন্ধে সচেতন। তাই বাৰ বাৰ কবি বলেছেন—

হীন পিজিবদ্দিন বলে সবাৰ জনাবে ।  
 ভুল চুক হইলে তাই সবে মাফ দিবে ॥ (পৃ ২৭)

কবি নিজের লেখন সন্তুষ্ট হতে না পৰে—

কফিলদ্দিন নাম ঘৰ জগদিয়া মোকাম ।  
 বড়ই পিয়ৱা সেই বড় গুণধাম ॥  
 সমাপ্ত কৰিয়া কেছা দেখাইনু ভাবে ।  
 বহুত কছেল্লা কৰে দিল মেৱা তবে ॥

কফিলদ্দিনেৰ মঙ্গল কামনা কৰে তিনি গাইলেন—

আমি হীন ভাৱিয়া আল্লাৱ দৱগান্ন ।  
 সুখে সালামতে আল্লা ৰাখেন তাহাৰ ॥ (পৃ ১৯)

আজিমাবাদ ৰানশিখা নিবাসী ফকিৰ মহাপদ যে পাঁচালী কাব্যখানি লিখেছেন তাৰ কাহিনী থেকে পিজিবদ্দিন সাহেব লিখিত কাব্যেৰ কাহিনী সম্পূৰ্ণ পৃথক। সংক্ষিপ্ত কাহিনী এইৰূপ ;—

ব্যাধি সৃষ্টি কৰে আল্লা মুক্তি পড়েছেন,—তাদেব সামলায় কে। ইলাহি

পাঠালেন জিবরাইলকে—মক্কাব সব পীর-পবগম্বরকে ডেকে আন। তাঁরা এলে ইলাহি বললেন,—

শুন সন্তে এই মতে ব্যাখিগণে লেহ উঠাইয়া।

তাঁরা নিজেদের অক্ষমতা জানিবে মাথা হেঁট কবে রইলেন। এলাহি তখন মানিককে তাতে ব্যাখি সমর্পণ কবে হুনিয়ার 'পবে পাঠালেন। তাঁর সঙ্গী হরজ আলি। মর্তভূমিতে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁরা মক্কার যেতে মনস্থ কবলেন। মক্কার পৌছুবার আগেই নামাজের বেলা হল। জঙ্গলের পাশে নদীর ধারে একান্তে আশাবাড়ি ও সোনার খডম বেখে দুজনে বসলেন নামাজে। সেই সময় হুনিয়া ও তার মা জঙ্গলে গক চবাতে এল। দুব থেকে মানিক—অলিকে নামাজ কবতে দেখে দুখের কোঁড়ুল বেড়ে গেল। মাকে বলে সে দেখতে চলল, নামাজ পড়া। পখিমধ্যে দেখে দুটি সোনার খডম। লোড সে আর সামলাতে পারল না। খডম দুটি চুবি কবে নিলে এল মাষের কাছে। মা তাকে ভর্ৎসনা কবলেন।

দুখে গেল খডম বেচতে বাজার বাজাবে। বেনে তো ফকিবের খডম দেখে ভরে অস্থির। অমনিই কিছু টাকা দিবে সে তো দুখেকে বিদায় কবল। সেই টাকায় দুখে হাট-বাজার কবে এল। মাতা-পুত্র ভোজন সমাধা কবে পালঙ্কে শুয়ে বিশ্রাম কবছে—এমন সময় মানিক পীর এলেন খডমের সন্ধান সূত্র ধবে। ফকিবের জিগীষ স্তনে দুখের মা এল ঘবেব বাইবে। খডমের কথা দুখের মা স্বীকার করল না। মানিক ধমক দিলেন : আমাব সঙ্গে কপটতা করা। এল দুখে। সেও প্রথমে স্বীকার করতে চাষ না। অবশেষে সে মনের কথা বলল যে তাঁরা কাঙাল দেখে কেউ তার সঙ্গে বোটর বিয়ে দেষ না। তার সাধ—সোনার খডম বেচে সে বিয়ে করবে। মানিক পীর বললেন—বীবসিংহ রাজার মেয়েব সঙ্গে তোর বিয়ে দিলে দেব, আমায় খডম এনে দে। দুখে বললে : বাগদীর ছেলে আমি, আমি বাগদীর মেয়েকেই বিয়ে কবব। মানিক বললেন : যা খুসী কব—আমায় খডম এনে দে। দুখে আবার খডম চুরির কথা অস্বীকার কবল—

পবিহাস কবেছিনু শুন শাহাজী।

মানিক এবাব বেনের কাছে টাকা নেবার কথা ফাঁস কবলেন। দুখে

তখন জড়িয়ে ধৰল মানিক পীৰেৰ পা। বললে, তুমি আমাৰ বিষেৰ ব্যবস্থা কৰে দাও।

তিন সত্য কৰে পীৰ ব্ৰাহ্মণেৰ বেষে প্ৰথমে গেলেন বাজসভায়। সেখানে তিনি বাজাৰ বাৰো বছৰেৰ কতাব সাথে বিয়েৰ সম্বন্ধ কৰলেন। পাণ্ডেৰ বিবৰণ শুনে বাজা কত্যা-সম্প্ৰদানে ব্যগ্ৰ হলেন। মানিক পীৰ ফিৰে এসে সে শুভ সংবাদ জানালেন দুৰেকে। এত ক্ৰত সম্বন্ধ কৰে আসতে দুখে ফকিৰকে বিশ্বাস কৰল না। সে বলল—

কেমন বাজাৰ কত্যা দেখাবে আমাৰে।

মানিক বললেন,—বেহা না হইলে আগে কত্যা দেখাৰ কে। দুখে বললে—বাগদীৰ বিষেৰ নিষম মানতে, পাডা-পডনীকে হলদি-তেল মাখতে এবং খীৰ পিঠা খেতে দিতে হবে। অভএৰ দাৰে পড়ে ফকিৰ তখন আসমানেৰ চাৰ শৈলি ডাকিয়ে তাদেৰ দিখে সব যোগাড কবালেন। দুখেৰ আৰো বাৰনা :—

পছন্দ মতন দাঁত-বাঙা কৰাৰ পাতা চাই, বাজন-বাঙ্গিৰ ব্যবস্থা কৰা চাই, আতস বাজি চাই। আৰো বাৰনা—“আধাবে কেমনে যাব বাজাৰ দৰবাৰে।” অগত্যা মানিক পীৰ বনেৰ বাঘদেৰ দ্বাৰা মশাল বহন কবিলে ববসহ বঙলা হলেন।

ববকে কিছু দূৰে বেখে বায়ুনেৰ বেষে মানিক গেলেন বাজবাড়ীতে। একদল বাঘ আসতে দেখে বাজাৰ প্ৰাণ গেল উড়ে। বাজা বললেন—

জামাই আৰ তুমি আসিবে লোকে কাজ কি।

মানিকও তাই চান। বাঘদেৰ বাদ দিখে তিনি দুখেকে নিৰে বিবাহ-সভায় এলেন। সোনাৰ বিছানা দেখে দুখে ডো ভৰে মাটিতে বসল। বাগে মানিক তাৰ গালে মাৰলেন দুই চড। দুখে উঠে বসল বিছানায়। পোৰেৰ অলৌকিক শক্তিতে ডা আৰ কেউ দেখতে পেল না। পঞ্চ উপকৰণে কাঞ্চনেৰ থালায় জামাই বসল খেতে। বালৈৰ বাগ্ৰন সে খেতে পাৰল না। মানিক দেখলেন—বিপদ। সে মন্ত্ৰই বা পড়বে কি কৰে। বাজা তাঁৰ সোকদেৰ বললেন,—জামাইকে আন, কতাব হাতেৰ সঙ্গে তাৰ হাত বাঁধ। মানিক বললে,—বা না ও সব আমাদেৰ নিষম নহ। বাজা

দুঃখিত মনে সে ব্যবস্থা মেনে নিলেন। দুখে বাসৰ ঘৰে কণ্ঠ্যৰ ৰূপ দেখে  
হতবুদ্ধি হৱে গেল,—

ইজ্জতৰ কামিনী জিনি দেখি তনুবেশ  
মুঠিতে কঁকালি লুকাই পিঠে ভাঙে কেশ।  
বিনোদ-বন্দান হাব গাঁথ্যা দিছে গলে  
মাথাৰ মানিক কণ্ঠ্যৰ শিকি শিকি জ্বলে।

দুখেৰ মনে হল যেন সাক্ষাত মা মঙ্গলচণ্ডী। সে বান্ধবাৰ গড কৰে আৰু  
বলে—

মাহামাই চণ্ডী ঠাকুবাণী তোমাকে বুঝাই  
আজি যদি বাঁচি মাগো কালি ঘৰে যাই।

শুনে ৰাজকণ্ঠ্য হাসি চাপতে পাৰে না। কণ্ঠ্যৰ হাসি শুনে তুখে ভৱে  
ঘৰেৰ চাল থেকে ঘোড়াৰ ঘাস নিবে ঘৰেৰ এক কোনে বিছৰি তাকে শুবে  
ৰাত কাটালো। সকালে ৰাজকণ্ঠ্য কেঁদে সমস্ত মাথৰ কাছে জানালে বাণী  
অভিযোগ আনলেন ৰাজ্যৰ নিকট। ৰাজ্য হুকুম দিলেন—

ঘটক বায়ুন কোথা বেঁধে আন গিয়া।

বায়ুন এসে বললেন—“বালে নুনে তোমরা কবছে স্বৰূপৰ !” আৰু  
কান্ধাৰ কথা? বনে বনে বিধে হল,—মা-বাপ, আত্মীয়-কুটুম্ব কেউ খবৰ  
পেল না—এ কাৰণে কেঁদে ছিল। গড কৰাৰ কথায় দুখেৰ জবানে ভব কৰে  
মানিক বললেন,—

শোবাৰ ভবে এমন জাৰগা দিয়াছিল মোকে  
বেটাব হইয়া গড কব্যাছিলাম তাকে।

ভাৱপূৰ্ণ সে নিজেৰ ঐশ্বৰ্য্যেৰ গল্প কৰল। ৰাজ্য তা দেখতে চাইলেন।  
জামাই জানালো—পাঁচ দিন পৰে গলে দেখতে পাওৱা যাবে। পীৰকে তখন  
দুখে বললে,—আমাৰ তো তালপাতাৰ ঘৰ, কি হবে উপায়! মানিক  
বললেন—আমি এগিৰে গিয়ে সব ব্যবস্থা কৰি। দুখে বলল,—আমাকে  
'ফেলে পালাবাব মতলব। মানিক আল্লাৰ দোহাই দিয়ে চলে গেলেন এবং  
গিয়ে সব ব্যবস্থা কৰলেন। হৰজ আলি বললেন,—সবই তো হল, কিন্তু  
ৰাজ্যৰ দলবলৰ পৰিচৰ্যা কৰবে কে? মানিক বললেন,—

উনকোটি ব্যাধি আমার মাজাইয়া আন।

ব্যাধিগণ এল পৰিচর্যা কবতে। দুখেৰ কুঁড়ে ঘৰেৰ চাবদিকে সোনাৰ-  
শহৰ গড়ে উঠল। 'সেই তালপাতাৰ ঘৰে পীৰ সিদ্ধি ঘুটে-খাষ।'

পাঁচদিন পৰ। বাজা চললেন জামাই-এৰ সাত্বে ঘৰ দেখতে। দুখে  
ঘোড়াৰ পিঠে উল্টে কৰে বসেছে। সেই ভাবে বসতে দেখে সবে তো হেসে  
খুন। অন্তৰ্যামী পীৰেৰ শক্তিতে ঘোড়াৰ লেজৰ দিকে হল তাৰ মুখ।

সৈন্ত সামন্ত নিষে বান্ধাও কৰে বাজা এলেন জামাই-এৰ বাডীতে।  
হবজ আলি এগিৰে এলেন অভ্যর্থনা কবতে। আদৰ-আপ্যায়নে পবিত্ৰ  
হয়ে বাজা চাইলেন বেহাইকে গড কবতে। দুখে আপত্তি কবল। বাজা  
নিষেধ শুনলেন না। বাজাৰ আসৰাৰ আগেই তালপাতাৰ ঘৰ সোনাৰ  
মন্দিৰে পৰিণত হল। মন্দিৰে ঢুকে তফাৎ থেকে পীৰকে বাজা কুৰ্শ  
কল্পলেন। পীৰ আশীৰ্বাদ কবলেন সেই বাজাকে। তাৰপৰ  
বিনা অনুমতিতে ঘৰে ঢোকাৰ অপবাধে পীৰ তাঁকে হ'চাৰ খুৰি মেৰে  
সঠিক পৰিচয় নিলেন। পৰিচয় পেৰে পীৰ খুশি হৰে সকলকে ভোজনে  
বসালেন। মানিকেৰ হুকুমে হবজ আলি, বাজা ও তাৰ দলবলকে উপযুক্ত  
ইনাম দিলেন। বাজাও জামাইকে অৰ্জেক পৰগনা লিখে দিলেন।

সকলে চলে গেলে মানিক বললেন দুখেকে,—

এখন সোনাৰ খডম দুটি এনে দেহ মোৰে  
তৌকে দ্বয়। কব্যা যাই হজ মকা শহৰে।

দুখে বললে,—তা হৰে না। আগে সাভে ভিন গঙা বেটা হোক—পৰে  
খডম দেবো।

মানিক হেসে বললে,—

বাইশ লক্ষ পৰগনাৰ হইল বাজতি  
ভবু নাঞি ছাভ বেটা বাখালিষা মতি।

পীৰ মক্কাষ চলে গেলেন। পীৰেৰ নামে দুখে ভালো বকম শিবনি  
দিলে,—

মানিকেৰ গীত যে বহিল এই খানে। ৭

পিজিবদ্দিন সাহেব বিবচিত কাব্য থেকে ফকির মহান্মদ বিবচিত কাব্য অন্ততঃ কাহিনী অংশে অত্যন্ত হাল্কা ধরনের। মানিক সম্বন্ধে সাধারণের প্রচলিত ধারণায় ফকির মহান্মদের কাব্য-কাহিনী পৌর-মহাত্ম্য সম্বন্ধে অনুচ্চ ভাব সৃষ্টি করে। বিপদে-আপদে অথবা শোকে-দুঃখে এ দেশে পৌরগণের জীবনপন্থা কবে যে দরদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখার ইতিহাস আছে তাব সঙ্গে এ কাহিনীর সঙ্গতি নেই। অতীত উনকোটি ব্যাধি সঁপে দিলেন মানিককে—ভাল কথা। কিন্তু তিনি যে আশি-ব্যাধি থেকে মানুষ বিশেষতঃ পশু-সম্পদকে রক্ষা করেন এ কাহিনীতে তার কোন আভাসই নেই। আপনাব খুঁজি ফিরে পাওঘাটাই যেন তার সর্বপ্রধান কর্তব্য।

মানিক পৌরকে ধ্বংস করতে পারে এমন কেউ নেই। বদর শাহ তাঁকে সিংহকে ভরে আলিখে দিয়েও ধ্বংস করতে পারলেন না, অথচ দুখের বাঘনা অনুমানী তাব বিয়ে দেবার এবং সম্মান দেবার প্রতিশ্রুতি পালন করে তবে চুল্লি যাওয়া আপনাব সোনার খডম জোড়া পেতে হয়েছে। কবি এ কাহিনী হাস্যবসাত্মক। রাজকন্ডাব সঙ্গে বাখাল যুবকের বিবাহ, উভয়ের আচরণের মধ্যে বৈষম্য পাঠকের স্বতঃস্ফূর্ত হাত্তোদ্বেগ করে। বরকে বিছানা ছেড়ে মাটিতে বসা, বৌকে মঙ্গলচণ্ডী মনে করে গড কবা, বাসব ঘবে চালের খড় টেনে এনে মাটিতে বিছিয়ে সেখানে শুয়ে রাত কাটানো, রাজকন্ডাব হাসি শুনে ভয় পাওয়া ইত্যাদি ঘটনা হাস্যবস সৃষ্টিব উৎস। এতে পৌরব প্রাতি ভক্তি জাগাতে সাহায্য করে না। অথচ পিজিবদ্দিনের কাব্যের কাহিনীতে কিনি-কানু ঘোষ সম্পর্কিত ঘটনা, রক্তনা বিবিব ককণ জীবন সম্পর্কিত ঘটনাব পৌরব ভূমিকা সাধারণের মনে আপনাই ভক্তিভাব জাগবিত করে।

তবে ফকির মহান্মদের কাব্যে ভাষাব কিছু উৎকর্ষ লক্ষ্যণীয়। সৈন্ত-সামন্ত নিয়ে রাজ্য যখন জামাই-এব বাড়ী এলেন তখনকার একট মনোবম বর্ণনা তাব প্রকৃষ্ট উদাহরণ,—

ক্ষেত্রি কুলেতে কেবল জনম তাহাব

নবীন বয়সে যেন বোডস্তা কুণ্ডাব।

ললাটে চন্দন চাঁদ পবম উজ্জল

গগন মণ্ডলে যেন শশী টলমল।

খাঁড়া-ধাব বাঁশি তার নাসিকার গঠনে  
বিজলী হটকে যেন মুখের দশনে ।  
কৰ্ণমূলে বীৰবোলি তাকে ভাল সাজে  
বতন-নপুৰ দুটি চরণেতে বাজে ।

এ কাহিনীতে আল্লা মহিমার কথা নেই বললেই চলে ;—আছে শুধু মানিকের মাহাত্ম্য কথা । আল্লা ব্যাধি সৃষ্টি করে মুন্সিলে পড়বেন—এই সব ধারণা ইসলামি আদর্শের সম্পূর্ণ বিবোধী । মুন্সিলে পড়ার মতন বক্তব্য অন্ত কোন পীর-কাব্যে লক্ষ্য করা যায় না । মানিকের মাহাত্ম্যে দয়া, প্রেম, মহানুভবতা, ত্যাগ, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণাবলী অনুপস্থিত । জনৈক বাখাল-বালকের বিবাহকণ খেলান চৰিতার্থ করতে মানিক পীর তার বৃজরগী বা অলৌকিক শক্তির ব্যবহার করেছেন । এভাবে বাখাল-বালককে বাজার মতন ধনৈশ্বৰ্য্যশালী-কবাব মধ্যে মানিক পীরের মতখানি স্বাদুকরের ভূমিকায় প্রতিভাত হতে দেখা যায়, অবহেলিত, বা নিপীড়িত বা হৃদশাগ্রস্ত কোন ব্যক্তির মুক্তিদাতার ভূমিকাও দেখা যায় না । এ কাহিনী তাই কাহিনী হিসাবে ঐতি-মধুর হলেও তা অৰ্বাচীনের নিকট পৰিবেশন-যোগ্য বলে মনে হয় । এ কাহিনীতে সমাজ-হিতৈষণার মূল্য অনুপস্থিত । পাঁচালী কাব্য হিসাবে এৰ ভাষার চাতুর্য্য অবশ্য প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু ভাষের গাভীৰ্য্য নেই বলে এৰ সাহিত্যিক-মূল্যও যে একেবারেই নেই তা বলা যায় না । খডম উদ্ধাব অভিযান, বাখাল-বালকের নিকট বাজার কণ্ঠার বিবাহ, বিবাহ-বাক্সিৰ বিবরণ ইত্যাদি সাধারণ মানুষের কাছে হাস্য-বস সঞ্চারে সাহায্য করেছে । সেই দিক দিখে এই কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য্য ।

অনেক অঞ্চলে এক কালে মানিক-মাজার বহুল প্রচাৰ ছিল । তাতে মানিক পীরের মাহাত্ম্য-কথাই প্রচাৰিত হত । আজ আর তার বহুল প্রচাৰ দেখা যায় না । বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট থেকে যে কাহিনী পাওয়া যায় তার সংক্ষিপ্ত রূপ :—

দানশীল বাদশাহ জায়গুণ । তাঁর দুই বেগম । দুই বেগমই নিঃসন্তান ।  
সন্তানহীন পৰিবাবে বয়েছে দুঃখেৰ ছায়া । দুঃখে বাদশাহ খয়বাত দেওয়া বন্ধ  
করলেন ।

মানিক ও মাদাব দুই ভাই । মানব কল্যাণে তাঁরা আপনাদেব জাহিৰ



করতে বাহির হয়েছেন ; এ হল আশ্রায় নির্দেশ । ফকিববেশে এলেন দুই পীর, বাদশাহ জায়গুণেব প্রাসাদে । বাদশাহেব সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতকাব হল । বাদশাহকে সান্না দিলে মাদাব-পীর দিলেন এক মন্ত্রপুতঃ ফল । সেই ফল আহাৰ কবলে বেগমেব সন্তান হবে । সন্তান-গৰ্বে গরবিণী হওযাব মোহে বড বেগম সেই ফল পাখবেব শিলাষ ছেঁচে একাই ভক্ষণ কবলেন,—ছোট বেগমকে প্রভাৱিত কবতে চাইলেন । সন্তান-বাসনাষ আকুল ছোট বেগম শেষ পর্য্যন্ত ‘শিল-ঘোয়া জলটুকুই’ পান কবলেন ।

উভষ বেগমই হলেন গৰ্ভবতী । ছোট বেগম তো ফল খাষ নি, তবে তাব গৰ্ভবতী হওলাব বহুত কোথাষ । বড বেগমেব নিবন্তৰ কুপবামৰ্শে বাদশাহ শেষ পর্য্যন্ত ছোট বেগমকে বনবাস দিলেন । ছোট বেগম বহু চেফা কবেও প্রাসাদে থাকতে পাবলেন না ।

প্রাসাদে বড বেগমেব দুই পুত্ৰ হল । তাদেব নাম স্বথাক্ৰমে ইজিল ও ভোৱদ ।

বনে ছোট বেগমেব হল এক পুত্ৰ । তাব নাম তাজল । ফকিব বেশধাৰী মানিক পীর ও মাদাব পীর তাদেব দেখা শোনা কবেন । কালক্ৰমে তাজল যুদ্ধ বিদ্যাও হয়ে উঠল পাবদৰ্শী ।

বাদশাহ জায়গুণ ভতদিনে ভুলে গেছেন ছোট বেগমকে । বড বেগমকে নিষে তাঁব সুখেব সংসাৰ । সে সুখ তাঁব বেশী দিন বইল না ।

বাদশাহ একদিন বনে এসেছেন শিকাৰ কবতে । সে বনে তাঁব শিকাৰ-কাঞ্জে কেউ বাধা দিতে পাৱে এমন তিনি কল্পনা কবেন নি । বেপবোষা হষে তিনি সংগ্ৰামে বত হলেন, ভোবদ এবং ইজিলও হল তাঁব যুদ্ধ সহযোগী । পীবেব শিক্ষান্ন শিক্ষিত এবং পীবেব দল্লাষ বলীয়ান তাজল যুদ্ধে জয়ী হল । শোচনীয় পৰাজন্নেব মুখে সেখানে আবিভাৰ হল মানিক পীবেব । মানিক পীর অতীত ঘটনাৰ পৱিচয় দিলে পিতা-পুত্ৰেব মধ্যে এক ককণাঘন পবিবেশেব সৃষ্টি হল । বাদশাহ এবাৰ পীবেব মহত্বে যুদ্ধ হষে তাঁব অশেষ ককণাব কথা ব্যক্ত করতে কবতে অভিভূত হলেন ।

মুনশী মোহম্মদ গিজিবদ্দিনেব কাব্য-বচনাৰ কাল ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰথমার্দ্ধ ।<sup>২৩</sup> ফকিব মহম্মদেব কাব্যেব বচনাকাল আনুমানিক

অষ্টাদশ শতাব্দীৰ শেগভাগ ৪১ ফকিৰ মুহম্মদ (ফকিৰউদ্দিন)-এৰ মানিক পীৰ কাবেৰ বচনাকাল ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰথমার্দ্ধ। ২৩ তাছাড়া আৰো কষেকখানি মানিক-পীৰ-মাহাত্ম্য প্ৰচাৰক পাঁচালী কাব্যেৰ বিবৰণ জনা যায়।

জয়বন্ধীৰ সাহেব বচনা কৰেছিলে মানিক পীৰেৰ জহুৱানামা ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰথমার্দ্ধে। ২৩ নসৰ শহীদ লিখেছিলে মানিক পীৰেৰ গান ঊনবিংশ-শতাব্দীৰ প্ৰথমার্দ্ধে। ২৩ জয়বন্ধীনেৰ কাব্যে, কৃষ্ণহৰি দাসেৰ বড় সত্যপীৰ ও সছ্যাবতী কস্তাব পুঁথিৰ কাহিনীৰ প্ৰাৱন্তেৰ তাল মানিক পীৰকে দুৰ বিবিৰ কানীল পুজুৰূপে দৃষ্ট হয়। তবে তাতে বদৰ পীৰেৰ কথাই বিশেষভাবে ৰবেছে। হেনাত মামুদেৰ আৱিলাবাণীৰ (১৭৫৭) বন্দনা অংশে দুইভাই মানিকপীৰ ও শাহাপীৰেৰ কেবামতিৰ ইঙ্গিত আছে। ৪১ জইদি বা জয়বন্ধীনেৰ কাব্যেৰ লিপিকাল ১২২৪ সাল ৪১ হলে এৰ ৰচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীৰ শেষ দশক বা ঊনবিংশ শতাব্দীৰ প্ৰথম বা দ্বিতীয় দশকেৰ মথোই হবে।

ডঃ সুকুমাৰ সেন লিখেছেন,—“অল্পকাল আগেও ৰামায়ণ-গানেৰ মতন মানিক পীৰেৰ গান পথে ঘাটে এবং তাঁৰ পাঁচালী, পীৰেৰ আন্তানান শোনা যাইত। এই গানেৰ গায়ক ও বাদক প্ৰায়ই মুসলমান। গায়ক চামৰ ধৰে। বাদকেৰা খোল ও মন্দিৰা বাজায়।”

মানিক পীৰেৰ গান গ্ৰামাঞ্চলে আজো গীত হয়। বৰ্তমান বৰ্ষে (১৯৭৪) অন্যান্য পীৰেৰ মতন বাৱাসতেৰ অন্তৰ্গত কাজীপাড়াৰ হজবত একদিল শাহেব দবগাহে মানিক পীৰেৰ গান গাওৱা হলেছে। এই গায়ক দলে শুধু মুসলিম নন—হিন্দুও আছেন। মূল গানেৰ মুসলিম কিন্তু দোহাৰ ও বাচকবগণেৰ মধ্যে বামেশ্বৰ দাস (৪৫) নামক একজনকেও প্ৰত্যক্ষ কৰা গেল।

বোগ নিৰাময় বিশেষতঃ পণ্ডৰ বোগমুক্তিৰ ক্ষেত্ৰে মানিক পীৰেৰ অলৌকিকতা পৰিচায়ক কিছু কিছু লোককথা প্ৰচলিত আছে। তাছাড়া অশান্ত ক্ষেত্ৰেও তাঁৰ মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক প্ৰবাদ শোনা যায়। চব্বিশ পৰগণাৰ বসিবহাট মহকুমাৰ অন্তৰ্গত স্বৰূপনগৰ থানাধীন গোকুলপুৰ নামক গ্ৰামেৰ

(আমার জন্মভূমি) মানিক পীরের খান সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রবাদটি আজীবন শুনে এসেছি :—

বাংলা ১৩০৭ সালে এক বিধ্বংসী ঝড় হয়। তাতে মানিক পীরের খানের উপবকার বিশাল অশ্বখ গাছটির গোড়া উপড়ে যায়। এ ঘটনা ঘটে বাজে। পরের দিনে বাজিকালে সকলে অবাক হয়ে দেখে যে সে গাছ আবার স্বাভাবিকভাবে সোজা হয়ে উঠেছে। বাজি প্রভাবে এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে গ্রামবাসী বিস্মিত হয়ে যান। ভক্তগণের প্রচেষ্টায় অনতিবিলম্বে অশ্বখ গাছটির গোড়া ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। গাছটি আজো পরিদৃশ্যমান।

---

## উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

### সত্যপীর

কিংবদন্তী অনুসারে বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কোন এক কন্ঠাব গর্ভে সত্যপীর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। [দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তবজ্রন বাল্ল সম্পাদিত লাল। জয়নাবারণ সেনের “হবিলীলা” (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯২৮)। রচনাকাল ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ]। ৫৫

কাবো মতে বাগদাদের বিখ্যাত সুফী-সাধক মনসুর আল হান্নাজ যিনি নির্দিষ্ট “আমিই সত্য” ঘোষণা করে কিছু মুসলিমের হাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তিনিই নাকি মূল সত্যপীর। [মূলী আবদুল করিম সম্পাদিত কবি বজ্রভের [সত্য নাবারণের পৃথিবী ভূমিকা—(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১৩২২), সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে রচিত]।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন,—বহুদিন একত্র বাস নিবন্ধন-হেতু হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে কতকটা উদারভাব অবলম্বন করেছিলেন। সত্যপীর নামক মিশ্র দেবতার আবির্ভাব সেই উদারভাব কল। হবিষ্ঠাকুর এই উপলক্ষে ফকিবি আলখান্না গারে পরেছেন ও উর্দু ভবানে বক্তৃতা দিতেছেন,—

বিশ্বনাথ বিশ্বাসে বুঝায়ে বলে বাছা।  
দুনিয়ামে এসাভি আদমি বহে সাঁচা ॥  
জাওত সত্যপীর মেবা জাওত সত্যপীর।  
ভেরা হুঃ দ্ব করতত্তা হাম ফকিবি ॥ ২১

সত্যপীর কোন মুসলমান পীর ছিলেন, পরে সমাজের স্বীকৃতির পব তিনি নারায়ণের সঙ্গে একাকার হয়ে সত্য নাবারণ রূপে পরিচিত হন। ১১

হিন্দু ও মুসলিমের সমন্বয়ের সূত্রপাত কবে আবর্ত হয়েছিল তা যেমন নির্দিষ্ট করে বলা যায় না, সত্যপীরের উদ্ভব ও পূজা প্রচলনের সূত্রপাত কবে

হয়েছিল তাও নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। কেহ বলেন,—পাণ্ডুরাবাসী বৃদ্ধ গোপ কালু ঘোষ বোধ হয় গোড়-বজ্রের সর্বপ্রথম মুসলমান। (পাণ্ডুরায় কালু পীরের সমাধি আছে)।<sup>১৪</sup> কেহ বলেন,—সত্যনারায়ণের কথায় যে আলা বাদশাহের কথা আছে, তাকে আমবা আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বলে মনে করি। হোসেন শাহ, হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে দেখতেন। তাঁর উদাবতা ও আশ্রয়প্রার্থিতা ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁরই স্বতন্ত্র সত্যনারায়ণের পূজা প্রবর্তিত হয়।<sup>১৫</sup>

অবশ্য মৈমনসিংহ পীঠিকায় দেখা যায় কবি রামেশ্বর তাঁর বই-এর সূচনাতেই সত্যপীরের পূজার প্রচলন কি ভাবে হল সে সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন,<sup>১৬</sup>—

কলিতে যখন চুই হৈন্দবী করিল নষ্ট  
দেখি রহিম বেশ হৈলা রাম।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতেই অনুকম মনোভাব পাওয়া যায় বামাই পণ্ডিতের শৃঙ্গ পুরানে,<sup>১৭</sup>—

ব্রহ্মা হৈল মহাপদ বিষ্ণু হৈল পেগাধর  
আদম হৈল শূলপানি  
গণেশ হৈল কাজী কার্তিক হৈল গাজী  
ফকির হৈল মত মুনি।  
ভেজিয়া আপন ডেক নীরদ হৈল শেক  
পুবন্দর হৈল মৌলানা  
চন্দ্র-সূর্য আদি দেবে পদাভিক ইয়া সেবে  
সবে মেলি বাজার বাজনা।

সত্যপীর পূজা করে এবং কার দ্বারা প্রথম আবিস্কৃত হয়েছিল সে সম্পর্কেও নানা মত আছে। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ কোন সময় সত্যপীরের শিরনি দিয়েছিলেন—সেই কাহিনীই পরবর্তী সাহিত্যে পল্লবিত ও নানা অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে জড়িত আকারে স্থান পেয়েছে। (বাংলাব নাথ সাহিত্য : বিশ্বভাবতী প্রকাশিত সাহিত্য প্রকাশিকা প্রথম খণ্ড)।<sup>১৮</sup>

সুতরাং আলাউদ্দীন হোসেন শাহ যে সত্যপীর পূজার প্রচলন করেছিলেন একমুখ্য ধারণার কোন ছেঁড় নেই।<sup>১৯</sup>

বজনীকান্ত চক্ৰবৰ্তী তাঁৰ 'গোঁড়ের ইতিহাস'-গ্ৰন্থে লিখেছেন যে, বাজা গণেশ বাংলাদেশে সত্যপীৰের শিৱলি প্ৰথা প্ৰবৰ্তন করেন।—বলং বাহুল্য, এ উক্তিৰ পিছনেও কোন প্ৰমাণ নাই। ১৭

মূলতঃ 'সত্য' শব্দ এখানে আৱৰ্ণী 'হক'-এৰ প্ৰতিশব্দ। সুফী গুৰুবাঈশ্বৰকে এই নামে নিৰ্দেশ কৰতেন। সপ্তদশ শতাব্দীৰ শেষ দুই দশক হতে পীৰ ও নাৰায়ণৰ একত্ব মূৰ্তি পশ্চিম ও উত্তৰবঙ্গে নতুন দেবতা। সত্যনাৰায়ণ অথবা সত্যপীৰৰূপে আবিৰূপিত হন। ১৮

কৃষ্ণহৰি দাসেৰ গ্ৰন্থে (বড় সত্যপীৰ ও সন্ধ্যাবতী কন্যাৰ পুথি) সত্যপীৰ ঐতিহাসিক ব্যক্তিকৰূপে উপস্থাপিত। মালঞ্চাৰ ৰাজ্য বৰেন্দ্ৰ ব্ৰাহ্মণ ময়দানবেৰ অবিবাহিত। কন্যা সন্ধ্যাবতীৰ গুৰুত সত্যপীৰেৰ জন্ম। শঙ্কৰ আচাৰ্য্যেৰ পাঁচালীতে সত্যপীৰেৰ ইতিহাস অনেকটা এই ৰকম—সেখানে তিনি আলা বাদশাহেৰ কানীন দৌহিত্ৰ। ১৯

কৃষ্ণহৰি দাসেৰ কাব্যে একস্থানে সত্যপীৰ আত্ম-পৰিচয় দিতে গিয়ে যে কথা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—

হিন্দুৰ দেবতা আমি মুসলমানেৰ পীৰ।

যে যাহা কামনা কৰে তাহাৰে হাসিল ॥

বামেশ্বৰ ভট্টাচাৰ্য্যেৰ সত্যপীৰেৰ কথাত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৩৬ পৃষ্ঠা ১৯) সম্পাদনা কৰে নগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত মন্তব্য কৰেছেন,—ব্ৰাহ্মণ সন্তান বামেশ্বৰ, মুসলমান ফকিৰেৰ আকৃতিতে বিষ্ণুমূৰ্তি দেখতে পেলেন। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীৰ উদাৰ ধৰ্ম-মন্তেৰ প্ৰতিফলন। এই উদাৰ ধৰ্ম-মন্ত আপনা আপনি আসে নি। তুৰ্ক আক্ৰমণে যখন উচ্চবৰ্গ ক্ষয়ভাৰ্য্য হ'য়ে এসে গেল নিম্নবৰ্গেৰ কাছাকাছি, তখন উপৰ ভলাৰ হিন্দুদেব মध्ये ক্ৰমে নিচেৰ ভলাৰ মানুহদেব দেবতা এবং তাদেৰ মাহাত্ম্যকেও স্বীকাৰ কৰে নেবাৰ প্ৰয়োজন হল। ২০

তুৰ্কগণ শাসন ক্ষমতাৰ আসাৰ জন্ম হাওৰাৰ পৰিবৰ্তন হল,—দেখা গেল আপোষেৰ প্ৰসন্ন। ডঃ সুকুমাৰ সেন লিখেছেন, সপ্তদশ শতাব্দেৰ কোন কোন ধৰ্মমজল কবি ধৰ্মঠাকুৰকে পীৰেৰ বেশে দেখেছিলেন। ৰূপবাম

চক্রবর্তী নিজেকে পুনঃ পুনঃ কপবাম ফকির বলেছেন। ফকির-বেশী ধর্ম-ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে ধীরে ধীরে সত্যপীবে বা সত্যনাবাষণে মিশে গেছেন।<sup>৪২</sup>

এখানে স্মরণীয় যে, আজিকার বাঙালী কয়েক সহস্র বৎসব পূর্ব হতে বংশ পরম্পরায় বসে আসা নানা বস্তু, নানা মত, নানা সংস্কৃতি, নানা প্রাকৃতিক প্রভাব, নানা ভাষা প্রভৃতির উত্তরাধিকার। নানা সম্প্রদায়, নানা ধর্মমত, নানা বর্ণ, নানা আদর্শ, নানা সংস্কৃতি নিয়ে একনাত্র বাংলা ভাষার মৌচাকে আবদ্ধ আগম। একটি মাত্র উজ্জ্বল বিশেষ্যে বিভূষিত, সে বিশেষ্য হল বাঙালী।<sup>৪৩</sup> কিন্তু প্রাক্ চৈতন্য যুগের ও চৈতন্য যুগের বাংলা সাহিত্যের মূল প্রেবণা ছিল হিন্দু সমাজের ও হিন্দু সংস্কৃতির আত্মরক্ষার প্রেবণা, প্রতিরোধের সাহিত্য। তার একটি দিক প্রগতির দিক—যেখানে সে লোক-জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত; কিন্তু আর একটি দিক প্রতিক্রিয়ার—যেখানে সে বক্ষণশীল, বিশেষ করে মুসলমান জীবন ও বিষয়ের প্রতি উদাসীন।<sup>৪৪</sup>

কালক্রমে এমন অবস্থাও এল যখন হিন্দুরা ষোড়শ শতাব্দীতে “আজ্ঞাপনিষৎ” রচনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নি। সম্রাট আকবরকে তো তাঁর অবতাবেব আসনে তুলে দিয়েছিলেন।<sup>৪৫</sup>

যাহোক সত্যপীবের কপবর্ণনার মুনশী ওয়াজেদ আলী সাহেবের কাব্যে সেই মিশ্রকপ পাওয়া যায়, —

হেন কালে সত্যপীব সুন্দবে লইয়া,  
সন্ন্যাসী বশ ধবি পৌছিল আসিয়া।  
সর্বান্নে তিলক তার কপালে জোড় ফোটা  
হাতেতে জপনমালা মাথা ভরা জটা। (পৃঃ ১২)

কবি কৃষ্ণচরিত্র দাস তাঁর ‘বড় সত্যপীর ও সন্ন্যাসবতী কন্যার পুথিতে সত্যপীবের বর্ণনায় লিখেছেন,—

অকুমারী সন্ন্যাসবতী                      তার গর্ভে উৎপত্তি  
মালঞ্চ কবিল ছাবখাব।  
হাতে আশা মাথে জটা                      কপালে বহতি ফোটা।

বাম কৰে শোভে অভি বাহাব ॥

সুবৰ্ণেৰ পৈত। কান্দে কোমবে জিঞ্জিৰ বাস্বে

অঙ্গে শোভে গেকৰা বসন।

বেডাৰ সন্মাসী বেষে ফিৰে অশ্ব দেশে দেশে

নানা মূৰ্তি কৰিষা ধাবণ ॥

এই কাব্যে সূচীপত্ৰাদিৰ শেষাংশে সত্য পীৰেৰ যে চিত্ৰ প্ৰদত্ত হইছে (জল বঙ্) তাতে দেখা যায় তাঁৰ মাথাৰ জটা, মুখে শ্মশ্ৰু-শ্মশ্ৰু, গলায় মালা, বাহুতে মাহুলি-সদৃশ বাজু, দুই হাতে বালা, বাম হাতে কোটা-সদৃশ কমণ্ডলু, ডান হাতে বাঁকা লাঠি বা আশা বাডী। গায়ে হাতকাটা ফকিৰি জামা,—পৰণে হাঁটু পৰ্য্যন্ত ভোলা কাপড়—আঁঠো কৰে পৰা, ডান কাঁধে খোলা ও পাৰে খডম। তাঁৰ পৰিপূৰ্ণ দোহাবা চোহাবা। তাঁৰ কল্পিত বহু শ্ৰামবৰ্ণ।

বস্তুতঃ সত্যপীৰ বা সত্যনাৰায়ণেৰ কোন মূৰ্ত্তি স্থাপনা কৰে পূজা কৰা হয় ন। এমন কি সত্যপীৰেৰ নামে নিৰ্দ্ধিষ্ট কোন ‘থান’ বা দৰগাহ একান্তই বিৰল। গ্রামেৰ হিন্দু গৃহস্থগণ সাধাৰণতঃ বাটীৰ উঠানে লেগন কৰা জালগাৰ ‘থান’ নিৰ্দ্ধিষ্ট কৰেন এবং সেখানেই পূজা প্ৰদান কৰেন। শহৰেৰ গৃহস্থগণ শহৰেৰ মध्येই ‘থান’ নিৰ্দ্ধিষ্ট কৰে পূজা দেন। পূজাৰী সত্যপীৰেৰ নামে দুধ, আটা, মিঠ (সাধাৰণতঃ আখৰ গুড়) এবং পাকা কলা একত্ৰে সংমিশ্ৰণ কৰে পীৰেৰ নামে অৰ্পণ কৰেন। পূজা-অন্তে সেই শিৰিনি ইতৰ-অনিতৰ ভক্তজন কৰ্ত্তক গৃহীত হয়। ভক্তবৃন্দেৰ অনেকে ফল, মূল, সন্দেশাদিও প্ৰদান কৰেন। সত্যপীৰেৰ পাঁচালী পাঠ একটা অবশ্য কৰণীয় অনুষ্ঠান। ধূপ-ধূপাৰ দ্বাৰা স্থানটিকে আৰো শুচি-স্নিদ্ধ কৰতে ভক্তগণ ক্ৰটি কৰেন না। সত্যপীৰেৰ নামে স্থায়ী ‘থান’ দেখা না। গেলেও অন্ততঃ দু’একটা স্থায়ী দৰগাহ অপৰ্য্যন্ত পাওৱা গৈছে। চব্বিশ পৰগনাৰ বাবাসত মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বাৱাসত মহকুমাৰীন কালসৰা নামক গ্রামে সেইৰূপ একটা দৰগাহ অবস্থিত। (বেঙ্গল সেটেলেমেণ্ট বেকৰ্ড ১৯২৮-’৩১ খৃষ্টাব্দ)। ৪০ উক্ত সত্য-পীৰেৰ দৰগাহটি আনুমানিক তিন বিঘা জমিৰ উপৰ অবস্থিত। সেই দৰগাহেৰ সেৱালৈতগণ যথাক্ৰমে বাসাৰং শাহজী, এসাৰং শাহজী, বসিৱন্ধিন শাহজী, দাউদ আলী শাহজী, তছিবন্ধীন শাহজী প্ৰমুখ (১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ)।



বাসারং শাহজী বলেন যে বাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাধেব ভবক থেকে 'সত্যপীবেব নামে এখানে প্রায় পনেরো ষোল বিঘা জমি পীরোত্তর প্রদত্ত হয়েছিল। বজ্রবজ্র থানার অন্তর্গত বাওলালী গ্রামেও সত্যপীবেব স্থান আছে। এতদ দৃষ্টে মনে হয় ঐতিহাসিক পীবেব সত্যপীরেব নামে আরো দবগাহ স্থান কোন কোন অঞ্চলে থাকি অসম্ভব নয়।

সত্যপীরেব দবগাহে বোগমুক্তি কামনার এবং সাধারণ মঙ্গলের আশায় হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ শিরনি ও মানত দেন। কালসবা গ্রামের সত্যপীবেব দবগাহে ভক্তগণ প্রত্যহ ধূপ-বাতি দেন। এখানে ফুল, ফল, বাতাসাও প্রদত্ত হয় এবং লুট দিবাব রীতিও প্রচলিত। প্রতি বছর ১৬ই ফাল্গুন তারিখে এখানে এক বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি শুক্লপক্ষেব একাদশী তিথিতে উৎসব অনুষ্ঠান উদযাপনান্তে সেবাবেতগণ সামর্থ্যানুযায়ী অতিথি সংকার কবে থাকেন। বাৎসবিক বিশেষ অনুষ্ঠানের দিনে এখানে মেলা বসে। তাতে প্রায় দুই তিন শত লোকের জমায়েত হয়। পূর্বে এই সময়ে এখানে কাওয়ালি গান গাওয়া হত।

বাজালা ভাষা ও সাহিত্যেব ইতিহাসে সত্যপীর বা সত্যনাবাষণকে নিয়ে রচিত এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক পাঁচালী কাব্যেব কথা জানা গেছে। এই কাব্যকথা মেঘেদেব ব্রতকথাত্তেও সভক্তিতে স্থান পেয়েছে। মনে হয় আরো বহু কাব্য আজো পর্যন্ত আছে অনাবিষ্কৃত। সে কাব্য বাজালা সাহিত্যেব ইতিহাসে স্থান পেলে শুধু সত্যপীর কাব্যের আলোচনাই একটা বিরাট অংশ অধিকার কবে নেবে। মনে হয় কেবল মাত্র সত্যপীর কাব্যগুলি একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাব অপেক্ষা বাখে। বলা বাহুল্য সত্যপীরেব মাহাত্ম্য কথা প্রতি কাব্যে একই কাহিনী-ভিত্তিক নয়।

সমগ্র পীর মাহাত্ম্য-সাহিত্যে সত্যপীরেব পাঁচালীই সংখ্যায়, কাহিনী বৈচিত্র্যে ও কাব্যগুণে প্রধান। সত্যপীর হিন্দু-মুসলিম নব-নাবীব উপব প্রভাব বিস্তার কবেছে। আজ হিন্দুবাই প্রধান ভক্ত।

সত্যপীর পাঁচালীর সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট-কাহিনী পশ্চিমবঙ্গ উদ্ভূত হয়ে অগ্রজ বিস্তৃত হয়েছে। এমন কি অর্বাচীন সংস্কৃত পুর্বানেও প্রবিষ্ট হয়েছে। স্কন্দপুরানের বেবাক্ষণ্ডে যে কাহিনী আছে তাতে ক্ষকিবেব স্থান নিয়েছে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ৪১

সমগ্ৰ সত্যপীৰ পাঁচালী কাব্যেৰ বিবৰণ প্ৰদান কৰতে গৈছে কলেবৰ অসম্ভব বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা। তাই মাত্ৰ কয়েক ৰানি কাব্যেৰ সীমাবদ্ধ আলোচনা কৰা হ'ল।

### ১। সত্যপীৰেৰ পাঁচালী

সত্যপীৰেৰ পাঁচালীৰ জনৈক ৰচয়িতা ফৈজুল্লা। তাৰ কাব্যেৰ কাহিনী ৰামেশ্বৰ ভট্টাৰ্য্যেৰ প্ৰসিদ্ধ ৰচনাৰ সঙ্গ্ৰে অভিন্ন। কবি ছিলেন দক্ষিণ ৰাঢ়েৰ লোক। অষ্টাদশ শতাব্দীৰ শেষেৰ দিকে ধৰ্ম্ম ও সংস্কৃতিতে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান যো ৰঙাটো এক হলে এসেছিল তাৰ মূল্যবান প্ৰমাণ পাওন্না য'ৰ ফৈজুল্লাৰ নিম্নলিখিত বন্দনায়।<sup>২</sup>

সেলায় কবিৰ আগে পীৰ নিৰাঞ্জন  
মহাম্মদ মন্তফা বন্দো আৰ পঞ্জাতন।  
সেৰ আলি কতেমা বন্দো একিদা কবিষা  
হাচেন পেৰদা হৈল যাহাৰ লাগিষা।  
বহুলেৰ চাৰি ইয়াৰ বন্দো শত শত  
চাৰি দহ ইয়াৰেৰ নাম লব কত।  
এবৰাহিম খলিলেৰ পায়ে কবি নিবেদন  
বেটাৰে কৰবানি দিল দীনেৰ কাৰণ।  
কৰবানি কবিষা দিল এসমাল কবিষা  
সেই হৈতে নিকে বিভা হইল দুনিষা।  
আগ্ৰিলাৰ হাসিল বন্দো পালআন দুইজনে  
এসমাইল গাজি বন্দো গড-মান্দাবনে।  
বন্দিব জেন্মা পীৰ কামাএৱ কনি  
ৰড-খান মুবিদ মিঞা কবিল আপনি।  
পাঁড়ুয়াৰ সাফি-খাৱে কবি নিবেদন  
অবশেষে বন্দিব সত্যপীৰেৰ চৰণ।  
সম্বল জাহানে বন্দিব পীৰ আছে যত  
এক লাখ আশি হাজাৰ পীৰেৰ নাম লব কত।  
সম্বল পীৰিণী বন্দো বিবিগণ যত  
বিবি ফতেমাৰ কদমে বন্দিব শত শত।

হিন্দুর ঠাকুরগণে কবি প্রণিপাত  
 খানাকুলের বন্দিব ঠাকুর গোপীনাথ ।  
 নামেতে বন্দিয়া গাইব ধর্ম নিরাঞ্জন  
 যাব ধবল খাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন ।  
 যমুনার তটে বন্দো বাস বৃন্দাবন  
 কৃষ্ণ-বলরাম বন্দো শ্রীনন্দেব নন্দন ।  
 নবদ্বীপে ঠাকুর বন্দো চৈতন্য গোসাঞি  
 শচীর উদবে জন্ম বৈষ্ণব গোসাঞি ।  
 কামারহাটির পঞ্চাননে করি নিবেদন  
 দশবধের পুত্র বন্দো শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।  
 লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দো গঙ্গাভাগীরথী  
 সীতা ঠাকুরাণী বন্দো আব যত সতী ।  
 দৈবকী রোহিনী বন্দো শচী ঠাকুরাণী  
 যার গর্ভে গোবার্চাদ জন্মিল আপনি ।  
 শুনহ ভকত লোক হএ একচিত  
 সত্যপীব সাহেব সভার কবে হিত ।.... .  
 তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি নাবাষণ  
 শুন গাজি আপনি আসরে দেহ মন ।  
 ভকত না একের তরে মোকেদ হইয়া  
 আসিয়া দেখহ পীব আসবে বসিবা ।  
 ছাড় গাজি মকার স্থান আসবে দেহ মন  
 গাইল ফৈজুল্যা কবি সত্য পদে মন ।

কবি ফৈজুল্লার বাস ছিল পাচনা গ্রামে । ভনিতাব কবি লিখেছেন, —

বলে ফৈজুল্লা কবি পাচনার বসতি  
 কহে ফৈজুল্লা কবি পাচনায থাকিয়া ।

কবি ফৈজুল্লা বা ফৈজুল্লা এবং ফরজুল্লা একই ব্যক্তি কিংবা একাধিক  
 ব্যক্তি ছিলেন কিনা ডঃ সুকুমার সেন সন্দেহ প্রকাশ কবেছেন । “ফরজুল্লা-  
 রচিত ‘গাজী বিজয়’ পাওয়া গেছে, ফরজুল্লা-রচিত ‘গোবন্ধ বিজয়’ও আছে ।  
 তা ছাড়া ‘সত্যপীরের পাঁচালীও’ পাওয়া গেছে । তিনটি বচনা কি একজনের

লেখা এবং তা কি ভবে এক বৃহত্তৰ কাব্যসূত্ৰে গাথা হৱেছিল ?<sup>৪১</sup> কবিৰ বসতি ছিল হাওড়া জেলাৰ পাচনা ( পাচলা ? ) গ্ৰামে ।<sup>৪২</sup>

সত্যপীৰেৰ পাঁচালী বচনিতাৰ নাম হুই বা ততোঃকিক বানানেও পাওৱা যায়। যথা,—কৈজুল্লা, বয়জুল্লা, ফউজুল্লা, ফউজুল বা ফউজুল ইত্যাদি। মূল বানান হাই খাবুক,—মানে হয় লিঙ্গিকবগণেৰ মাধ্যমে বানান-ভেদ হৱেছে।

তাহাতা নিয়লিখিত ভনিতা থেকেও এক্ৰপ অনুমান বাতাবিক,—

গোখ' বিজ্ঞা আদে মূনি সিদ্ধা কত...

এবে কহি সত্যপীৰ অপূৰ্ব কখন...

গাজী বিজ্ঞা সেহ শোক হইল বাজি।

শেখ ফয়জুল্লা ডনে ভাবি দেখ মন।

এবং

সতিৰ কউসে কবি ফউজুল গাৰ।

হৱি হবি বল সবে দিন বএ জাৱ ॥

ঈশ্বৰক কুমাৰ কৱাল মহাশয় ফউজুল বা ফউজুলৰ ৰে সত্যপীৰেৰ পাঁচালীখানি আলোচনাৰ জন্ম আমাকে দেখতে দিৱেছিলেন তাতে ভনিতাৰ কবিৰ বাসস্থানেৰ উল্লেখ নজৱে পড়ে না। ফউজুল কোথাও বা ফউজুল্য এই বানান এই পাঁচালীৰ মধ্যে ভনিতাৰ দৃষ্ট হয়। এই পুঁথিতে ব্যবহৃত 'জ' 'লু' ৰূপেও দৃষ্টিগোচৰ হয়। সেই হিসাবে ফউজুল হতেও পাবে।

এই পুঁথিৰ পাঠ উদ্ধাৰ কৰা খুব সহজসাধ্য নহ, বিশেষ কয়েকটি স্থানেৰ কয়েকটি শব্দ খুবই দুৰ্বোধ্য। এই পুঁথিটিৰ প্ৰথম থেকে কয়েক পৃষ্ঠা পোকাৰ কেটে দেওৱাৰ পঠোদ্ধাৰ সম্ভৱ নহ। ১০"×৬½" মাপেৰ এই পুঁথিটিৰ পৃষ্ঠাগুলি অসৃণ সাদা কাগজেৰ। কালো মোটা কালিতে লেখা। শব্দগুলি বামদিক থেকে ডান দিকে এবং পৃষ্ঠাগুলি ডানদিক থেকে বাম দিকে সাজানে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা প্ৰায় সত্ত্বা পঁচিশ।

ফউজুল্য বচিত সত্যপীৰেৰ পাঁচালীৰ ৰে কাহিনী পাওৱা যায় তাৰ চুহক এখানে পৰিবেশিত হল,—

সুবর্ণ নামক সাধু সদাগরের পত্নী রতন মালার এক পুত্র হয়েছে,—নাম তাব কুঞ্জবিহারী। কুঞ্জবিহারী দিনে দিনে বাড়তে লাগল এবং সাবালক হল। কুঞ্জবিহারী ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তার পিতা গেছেন বানিজ্যে। কুঞ্জ বড় হয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করল যে সে যাবে তার পিতার সন্ধানে। তাই মা বতনমালার মনে নানা ভাবনা,—

বাজা হোক আঁব যে-ই হোক, পুত্র যার ঘরে নাই তার জীবন কুখ্য।  
অতএব পুত্র কুঞ্জবিহারী নির্ঝাদে ফিবে আসুক এই কামনা মাতাব। তাই  
তিনি সত্যপীরেব মানত কবেছেন।

কিছু বাহানা করে শেষে সত্যপীর চললেন কুঞ্জবিহারীর সাথে তাব পিতাব উদ্ধাবে খঞ্জন পাখীর কপ ধবে। তিনি চলেছেন কুঞ্জবিহারীর ডিঙ্গাব কবে। কলিঙ্গ থেকে বণ্ডনা হয়ে নানা গ্রাম পাব হয়ে চলেছে সে ডিঙ্গা। নানা বিপদ লঙ্ঘন কবে চলেছে ডিঙ্গা, সত্যপীরেব অলৌকিক ক্ষমতাব জন্তে। অবশেষে ডিঙ্গা এসে পৌঁছুল অমবানগবে।

অমবানগবে এসে নাগবা বাজাতেই বাজাব কৌটাল এল ছুটে। চোব বলে কুঞ্জবিহারীকে সে পাকভাঙ কবল। কুঞ্জবিহারী জানালে যে সে এ দেশেব বাজাব ঘব জামাই হয়ে থাকতে চায়।

কৌটালের কাছে জানা গেল সে দেশেব বাজকস্তাব নাম মালতী, বরস তেবে।

কৌটাল পাঞ্চাশ টাকা ঘুষ নিবে বাজ-কস্তাব সাথে কুঞ্জবিহারীর প্রথম দর্শনের ব্যবস্থা কবে দিল।

সাধু কুঞ্জবিহারীর সাথে মালতীর প্রণয় আদান-প্রদান হল দাসীর মধ্যস্থতায়।

পবদিন সাধু গেল বাজ-দববাবে। দববাবে সাক্ষাত হল বাজাব সাথে। অল্প ও মধুব কথোপকথনের পব বাজা মহাপ্রসূী হলেন কুঞ্জবিহারীর উপব। তাব কপ ও গুণেব পবিচয় পেয়ে বাজা এস্তাব দিলেন কস্তা মালতীর সাথে কুঞ্জবিহারীর বিবাহেব। তবে সপ্ত যে তাকে ঘব জামাই থাকতে হবে। কুঞ্জবিহারী তাতেই বাজী। খঞ্জন পাখীর কপধারী সত্যপীরেব নির্দেশে কুঞ্জবিহারী কর্তৃক অঙ্গীকারপত্র লেখা হল। এ বিবাহে বাণীও সম্মতি

দিলেন। সত্যপীথ এ সব ব্যবস্থা কবে জাহাজে ফিবে এলেন। মূলতীব্র সাজ সজ্জা হল। সাধু কুঞ্জবিহারীও সজ্জিত হয়ে এসে পীথের পরামর্শ মতন বাণীর “বন্দী-শালা” বিবাহের যৌতুক স্বরূপ চাইল। ঐ বন্দী ঘবেই বন্দী ছিল তাঁর পিতা সাধু সদাগর। বাজা অবস্থ্য সহজেই স্বীকৃত হলেন বন্দীঘর দান হিসাবে দিতে। সাধু তখন কোটাল গুলিবাম হাজাবিকে আদেশ দিল সব কয়েদীকে মুক্তি দিতে। কয়েদগণ মুক্ত হয়ে সকলকে আশীর্বাদ করে প্রস্থান কবল, কিন্তু সাধুর পিতার সাক্ষাত পাওয়া গেল না। অনেক অনুসন্ধানের পর সাধু সুবর্ণবিহারীকে পাওয়া গেল এক অন্ধকার কুটারের কোণে। তাঁর অবস্থা তখন শোচনীয়। কারণ তাঁর বাকশক্তি এবং জ্ঞান শক্তি বহিত হয়ে গেছে। তিনি কাউকে চিনতে পাবলেন না।

সাধু, বন্দীঘর থেকে মুক্ত হয়ে ডিঙ্গা কবে ফিবে চলল কলিঙ্গের দিকে। ভোমবার পাড়ায় আসতে পীথের ইচ্ছানুসারে ডিঙ্গা গেল ডুবে। পীথকে অবহেলা কবাব জন্ত এই দুর্ঘটনা ঘটল। কোন প্রকারে বন্ধা পেয়ে সাধু সদাগর অর্থাৎ কুঞ্জবিহারীর পিতা ঘবে ফিবে এলে বতনমালা তাঁকে অনেক সেবা শুশ্রূষা কবল।

কিন্তু তাঁর সাথে পুত্র ফিবে না আসায় বতনমালা কাঁদতে লাগলো। পুত্রের কথা শুনে সদাগর তো হতবাক। তিনি খুব খুশী হলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে পিতার সন্ধান সে ডিঙ্গার কবে দক্ষিণে গেছে তখন পিতা ভীত হয়ে বললেন—

দক্ষিণের কথা মোব কহিতে প্রাণ কাটে ।  
পক্ষীতে তরুণী নেব হান্নবে মানুষ কাটে ॥  
অবলা হাওয়ালে তুমি দিলে পাঠাইয়ে ।  
কোনখানে মাছে তাবে ফেলিল গিলিএ ॥

পবক্ষণে তিনি পত্নী বতনমালাকে সান্ধা দিখে বললেন,—

আমি যে থাকিলে কত পুত্র পাবে তুমি ।  
বতনমালা বলে সাধু তোব মুখে হাই  
পুত্রের বিহনে আমি দেশান্তরে যাই ।

গয়া গঙ্গা—উড়িঙ্গা পীর হযে বভনমাল। যেতে যেতে প্রথমে সত্য পীরেব  
সাক্ষাত পেলেন। পীর কিছু পূর্ব-ঘটনা বললেন এবং পুত্র ও পুত্রবধূকে এনে  
দিতে প্রতিশ্রুত হলেন।

পীর অমবানগবে গিয়ে কুঞ্জবিহারীকে তাব মাষেব অবস্থা কথ্য  
জানালেন। কুঞ্জবিহারী মায়েব জন্ত ব্যগ্র হয়ে পড়ল। মালতী তো বাপেব  
বাড়ী ছেড়ে আসতে চায় না। বিশেষতঃ ঘব জামাই থাকার মত খত তো  
লেখাই আছে। তখন সাধুপুত্র নিজ বাজ্যের প্রশংসা কবে বলল ;—

বিভা কবেছি আমি সাত বাজার ঝি ॥

পালঙ্ক ছাড়িবে তাব। ভূমে না দেব পা ॥

মালতী বলেন তবে আমি সঙ্গে যাব

সেবার সতীন সব বশ করে থোব ॥

মালতী তাব মাতাকে বলল,—

ছাড়ি মাগো স্বামীব তবে, কে আছে বাপেব ঘবে

কহ দেখি কবি নিবেদন।

এই প্রসঙ্গে শিব-উমা, বাম-সীতা প্রমুখের কথা হল।

মালতী আরও বলল,—

ছাড়ি এ সোষামিব কে থাকে বাপেব ঘবে

সে কেমন কুলবতীগণে ॥

সব তীর্থ থাকিতে নাবীর তীর্থ গতি।

পতিগৃহে যাবার জন্ত মালতী প্রস্তুত হল। অবশেষে বাণী অনেক  
মনোবেদনাব মধ্য দিখে কথা মালতীকে বিদায় দিলেন।

সত্যপীর এবাব কুঞ্জবিহারীকে দেশে ফেবার জন্ত বললেন। সাধু  
বলে,—

ঘব-জামাতা রুব বলে লিখে দি খত,

সত্যপীর বলে যাও অমবাব তটে।

আপনি আসিবে বাজা তোমার নিকটে।

সত্যপীরেব সহায়তায সকলে বাজাব কাছে বিদায় নিল ।

সত্যপীর এবার সুবর্ণ সাধু সদাগবেব ডুবে যাওয়া ডিঙ্গাও উদ্ধার কবলেন । সব ডিঙ্গা একসঙ্গে ফিবে এল কলিঙ্গে, বতনমালাব পুত্র কুঞ্জ বিহারীও ফিবে এল বধু মালতীকে নিষে ।

সাধু বলে জননী গো ঘবে যাও তুমি ।

সত্য পীরেব নামে আগে সিন্ধি দেই আমি ॥

কলিঙ্গে নগর যেন হইল সুবপুৰি ।

প্রতিদিন পুজে পীর কুঞ্জবিহারী ॥

ফয়জুল্লাব সত্যপীরেব পাঁচালীর ( কুঞ্জবিহারীর পালা ) কাহিনী বল্পভেব সত্যপীরেব পাঁচালীর ( মদন সুন্দবেব পালা ) কাহিনীকে স্মরণ কৰিষে দেব । উভয় কাহিনীৰ মূলগত ভাব এক থাকলেও কাহিনী হিসাবে তাদের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে ।

ফয়জুল্লাব কবিত্ব শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না । এমন কতকগুলি স্থান আছে যেখানকার বর্ণনার সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কৰে । একটা উদাহরণ দিচ্ছি । সাধু কুঞ্জবিহারী ও বাজকণ্ঠা মালতীর প্রথম সাক্ষাতকাবেব বর্ণনা ,—

খোপায় উড়িছে কণ্ঠেব রূপ মহজাৰ ( ? )

রূপ দেখিলে গাছ পাষাণ মিলায় ॥

ঘাটে দাঁড়াইল কণ্ঠা চাহে চাবিদিক ।

রূপ দেখি এ রূপ কৰে বিকমিক ॥

অথবা

শ্রুতবালবে যাওয়াব জন্ত প্রস্তুত মালতী যেভাবে মায়ের কাছে, কথোপকথনে লিপ্ত ভাব বর্ণনার সতীৰ পতিগৃহে স্বাবাব মুহূর্তকে স্মরণ কৰিষে দেব । কবি লিখেছেন,—

কোলেতে মালতী,

বাবুল হইল সতী

কান্দে বাণী বাম পানে চেখে ।

অতি দূর দেশান্তবে

পাঠাব পবেব ঘবে

কেমনে ধবিএ রব এ হিলে ॥



অনেক বিলাপ কবি

মালতীর গলা ধবি

কান্দিয়া আপনি বলে বানী ।

বিধাতা দাক্ষণ বড়

পালিয়া কবিনু বড়

বিধি মোবে দুঃখ দিল আনি ॥—ইত্যাদি

## ২। লালমোনের কেছা

কবি আরিফ বচিত সত্যনাবাষণ পাঁচালীর বা লালমোনের কথা, ফকির  
রামের ফাঁসিলাভার পালাও তা-ই । ৪১

আরিফের নিবাস ছিল দেশভাব নিকট ভাঙ্গপুর গ্রামে । তিনি দক্ষিণ  
বাটের লোক । কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপ :—

কেববি শহরের উজীর সৈয়দ জামালের কন্যা লালমোন । একদিন বাদশা  
হোসেন তাকে দেখে আকৃষ্ট হলেন । পত্র মাধ্যমে উভয়ের আলাপ এবং  
সাক্ষাত হল । পবম্পব প্রেমে নিমজ্জিত হওয়ার পর হোসেন তাকে বিয়ে  
করতে চাইলেন । সত্যপীরকে সাক্ষী করে সে বিয়ে সম্পন্ন হল । লালমোন  
তো খুব খুসী ।

গাজী সত্যনাবাষণ এলেন লালমোনকে আশীর্বাদ করতে । বাদশা  
তাড়িয়ে দিলেন ফকিরকে । ফকির অভিযোগ দিলেন,—পথে লালমোনকে  
সে হাবাবে ।

ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার বাদশা তখনই লালমোনকে নিয়ে ভিন্ন দেশে  
পালিয়ে গেলেন । লালমোন পুরুষের সাজ নিল ।

জুলুমাত শহরের দশ ক্রোশ তফাতে থেকে যেতে যেতে তাঁবা ভুলে  
ফাঁসিলাভার বাতীর দরজার এসে হাজির ।

ফাঁসিলাভা শিকাবে গিয়েছিল । বাতীর দরজার বসে আছে এক বুড়ী । তাঁবা  
বুড়ীর অতিথি হলেন । সেখানে রান্না সেবে নিলেন বটে কিন্তু খাবার আগে  
বুড়ীর হাব-ভাবে ভয় পেয়ে তাঁবা পালাতে চেষ্টা করলেন । বুড়ীর হাঁকে  
শিকারীরা এসে পড়ায় বেগতিক দেখে বাদশাকে লালমোন বল্ল,—

ঘোড়া হেঁকে প্রাণনাথ ভেগে যাহ তুমি

ফোসজার সাথেদে লদাই দিব আমি ।

বাদশা বল্লেন,—তা হয় না। তখন উভয়ে লড়াইতে অগ্রসর হল। লালমোনের হুঙ্কারে কাঁসিবাড়ার হাটে গেল। যে অগ্রসর হয় সেই পড়ে কাটা। অবশেষে এক অল্পবয়সী ছোকবাকে দেখে বাদশার মাথা হল। লালের মানা না শুনে বাদশা তাকে সঙ্গে নিলেন এবং তিনদিন বনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এক গাছ তলায় বোকাম কবলেন।

একদিন লালমোন স্নানে গেলে সেই ছোকবা সেখানে ঘুমন্ত বাদশার শিব তলোয়ারের আঘাতে হিন্ন কবল। বাদশার কাটা মুখ লালমোনের নাম ধরে ডাকতে লাগল। ছোকবা তখন বাদশার পোশাক পরে লালমোনের কাছে গিয়ে বল্লেন,—তোমার পতি আমার হাতে নিহত, তুমি আমার ঘবে চল।

স্বামীর মৃতদেহ কোলে নিয়ে লালমোন বিলাপ করতে লাগল।

চারদিন পর সত্যপীর এসেন লালমোনের কাছে এবং পূর্ব ঘটনা জেনে বল্লেন,—

“এবেছে তোমার পতি সত্যপীরের হাটে।”

লালমোন তখন সত্যপীরের শিবনি মানলেন। পীর এবার এলাহি ভেবে বাদশার কাটা মুখ জোড়া লাগিয়ে দিলেন।

আবার দুজনে পথে চলতে লাগলেন। লালমোন কিন্তু পীরের শিবনি দিতে ভুলে গেলেন।

তাঁরা এলেন মৃগাল শহরে। এক পুকুরের ধারে তাঁরা বিশ্রাম নেবেন। একহানে তাঁরা আস্তানা কবলেন। কিছু পর বাদশা চললেন বাজার কবতে। পথে পাকল মালিনী বাদশার কপে মুগ্ধ হল, বাদশাও হলেন মুগ্ধ পাকলের কপে। যোগ বিদ্যায় বাদশা শেষে হলেন বেড়া। বেড়া হবে তিনি চললেন পাকলের সঙ্গে। ব্যস্তে তিনি মানুষ হন, দিনে হন বেড়া।

এদিকে মৃগাল শহরের বাজার ঘোড়া চুরি মাওষায় বাজার কোটাল সেই ঘোড়া খুঁজতে খুঁজতে পুকুর ধারে এসে পুষ্করবেশী লালমোন এবং বাদশার ঘোড়াকে নিয়ে বাজার কাছে গেল। বাজা বল্লেন,—“এই বেটাবে লম্বা কাট দক্ষিণ মশান।”

লালমোন বল্লেন,—বাজা তুমি আগে বিচার কর।

রাজা তাকে বন্দীশালায় পাঠালেন। ছ'মাস পৰ পীরের দশা হল। তিনি শহরকে উৎপাত করলেন এবং জঙ্গল থেকে এক গণ্ডার পাঠালেন। গণ্ডার এসে উৎপাত আবিস্ত করল। সকলে গণ্ডাবের কাছে হার মানল।

বাজা জানালেন, যে গণ্ডার মারবে, সে বাদশাজাদীকে বিয়ে কবতে পাবে। লালমোন কোটালকে ঘুষ দিয়ে ছাড় পেল এবং গণ্ডারকে হত্যা করে বাদশাজাদী মহাতাবকে বিবাহ করল।

মহাতাব পবে লালমোনকে কাঁদতে দেখে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করল। লালমোন বলল—পবে বলব।

পবে নাটগীতের আসব বসানো হল। উদ্দেশ্য সেখানে বাদশা হোসেন যদি আসে।

মালিনী এল নাটগীতের আসরে। বাদশা হোসেন তার সাথে ছিল, কিন্তু তাঁকে চেনা গেল না। ফিরে যাবার আগে গোপনে বাদশা তাঁর দুঃখেব কথা মসজিদেব গায়ে লিখে গেলেন। পবদিন তা দেখে লালমোন, কোটালকে দিয়ে শহরের সব মেডাকে আনাগো। সে মালিনীকে বলল,—মেডাকে মানুষ কবে দাও।

মালিনী রাজী না হওয়াব তাকে বেদম প্রহার করা হল। অবশেষে সে সেই মেডাকে মানুষ করে দিল।

স্বামীকে পেয়ে লালমোন নিজের পরিচয় দিল মহতাবেব কাছে। মহতাব তার পিতার কাছে কেঁদে সব কথা জানাগো। রাজা তখন মহতাবেব লালমোনেব অনুমতি নিয়ে বাদশা হোসেনের নিকট অর্পণ করলেন। তিনি বাদশাকে তাঁর পুত্রবৎ সেখানে রাজত্ব কবতে অনুরোধ করলেন। লালমোন এবার সত্যপীরেব মানভ শোধ করল।

ডঃ মুকুমার সেন স্পষ্টই বলেছেন,—এইসব বচনাগুলির বিষয় রূপকথা অথবা অলৌকিক গল্প হতে নেওয়া।

আরিকেব এ কাব্য সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছে। কৃষ্ণহরি দাসের কাব্যে যেমন দেখা যায় বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠাব জন্ত সত্যপীরকে সংগ্রামী ভূমিকায় আসতে হযেছে, এখানে ঠিক তেমনটি দৃষ্ট হয় না। এখানে

লালমোন গ্ৰেমেৰ অগ্নিপৰীক্ষায় উৰ্ত্তীণ হৈছে,—এটাই এ কাব্যেৰ মূল বক্তব্য । সত্যপীৰকে অবজ্ঞা কৰায় বাদশা হোসেনেৰ কিছু দুৰ্ভোগ সহ কৰতে হৈছে বটে কিন্তু স্বার্থ কৃচ্ছসাধন কৰতে হৈছে সাক্ষী লালমোনকে ।

গ্ৰেমের কাৰণে গৃহভ্যাগ এ কাহিনীৰ লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য । মঙ্গল কাব্যেৰ যে সব লক্ষণেৰ সংগে সংযুক্ত কৰে এ কাহিনীকে মঙ্গল কাব্য-ধাৰাৰ আনা যায় তাৰ ব্যাখ্যায় বলতে হয় যে, সত্যপীৰেৰ মঙ্গল দৃষ্টিতে হোসেন-লালমোনেৰ পুনর্মিলন সম্ভব হৈছে । এই কাব্যে বিশেষ কৰে আধুনিক প্ৰেমাৰ্শেৰ অভাসই অধিকতৰ স্পষ্ট ।

কাহিনীটি আপাততঃ মুসলিম চৰিত্ৰ-ভিত্তিক বলে বনে হয় । কিন্তু ঋষিষাভাৰ সভাৰ প্ৰধান গোপাল, জগাই, দামুদৰ এবং মালিনী, পাকল প্ৰমুখৰ চৰিত্ৰ এই কাহিনীতে বৈছে । কবিও হিন্দু এবং মুসলিম উভয় আদৰ্শ ভাবাপন্ন ছিলেন তা বোঝা যায়, তাঁৰ পুঁথিৰ আৰম্ভে এবং শেষে লিখিত “শ্ৰীদুৰ্গা” উল্লেখ থেকে ।

এই কাব্যেৰ লিপিকাল ১২৫৩ সাল, ইংৰাজী ১৮৪৫/৪৬ সাল ।

### ৩ । সত্যপীৰেৰ পাঁচালী

বল্লভেৰ কাব্যেৰ লিপিকাল ১২২৯ সাল । এব কাহিনী ৰূপকথা স্থানীয় । কাহিনী অভিনব বটে । ভনিতাৰ কবি কোন স্থলে শ্ৰীবল্লভও লিখেছেন ।

সদানন্দ ও বিনোদ দুই ভাই । তাৰা সদাগর । ৰাজা তাদেবকে আদেশ দিলেন বাণিজ্যে য়েতে । অগত্যা তাৰা সহবে চলেছে । সমুদ্রে তাৰা দেখল এক অপূৰ্ব দৃশ্য ।

পাখবেৰ গোব এক ভাসবে দৰিষায় ।  
নৃত্য কৰে নৰ্ত্তকী কিলবে গীত গায়  
দৰিষাব বিচেতে অপূৰ্ব শোভা পায় ।  
সুগছাল পানিৰ উপবে ডাল্যা দিযা  
চাৰি ফকিৰ নিমাজ কৰে পশ্চিম মুখ হুয়া ।

সদাগৰগণ সেখানকাৰ ৰাজাকে এ দৃশ্য দেখাতে পাৱল না বলে কাৰাকহ হ'ল । গৃহে তাদেব পত্নীৰা এক ফকিৰেৰ পাল্লায় পড়ে সিদ্ধাই শিখে ডাকিনী হৈছে গাছে চড়ে দেশে দেশে ঘূৰছে ।

ছোট ভাই মদন একবার তাদের সঙ্গে গিয়ে এক বাজকন্যাকে বিবাহ করে পালিয়ে এল। অনেক বিভ্রম্নার পর তাদের মিলন হল।

ডাকিনীদ্বয় বুঝতে পারল যে মদন তাদের কাণ্ডকারখানা বুঝতে পেরেছে। তারা মন্ত্র পড়ে মদনকে শ্বেনপক্ষী করে দিল। খোদা বাজ পাখী হয়ে তাকে তাড়িয়ে পাটনে নিয়ে গেলেন। সেখানেই তার দুই ভাইও বন্দী ঘরে ছিল।

খোদা বাজাকে স্বপ্নে ভব দেখালেন। বাজ ভব পেয়ে সদাগর দু'ভাইকে মুক্তি দিলেন। তারা গৃহে ফিরে এল। সংগে নিয়ে এল সেই শ্বেন পাখী। কাবণ মদন তাদেরকে বাণিজ্য শেষে ফিরবার পথে একটা শ্বেন পাখী আনতে বলেছিল।

দেশে ফিরে তারা ভাই মদনকে না দেখে শোক করতে লাগল।

খোদা ফকিরের কপ ধবে মদনের পত্নীকে সত্যনাবাধণের পূজা দিতে বললেন। মদনের পত্নী তা কবল এবং পিঞ্জরের শ্বেন পাখীকেও সেই শিবনি কিছু দিল। সেই শিবনি ঘেবেই মদন ফিরে পেল মনুষ্যকপ।

### ৪। সত্যপীরের পাঁচালী

কবি ভাবতচন্দ্র বাঘ গুণাকর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের শেষ কবি (১৭১২—১৭৬০)। সেই হিসাবে তাঁর রচিত “সত্যনাবাধণের ব্রতকথা” সত্যপীর পাঁচালী কাব্যসমূহের মধ্যে অবশ্য উল্লেখযোগ্য।

“সত্যনাবাধণের ব্রতকথা” দু'খানি। এক খানি ত্রিপদী ছন্দে এবং অপবখানি চৌপদী ছন্দে রচিত এইটাই। কবির প্রথম কাব্য-রচনা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন—“নবোক্তনাথ বাঘ মহাশয় জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি ‘ভুবসুট’ পবগনার মধ্যস্থিত ‘পেঁডো’ নামক স্থানে বাস করিতেন। তিনি অতি সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ভূম্যমিকারী ছিলেন, সর্বসাধারণ তাঁহারদিগে সন্মানপূর্বক বাজা বলিষা সন্মান করিতেন। ইনি ভবদ্বাজ গোত্রের মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন, বিষয়-বিভবের প্রাধান্য জ্ঞাত ‘বাঘ’ এবং ‘বাজা’ উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইহার বাটীর চতুর্দিকে গড় ছিল, এ কাবণ সেই স্থান ‘পেঁডোর গড়’ নামে আখ্যাত হইয়াছিল”।

‘ভাবতচন্দ্ৰ হলেন নবেল্লনাৰাষণ বাৰেৰ চতুৰ্থ পুত্ৰ।

“জিলা ছগলীৰ অন্তঃপাতি বাঁশবেড়িষাৰ পশ্চিম দেবানন্দপুৰ গ্ৰাম নিবাসী কাষস্থ কুলোস্তব মাণ্ডবৰ বামচন্দ্ৰ মুঙ্গী মহাশৰেৰ ভবনে আগমনপূৰ্বক ভাবতচন্দ্ৰ পাৰম্ভাৰ। অধ্যয়ন কৰতে আৰম্ভ কৰেন। উক্ত মুঙ্গী বানুদেব বাটীতে এক দিবস সত্যনাৰাষণেৰ পূজাৰ শিৰিনি এবং কথা হইবে তাহাব সমুদয় অনুষ্ঠান ও আয়োজন হইবাছে। একখানি পুথিৰ প্ৰযোজন। বানু (কৰ্তাকে) কহিলেন,—আমাৰ নিকটেই পুঁথি আছে, পূজা আৰম্ভ হউক, আমি বাস। হইতে পুঁথি আনিয়া এখনি পাঠ কৰিব।—এই বলিয়া বাসাৰ গিয়া তদুপেই অতি সৰল সাধু ভাবাব উৎকৃষ্ট কবিতাৰ পুঁথি বচিয়া শাস্ত্ৰই সভাস্থ হইব। সকলেৰ নিকট তাহা পাঠ কৰিলেন,—হাঁহাব। সেই কবিতা শ্ৰবণ কৰিলেন, তাহাব। তাহাতেই মোহিত হইয়। সাধু সাধু ও ধন্ত ধন্ত ধ্বনি কৰিতে লাগিলেন।”

গুপ্ত কবিৰ মতে ১১১১ সনে অৰ্থাৎ ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ভাবতচন্দ্ৰেৰ জন্ম। ডঃ দীনেশ সেন তাঁৰ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্ৰন্থেৰ একস্থানে ভাবতচন্দ্ৰেৰ জন্ম ১৭১২ খৃষ্টাব্দ এবং অস্তস্থানে ১৭২২ খৃষ্টাব্দ লিখেছেন। ডঃ সুকুমাৰ সেন লিখেছেন ভাবতচন্দ্ৰেৰ জন্ম বোধহয় ১১১১ সালে।<sup>৪২</sup>

ভাবতচন্দ্ৰ অল্প বয়সে ঘৰ ছেড়ে গলায়ন কৰে দেবানন্দপুৰে আসেন। তাঁৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কীৰ্ত্তি কালিকা-মঙ্গল অৰ্থাৎ বিদ্যাসুন্দৰ উপাখ্যান-ভিত্তিক কাব্য বচন। তাঁৰ অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূৰ্ণামঙ্গল ৰে ডিন ভাগে বিভক্ত কালিকামঙ্গল তাৰ দ্বিতীয় ভাগ। প্ৰথম ভাগ শিবাযন বা দেবীমঙ্গল, তৃতীয় ভাগ মানসিংহ-প্ৰতাপাদিত্য-ভবানন্দ উপাখ্যান অৰ্থাৎ অন্নপূৰ্ণা পূজা প্ৰচাৰ উপলক্ষ্যে কবিৰ পোষ্ট। কৃষ্ণচন্দ্ৰ বায়েৰ প্ৰশস্তি। তিনি ‘নাগাটক’ ‘গঙ্গাটক’ নামে সংস্কৃত কবিতা লিখেছিলেন। বাজা কৃষ্ণচন্দ্ৰেৰ আশ্ৰবে এসে তিনি মৈথিল কবি ভানু দত্তেৰ ‘রসমঞ্জৰী’ নামক গ্ৰন্থেৰ অনুবাদ কৰেন।<sup>৪৩</sup>

কৃষ্ণচন্দ্ৰ মহাবাজ ভাবতচন্দ্ৰকে তাঁৰ বাজসভাৰ মাজ চল্লিশ টাক। বেতনে সভাকবি নিযুক্ত করেছিলেন। এই শুভ যোগাযোগ কৰে দিখেছিলেন ফৰাস ডাক্তাৰ বিখ্যাত দেওহান ইল্লনাৰাষণ চৌধুৰী।

কবির নাগাফিক পড়ে বাজ। কৃষ্ণচন্দ্র সম্ভাষণ লাভ কবেন এবং দয়াপববশ  
হয়ে আনোয়ারপুরের গুস্তিরা গ্রামে একশত পাঁচ বিঘা ও মূল্যমোড়ে বোল  
বিঘা জমি নিষ্কর প্রদান কবেন। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে  
কবি ভারতচন্দ্র বহুমুত্র রোগে মৃত্যুবরণ কবেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য :  
ডঃ দীনেশ সেন)।

ত্রিপদী ছন্দে ভারতচন্দ্র রচিত সত্যনাবায়ণের ব্রতকথাৰ সংক্ষিপ্ত  
কাহিনী :—

দ্বিজ ক্ষত্রিয় বৈষ্ণৱ শূদ্রকে ক্ষুদ্র ও মবনকে বলবান কবতে হবি এক  
ফকিরের শবীর ধারণ কবতঃ অবতাব হয়ে এক বৃক্ষতলে অবস্থান কবতে  
লাগলেন।

তাঁৰ নম্রমান দাড়ি-গোঁপ, গাৰ বাঁধা, শিরে চৌপ, হাতে ‘আসা’ বাঁধে  
ঝোলাঝুলি।

ডেজঃপুঞ্জ যেন ববি, মুখে বাক্য পীর নবি  
নমাঞ্জে দর্গাব চুমে ধুলি ॥

সেই বৃক্ষতলে বসে ভাবছেন যে কিরূপে তিনি নিজেকে জাহিৰ কববেন।  
এমন সময় ঈশ্বরের ইচ্ছাৰ বিষয় নামে এক বিপ্র দ্রুত সেখানে এসে উপস্থিত  
হলেন। হবি দেখলেন যে দ্বিজ বড়ই দীন। তিনি দ্বিজকে বললেন,—তুমি  
সত্যপীৰকে শিবনি দিলে পুলকে প্রসাদ খাও। বিপ্র মনে মনে বললেন,—তিনি  
তো হবি বিনা কাউকে পূজা কবেন নি। আৰ এই দুৰাচাৰ ফকির কি বলে।  
অকস্মাৎ তিনি ফকিরের দিকে তাকিৰে দেখেন ফকিরের স্তলে দাঁড়িৰে  
আছেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। তাঁকে প্রশ্নতি জানিৰে বিপ্র পুনৰায়  
সামনে তাকিয়ে দেখেন—তিনিও অদৃশ্য। ভবে শূন্য থেকে বাণী চল। তদনুযায়ী  
দ্বিজ দিলেন সত্যপীৰের শিবনি এবং অন্তে তিনি গেলেন শ্রীনিবাসধামে।

বিপ্ৰের কাছে ভেদ পেৰে সাতজন কাঠুবিষাও সত্যপীৰের শিবনি দিল।

দ্বঃখ ভিত্তিৰেব ববি সকল বিদ্যাব কবি  
অন্তে পেল অনন্ত শবীর ॥

সদানন্দ বেনে সত্যপীৰের শিবনি মান্লে। তাঁৰ কামনা এক সন্তান। সে  
পেল এক কন্যা চন্দ্রমুখী চঞ্চল-নয়না। তাঁৰ নাম বাখা হল চন্দ্রকলা।

চন্দ্ৰকলা দিনে দিনে বেড়ে হল বিবাহযোগ্য। এক বণিক-পুত্ৰের সঙ্গে চন্দ্ৰকলাৰ বিবাহও হৰে গেল। সদানন্দ ভুলে গেল সত্যপীৰেৰ শিবনি দেবাব কথা। সত্যপীৰ ক্রুদ্ধ হলেন। ফলে ৰাজ্যৰ কোটাল কৰ্তৃক সদাগৰ হল অবকদ্ধ। সাধু-কন্ডা দেখল মহা বিপদ। সে মানল সত্যপীৰেৰ শিবনি। সত্যপীৰ সন্তুষ্ট হলেন। সদাগৰ ফিৰে পেল সাতগুণ ধন। সে ধন নিয়ে সাধু চলল নৌকা বেৰে। পথে দেখা ফকিৰ বেশধাৰী সত্যপীৰেৰ সাথে। সদাগৰ তাঁকে চিনতে না পেৰে ষোগ্য ব্যবহাৰ না কৰাল নৌকাৰ সব ধন হৰে গেল নীৰ। অবশেষে অনেক স্ততিতে সদাগৰ সে ধন পেৰে ফিৰে এল দেশে।

সাধু-কন্ডা সে সংবাদ পেৰে সত্যপীৰেৰ শিৱনি হাতে নিয়ে ছুটে চলল সদাগৰেৰ কছে। ক্রত গমনেৰ ফলে হাতেৰ শিবনি গেল ছড়িয়ে। সত্যপীৰ তাতে ক্রুদ্ধ হলেন। ফলে জামাতাৰ হল মৃত্যু। চন্দ্ৰকলা কাঁদতে বসল। সে জলে ডুবে মৰতে চাইল। এমন সময় হল দৈববাণী। পীৰেৰ নিৰ্দেশে সে ফিৰে পেল শিৱনি। সে তা খেলও। এবাৰ তাৰ মৃত স্বামী হল জীবিভ। সদাগৰ সুখী হল—সত্যপীৰেৰ নামে শিৱনিও কৰল।

কবি গুণাকৰেৰ চৌপদী ছন্দে বচিত সত্যনাৰায়ণেৰ ব্ৰতকথা বা ‘সত্যপীৰেৰ কথা’ৰ কাহিনীও মূলতঃ ত্ৰিপদী ছন্দে বচিত পাঁচালী খানিৰ দ্বাৰ। তবে কিছু আঙ্গিক পাৰ্থক্য দৃষ্ট হয়। এথম কাব্যেৰ আৱন্তে আছে,—

গণেশাদি কপ ধৱ	বন্দ প্ৰভু স্মৰ হব
ধৰ্ম অৰ্থ কাম মোক্ষদাত।	
কলিমুগে অবতাবি	সত্যপীৰ নাম ধৰি
প্ৰণমহ বিধিৰ বিধাতা ॥	

দ্বিতীয় কাব্যে আছে,—

সেলাম হামাব। পাঁডে	ধূপমে তুম্ কাহে খাডে
পেবেসান দেখে বডে	মেবে বাৎ ধবতো।
শিৱনি দেবে পীৰ বা	সডে হামছে মিৰবা
মোকামে জাহিৰ বা দবব্ হস্তে তপতো ॥	

কাব্যেৰ শেষাংশে কবি ভণিতাৰ আত্মপৰিচয় দিষেছেন। চৌপদী ছন্দে



বচিত কাব্যে তাঁর পবিত্রিতি কিছু বেশী পাওয়া যায়। এখানেই তিনি এই কাব্যের বচনাকাল নির্দেশ করেছেন। এ বিষয়ে পবে আলোচনা করা হবে।

ডঃ দীনেশ সেন মহাশয় ভাবতচন্দ্রের কবিতার গুরুত্বকে শ্রদ্ধেয় বলে মনে করেন নি। কাব্য কবি এই কাব্যে জীবনের কোন গুঢ় সমস্যা কি কঠোর পরীক্ষা উদ্ঘাটন করে উন্নত চরিত্রবল দেখান নি।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন—ভাবতচন্দ্র শঙ্ককুশলী কবি। তাঁর কাব্যে শব্দ ও অর্থালংকারের যথেষ্ট ছড়াছড়ি।

বাস্তবিক তৎকালে কবিতায় এমন মিল, এমন বাছাই করা শব্দ সংযোজন এমন অনুপ্রাস সৃষ্টি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। চৌপদী ছন্দে রচিত নিয়ে উজ্জ্বল অংশে কবি যৌবন সম্পর্কে যা বলেছেন তা লক্ষণীয় ;—

যৌবনে প্রভুব কাল	মদন দহন জ্বাল
কোকিল কোকিল। কাল	রাখ পদতলে হে।
যৌবন প্রফুল্ল ফুল	কেবল দুঃখের মূল
খেদে হয় প্রাণাকুল	ধাপ দিই জলে হে ॥

সত্যনারায়ণ পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ। পাঁচালী পাঠের ডাক পড়েছে। তখন বাড়ী থেকে পাঁচালী এনে পাঠ করার কথা। প্রকৃত কবি ব্যতীত যে কোন ব্যক্তির পক্ষে বাড়ীতে গিয়ে তখনই এমন সুললিত ভাষার যথার্থ কাহিনী কবিতার ছন্দে গ্রহণ করা যে এনে পাঠ করা যে কতখানি দুকহ ব্যাপার তা বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাত্রাই অনুধাবন করতে পারেন। উপরি লিখিত পংক্তিগুলির ‘ল’-কারের অনুপ্রাসটি সাধারণ পাঠকের সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ল-কারের কোমল অক্ষর দ্বারা যে যাহ সৃষ্টি করা হয়েছে তা জড়ির পক্ষে অমৃত বটে। অবশ্য এ কথাও সত্য যে তাঁর বর্ণনা বেশ প্রাণহীন। তাঁর কাব্যে কোন স্থানে এমন হৃদয়-ব্যাকুলতা পবিত্র হই নি যা আমাদের নিকট মর্মস্পর্শী হতে পারে।

ভাবতচন্দ্র, সত্যনারায়ণের ব্রতকথা বচনাকাল নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিচার এইরূপ :—

“আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা কতিপয় প্রামাণ্য লোকের প্রমাণ

জ্ঞাত হইলাম, যৎকালে ঐ পুস্তক প্রচাৰিত হয় তৎকালে পুস্তককাৰকেব বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৰ্ষের অধিক হয় নাই। এ জন্ত—কল্প শব্দে একাদশ, এই একাদশ পূৰ্ব্ভাগে স্বতন্ত্ৰ রাখিয়া তৎপরে ‘অক্লান্ত বামাগতি’-ক্রমে চৌ, গুণাব, অর্থ ৩৪ নিৰ্ণয় কৰিয়াছি। একপ না কৰিলে তিনি ২৫ বৎসৰ বয়সের কালে গ্রন্থ বচিয়া ছিলেন, তাহা কোনো মতেই প্রামাণ্য হইতে পারে না।”।

শুণ্ড কবির বিচাৰে এই কাব্যের রচনাকাল ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ।

ডঃ মুকুমাৰ সেন লিখেছেন,—“ . হীৰাবাম ব্ৰায়ের এবং রামচন্দ্র মুসীৰ অনুবোধে ভারতচন্দ্র দুইটি ছোট সত্যনাবায়ণ-পাঁচালী কবিতা লিখেছিলেন। শেষের কবিতাটির রচনাকাল ১১৪৪ সাল (১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) “সনে কল্প চৌগুণা”। কি জানি কেন প্রায় সকলেই ১১৩৪ সাল ধৰিয়াছেন। কিন্তু বাক্সালাৰ ‘চৌ’ শব্দের প্রয়োগ নাই, ইহা সমাসযুক্ত পদের পূৰ্বপদরূপেই পাওবা যায়। তর্কের খাতিৰে ‘চৌ’ শব্দের স্বাধীন অস্তিত্ব মানিয়া লইলেও ১১৪৩ সাল হয়। অন্ধের অর্ধাংশে মাত্র ‘বামাগতি’ হয় কোন যুক্তিতে?”

ডঃ দীনেশ সেনের মতের সঙ্গে ডঃ মুকুমাৰ সেনের মতভেদ নেই। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে ভাবতচন্দ্রের জন্ম তাৰিখ যখন তাঁৰা সকলেই ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ বলে ধরেছেন তখন কবির পঞ্চদশ বছৰ বয়সের কালে সত্যনাবায়ণের স্বতকথা রচিত হলে তা তো হয় ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ। ডঃ দীনেশ সেনের পুস্তকে যেখানে কবির জন্ম তাৰিখ ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দ লিখিত আছে, তাৰ সাথে পঁচিশ বছর যুক্ত হলে এই কাব্যের রচনাকাল হয় ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। অর্থাৎ কবি যখন এই কাব্য রচনা কবেন তখন তাঁৰ বয়স পঁচিশ বা পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে থাকবে। অবশ্য কবির জন্ম সাল ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দ নয়—তা ডঃ দীনেশ সেনের গ্রন্থ দুইটো মূদ্রণ প্রমাদ বলে মনে হয়।

৫। বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্তার পুঁথি

সত্যপীরের পাঁচালী কাব্যের মধ্যে কৃষ্ণহরি দাসের “বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্তার পুঁথি” বৃহত্তম। গ্রন্থের এক স্থানে লেখা আছে, “ছহি বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্তার পুঁথি।”

কৃষ্ণহরি উত্তববজ্জের কবি। ভগিতাৰ তাঁৰ পবিত্ৰ পাওবা যাৰ :—

তাহেব মামুদ গুৰু শমস নন্দন

তাহাব সেবক হৰে কৃষ্ণহৰি গান।

রামদেব দাস পিতা মইপুরে নিবাস  
 আমর সেবক হরনাবায়ণ দাস ।  
 পঞ্চমীৰ পুত্র আমি নাম কৃষ্ণহরি  
 জন্মভূমি ছিল আমার বোনগাও সাখারী । (পৃঃ ১৯২)

অবশ্য তিনি একস্থানে লিখেছেন,—“কৃষ্ণহরি দাস ভণে বাস মেহেবপুর ।”  
 (পৃঃ ৩২) মেহেবপুর কি মইপুরের সংস্কার করা নাম নাকি মইপুর শব্দ,  
 মেহেরপুর শব্দের অপভ্রংশ ! নাকি কবি পরবর্তীকালে মেহেরপুর নামক  
 গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন । এ সংশয় আজো রয়ে গেছে ! তাঁর  
 জন্মভূমি বোনগাও সাখাবিবা গ্রাম ; গুরুব নাম তাহের মামুদ সবকার,  
 পিতাব নাম রামদেব দাস, মাতার নাম পঞ্চমী, বচনিত। তিনি নিজে এবং  
 লেখক তাঁর শিষ্য হরনাবায়ণ দাস । ভণিতায় তিনি বলেছেন,—

হরনাবায়ণ দাসে লেখে রচে কৃষ্ণহরি  
 শিরে যার সত্যপীর কণ্ঠে বাগেশ্বরী ।

কবির জন্ম তারিখ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে । তিনি বাউল-দরবেশ  
 সম্প্রদায়ের শিষ্য ।<sup>৪২</sup> হিন্দু ও মুসলিমের সমন্বয়মূলক ভণিতা বিশেষ  
 লক্ষণীয় :—

হরনাবায়ণ দাসে লিখে বচে কৃষ্ণহরি  
 মুসলমান বলে আল্লা হিন্দুতে বলে হরি । (পৃঃ ১৯৭)

অথবা—

এই পর্য্যন্ত হলান কান্ত বাধাকান্ত স্মরি  
 মুসলমানে বল আল্লা হিন্দুবা বল হবি । (পৃঃ ২১৬)

কৃষ্ণহরি কি কোন প্রেরণায় কাব্য বচনা কবেছিলেন ? কবি নিজে তাঁর  
 ভণিতায় বলেছেন,—

শতেক বন্দেগী মোর সত্যপীরেব পায়  
 তোমাব আদেশে গান কৃষ্ণহরি গায় । (পৃঃ ১৮৬)

এই সুবৃত্ত কাব্যের ভাষা কিন্তু প্রাজ্ঞল ! এইরূপ বৃহদাকার কাব্য  
 কবিকে বহুশ্রমে সমাপ্ত কবতে হয়েছে । কবি তাই লিখেছেন,—

এই পৰ্য্যন্ত পুথিখান সমাপ্ত হইল ।

বহুশ্রমে কৃষ্ণহৰি দাস বিরচিত ।

আবৰী ও ফাবসী শব্দের সাথে কিছু ইংরাজী শব্দও এতে প্রবেশ  
কবেছে। বাংলা ও সংস্কৃতে মিশ্রিত করেকট শ্লোক এবং লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।  
বেশ কিছু বর্ণগুণ্ডি আছে। অনেক স্থলে পদান্তে অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত  
হবেছে।

কাব্যখানি মুদ্রিত। আকৃতি ৯"×৬"। পৃষ্ঠাগুলি সেমেটিক রীতিতে  
(ডান থেকে বামদিকে) সজ্জিত। ছন্দ : পন্নাব—দ্বিপদী এবং ত্রিপদী।  
পংক্তিগুলি গদ্যের আকারে সাজানো। প্রথম পংক্তির শেষে দুই দাঁড়ি এবং  
দ্বিতীয় পংক্তির শেষে তারকা চিহ্নের ছন্দ। মধ্যো মধ্যো 'কমা' ব্যবহৃত  
হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা—২২০। পৌর পাঁচালী কাব্যে চিত্র সংযোজন একান্তই  
বিবল। কিন্তু সর্বমোট ছয়খানি ছবি সন্নিবিষ্ট ববেছে এই পাঁচালীতে। পৌর  
পাঁচালী কাব্যের ইতিহাসে এটি একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। ধূলা, দিসা এবং  
মোকের সংখ্যা সতেরো। তাদের মধ্যে একটি মন্ত্র। সমগ্র কাহিনী  
তিন্নান্তবট শিরোনামাধা বিভক্ত। এতে আছে নিম্নলিখিত দশটি পাল :—

- ১। মালঞ্চার পাল,
- ২। শিশুপাল বাজার পাল,
- ৩। হীৰা মুচির পাল,
- ৪। শশী বেস্তার পাল,
- ৫। জসমন্ত সাধুর পাল,
- ৬। শুদ্ধি সওদাগরের পাল,
- ৭। কানীকান্ত বাজার পাল,
- ৮। ধনঞ্জয় গোবালার পাল,
- ৯। মঙ্গলু বাম্বকরের পাল ও
- ১০। মল্লেন গিদালের পাল।

মালঞ্চার পাল :

মালঞ্চার বাজা মৈদানব। বড়ই পাশগু তিনি। ফকির তাঁর পবন শত্রু।  
তিনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর পূজা করেন, সেবা করেন। ফকিরকে তিনি জিজ্ঞার  
দিবে বেঁধে কাবাগাবে নিষ্কেপ করেন।

আল্লাহ্ তালা দেখলেন পাখণ্ড মৈদানবকে দমন করা দরকার। নবীরা পরামর্শে কলিকালের অবতার কপে সত্যপীকে আল্লাহ্ তালা মর্তে পাঠাতে মনস্থ করলেন। স্থিৰ হল বেহেশ্তের চান্দবিবি জন্ম নেবেন মৈদানব বাজাব পড়ী প্রিলাবতীর গর্ভে।

মথাসময়ে প্রিলাবতী এক কন্যা-সন্তান প্রসব কবলেন। তাঁর নাম রাখা হল সন্ধ্যাবতী।

সন্ধ্যাবতী বয়ঃপ্রাপ্তা হলেন। সখি সমভিঘ্যাহাবে তিনি একদিন দান করতে গেলেন এন্নর নদীতে। সেখানে ভেসে-আসা এক ফুল পেয়ে সন্ধ্যাবতী যেইমার্ত্ত তাঁর স্বামী নিলেন অমনি তাঁর গর্ভসঞ্চার হল। এ সবই হল আল্লাহ্ তালার ইচ্ছার।

বাণী প্রিলাবতী বিভ্রত হয়ে পড়লেন যখন জানুলেন কুমারী সন্ধ্যাবতী হয়েছে গর্ভবতী। দাই-এব সাহায্যে তিনি সন্ধ্যাবতীর গর্ভপাত কবাতে চাহলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। অগত্যা তাঁকে বনবাসে পাঠাতে হল,—সঙ্গে গেল দুই সখী। কোটাল তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন কুলবনে। সেখানে রেখে মালঞ্চার কিবে সে খবর দিল বাজাকে। হাঁটাপথে ফিবতে তাঁর সাতদিন সময় লাগল।

বনমধ্যে সন্ধ্যাবতী ক্ষুৎপিপাসার আকুল হলেন। তাঁর ক্রন্দনে দীননাথের আসন উঠল কেঁপে। নিবজন তখনই কেবেস্তাকে কোটালবেশে পাঠালেন। স্বথা নির্দেশে কেবেস্তা অবিলম্বে সন্ধ্যাবতী ও তাঁর সখীদ্বয়ের আহাবের ব্যবস্থা করে দিলেন।

কুমারী সন্ধ্যাবতীর গর্ভের সন্তানই সত্যপী। গর্ভে থেকেই সত্যপীকে ডেকে পাঠালেন লোকমান হাকিমকে। তাকে বললেন,—এই কুলবনে সুন্দর পুৰী নির্মাণ করে দাও। লোকমান হাকিম তা-ই কবল।

মাঘ মাসের বাত। সন্ধ্যাবতী প্রসব কবলেন। কিন্তু একি! সন্তান কোথায়। এ যে মাত্র একদলা বস্ত্র। সন্ধ্যাবতী অভি দুঃখে সেই বস্ত্রের দলা বেগবতী নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন। এক পাপীষসী কচ্ছবিনী ভক্ষণ করল সে বস্ত্রের দলা। বস্ত্র-দলাকণী সত্যপীরের স্পর্শে পাপ থেকে সেই কচ্ছবিনীর মুক্তি ঘটল। পীরকে বন্দনা কবে সে চলে গেল স্বর্গে।

পাঁচ বছৰেৰে শিশুৰূপে সত্যপীৰ মাতা সন্ধ্যাবতীৰ নিকট স্বপ্নে আপনাৰ পৰিচয় দিয়ে ফকিৰবেশে ফিৰে এলেন। সন্ধ্যাবতী তাঁকে সাদৰে কোলে তুলে নিলেন। সত্যপীৰ এবাৰ মাত্ৰেৰে হুংখ দূৰ কৰতে মনহু কবলেন।

কুলবনে কিছু জনবসতি গড়ে ওঠা দৰকাৰ। ৰাডখণ্ডেৰ কিছু প্ৰজাকে সেখানে আনতে তিনি চেষ্টা কৰলেন,—কিন্তু প্ৰজাগণ আসতে ৰাজী হ'ল না। সত্যপীৰ এবাৰ বোগীস্বৰীৰ শব্দপন্ন হলেন। বোগীস্বৰীৰ সহায়তায় কুঠ—মডকেৰ পৰোক্ষচাপে চান্দ খাঁ প্ৰমুখ প্ৰজা ৰাডখণ্ড থেকে কুলবনে এল। ৰাডখণ্ডেৰ ৰাজা বসন্ত এ সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ হলেন। প্ৰজাগণকে ফিৰিয়ে আনতে সৈন্ত পাঠালেন। কিন্তু সৈন্তগণ ‘সোটাৰ’ (লাঠি—সোটা) ৰাডি থেবে পলায়ন কৰল। ৰাজা নিজে এলেন বুদ্ধে। সেখানে সত্যপীৰেৰে শৰীৰ হ'ল ঘেন্ৰ প্ৰকাণ্ড পাথৰ।

বন্দুকেৰ গুলি যেন তাৰা হেল ছুটে।

অন্ধে লাগি গুলী সব পক্ষী ডিহু ফুটে।

সত্যপীৰ “চতুৰ্ভুজ মূৰ্তি তবে কৰিল ধারণ।

শঙ্খ-চক্ৰ-গদা-পদ্ম নিল চাবি হাতে,

আসিবা হইল খাড়া ৰাজ্যৰ সাক্ষাতে।

ৰাজা এবাৰ গলবন্ধে সত্যপীৰেৰে স্তব কবলেন এবং নিজ দেশে প্ৰত্যাবৰ্তন কবলেন।

মাতা সন্ধ্যাবতীৰ নিকট তাঁৰ প্ৰথম জীৱনেৰে আবে। হুংখকথা সত্যপীৰ শুনে নিলেন। পাৰ্শ্ব ৰাজা মৈদানবেৰ উপৰ তাঁৰ প্ৰচণ্ড ৰাগ হ'ল। তিনি মালঞ্চায় গিয়ে এই কথাবিহিত কৰে মাতাৰ কলঙ্ক দূৰ কৰতে চাইলেন। মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল—পাহে পুত্ৰকে হাবাতে হয়। তিনি পুত্ৰকে নিৰ্বেশ কবলেন মালঞ্চায় যেতে। সত্যপীৰ অবশ্য তখনকাৰ মতন মাতাৰ কথাৰ সন্মত হলেন।

একবাৰে সত্যপীৰ মাতাকে নিদ্ৰিত। অবস্থায় বেখে গৃহত্যাগ কবলেন। পৰদিন পুত্ৰকে না দেখে সন্ধ্যাবতী কেঁদে আকুল হলেন। শুধাপক্ষীকে ডেকে তিনি পুত্ৰেৰ খবৰ জানতে চাইলেন। শুধাপক্ষী সত্যপীৰেৰে মালঞ্চা অভিমুখে গমনেৰ কথা সন্ধ্যাবতীকে জানালো। পুত্ৰশোকে আকুল জননী কেঁদে কেঁদে অস্থিৰ হয়ে উঠলেন।

মালঞ্চার পথে সত্যপীর এলেন গোমনি নদীর কূলে। নদী পাব হওয়া দবকাব। ঘাটের পাটনী কে? পাটনী এক কুস্তীব। তাব খেয়াল পায় হতে হলে কডি সে নেবে না,—নেবে একটি ছাগল। অগ্ৰথায় সে সোওষাবীব অর্ধেক ডক্ষণ করে। সত্যপীর এই উদ্ধত কুস্তীবের পেটের মধ্যে প্রবেশ কবলেন এবং পবক্ষণে পেট চিবে বাহিব হষে এলেন। এ কুস্তীবও আগে থাক্তে অভিশপ্ত ছিল। সত্যপীরের স্পর্শে সে পাপমুক্ত হল দ্বাদশ বৎসর পর। সে পাপমুক্ত হষে বিদ্যাবীবীকপে পীরের বন্দনা কবে চলে গেল স্বর্গে।

সত্যপীর এগিলে চলেছেন। পথে দেখা ভীমা নমঃশূদ্রের সাথে। সে চোর। সেবার নামে হলনা কবে সে পীরের সুবর্ণ-কঙ্কন চুবি কবল। ফলে মবল তার চাব পুজ। সত্যপীর বললেন,—অকুলপুবে তাকে ‘শূলে’ যেতে হবে। ভীমা বলল—প্রভিজ্ঞা কবছি, নব টাকা খবচ কবে ‘শিবনি’ দেবে। সত্যপীর দস্তাপববশ হষে পুত্রগণসহ তাকে সে রাজা রক্ষা কবলেন; কিন্তু পীরের অভিশাপে সে পবে অকুলপুবে চুবিব শাবে ধবা পডল এবং শূলে যেতে হল।

সন্ন্যাসীর বেশ ধরে সত্যপীর এগিষে চলেছেন গ্রামকে গ্রাম পাব হষে। এবাব সত্যপীর য়ার বাজ্যে এলেন তিনি বাবেল্ল ব্রাহ্মণ, তিনি মালঞ্চাব বাজা, তিনি সন্ধ্যাবতীর পিতা মৈদানব।

সত্যপীর প্রথমে গেলেন ‘বাজ্ঞ-অন্তঃপুবে বাণী প্রিমাবতীব নিকট। পবিচব পেষে বাণী শক্তিহ হলেন, পাছে বাজ্ঞার কোপে তাব কোন অদ্রল হয। তিনি সত্যপীরকে দুবে সবে যেতে পবায়র্শ দিলেন। কিন্তু সত্যপীর বেপবোষা। দাবোযানকে দিষে খবব পাঠালেন রাজ্যাব কাছে—জনৈক ফকিব তাঁব সাক্ষাত প্রার্থী। বাজ্ঞা সাক্ষাত-প্রার্থনা দজুব কবলেন না,—ভিক্ষা নিষে বিদায় হতে বললেন। ফকিবকে ভিক্ষা এমনকি মানিক দিষেও বিদায় কবা গেল না। বাজ্ঞা অবশেষে সত্যপীরকে বন্ধন কবে নিক্ষেপ কবলেন কাবাগাবে। পবের দিন তাঁব শিবঃশ্চেদ কবা হবে। সত্যপীর স্মবণ কবলেন আল্লাহতালাকে। আল্লাহতালার দযা হল। ফুলেব আঘাতে কপাট গেল যেটে,—সত্যপীর মুক্ত হলেন।

সাত বছবের বালক-রূপ ধবে সত্যপীর এলেন শালাবতীপুবে। ‘না

হৈল সন্ন্যাসী বেশ না হৈল ফকির ।” সেখানে ক্ৰীড়াবত ৰাখাল-বালকগণেৰ  
সাথে তিনি চৌগান খেলাৰ যোগদান কৰলেন। ক্ৰীড়া বিদ্যাৰ তিনি  
সকলকে পৰাজিত কৰলেন এবং সেখান থেকে প্ৰস্থান কৰে ব্ৰাহ্মণ বালকেৰ  
কপ ধাৰণ কৰলেন।

চলাৰ পথে সাক্ষাত হল কুশল ঠাকুৰেৰ সঙ্গে। কুশল ঠাকুৰ নিঃসন্তান।  
তিনি বালকেৰ সাধাৰণ পৰিচয় পেৰে আপনাৰ বাটীতে নিৰে আসেন। ভদীয়া  
পত্নী ব্ৰজলী আনন্দী ক্ষুধাৰ্ত্ত বালককে পোস্তপুত্ৰ ৰূপে গ্ৰহণ কৰেন। তিনি  
পুত্ৰকে বহন কৰা খাদ্য আহাৰেৰ জন্য পৰিবেশন কৰে জানুতে পেলেন,—

জনম অবধি আমি অন্ন নাহি খাই।  
কাঁচা দুধ আটা বজ্জা ফল-মূল আদি,  
তাহা খাইতে শিখিবাছি জনম অবধি।

বাজকাৰ্য্যে বসে বাজা মৈদানবেৰ মনে পড়ল বন্দী সেই ফকিৰেৰ কথা।  
কালী পূজায় তাকে বলি দিবাৰ জন্তু কোটালকে হুকুম দিলেন। দৰ্পচুৰ,  
শোভা সিংহৰাষ, মনোহৰ ৰাষ, দণ্ড ৰায় প্ৰমুখ অনেকেই সেই ফকিৰকে  
বলিদান দিবাৰ কাজে এগিষে এল। পোতা মাৰি এগিৰে গেল কাৰাগাৰেৰ  
দিকে, কিন্তু ফকিৰ কোথায। ফকিৰ তো নেই। সে ক্ৰত এসে খবৰ  
দিল ৰাজাকে। শুনে ৰাজা বিস্মিত হলেন, চিন্তিত হলেন,—ব্যাপাৰ কি।

কুশল ঠাকুৰ পুত্ৰেৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰলেন, কিন্তু বালকেৰ পড়াশুনাৰ  
মতি নেই। ব্ৰাহ্মণ অসন্তুষ্ট হৈয়ে তিবন্ধাৰ কৰতে সত্যপীৰৰূপে ব্ৰাহ্মণকে  
স্বপ্নে আপনাৰ পৰিচয় দিলেন। ব্ৰাহ্মণ সে কথা প্ৰকাশ কৰলেন না।

নুব নদী থেকে স্নান কৰে ফেৰাৰ পথে কুশল ঠাকুৰেৰ পোস্ত-পুত্ৰ  
কুডিৰে পেলেন একখানি কোবাণ। পুত্ৰ বললেন,—

আমাৰ পড়াও বাপ কোবাণ কেমন  
কথা শুনি শুকু হইল কুশল ব্ৰাহ্মণ।  
কহিতে লাগিল ঠাকুৰ হৈয়ে ক্ৰোধভাৰ  
কি কাৰণে চাহিস তুই কোবাণ পড়িবা।  
ব্ৰাহ্মণে কোবাণ পড়ে কোন শাস্ত্ৰে বলে  
এই ক্ষণে কোবাণ ভাসাবে দেহ জলে।



সত্যপীর বলে কোবাণ পড়িলে কিবা হব  
 দ্বিজ বলে কোবাণ পড়িলে জাতি স্বায় ।-  
 এক ব্রহ্ম বিনে আব দুই ব্রহ্ম নাই  
 সকলের কণ্ঠে এক নিবন্ধন গোসাই । -  
 সেই নিবন্ধনের নাম বিছমিল্লা কব  
 বিষ্ণু আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নব ।  
 কেহ কোন নদী বইয়া কোন দিকে স্বায়  
 সমুদ্রে যাইয়া সব একত্র মিশায় ।  
 তেমন হুজিরা জাতি এক জাত হইয়া  
 একপথ দিয়া সবে যাবে মিশাইয়া ।

ব্রহ্মজ্ঞান শুনে ঠাকুর স্তম্ভিত হলেন । তিনি কোবাণ পড়তে উৎসুক হলেন ।  
 খোদার আজ্ঞায় তিনি সত্বরে কোরাণের হবক চিনতে পাবলেন এবং তা পাঠ  
 কবলেন । এবার তিনি কোবাণখানি সম্বন্ধে গৃহে বেথে দিলেন ।

রাজবাটীতে ভাণ্ডারী এল পুরোহিত কুশল ঠাকুরকে ডাকতে । সত্যপীরের  
 ছলনার পুরোহিত তো অসুস্থ । অগত্যা তাঁর পুত্র অর্থাৎ সত্যপীর দশকর্ম-  
 পুঁথি নিয়ে পূজা কবতে গেলেন ।

বালক পুরোহিত জীবিসু স্মরণ কবে আচমন কবলেন, বিছমিল্লা  
 বলে কর্ণে হাত দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মহম্মদাদি কলমা দিখে সকল কাজ  
 সমাধা কবলেন । পবে তিনি সেখান থেকে দক্ষিণা নিয়ে যবে ফিবে এলে  
 মাতা আনন্দীর তো মহা-আনন্দ ।

কুশল ঠাকুর রাজ-পাঠশালার শিক্ষকও বটে । তিনি শিক্ষকতায় অবসর  
 নিলেন । তাঁর আসনে এলেন ( সত্যপীর ) তাঁর পোদ্দাপুত্র । রাজার পুত্র  
 আম্রসুন্দর এবং দামুদর দুজনেই পড়ে সে পাঠশালায় । শিক্ষক মহাশয়ের  
 তাড়না তারা সহ্য কবল না । গুরু-শিষ্যে দেখা দিল সংঘর্ষ । তাতে আম্র-  
 সুন্দর বৈমুখ্য হল । সংবাদ পেলেন রাজা । ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি শিক্ষককে  
 কামানের গোলাব আঘাতে হত্যার আদেশ দিলেন । কামান গর্জে উঠল  
 কিন্তু সত্যপীরের মৃত্যু হল না । তাঁর গলায় পাথর বেঁধে জলে নিক্ষেপ  
 করা হল । সেই পাথর হল তাঁর ভেলা । ভেলার ভেসে তিনি ফিবে এলেন-

কুশল ঠাকুৰেৰ বাডীতে। ৰাজ-দৰবাৰে কুশল ঠাকুৰ আটক পড়লেন। সত্যপীৰেৰ কাৰণে কুশল ঠাকুৰ বাঁধা পড়েহেন, অভাৱ আনন্দী ঠাকুৰাণী বাঁধলেন সত্যপীৰকে। পীৰ বললেন,—

বন্ধন দাকণ জালা সহিতে না পাবি। ..

সত্যকালে জন্ম মোৰ নাম সত্যপীৰ,

কলি কালে জগিন্না হইনু জাহিৰ।

হিন্দুৰ দেবতা আমি মোমিনেৰ পীৰ,

যে যাহা কামনা কৰে তাহাৰে হাসিল।

এ দিকে ৰাজা মৈদানৰ খজাঘাতে ব্ৰাহ্মণ কুশল ঠাকুৰকে হত্যা কৰতে উদ্ভত হলেন। এমন সময়ে পীৰ এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। পিতাৰ বন্ধন নিজেৰ হাতে নিলেন ;—ব্ৰাহ্মণ ফিৰে গেলেন গৃহে। সত্যপীৰ আপনাৰ পৱিত্ৰ দিলেন ৰাজাৰ কাছে। তবুও তিনি শান্ত হলেন না। পীৰকে নিৰে যাওৱা হল বহাভূমিতে। সেখানে তিনি শ্বেত মাছিৰ ৰূপ ধৰে অন্তৰ্হিত হৱে সাহায্যেৰ জন্ম গেলেন অমৰাপুৰীৰ ৰাজা। ইল্লৰ নিকট। সেখানে আছে আৰ্বৰ্ত, সাৰ্বৰ্ত্ত প্রভৃতি বাবোখানা মেঘ। সেই মেঘ থেকে ভৱাবহ বৃষ্টি হল মালঞ্চাৰ। তাতে ভেসে গেল মালঞ্চা। ৰাজা জলবন্দী হলেন। ৰাজাৰ পুত্ৰবধূ ৰূপবতী এবং মালাবতী অঙ্গীকাৰ কবলেন যে তাঁৰ। সত্যপীৰকে পূজা দিবেন। সত্যপীৰ বললেন যে, শিৱনি পেলেই তিনি সকলকে উদ্ধাৰ কৰবেন। বহুধৰ মহামূল্য কঙ্কনেৰ বিনিময়ে শিৱনি আনাগলেন কিন্তু বীৰবল ছিল না। কবাব, সত্যপীৰ গেলেন সেখানে। বীৰবল প্রহাৰ কৰতে এল সত্যপীৰকে। পীৰ অদৃষ্ট হৰে গেলেন এবং এক কক্ষ ফকিৰকণে পুনৰাৰ বীৰবলেৰ নিকট এলেন। তবুও পীৰ অপমানিত হলেন। ফলে বীৰবলেৰ পুত্ৰ সৰ্পাঘাতে মৱল।

এবাৰ বীৰবলেৰ সন্নিহিত ফিৰল। সে ফকিৰেৰ পা জড়িলে ধবল। দহাৰ পীৰ তাৰ পুত্ৰেৰ জীবন ফিৰিলে দিলেন। ৰূপবতী-মালাবতী পেলেন কঙ্কন ও আধমন চিনি।

ৰূপবতী ও মালাবতীৰ স্তুতিতে সন্তুষ্ট হৰে সত্যপীৰ মাৱাতবীৰ সাহায্যে ৰাজা মৈদানবকে উদ্ধাৰ কবলেন। বিশ্বকৰ্মাকে ডাকিৰে দশ দণ্ডেৰ মধ্যে ৰাজপুৰী পুনৰ্গঠিত হল সুন্দৰ ৰূপে। তবুও ৰাজা অস্বীকৃত হলেন সত্যপীৰেৰ শিৱনি দিতে। তিনি বললেন,—

সকলি পাইনু আমাব হবিহব কোথাষ ।

হবিহব বাবো বছব বয়সে কুমীরেব পেটে নিহত হয়েছিল। সত্যপীৰ ডেকে পাঠালেন কুমীর-বাজকে। ব্যাপাব শুনে কুমীর-বাজ ভিম্বিল্ল। ভো অবাক। হরিহবেব খোঁজ পডল এখন। কুমীর-বাজা ডেকে পাঠাল অনেক কুমীরকে। কেউই তো হরিহরকে খায় নি। ছেদডা নামক কুমীর বলল যে তার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। সত্যপীৰ তখন জিঙ্গীৰ (অর্থাৎ চাঁৎকাৰ) ছাড়লেন। ছেদডা দ্বিখণ্ডিত হল :— প্রথম খণ্ড কুমীর নিজে আব দ্বিতীয় খণ্ড হল হরিহব। কুমীর জলে নেমে গেল; হরিহবেব জীবন সম্বাজেব বাড়ী সন্ধ্যামণিগব থেকে এনে তাকে পীৰ সঞ্জীবিত কবলেন।

সত্যপীৰেব সাথে হবিহব এল বাজ-দববাবে। বাজা আনন্দে যেন আত্মহারা হষে সিংহাসন থেকে নামলেন এবং লক্ষ টাকা ব্যয়ে সত্যপীৰেব শিবনি দেবাব ব্যবস্থা কবলেন। সাডমবে শিরনি দেওয়া হল। বাজার সম্বন্ধী গোকুল ঠাকুর এতে অবজ্ঞা কবলে তাব জ্যেষ্ঠ পুত্রেব মৃত্যু হল। অবস্থা ক্ষমা প্রার্থনা কবায় পীৰ সদয় হষে তাকে ক্ষমা কবলেন।

মৈদানব বাজাকে এবাব সত্যপীৰ আদেশ কবলেন সন্ধ্যাবতীকে ফিবিষে আনাব জন্ত। বাজা তাতে সম্মতি দিলেন। পুত্র হরিহব হাতীৰ পিঠে চড়ে চলল কুলবনে। সত্যপীৰ চললেন নৌকাষ চড়ে।

নৌকা চলেছে নুব নর্দা বেধে। অনেক গ্রামেব পব এল ‘বাইনট’ নামক গ্রাম। সেখানকাব বাজা, শফ্র দ্বারা আক্রান্ত হষেছেন ভেবে সসৈন্তে অগ্রসব হলেন। সত্যপীৰেব কোন কথাই তিনি শুনলেন না। অবস্থা মায়াবলে সত্যপীৰ যুদ্ধে জবী হলেন। বাজা নিজ কথা লীলাবতীৰ সঙ্গে হবিহবেব বিবাহ দিলেন। বিবাহান্তে লীলাবতীও চলল হবিহব ও সত্যপীৰেব সঙ্গে।

সত্যপীৰ সকলকে নিষে মাতা সন্ধ্যাবতীৰ নিকট এলেন এবং সাখী সকলেব সঙ্গে পরিচয় কবিষে দিলেন। পবে তাঁকে মালঞ্চাতে ফিবিষে নিষে যাবাব কথা জানানলেন। অকস্মাৎ একথা শুনে সন্ধ্যাবতীৰ সন্দেহ হল। হবিহব সমস্ত ব্যাপাব বুঝিষে বলতে তববেই তিনি বাজী হলেন মালঞ্চায় ফিবে-ষেতে। তখন সমস্ত ধন-সম্পদ চাঁদ ঝাঁ মণ্ডলকে বুঝিষে দিয়ে—

সন্ধ্যাবতী চাভিলেন দিব্য মহাফাল্ল ।  
 অবিলম্বে এলেন মালঞ্চাৰ ।  
 মহাফা হইতে তবে নামে সন্ধ্যাবতী,  
 মাৰেব চৰণে পড়ে কবেন প্রণতি ।  
 প্ৰিম্ববতী বলে বাছা দেবী সন্ধ্যাবতী  
 সত্যপীৰে কৈল মাও এতক দ্ৰুগতি । ..  
 দুখ কলা আনিয়া দিলেন মালাবতী,  
 খাইলেন সত্যপীৰুইয়া কৃপামতী ।  
 তবে পুনঃ সত্যপীৰ হইল অন্তৰ্ধান,  
 অমব শহবে গিয়া দিল দৰশন ।

শিশুপাল ৰাজ্যৰ পাল ৪

সত্যপীৰ সন্ন্যাসীৰ বেশে অমব শহবে গেলেন । সেখানকাল ৰাজ্যৰ নাম  
 শিশুপাল । ৰাজা, নৱবলিদিয়া অৰ্জুকালী পূজাককৈলেন ।

সেদিন পূজা । সুদৰ্শন এক বালককে বলিদানেৰ ব্যবস্থা কৰা হৈছে ।  
 অসহায় বালকটিকেই দেখে পীৰেব প্ৰাণে জাগল মায়া । তিনি বাজাব  
 কাছে গিবে উপস্থিত হলেন এবং ডিঙা প্ৰাৰ্থনা কৰলেন ।  
 ৰাজা ডিঙা দিতে বাজী হলেন । সত্যপীৰ সেই বালককে উপহাস  
 স্বৰূপ চাইলেন । ৰাজা বললেন,—বৰং জ্ঞান-বিবুদ্ধকেও এই ডিঙা দেওবা  
 হবে না । সন্তোষে সত্যপীৰ স্থান ত্যাগ কৰলেন । বালক এক মনে সত্যপীৰকে  
 স্মৰণ কবতে লাগল ।

বলিদানেৰ জন্ত বালকেৰ স্কন্ধে খজাঘাত কৰা হল, কিন্তু খজেৰ আঘাত  
 তাৰ লাগল না, বৰং খজা ভেঙে হল দু'খণ্ড । বাজা চিন্তান্বিত হৈছে ছকুম  
 দিলেন,—নিষে এস 'সোম ছেদা' খাঁডা । আনা হল খাঁডা । তাতে  
 মন্ত্ৰ পড়ে দেওবা হল । ইতিমধ্যে সত্যপীৰ স্ত্ৰেতমক্ষি-ৰূপে বালকেৰ স্কন্ধে  
 এসে বসলেন । তিন তিন বাৰ বালকেৰ স্কন্ধে সে খাঁডা নিক্ষেপ কৰা সত্ত্বেও  
 যখন বালকেৰ কোন আঘাত লাগল না তখন,—

বাজা বলে দাওলিষ ।                      ফেলাও হাতেৰ দাও ।  
 খিল খসাইষা ছেলেৰ                      মুখে জল দাও

বাজা নদীতীরে উপনিষ্ট সন্ন্যাসীর বিবরণ জেনে নিলেন এবং তাঁকে ডেকে পাঠালেন সন্ন্যাসী বাজা-আহ্বান প্রত্যাখ্যান কবে বাজাকেই তাঁব কাছে আসতে বললেন । বাজা এলেন ফকিরের নিকট ।

কবজোড়ে শ্রদ্ধা নিবেদন কবে বাজা বললেন,—বংশ বক্ষাব জন্ম এইকপ বলিদানের ব্যবস্থা,—

সত্যপীর বলেন বাজা      গল্প পুষ্পে কব পূজা  
নববলি দিতে না জুয়াষ ।  
নববলি দিতে চাহ পুষ্পের কাষণ ।  
পবকালে কি হইবে না বুঝ বাজন্ ।

সত্যপীর আত্মপবিত্র দিলেন এবং বললেন,—পাঁচ বাণী যদি ‘নিলা’ নদীতে স্নান কবে তগস্থা করেন তবে পাঁচটি বস্তা পাবেন । সেই বস্তা প্রাপ্তি-বোগের কার্য্যক্রমে বাজার বংশ বক্ষা হবে ।

বাণীগণ স্মৃতি-পরামর্শ ব্রত পালন কবে পাঁচটি বস্তা পেলেন । নদী থেকে ফেরার পথে সাক্ষাৎ হল এক ফকিরের সাথে । ফকির বল্লেন,—আমি ক্ষুধার্ত, ঐ ফল আমার খেতে দাও । চার বাণী ফকিরকে অবহেলা করলেন । ছোটবাণী বিন্দুমতী ভাবলেন,—“ফলদানে ফল পায় লোকমুখে গুনি ।” তিনি তাঁর বস্তা ফলটি ফকিরকে দিলেন । ফকির সেটি খেয়ে শুধু চোচা খান বাণীকে ফিবিবে দিবে বল্লেন,—

ধব বাছা চোচায় খুইব। খাও জল ।  
অবশ্য খোদায় তোবে দিবে বংশ বল ॥

চার বাণী চাব ফল আনার বাজা খুশী । ছোট বাণী ‘চোচাখান’ আনার বাজা তাঁকে গালি দিলেন । কিন্তু ভাগ্যের কি পবিহাস,—

ছোট বাণীর গর্ভ হইল সত্যপীরের ববে,  
চাবজন বাজা হইল অভাগ্যের ফলে ।

ঈর্ষাপবারণ হয়ে দাই-এব সাহায্যে ছোট বাণীর গর্ভ নষ্ট কবার জন্ম চার বাণী চেষ্ঠা করলেন ; কিন্তু পাবলেন না । সত্যপীর তাঁকে বক্ষা করলেন এবং দাই-এব নাক-কান কেটে শাস্তি দিলেন ।

যথাসময়ে ছোট বাণীর অপকপ এক ছেলে হল । বল দাসাগণ বাজাকে জানাল,—

ছোট বাণীর হৈল এক চামেব বালক ।

বাজা বিমর্ষ হলেন । অন্য বাণীরা হলেন আনন্দিত । তাঁরা কোশলে এসেই ছেলেকে বাঙ্ক-বন্দী কবে গজার জলে নিক্ষেপ কবলেন, কিন্তু তাঁকে বক্ষা কবলেন গজাদেবী । খোঁওয়াজেব অনুবোধে বসুমতী শিশুকে দুধ দিয়ে ঝাঁচালেন । বসুমতীর সহিত খোঁওয়াজেব কলিকাল-বিষয়ক কথোপকথন হল । শেষে সত্যপীর নিষে গেলেন শিশুটিকে ।

পুত্রশোকে কাতব হয়ে ছোট রাণী ঝাঁপ দিতে গেলেন 'নিলা' নদীতে । সত্যপীর সেখানে হাজির হলেন । শিশুপুত্রকে ফিবিবে দিবে তিনি বল্লেন,—

পূর্বে যেই ফকিবকে কলা দিছ ভিক্ষা,  
সেই ফকিব আসি তোমার পুত্রকে কৈলাম রক্ষা ।

বাণী তো মহা ধুশী । বাজার কাছে সংবাদ গেল । পুত্রকে পেয়ে বাজা মুক্তি দিলেন বন্দীদের, বডমন্তকাবী বাণীগণকে সব থেকে বেব কবে দিলেন, পুত্রের নাম-কল্ল কবে সত্যোব সেবার ব্যবস্থা কবলেন । সত্যপীর এবার চল্লেন মাইলানিনগবে হীবা মুচিব বাড়ী ।

হীরা মুচির পালা :

সত্যপীর হীবা মুচিব বাড়ীর সামনে এসে জিগীৰ ছাড়লেন । হীরা মুচী তো মহাধুশী । কিন্তু হার । ফকিবকে দিবার মত তাব হবে তো কিছু নাই । পুত্র মধুবামেব সঙ্গে সে পবামর্শ করলে । কোনও উপায় না দেখে, ফকিবকে অপেক্ষা কবতে বলে, সে বাজাবে চল্ল জুতা বিক্রী কবতে । পাথমধ্যে সত্যপীর, পেয়াদাব বেশে তাব জুতো কেড়ে নিলেন,—দাম দিলেন না । হীরা ফিরে এল বাড়ীতে । বেঙ্গা মুদীর দোকানে পুত্রের কাজ করার সর্তে আগাম টাকা নেবার পবামর্শ কবতে মধুরাম তো ক্ষুব্ধ হল । অবশেষে মধুবাম রাজী হল । তখন পিতা-পুত্রে চল্ল বাজারের দিকে ।

সত্যপীর, হীবাকে পবীক্ষা কবাব উদ্দেশে মধুবামকে জয়ন্তে থেয়ে ফেলার জন্য নাগেন্দ্রবী নারী বাঘকে আদেশ কবলেন । নাগেন্দ্রবী তা-ই কবল । হীবা শোকে-হৃৎখে আহত হয়ে ভিক্ষা কবতে গেল মোগলেব বাড়ী । মোগল বল্ল যে যদি হীবাব স্ত্রী তাব মসজিদ তৈয়াবাব সুবকী কুটে দিতে পাবে তবে সে আগাম চাব আনা দেবে । হীবা ক্রুত বাড়ী ফিরে পত্নী মহেসার ( মহেশীব )

সম্মতি চাইল। পতিব্রতা মহেশী সম্মতি দিলে, পত্নীকে সঙ্গে নিয়েই হীরা গেল মোগলের কাছে। সেখান থেকে যখন সে ফকিরের কাছে ফিবে এল, ততক্ষণে বিলম্বের দরুণ ফকির অধৈর্য হয়ে গেছেন। তিনি এর জন্য হীরাকে তিরস্কার কবলেন। হীরা বলল,—

যে জন ফকির হয় বৃক্ষ হইতে ছোট।  
ফকিরে না কবে ক্রোধ সিধা হয়ে চলে,  
হইবা থাকিবে যেন তকব সামিলে।  
শুকাইয়া গেলে বৃক্ষ জল নাহি পায়,  
গাছ-সম হৈতে পাবে ফকির বলি তার।  
মালিকের নিজ নাম জপিরা অন্তরে,  
হইয়া নিবাসিন বেশ দেশে দেশে ফিরে।  
শোনহু ফকির সাহেব আমার বচন,  
ফকির হইবা এত ক্রোধ কি কারণ। ...  
মুচাবে কহিল এহি শাস্ত্র-বুজ্জি কথা,  
শুনিল্লা লজ্জিত ওলি হেট কৈল মাথা।

ফকির সন্তুষ্ট হয়ে হীরাকে আটা, কলা, ঘি, মধু প্রভৃতি কিনে আনতে বললেন। হীরা তা-ই কবল।

হীরা বলে মোর হাতে কেহ নাহি খায়,  
তুমি যে খাইতে চাহ শুনি লাগে ভয়।  
সত্যপীর বলে মোর জাতি-ভেদ নাই,  
যে জন ভক্তি কবে তাব হাতে খাই।

ফকিরের শিরনি প্রস্তুত হল। বস্ত্রদ্বারা আভাল কবে তিনি আহাৰ কবতে চাইলেন। হীরার বস্ত্রের অভাব কিন্তু চর্ম আছে যবে। তা দিয়ে আহাবের জালগা আভাল করা হল। ফকির জিপীর ছেড়ে সেই চর্ম স্পর্শ কবতে তা সুন্দর দেওয়াল হল। ফকির এবার হীরার পরিবাহের সকলকে কাছে ডাকলেন; কিন্তু হীরা ছাড়া কাউকে পেলেন না। সমস্ত বিবরণ জেনে ফকির ফিবিয়া আনলেন মধুবাংকে।

সত্যপীর বলে তুমি ধন্য বে মুচাব  
তোমার সমান ভক্ত কেহ নাহি আব।

পিতা-পুত্র ও সত্যপীর একসাথে শিরিনি গ্রহণ করলেন। সত্যপীর এতক্ষণে আপনার পরিচয় দিলেন।

এ দিকে মোগল, সুন্দরী মহেশীকে সম্ভোগ কবাব ব্যবস্থা করল। সত্যপীর শ্বেত-মক্ষিকপে মহেশীকে অভয় দিলেন। সত্যপীরের অভিযোগে মোগল অঙ্ক হল। মোগল, মহেশীব পায়ে ধরতে দরঙ্গাববশ হয়ে মহেশী বলল,—

সত্যপীর ককক ডুখি পাও চক্ষুদান।

পীরের দরঙ্গা মোগল চক্ষুদান হল। তখন সে মহেশীকে একশত টাকা, কিছু অলঙ্কার দিয়ে দুই জন দাসীর সাথে সসম্মানে বাড়ী পাঠিয়ে দিল। পত্নীকে দেখে হীরা হল খুশী।

হীরার হৃৎযন্ত্র মোচনের জন্য সত্যপীর তাকে দুই-ঘড়া ধন দিতে চাইলেন—

হীরা মুচি বলে সাহেব ধনের নাই কাম,  
ডিক্কা করিলা আমি লব তোমার নাম।

শেষে হীরা সে ধন নিতে বাজী হল। কেবার পথে দুইন কোতালিনী এক ঘড়া ধন চাইল। হীরা তাকে কোশলে এড়িয়ে বাড়ী চলে এল।

সত্যপীর বিশ্বকর্মাণে দিয়ে এক গৃহ নির্মাণ করিয়ে দিলেন। হীরা খুশী হয়ে সেখানে বাস করতে শুরু করল।

হীরার বাড়ী যেন রাজপুরী। নাম তাব হীরাগঞ্জ। হিংসার উদ্ভূত দুইন কোতাল গিরে সে বিবরণ জানালো রাজা মানসিংহের কাছে। মানসিংহ ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্যদ্বারা হীরাকে বেঁধে রাজসভার আনালেন। রাজা বললেন,— ‘সব ধন নিয়ে এস।’ হীরার সঙ্গে লোকজন গেল। মোহর, মোতি, হীরা, পান্না দেখে তো তারা অবাক। কিন্তু হার। সে সব সিন্ধুকে পুবে তারা দেখল—সবই ‘খোলা আঁব খাপার।’ হীরার চাতুরী মনে করে তাকে খুব প্রহার করা হ’ল। হাতে কড়া, পায়ে বেড়ী ও বুকে পাথর দিয়ে তাকে বন্দীশালার নিক্ষেপ করা হল। হীরা কারাগারে বসে সত্যপীরের চৌভিষা পাঠ করিতে লাগল, অভিমান ভরে অনেক মন্দ কথা বলিতে লাগল।

সত্যপীর কর, প্রাণে নাহি ভয়,  
কেনে মোরে মন্দ বল।



-গোহাক ভিম্ব, দেখাব জাহির

যতক কবিব আমি ।

সত্যপীর নিশি শেষে রাজা মানসিংহকে স্বপ্নে বললেন,—তোমাকে মাঝি  
রাজ্য মুচাবকে দিব ।

স্বপ্নভঞ্জে ভীত রাজা মানসিংহ পরদিন কোটালকে ডেকে হীরাকে মুক্ত  
কবালেন এবং সমস্ত ধন-সম্পদসহ বাড়ীতে ফেরবার ব্যবস্থা কবলেন । হীরা  
বাড়ীতে ফিরে এলে মর্হেশী খুব খুশী হল । হীরা আবার সত্যপীরের শিবনি  
দিল । সত্যপীর, তাদেরকে মুখে থাকবার আশীর্বাদ করে স্থানান্তরে  
চলে গেলেন ।

শশী বেষ্ঠার গালা :

সত্যপীর চলেছেন বগজোড় সহবে । আজাজিল তাঁকে হলনা করবার  
জন্ত পাটনী সেজে চেকী করে ব্যর্থ হলো । সে ভয়-মনোরথ হলো না ।  
শশী বেষ্ঠাকে মাধ্যম করে পুনরায় চেকী কবতে লাগল ।

শশী মাঝপথে সত্যপীরকে ধরে রাখতে চাইল । সত্যপীর ছেলের মূর্তি  
ধবতে শশী তাঁকে কোলে নিতে গেল । সত্যপীর তৎক্ষণাৎ ভয়, পক্ষী হয়ে  
উড়ে গেলেন । শশী হাব মানল ; ক্ষমা প্রার্থনা কবল । সমস্ত ধন-সম্পদ  
বিতরণ করে সে সত্যপীরের নিকট আশ্রয়-সমর্পণ করল । পীরের নির্দেশে  
সে সবধন নদীতে ন্যাস কবে নীল শাড়ী পবিত্রান কবে পীরের চরণে পতিত  
হল এবং জ্ঞান হাবিয়ে ফেলল । পীরের নির্দেশে সে পুনরায় সবধন নদীতে  
ন্যাস করে-তীব্র প্রাপ্ত পাথর বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে সেখানে মাথা কুটে  
মবতে চাইল । সত্যপীর সেই পাথরকে সেবা কববার জন্ত শশীকে বললেন ।  
শশীর বেষ্ঠা নাম-ঘুচে গেল ; নৃতন নাম হল জসি ফকিবাণী । সেই নীলবর্ণ  
পাথর স্নেহ পাথর হল । সত্যপীর তাতেই গারোব হলেন ।

এক মালিনী রাজাবে চলেছে ফুল বেঁচেতে । ফকিবাণী তার কাছে  
পীরের পূজার জন্ত ফুল চাইল । সে ফুল দিল না । রাজাবে গেলে আকস্মিক  
সে ফুলে আগুন জ্বলে উঠল । মালিনীর সন্ধিৎসু ফিরে আসতে সে ফকিবাণীর  
নিকট এসে ক্ষমা চাইল । পরদিন সে ফুলের সুন্দর একটি মালা এনে স্নেহ-  
পাথরে পবিয়ে দিল । অমনি রাজাবে তার ফুলের চাহিদা বেড়ে গেল । ষোল  
কাহন কডি পেয়ে সে সত্যপীরের শিবনি দিল ।

জসমন্ত সাধুৰ পালা :

কদম্ব বৃক্ষের তলে পাথররূপে সত্যপীৰ অবতীৰ হইলেন। “যে যেমন কামনা কৰে সিদ্ধ হয় তাৰ।” জসমন্ত সাধু বাণিজ্য-যাত্রা কৰেছেন। তিনি কদম্বতলে এসে ফকিবাণীকে বললেন,—তেলজা পাটনে গিয়ে যদি দশগুণ বেপাৰ হয় তবে ধন-পুত্র নিয়ে কেবাবৰ সমস্ত বত বেপাৰ লাভ হবে তাৰ সবই সত্যনারায়ণকে দিয়ে যাবেন। ফকিবাণী তাঁকে আশীৰ্বাদ করলেন।

জসমন্ত সাধুৰ নৌকা সবমু নদী বেয়ে হস্তিনানগৰ অভিক্রম করে দিল্লী থেকে আয়ো এগিয়ে চলল। তিনি জিণ্ডাবাৰ ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ালেন। চাঁল, গম, সরষে, কলাই প্রভৃতিৰ ব্যবসাৰ কৰে তাঁৰ দশগুণ বেপাৰ হল। ব্যবসায়-অন্তে তিনি কিৰে এলেন বগজোডে, কিন্তু সত্যপীৰকে প্রতিজ্ঞাত এক ডিক্কা ধন না দিলে, দিতে চাইলেন কেবল মাত্র শিরনি। সত্যপীৰ অসন্তুষ্ট হইে জসমন্ত সাধুৰ প্রধান ডিক্কা হংসমোড়ার দাঁড়ি-মাখিকে নদীতে ফেলে দিবে সেই ডিক্কাকে কদম্বের তলে এনে বঁধলেন। সকালে তিনি নিদ্রাভঙ্গে ঘাটে ডিক্কা নেই দেখে কঁদে ফেললেন। পুত্ৰের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত থেকে অবগত হয়ে তিনি পুত্ৰসহ সত্যপীৰের দরগাহে আৰাব এসে কঁদে পড়লেন। সাধুৰ পুত্ৰ ঘাটে সেই ডিক্কা পেৰে হল আনন্দিত।

শুন্দি সওদাগরে পালা :

সত্যপীৰ এলেন বনগ্রামে। সেই অঞ্চলের কর্ণপুৰ গ্রামে নিঃসন্তান শুন্দি সওদাগর থাকেন। পুত্ৰ কামনাৰ তিনি ফকির-বৈষ্ণবকে দুধছত্র দেন। দুধছত্র দিতে দেখে পীৰ সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন। শুন্দি তো নাছোড়বান্দা। পীৰ বললেন,—

দুধ খাওরাইয়া তুমি দোওরা শিখাও আগে।

এহি সে কাৰণে কারো দোওরা নাহি লাগে ॥

সত্যপীৰের কথানুযায়ী সওদাগর তদীয় পত্নীকে বাজীৰ বাইরে ডেকে আনলেন। তাঁৰা প্রতিজ্ঞা করলেন যে,—যদি দুই পুত্ৰ লাভ হয় তবে কনিষ্ঠ পুত্ৰকে তাঁৰা পীৰের নক্ষর হিসাবে দান কৰবেন। পীৰ তাঁদেরকে মুচিকান্ত ও নিশিকান্ত নামে দুটি ফুল দিলেন। সেই ফুল-ধোওরা জল খেয়ে সওদাগর-পত্নী গৰ্ভবতী হলেন। যথা সময়ে তাঁৰ অপৰূপ দুই পুত্ৰ ভূমিষ্ঠ হল।

কনিষ্ঠ-পুত্রকে ত্যাগ করতে হবে—এ কথা ভাবতে তাঁদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় ।

বারো বছর পর পীর এসে উপস্থিত । তিনি কনিষ্ঠ পুত্রকে চাইলেন । সওদাগর বললেন,—কনিষ্ঠ জন তো পুত্র নয়,—কন্যা । পীর বুঝলেন সওদাগরের কপটতা । পীর বললেন,—আমি তাদেরকে আশীর্বাদ করতে চাই । সওদাগর অগত্যা পুত্রকে আনলেন নাবীর সাজে । পীর তখন পবনের সহায়তার তাকে বিবদ্ধ করলেন,—সওদাগরের কপটতা ক'স হয়ে গেল । সওদাগর পীরের পারে ধবলেন,—তবুও পুত্রকে দিতে হল । পীর তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলে সওদাগর পুত্রশোক নিদারুণ অভিভূত হলেন ।

কাশীকান্ত রাজার শালা :

সত্যপীর এলেন শম্ভুহাটা নামক গ্রামে । সেখানে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি । পীরের বেশ এবার অর্দ্ধসন্ন্যাসী-অর্দ্ধককিণের ।

সে গ্রামে এক পাঠশালা চলছে । পীর সেখানে গিবে উপস্থিত । তাঁর চেহারা দেখে তাঁকে কেউ বলল—পাগল, কেউ বলল—নাড়া, কেউ বা বলল শাস্ত্র ছাড়া । পীর বললেন,—কাঁচা দুধ, পাকা রসুন, মধু, চিনি ও আটা দিয়ে ফলাহার দাও, আর দাও একটা পৈতা । এক ছাত্র পীরকে একটি সংস্কৃত শ্লোকে গালি দিল । পীর তাকে সাত পুরুষ মুখ থাকবাব অভিশাপ দিয়ে চলে গেলেন ।

পীর এক পুকুরের ধারে গিয়ে আসন করলেন এবং অলৌকিক শক্তিতে সেখানকার সমস্ত ব্রাহ্মণের পৈতা হরণ করলেন । ব্রাহ্মণগণ এসে পীরকে ধবলেন—

কে তুমি কপট বেশে,

কিবি সব দেশে দেশে,

দয়া করি দেহ পবিত্র ।

কেনে মনে ক্রোধ কবি, যজ্ঞসূত্র নিলে হবি,

তোমার এমত ধর্ম নয় ॥

পীর বললেন—

তোমরা ব্রাহ্মণ বটে,

কেহ নহ বড় ছোট,

কাল সৰ্প-সকলি সমান ।  
সন্ন্যাসী ফকির প্রভি,  
কিছু কব ভব ভক্তি  
ভোবা হৈলি পড়ুয়া শযতান ।

অতঃপৰ তিনি আত্ম-পৰিচয় দিলেন । ব্রাহ্মগণ আত্ম-সমর্পণ কবায়  
পীঠ তাঁদেরকে আশীর্বাদ কবলেন । সকলে মিলে সত্যনাথারূপের ভোগ  
দিলেন এবং তা জাতিভেদ বিচার না কবে সকলে বর্জন কবে খেলেন ।

বাজা কাশীচন্দ্র এ ঘটনার কথা শুনে বেগে আস্তান । পেয়াদা এসে শঙ্কহাটির  
ব্রাহ্মগণকে বেঁধে নিবে চলল । সেই সাথে সন্ন্যাসীও চললেন ।

বিপ্রগণ বাজাকে সত্যপীঠের কথা জানালেন । বাজা বললেন,—  
আপনারা ব্রাহ্মগণ হাবিয়েছেন । সন্ন্যাসী তাঁর পীরত্ব জাহির ককক তো  
দেখি ।

পীর শ্বেত মক্ষিকপে বাজ-অন্তঃপুরে গেলেন এবং বয়লীগণের সুবুদ্ধি হরণ  
কবলেন । তাবা তখন বেছাং “বিদ্যাবি হইবা সবে নাচিতে লাগিল ।”  
ব্যাপার দেখে সকলে স্তম্ভিত । বাণীও কি পাগলিনী হলেন । বাজাও  
বিস্মিত হলেন—

বীৰভূমের বাজা আমি বাচে বঙ্গে নাম ।  
কলঙ্ক বাখিল বাণী ছাডি নিজ ধাম ॥

সত্যপীঠ বাজাকে বললেন,—আর কি জাহির দেখতে চান ? বাজা বেগে  
পীঠকে ইন্দাবাতে ফেলে দেওয়ালেন ।

এক গাছি সুতা বেবিয়ে এসে বাজার গলায় আবদ্ধ হল । বাজা আকুট  
হলেন কূপের মধ্যে । কোন অস্ত্রে কোন উপায়ে সে সুতা কাটা গেল না ।  
বাজা গিয়ে পড়লেন কূপের মধ্যে । বাজা বললেন, অপবাহ মার্জনা ককন ।  
পীঠের দয়া হল । তিনি ক্ষমা কবে বাজাকে কলেমা শোনালেন । বাজা পীঠকে  
সম্মুখে নিজ পুৰীতে নিষে বহু-সিংহাসনে বসালেন । লক্ষ টাকা ব্যয় করে  
পীঠের ভোগ দিলেন । পীর সন্তুষ্ট হয়ে পূর্বদিকে চললেন ।

ধনঞ্জয় গোয়ালার পাল :

ধনঞ্জয় গোয়ালার বাড়ী। সে বড় অহঙ্কারী। সত্যপীৰ এলেন ধনঞ্জয়ের বাড়ী এবং তাঁর আগমন-বার্তা জিগীৰ ছেড়ে জ্ঞাপন কবলেন। ধনঞ্জয় গোয়ালার ঘরের বাইরে এল। ফকিরকে সে দিল তাব এঁটো অন্ন। পীৰ অভিশাপ দিলেন,—আজ থেকে তোব লক্ষ্মী ছাড়ল। পর জন্মে তুই শ্ৰীগাল-কুকুর হয়ে পরের এঁটো খেয়ে জীবন কাটাবি। গোয়ালার তাঁকে পাংগল বলে গালি দিল। সেই মুহূর্তে এক শঙ্খচিল গোয়ালার হাতের খালা উঠিয়ে নিষে তার মাথায় নিক্ষেপ কবল। ধনঞ্জয় গোয়ালার নিদারুণ আঘাত পেয়ে ভূমিতলে পড়ে গেল।

ধনঞ্জয়ের ধানের গোলা মাটির তলায় গেল। হাজ্জাব গরু যুগ হয়ে বনে প্রবেশ কবল। তাকে নিঃশ্ব হয়ে চাব পুত্রের হাত ধবে ডিঙ্কাব বেকতে হল। শেষে সে এমন অবস্থায় এল যাতে তাকে লুটিয়ে পড়তে হল পীৰেব পদতলে। দরবার পীর সত্যপীর তাকে ক্ষমা করলেন।

মঙ্গলু বান্দ্যকরের পাল :

দুর্বাদল নগর। মঙ্গলু বান্দ্যকরের সেখানে বাড়ী। কুঁড়ে-আতুৰকপে সত্যপীৰ এলেন তার বাড়ীতে। তিনি কিছু খাবার চাইলেন। মঙ্গলু বড় গবীৰ। সে সময় তাব ঘবে একটু জলও আনা ছিল না। আহ। ফকিরকে সে কি দেবে। ফকির বললেন,—তোব ঘবে দু'হাঁড়ি ভর্তি কাঁচা দুধ, আটা ও রুত্তা আছে। মঙ্গলু তো অবাক্। ঘবে গিয়ে সে দেখল,—কথা সত্য বটে। সেগুলি যত্ন করে এনে সে ফকিরকে খেতে দিল। ফকির তা সানন্দে আহার করলেন। তিনি মঙ্গলুকে আশীর্বাদ কবে বললেন,—

বোজা ও নামাজ পবে কায়েম বহিবে,  
গবীৰ হুঃখীৰ পর রহম কবিবে।

তিনি আরো বললেন,—সে যেন মইন গিদালের গৃহে তাব কন্যাব বিবাহ দেয়।

সত্যপীৰ সেখানে আবে। কিছুদিন বইলেন। মঙ্গলুব পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। তাকে আশীর্বাদ কবে সত্যপীৰ চললেন মশেন গিদালের বাড়ীর দিকে।

ময়েন গিদালৈৰ পাতা :

ৰাজা ময়েন গিদালৈৰ প্ৰাসাদ জয়মগবে। তিনি মুসলিমেৰ শত্ৰু। মমিন-মুসলমানকে পেলে তিনি মা কালীৰ মন্দিৰে বলি দেন। সত্যপীৰ সে অঞ্চলে গিৰে জিগীৰ ছাডলেন। ঘৰ থেকে বেবিৰে এল বুড়ী। বালক ফকিবকে দেখে বুড়ীৰ বড মায়া হল। বালকেৰ কেহ নেই শুনে বুড়ী তাকে আপনাৰ ঘৰে স্থান দিল। সে বালক-ফকিব খেলেন দুধ-কলা এবং আটাৰ তৈৰী খাদ্য।

পৰেব দিন বালক-পীৰ ধবলেন আসলকপ। সত্যপীৰ এবাব এলেন ৰাজবাড়ীৰ কাছে। তিনি জিগীৰ ছাডলেন। ৰাজা এলেন প্ৰাসাদেৰ বাইৰে কিন্তু পীৰেৰ প্ৰতি কোন কল্প ব্যবহাৰ কবলেন না। বৰং তিনি খুবই নম্ৰ ব্যবহাৰ কবলেন। কোন এক অজ্ঞাত কাৰণে তাঁৰ মনেৰ এই পৰিবৰ্তন হয়েছিল। তিনি পীৰকে প্ৰণতি জানালেন। পীৰেৰ নামে তিনি শিৱনি দিলেন এবং তাঁৰ চিবদাস হলেন।

সত্যপীৰেৰ মাহাত্ম্য বৰ্ণনা এবং হিন্দু ও মুসলিম ধৰ্মেৰ একটা মিলনেৰ চেষ্টা এই কাব্যেৰ মূল লক্ষ্য।

বিভিন্ন পাঁচালী কাব্যেৰ প্ৰভাব এই কাব্যে সুস্পষ্ট। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্যনীয়।

পীৰ একদিন শাহ কাব্যে আছে,—আশক নুবী, ‘সান’ নদীতে স্নান কৰতে গিৰে ভেসে আসা ‘হুলাল’ ফুল পান। তাৰ ভাণে আশক নুবীৰ গৰ্ভ সঞ্চাৰ হয়। এ কাব্যেও অনুকপ ঘটনায় দেখা যায়, সন্ধ্যাবতী, এম্বৰ নদীতে স্নান কৰতে গিৰে ভেসে আসা হুলাল ফুল পান। তাৰ ভাণে সন্ধ্যাবতীৰ গৰ্ভ সঞ্চাৰ হয়।

সত্যপীৰেৰ পুৰিও স্পৰ্শে পাপীয়াসী কচ্ছবিনী মুক্তি পেয়ে স্বৰ্গে যাওঁবাৰ কাহিনী অহল্যাৰ শাপ-মোচনেৰ কাহিনীকে স্মৰণ কৰিৰে দেখ।

সত্যপীৰেৰ গলাৰ পাথৰ বেঁধে তাঁকে জলে নিক্ষেপ কৰা হল, তাতেও তাঁৰ মৃত্যু হল না। পুৰাণে বৰ্ণিত প্ৰহ্লাদেৰ চৰিত-কাহিনীৰ সংগে এক সাদৃশ্য বিদ্যমান।

সত্যপীৰ এই কাহিনী-অংশেৰ একস্থানে বলছেন,—

“বন্ধন দাকণ জালা সহিতে না পাবি।”

ননী চৌব কুক্ষেব বন্ধন জালাব কথা আমাদের মনে পড়ে। এখানে কুক্ষ-কাহিনীর প্রভাব লক্ষণীয়।

মুসলিম বিদ্রোহী মৈদানবেব পুত্রবধূর স্বথাক্রমে রূপবতী ও মালাবতী পীৰ-ভক্ত। বধূর পীরকে পূজা করলেন। মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা বিদ্রোহী চাঁদ সওদাগবের পুত্রবধূ বেহলা মনসা-ভক্ত। মানিক পীৰ কাব্যেও দেখা যায় পীৰ বিদ্রোহী এক বৃদ্ধা ঘোষ জননীর পুত্রবধূ সনকা, মানিক পীৰকে শ্রদ্ধাদি নিবেদন করেছেন।

শিওপাল রাজার পালায় দেখা যায় বাজা শিওপাল অর্ধকালী ভক্ত। তিনি নববলি দেন। সত্যপীরকে জনৈক বালকের প্রাণ রক্ষার জন্য বাজার সঙ্গে তাঁকে সংগ্রামে 'অবতীর্ণ হতে হয়েছে। পীর গোরাচাঁদ কাব্যে দেখি জনৈক মমিন এবং তার পবিবার ঠিক অনুকূপভাবে হাতিয়াগডেব অধিপতি কর্তৃক অনুসৃত বলিদান কুপ্রথাব শিকার হয়েছে। এর বিকক্ষে এবং উক্ত পবিবারের প্রাণ রক্ষার জন্য পীর গোরাচাঁদকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। অবশ্য সত্যপীরকে সংগ্রামের সাফল্যের সাথে পীর গোবাচাঁদের জায় শহীদ হতে হয় নি।

এক স্থানে হীরার কথার আছে,—

ফকিরে না কবে ক্রোধ সিধা হবে চলে,  
সহিয়া থাকিবে যেন তব্বর সামিলে।  
শুকাইয়া গেলে বৃক্ষ জল নাহি পায়,  
গাছ সম হৈতে পাবে ফকির বলি তার।

এই অংশে বৈষ্ণব প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন,—“হীরা মুচিব কাহিনীতে ধর্মপূজা পদ্ধতিব সদাই ডোমেব উপাখ্যানের প্রভাব আছে।” অতীত আছে রাজা কাশীকান্ত, সত্যপীরেব কিছু কেরামতিব পবিচর পেতে চাইলেন। সত্যপীর আপনাব স্বথায়থ পরিচর দিলেন। পীৰ গোবাচাঁদ কাব্যে দেখা যায় বাজা চন্দ্রকেতু, গোবাচাঁদের অলৌকিক শক্তির পবিচর পেতে চাইলেন। “সেক শুভোদযাব” সেককে অনুকূপ অলৌকিক শক্তির পবিচর দিতে হয়েছে।

এই কাব্যে মানব চরিত্রই প্রধান,—পশু চরিত্র প্রায় অনুপাস্ত। কোন

দেব-চবিজ্ঞ নেই। কাহিনী কিছুটা উপকথা জাতীয়। কাহিনী ঐতিহাসিক মনে হলেও বস্তুতঃ ইতিহাসের বস্তু এতে নেই। চর্যাপদের শ্রাব্য এর সাধন-ভজন প্রকাশক পদ লক্ষ্যণীয় :—

বুঝিলাম ২ গুরুকথা কহি সাব  
ফকিরেব অন্ত এই শরীর বিচার।  
পড়িলে সে পড়া নহে বুঝিলে সে হয়,  
বুঝিলে সে বড় নহে সাধনে সে পায়।  
এক গোটা তালবৃক্ষ দেখিতে সুন্দর,  
একটা ছাগল বান্ধা তলার তাহার।  
তালের শিকড় যদি ছাগলে না চাটে,  
তবে আর তালগাছেব মাঝা নাহি ফুটে।  
ছাগল চাটেন যদি তালগাছেব গোড়,  
বুঝ বাবা সত্যপীর ফকিরেব ওড়। ইত্যাদি।

সত্যপীর এই কাব্যের মূল চবিজ্ঞ। তাঁকে কেন্দ্র কবে দশটি খণ্ড কাহিনী গড়ে উঠেছে। খণ্ড কাহিনীগুলি অবশ্য এক-একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কাহিনী। বনবিবি কাব্যে অবশ্য নাবারগী জঙ্গ পালা ও ধোনা-হুখে পালা নামে দুটি খণ্ড কাহিনী আছে; মানিক পীর কাব্যে কিন্নু গোয়ালার কাহিনী ও রজনী বিবির কাহিনী নামে দুটি খণ্ড কাহিনী আছে, বড়খাঁ গাজীকে নিষে বাঘমজল কাব্য, গাজী সাহেবের গান এবং কালু-গাজী-চম্পাবতী কাব্য পৃথক পৃথকভাবে বচিত হয়েছে—কিন্তু বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কথার পুথির শ্রাব্য এতগুলি খণ্ড কাহিনী এদের আব কারো মধ্যে দেখা যায় না যাদের প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মালম্ভার পালার মুসলমান-বিদ্বেষী রাজা মৈদানবের গৃহে জন্মগ্রহণ কবে সত্যপীর তাঁকেই দমন কবেছেন।

শিশুপাল বাজার পালার দেখা যায়, অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন বাজা, অর্থকালীর পূজার নববলি দিয়ে (নব) সন্ধান কামনার উন্নত। তাঁর সেই উন্নততাকে সত্যপীর দৃঢ়তাব সঙ্গে প্রতিহত কবেছেন।

হীবা মুচিব পালার দেখা যায়—হীবা দবিজ্ঞ কিন্তু পবন অতিথি-বৎসল।



হীরা তার এই সদৃশের অনেক পরীক্ষার উত্তীর্ণ হষে সত্যপীর কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে ।

শশী বেখার পালায় দেখা যায়—হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় যাদের চিবকালের মত স্থান নেই দয়ার পীর সত্যপীর তাঁর আদর্শ মাধ্যমে সুপথে আগমনকারী শশীকে শুধু সত্যপীবেব সেবার অধিকার নষ,—সে যাতে সমাজে পূজাবিগীকপে স্থান পায় তার ব্যবস্থা করেছেন ।

জসমন্ত সাধুব পালায়, জসমন্তব ন্যায় প্রভাবককে সত্যপীর উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন । শুদ্ধি সওদাগরের পালায়ও তিনি অনুকপভাবে শুদ্ধি সওদাগবকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছেন ।

কাশীকান্ত রাজার পালায় দেখা যায় যে, বর্ণাশ্রম প্রথার অপপ্রয়োগকাবীকে, সত্যপীর উপযুক্ত শাস্তি ও শিক্ষা দিয়েছেন ।

ধনঞ্জয় গোলালার পালায় দেখা যায় ধনঞ্জয় বড় অহঙ্কারী । মানুষ হয়ে মানুষকে দ্বুণা কবার সত্যপীর তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন ।

মঙ্গলু বাদ্যকরের পালায় দেখা যায়,—ভক্ত মঙ্গলুকে সত্যপীর উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করেছেন ।

ময়েন গিদালের পালায় দেখি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে ময়েন গিদাল আপনা-আপনিই পরিবর্তিত হয়ে ধর্মবিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়েছে ।

সত্যপীবেব নামে এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত পাঁচালীকারেব কাব্যগুলিব কথা জানতে পারা গেছে :—

ক । ডঃ সুকুমার সেন কর্তৃক তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস ( ১ম খণ্ড অপরাধ ) গ্রন্থে উল্লিখিত ;—

১ । ভৈববচস্র ঘটক—১৭০০-১৭০৯

২ । ঘনরাম চক্রবর্তী—১৩৫১ সালে বর্ধমান সাহিত্য-সভা কর্তৃক প্রকাশিত ।

৩ । রামেশ্বর ( ভট্টাচার্য ) চক্রবর্তী—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ।

৪ । ফকির দাস

- ৫। বিকল চট্ট—১৬৩৪
- ৬। দ্বিজ গিবিধব—১০৭০
- ৭। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী—১০৭০
- ৮। মোজিবাম ঘোষাল
- ৯। কৃষ্ণকান্ত
- ১০। শিবচরণ
- ১১। বামশঙ্কর সেন
- ১২। দ্বিজ কৃপারাম—১৭৭৯-১৮৩২
- ১৩। কাশীনাথ ভট্টাচার্য সার্কভোয়—১৭৪০
- ১৪। দ্বিজ বামধন
- ১৫। দ্বিজ নন্দরাম—১২৩২ সাল
- ১৬। অমোধ্যাবাম রায় কবিচন্দ্র
- ১৭। দ্বিজ বামভদ্র
- ১৮। দ্বিজ বিশ্বেশ্বর—১১৫১ সাল
- ১৯। ভারতচন্দ্র রায়—১৭৩৭ ইং
- ২০। দ্বিজ জনার্দন—১১৭০
- ২১। দ্বিজ অমব সিংহ
- ২২। দ্বিজ বামচন্দ্র—উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ
- ২৩। দুর্গাপ্রসাদ ঘটক—১২১০
- ২৪। ইশান গোস্বামী—১২৫৬
- ২৫। নবহবি
- ২৬। মধুসূদন
- ২৭। দ্বিজ কালিদাস
- ২৮। দ্বিজ বিশ্বনাথ
- ২৯। গোবিন্দ ভাগবত
- ৩০। শিবচন্দ্র সেন
- ৩১। বিপ্রনাথ সেন
- ৩২। দ্বিজ বামকিশোর

- ৩৩। লাল। জয়নারায়ণ সেন  
 ৩৪। দ্বিজ বামানন্দ  
 ৩৫। দ্বিজ বসুনাথ—১২৬৬  
 ৩৬। দ্বিজ রামকৃষ্ণ  
 ৩৭। ফকিবচাঁদ  
 ৩৮। দ্বিজ দীনরাম—‘অবসর’ পত্রিকায় ১৩১২ কাশ্মির সংখ্যা।  
 ৩৯। নয়নানন্দ  
 ৪০। দ্বিজ রঘুবাম  
 ৪১। দ্বিজ হবিদাস  
 ৪২। বিজয় ঠাকুর  
 ৪৩। শিবরাম বাজা  
 ৪৪। দেবকীনন্দন  
 ৪৫। গঙ্গাবাম  
 ৪৬। শিবনারায়ণ  
 ৪৭। কুমুদানন্দ দত্ত  
 ৪৮। মুক্তারাম দাস—১১৮৭ সাল  
 ৪৯। বিদ্যাপতি—১০৯০ মল্লাব্দ  
 ৫০। বল্লভ (শ্রীকবি বল্লভ)—১২২২, বল্লভ দাস ষড়ঙ্গ কবিও হতে পাবেন।  
 ৫১। কিল্লব,—ভনিতায় শঙ্করও পাওয়া যায়  
 ৫২। ফকির বাম—১২০৫  
 ৫৩। কৃষ্ণবিহাবী  
 ৫৪। আবির—১২৫৩  
 ৫৫। দ্বিজ গুণনিধি  
 ৫৬। লালমোহন—১২৫৩, চন্দ্রকেতু পাল।  
 ৫৭। দয়াল—শঙ্কর গুডা পাল।  
 ৫৮। কৈজুলা  
 ৫৯। শঙ্কর আচার্য—১০৬২ মল্লাব্দ। শঙ্কর আচার্যের ভনিতায় এক ছোট  
 পৃথক পাঁচালীও পাওয়া যায়। লিগিকাল—১২৫২  
 ৬০। কৃষ্ণহরি দাস—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ।

খ। আক্কেল কবিম সাহিত্য-বিশাব্দ কর্তৃক তাঁর পুঁথি পরিচিতি গ্রন্থে  
উল্লিখিত—

- ১। ওয়াজেদ আলি
- ২। লেংটা ফকির—উনবিংশ-বিংশ শতাব্দী
- ৩। শেখ ভনু—অষ্টাদশ শতাব্দী
- ৪। সেববাজ চৌধুরী—অষ্টাদশ শতাব্দী
- ৫। গবীবুল্লাহ

গ। পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর পুঁথি পরিচয়ে উল্লেখ কবেছেন,—

- ১। খোকনরাম দাস—১০৮৭
- ২। অজ্ঞাত—১১০৪
- ৩। অজ্ঞাত—১১৩১
- ৪। দ্বিজ রামপ্রসাদ—১১৩৫
- ৫। অজ্ঞাত—১১৪৩
- ৬। অজ্ঞাত—১১৪৮
- ৭। অজ্ঞাত—১১৬২
- ৮। অজ্ঞাত—১২১২
- ৯। অজ্ঞাত—১২৮২
- ১০। অজ্ঞাত—১২৪৮
- ১১। অজ্ঞাত—১৩০১
- ১২। হবেকুয়া দাস চক্রবর্তী—১৩১২
- ১৩। অজ্ঞাত—১৩১৬
- ১৪। অজ্ঞাত—১৩৭০

ঘ। আরো যে সমস্ত পাঁচালীর সন্ধান পাওয়া গেছে,—

- ১। রত্ননাথ সার্বভৌম ৫৩
- ২। তাবিগী শঙ্কর ঘোষ ৫৩
- ৩। নন্দবাম মিত্র ৫৩
- ৪। দ্বিজ শুকদেব ৩
- ৫। বেচারাম ৫৩
- ৬। কৌতুকরাম চট্টোপাধ্যায় ৫৩
- ৭। কালাচাঁদ ৫৩

- ৮। অজ্ঞাত ৫৩  
 ৯। অজ্ঞাত ৫৩  
 ১০। জৈমিনী ৫৩  
 ১১। কালীচরণ ৫৩  
 ১২। মথুরেশ ৫৩  
 ১৩। নারেক মন্সাজ গাজী ২৯  
 ১৪। বামানন্দ ২৯

৬। বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ গ্রন্থতালিকা অনুসারে,—

- ১। সত্যনাবায়ণ ইতিহাস ও জীবনী (বচনা ঘনবাহু কবিবহু)—  
 সম্পাদনায় মহেন্দ্রনাথ ঘোষ  
 ২। সত্যনাবায়ণ কথা মঙ্গলনাথ শ্রুতিবহু  
 ৩। সত্যনাবায়ণ পাঁচালী  
 ৪। সত্যনাবায়ণ ব্রতকথা অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ  
 ৫। সত্যনাবায়ণ ব্রতকথা মেঘনাদ ভট্টাচার্য  
 ৬। সত্যনাবায়ণ ব্রতকথা যোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ  
 ৭। সত্যনাবায়ণ ব্রতকথা রাধানাথ মিত্র  
 ৮। সত্যনাবায়ণ ব্রতকথা সর্বোজ্জ্বল চক্রবর্তী  
 ৯। সত্যনাবায়ণ ব্রতকথা সুবনাথ ভট্টাচার্য  
 ১০। সত্যনাবায়ণ সেবার পাঁচালী হৃদয়বনচন্দ্র চক্রবর্তী  
 ১১। সত্যনাবায়ণ পাঁচালী প্রঃ গুরুচরণ নাথ  
 ১২। সত্যনাবায়ণ পাঁচালী জগদ্বন্ধু বিদ্যাবিনোদ  
 ১৩। সত্যনাবায়ণ পাঁচালী দুর্গাপ্রসাদ ঘটক  
 ১৪। সত্যনাবায়ণ পাঁচালী সঃ বাদবেশ্বর ভট্টবহু  
 ১৫। সত্যনাবায়ণ পাঁচালী সঃ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত  
 ১৬। সত্যনাবায়ণ পাঁচালী বমণীমোহন গুপ্ত  
 ১৭। সত্যনাবায়ণ পাঁচালী বাধামণি গঙ্গোপাধ্যায়  
 ১৮। সত্যনাবায়ণ পুস্তক বীৰচন্দ্র চক্রবর্তী  
 ১৯। সত্যনাবায়ণ ব্রতকথা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত  
 ২০। সত্যপথ বা সত্যনাবায়ণ ব্রতকথা হ্রদীকেশ দত্ত  
 ২১। সত্যপীর ব্রতকথা গদগতি চক্রবর্তী

- ২২। সত্যপীৰেৰ কথা সঃ নগেন্দ্ৰনাথ শুপ্ত  
 ২৩। সত্যমণ্ডল বা সত্যনাৰায়ণ লীলা বাজকৃষ্ণ বাথ  
 ২৪। সত্যনাৰায়ণ বা সত্যপীৰেৰ পাঁচালী দ্বিজ কৃষ্ণধন।

৫। নিম্নলিখিত দুইখানি পাঁচালীৰ সন্ধান পাওঁৱা গৈছে ;—

- ১। সত্যনাৰায়ণেৰ পাঁচালী সম্পাদনা কালীপ্ৰসন্ন বিদ্যাবত্ৰ  
 ২। সত্যনাৰায়ণ দেবেৰ পাঁচালী সম্পাদনা কুমুদ বিহাৰী বসু  
১৯৩৪ ইং।

বলাবাহুল্য কত শত কবি কৰ্তৃক যে প্ৰায় তিন শত বছৰ ধৰে সত্যপীৰেৰ পাঁচালী বা সত্যনাৰায়ণেৰ পাঁচালী বচিত হ'বোঁছিল তাৰ আজো ইয়ত্তা হয় নি। সত্যপীৰেৰ বাহাৰ্য্য প্ৰচাৰ এই সব পাঁচালীৰ মূলগত উদ্দেশ্য হলেও কাহিনীগত এক সৰ্ব্বত্ৰ দৃষ্ট হয় ন'।

সত্যপীৰ পাঁচালীৰ শতাধিক বচনিতাব প্ৰাচীনতম কে তা আজো নিৰ্ণীত হয় নি। কেহ মনে কবেন কবি কয়জুৱা বচিত সত্যপীৰেৰ পাঁচালীই প্ৰাচীনতম। ৩৪ ডঃ এনাথুল হক্ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দেৰ মাসিক মোহান্মলী পত্ৰিকাৰ (ভাষ্য) লিখেছিলেন,—

এবে কহি সত্যপীৰ অপূৰ্ব কথন  
 মুনি বস বেদ শশী শাকে কহি সন।

ডঃ মুকুমাৰ সেন লিখেছেন যে 'মুনি বস বেদ শশী' পাঠ নিশ্চয়ই জাত, শুদ্ধ পাঠ 'মুনি বেদ বস শশী' হবে। সত্যপীৰেৰ সবচেয়ে পুৰানো পাঁচালীগুলি হচ্ছে ভৈৰবচন্দ্ৰ ঘটকেৰ, যনবাম চক্ৰবৰ্ত্তীৰ, বামেশ্বৰ (ভট্টাচাৰ্য্য) চক্ৰবৰ্ত্তীৰ, ককিৰাম দাসেৰ ও বিকল চট্টেৰ। বৰ্থমান জেলাৰ সাহাবাদ পৰগণাৰ অন্তৰ্গত ভাকহা গ্ৰাম নিবাসী দ্বিজ গিৰিধৰেৰ নিবন্ধ ১০৭০ সালে লেখা হ'বোঁছিল, অগ্নিকাচৰণ ব্ৰহ্মচাৰীৰ মতে। ১০৭০ বঙ্গাব্দ না হলে এইটাই প্ৰাচীনতম পাঁচালী। তবে এই ভাবিখের যথার্থতাৰ প্ৰমাণ নাই। ৪১

সত্যপীৰেৰ নামে বহু পাঁচালী কাব্য বচিত হ'বোঁছে শুধু তাই নয়,—অনেক লোককথাও প্ৰচাৰিত আছে। উত্তৰ চব্বিশ পৰগণা জেলাৰ বাবাসত মহকুমাৰ অধীন কালসবা গ্ৰামে সত্যপীৰেৰ যে স্থায়ী থান বা দৰগাহ আছে সেখানকাৰ একটা লোককথা এখানে প্ৰদত্ত হল,—

সত্যপীর ছদ্মদেশী এক ভ্রাম্যমান ফকির। কৃষ্ণনগরের বাজার ভবক-  
থেকে নাকি ফকিরকে আদেশ দেওয়া হয় :—কালসরা অঞ্চলের প্রজাগণের  
বকেয়া খাজনার হিসাব সংগ্রহ করে অবিলম্বে রাজদরবারে পাঠাও।  
সংসার-বিরাগী ফকির এতে বিম্বুদ্ধ হলেন। তিনি রাজ-আদেশ মানলেন  
না। অনেক দিন পরে রাজ-প্রতিনিধি রাজস্ব আদায়ের জন্য নিজে এলেন।  
কালসরা গ্রামে। এসেই তিনি ধোঁজ কবলেন সেই ফকিরকে।

ফকিরকে ডাকতে গেল লোকে। ইতিমধ্যে অনেক লোক জমে গেছে  
সেখানে। রাজ-প্রতিনিধিও পেয়েছে পিপাসা। তিনি ডাব খেতে চাইলেন।  
কাছেই ছিল ডাব-গাছ। গাছটি এত উঁচু যে কেউ তাতে উঠতে বাজী হল না।  
ভীড়ের মধ্য থেকে বেবিরে এলেন এক ফকির। তিনি বললেন,—আমি  
আপনার পিপাসা নিবাবনের জন্য ডাবের ব্যবস্থা করতে পারি।

রাজার প্রতিনিধি পিপাসায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন,—  
তাই কবো।

ফকির ডাব-গাছকে অবনত হতে বললেন। আশ্চর্য! তখনই ডাব-  
গাছ অবনত হল। রাজ-প্রতিনিধি বিস্মিত হলেন।

গাছ থেকে ডাব পাড়া হল। রাজ-প্রতিনিধি তাব স্নিগ্ধ জল পান করে  
তৃপ্ত হলেন। ফকিরকে তিনি অন্য কথা বললেন না; শুধু অনুবোধ  
কবলেন,—আপনি অনুগ্রহপূর্বক একদিন রাজ-দরবারে আসুন,—আমবা  
খুবই খুশী হব।

কিছুদিন পরে ফকির রাজ-দরবারে গিয়েছিলেন। তিনি নাকি দেওয়ালের  
উপর সওয়ার হয়ে যাওয়ার তাঁর সেই অলৌকিক শক্তি দেখে সকলে  
আরো বিস্মিত হন।

-----

## পরিশিষ্ট

### বাংলা পৌর-সাহিত্যের গ্রন্থতালিকা

#### [ ক ] পৌর-কাব্য

- ১। আদমখোঁব আকানন্দ-বাকানন্দের পুথি : আবদুল লভিক
- ২। কালু-গাজি-চম্পাবতী : মহম্মদ মুনশী সাহেব
- ৩। কালু-গাজি-হামিদিয়া : অজ্ঞাত
- ৪। কালু-গাজি-চম্পাবতী : আবদুল গফ্ফর
- ৫। গোরাচাঁদ পাঁচালী : শেখ লাল ও শেখ জয়নদ্দিন
- ৬। বগশন বিবির পুথি : অজ্ঞাত
- ৭। গাজী-কালু-চম্পাবতী কস্তাব পুথি : আবদুর বহিম
- ৮। গাজী সাহেবেব গান : কলেমদী গারেন (নগেজনাথ বসু সংকলিত)
- ৯। গাজী-কালু-চম্পাবতী : গোলাম খয়র ও আবদুর রহিম
- ১০। তরিকানে কাদেরিয়া ও পৌর গোরাচাঁদের পুথি  
: মহম্মদ ওমর আলি ওরফে রামলোচন বোহ
- ১১। তিতুমীরেব গান : সাজন গাজী
- ১২। পৌর গোরাচাঁদ পাঁচালী : মহম্মদ এবাদোল্লা
- ১৩। পৌর একদিল শাহ্ পাঁচালী : আশক মহম্মদ
- ১৪। ফাতেমার সুবতনামা : শেখ তন্
- ১৫। ফাতেমার সুবতনামা : শেখ সেবাজ চৌধুরী
- ১৬। ফাতেমার জহরানামা : আজমতুল্লাহ খোন্দকার
- ১৭। ফাতেমার সুবতনামা : কাজী বদিউদ্দীন
- ১৮। বাদশাহ্ আজাউদ্দীন ও পেরাবশাহের পুথি  
: মোহম্মদ আবদুল বাবি
- ১৯। বিবি ফাতেমার বিবাহ : অজ্ঞাত
- ২০। বোনবিবির জহরানামা : মোহম্মদ মুনশী
- ২১। বোনবিবি জহরানামা : মুনশী মোহম্মদ বাতের





৫০।	”	”	বিকল চট্ট
৫১।	”	”	দ্বিজ গিরিধর
৫২।	”	”	মৌজিরাম ঘোষাল
৫৩।	”	”	কৃষ্ণকান্ত
৫৪।	”	”	শিবচরণ
৫৫।	”	”	রামশঙ্কর সেন
৫৬।	”	”	দ্বিজ কৃপারাম
৫৭।	”	”	কাশীনাথ ভট্টাচার্য
			সার্করভৌম
৫৮।	”	”	দ্বিজ রামধন
৫৯।	”	”	দ্বিজ নন্দবাম
৬০।	”	”	অমোধ্যাবাম রায়
			কবিচন্দ্র
৬১।	”	”	দ্বিজ বিশ্বেশ্বর
৬২।	”	”	ভাবভচন্দ্র বার
৬৩।	”	”	দ্বিজ জনার্দন
৬৪।	”	”	দ্বিজ অমর সিংহ
৬৫।	”	”	দ্বিজ রামচন্দ্র
৬৬।	সত্যদেব সংহিতা কাব্য	:	দ্বিজ রামধন
৬৭।	সত্যপীরের বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী	:	হর্গাপ্রসাদ ঘটক
৬৮।	”	”	ঈশান গোস্বামী
৬৯।	”	”	নবহবি
৭০।	”	”	মধুসূদন
৭১।	”	”	দ্বিজ কালিদাস
৭২।	”	”	দ্বিজ বিশ্বনাথ
৭৩।	”	”	গোবিন্দ ভাগবত
৭৪।	”	”	শিবচন্দ্র সেন
৭৫।	”	”	দ্বিজ রামকিশোর
৭৬।	”	”	লালা জয়নারায়ণ সেন
৭৭।	”	”	দ্বিজ রামানন্দ
৭৮।	”	”	দ্বিজ রঘুনাথ

৭৯।	”	”	দ্বিজ রামকৃষ্ণ
৮০।	”	”	ককিচাঁদ
৮১।	”	”	দ্বিজ দীনরাম
৮২।	”	”	নয়নানন্দ
৮৩।	”	”	বসুবাম
৮৪।	”	”	দ্বিজ হরিদাস
৮৫।	”	”	বিজয় ঠাকুর
৮৬।	”	”	শিবরাম রাজা
৮৭।	”	”	দেবকীনন্দন
৮৮।	”	”	গঙ্গারাম
৮৯।	”	”	শিবনারায়ণ
৯০।	”	”	কুমুদানন্দ দত্ত
৯১।	”	”	মুক্তারাম দাস
৯২।	”	”	বিদ্যাপতি
৯৩।	”	”	বল্লভ ( শ্রীকবিবল্লভ )
৯৪।	”	”	কিঙ্কর ( ভগিনী শঙ্কর )
৯৫।	”	”	ককিরাম
৯৬।	”	”	কৃষ্ণবিহারী
৯৭।	”	”	দ্বিজ গুণনিধি
৯৮।	”	”	লালমোহন
৯৯।	”	”	দয়াল
১০০।	”	”	ওষাজেদ আলি
১০১।	”	”	শঙ্কর আচার্য্য
১০২।	সত্যপরের ব। সত্যনাথরশেব গাঁচালী :		লেংটা ককির
১০৩।	”	”	শেখ তনু
১০৪।	”	”	সেববাজ চৌধুরী
১০৫।	”	”	গবীন্দ্রলাহ
১০৬।	”	”	খোকনবাম দাস
১০৭।	”	”	অজ্ঞাত
১০৮।	”	”	অজ্ঞাত
১০৯।	”	”	অজ্ঞাত
১১০।	”	”	অজ্ঞাত

১১১।	„	„	অজ্ঞাত
১১২।	„	„	অজ্ঞাত
১১৩।	„	„	দ্বিজ বামপ্রসাদ
১১৪।	„	„	অজ্ঞাত
১১৫।	„	„	অজ্ঞাত
১১৬।	„	„	অজ্ঞাত
১১৭।	„	„	হৰেকৃষ্ণ দাস চক্ৰবৰ্তী
১১৮।	„	„	অজ্ঞাত
১১৯।	„	„	অজ্ঞাত
১২০।	„	„	রঘুনাথ সার্বভৌম
১২১।	„	„	তারিণীশঙ্কর ঘোষ
১২২।	„	„	নন্দবাম মিত্র
১২৩।	„	„	দ্বিজ শুকদেব
১২৪।	হজৰত শাহ মোম্বলেৰ পুথি : মুনশী কাসিম উদ্দীন		
১২৫।	হজৰত সৈয়দ শাহ। মোবারক গাজী সাহেবেৰ সংক্ষিপ্ত জীবনী : নূর মহম্মদ দেওৱান।		

১২৬। শত্ৰুপুৰাণ ( নিরঞ্জনেন কৰ্ম ) : বামাই পণ্ডিত

১২৭। দম মাদার : আলী খোন্দকার

[খ] পীৰ গদ্য-বচন।

১। খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তী : মৌলভী আজহাব আলী

২। খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তী : আবদুল ওয়াহীদ কাসেমী

৩। তিতুমীৰ ও নাবিকেলবেডিৰাৰ লভাই : বিহাবীলাল সবকাৰ

৪। ধন্য জীবনেৰ পুণ্য কাহিনী : আবদুল আজিজ আল আমীন

৫। ফুৰফুৰা শৰীফেৰ ইতিহাস ও আদৰ্শ জীবনী :

গোলাম মহম্মদ ইব্রাহিম

৬। বালান্তাৰ পীৰ হজৰত গোবাৰ্চাদ বাজী : আবদুল গফ্ফর সিদ্দিকী

৭। বাইশ আউলিয়ার পুথি : বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় ওৱকে শামসুল হক্

৮। বাউল বাজাৰ প্ৰেম : পৱেশ ভট্টাচাৰ্য

৯। মেৰেদেৰ ভক্তকথা : পণ্ডিত গোপালচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য

১০। শহীদ তিতুমীৰ : আবদুল গফ্ফর সিদ্দিকী

১১। সৰ্গাই সিৰাজ বা লালন ককিব : শ্ৰীদেবেন নাথ

১২। হজরত বড়পীরের জীবনী : মোলভী আবদুল মজিদ

১৩। হজরত বড়পীরের জীবনী ও আশ্চর্য কেবামত :

মোলভী আজহার আলি

১৪। হজরত বড়পীরের জীবনী : কাজী আশরাফ আলি

১৫। হজরত ফাতেমা : মনির-উদ্দীন ইউসুফ

১৬। হজরত ফাতেমা : মনির-উদ্দীন ইউসুফ

১৭। হজরত সৈয়দ মোবারক শাহ সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান

: নোবমোহন সেন

১৮। ফুরফুরার হজরত দাদাপীর সাহেবের বিস্তৃত জীবনী

: মোলানা কহল আমিন

১৯। বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী ( প্রথম সংস্করণ ১৩৪২ বাং )

: মোলানা কহল আমিন

২০। তাপস সন্ধানে—হজরত শাহ্ ছকু দেওরানী : মহম্মদ আবু হোসেন

### [ গ ] পীর নাটক

১। কালু-গাজী-চন্দ্রাবর্তী : সতীশচন্দ্র চৌধুরী

২। কালু-গাজী : হাছাম উদ্দীন

৩। গোরাচাঁদ ও চন্দ্রকেতু : হরমুজ আলী

৪। তিতুমীর : শ্রামাকান্ত দাস

৫। বাঁশের কেল্লা : প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

৬। বনবিবি : সতীশচন্দ্র চৌধুরী

৭। সাঁই সিরাজ বা লালন ককির : শ্রীদেবেন নাথ

৮। শহীদ তিতুমীর : বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত নাটক

## গ্রন্থ নির্যণ্ট

অন্নদামঙ্গল ৪৬৫

অভিনয় ১১০

আজাদ ( পত্রিকা ) ১৩৬

আল্লোপনিষদ্ ৪৫০

ইসলামি বাংলা সাহিত্য ২৮৫, ৩২২

এক্স পত্রিকা ৮

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ( ১৯৭৫ ) ৩৩৪, ৪৪৭, ৪৪৯

কোরাণ প্রচার ২৮

কথোপকথন ৭৫

কুশদহ ( পত্রিকা ) ১৫১, ৩৩০

কালু গাজী চন্দাবতী ২৪৮—৬১, ২৮৯

কালু গাজী ২৬৯-৭০

কালু গাজী হামিদিয়া ২৮৯

কিতাব্ আত্-তহকীক আল-হিন্দ ৬

কুশদহের ইতিহাস ১৪৮, ১৭২

কালিকামঙ্গল ৪৬৫

খাজিনাতুন আফসিয়া ১০৭

খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তী ১৮, ১০৬

খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তীর জীবনী ১০০. ১০৫

খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদীপ কাহিনী ১৭২, ১৮৫

গণস উল্ আজম ৩০১

গোড কাহিনী ১০৭

গোরাচাঁদ ও চন্দ্রকেতু ১২৯

গাজী সাহেবের গান ১৩৫, ২৬৪-৬৯, ২৮৯

গাজীর গীত ২০৪

গাজী কালু-চম্পাবতী কণ্ঠ্য পুঁথি ২৩০-৪৮

গাজী-কালু-চম্পাবতী ২৭০

গাজী বিজয় ২৮৯

গাজীর পুঁথি ২৮৯

গোলরঙশন বিবির পুঁথি ৩৩০

গোড়ের ইতিহাস ৪৪৯

গজাফক ৪৬৫

চন্দ্রকেতু ও গোরচাঁদ ১২৯, ১৪২-৪৪

চর্যপদ ৩৩৭

ছোলতান বলশি ৩৫০

জোবেদা খাতুনের বোজানামা ২০৬

জামাই-বাবিক ১৬, ৪১৮

জঙ্গম ( পত্রিকা ) ১৬০

ডাকা রিভিউ ৯৮

তিতুমীর ১৮, ১৭৮—১৯২

তিতুমীর ও নাবিকেল বেড়িয়ার লড়াই ১৭৯

তিতুমীরের গান ১৮৩—৯০

জিনাথের পাঁচালী ২৮৩—৮৫

দমদামার ৩২২—২৬

ঈশ্বর জীবনের পুণ্য কাহিনী ১৭, ১০৭, ৭৮, ৯১, ১৯৬

নাগফক ৪৬৫

পূর্ব-পাকিস্তানের সুফী সাধক ৬

পীৰ গোবাচাঁদ ( পাঁচালী ) ১৩, ৩৬, ১২৮, ১২৯-৩৫, ১৬২

পুঁথির ফসল ১৬

পীর একদিল শাহ কাব্য ১৭, ১৯, ৪০, ৫০, ৭৭, ১২৮,  
১৩৪, ২২২

পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলামের আলো ৪০, ২২০

পুঁথি পবিচিতি ৭৪, ৭৫

পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা ১২৫, ২২৭, ৩১৪

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ৩১৫

পাঁড়ষার কেছা ৩৪৮-৫০

ফাতেমাব স্মৃতি নামা ২০৬

ফুৰফুৰা শবীফেব ইতিহাস ও আদৰ্শ জীবনী ১৮,

১৯৬—২০০

ফুৰফুৰাব দাদাপীৰ সাহেব কেবলার বিস্তাৰিত জীবনী ১৯৬

ফাতেমাব জহ্বানামা ২০৬

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪৬৫

বেঙ্গল সেটেলমেন্ট রেকর্ড ৩৪, ৪৫৯

বাক্সালাৰ ইতিহাস ৬

বাঙালী সংস্কৃতির রূপ ৯

বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস ১৬

বড সত্যপীৰ ও সন্ধ্যাবতী কন্তার পুঁথি ১৭, ১৩৪, ৪৬৯, ৮৯

বনবিবি ৪০৯, ১৭, ২৪৯

বাঁশেব কেলা ১৮, ১৮১-৮৩

বালাগুৱাৰ পীৰ হজরত গোৱাটাদ বাজী ৩৭, ১২৯, ১৩৬, ৪২

১৮১, ২৮৯

বাংলা সবকারের গেজেট ৭২

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৭৪, ১৭২, ৩৩০, ৪৪৭

বভৰ্মা গাজী ৭৫, ৭৬, ২৮৯

বিশ্বকোষ ৯৮

বেতাৰ জগৎ ১১২

বাংলা সাহিত্যেৱ কথা ১৪৯

বিবি ফাতেমাব বিবাহ ২০৬

বাউল বাজার প্রেম ৩৩৫, ৩৪০

বাংলাৰ প্ৰাচীন পুঁথিৰ বিবৰণ ৩৮২

বনবিবি জহ্বানামা ৪১২

ভাৰতের ইতিহাস ১৭৮, ১৮০

ভাবতীৰ মধ্যযুগে সাধনাৰ ধাৰা ৮

ভাবতেব মুসলমান ১৭৮

ভাবতে আধুনিক ইসলাম ১৭৮

ভাৰতেব কৃষক-বিদ্ৰোহ ও গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম ১৭৬



- মিহির (পত্রিকা) ৭৫, ৭৬, ১৪৫-৪৮  
মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ ৬  
মিজান (পত্রিকা) ১২, ১৮, ১৪৮, ১৯৪  
মেয়েদের ব্রতকথা ১৮  
মনসা বিজয় ৭৪  
মুক্তির সন্ধানে ভারত ১৮০  
মানিক পীরের জহুরানামা ২২৩  
মৈমনসিংহ গীতিকা ৪৪৮  
মহম্মদী গীত ৩১৬  
মহম্মদী পুথি ৩১৭  
মসনদ আলী ৩১৯  
মা বরকতের মেজমানি ৪১৩  
মানিক পীরের গীত ৪১৭, ৪২৩  
মানিক পীরের গান ৪২২  
মোবারক গাজীর কেছা ২৮৯, ৪১৭, ৪২৩  
মশোহর-খুলনার ইতিহাস ১৪৮, ১৫১, ১৭০, ২০১, ২০৩  
রাসমঙ্গল ৭৪, ১৩৫, ২৫৪, ২৬১-৬৪, ২৮৮  
রসমঞ্জরী ৪৬৫  
লালন কবির ৩০, ১৯২, ৩৩৪-৩৫, ৩৪০-৪২  
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২৯  
শহীদ ভিড়ুমীর ১৭৮-৮৯  
শূদ্র পুরাণ ৩২১, ৪৪৮  
সত্যপীর/সত্যনারায়ণের পাঁচালী ১৮, ৪৫৩-৪৭০  
সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ ১, ৫, ৩৩, ১০৭, ১০৮, ২২০, ২২৩, ৩২১  
সাধক দারা শিকোহ ৭, ৮  
সাংস্কৃতিকী ২৯  
সাঁই সিরাজ ৩০, ১৯২, ৩৩৪-৩৫, ৩৪০-৪২  
সেক শুভোদয়া (সংস্কৃত) ৭২, ১৩৪, ১৫২  
সন্নাকুল আখতার ১০৭, ১০৮  
সুন্দরবনের ইতিহাস ১৫২

সত্যপ্রকাশ ১৪৮, ৩১২

সাক্ষি সুলতান ৩৪৮-৫০

সাতবিবির গান ৩৭৫

হবিলীলা ৪৪৭

হজবত ফাতেমা ১৭, ১৮, ২১০-১৭

হজবত গাজী সৈয়দ মোবাবক আলী শাহ সাহেবেব

জীবন চরিত্রখান ১৮, ২৭১-৮১

হজবত বড় পীরেব জীবনী ১৮, ৩০১-১০

হজবত একদিল শাহের জীবনী ১৮

হুতোম পৌঁচাব নকশা ২৯

হুগলী জেলাব ইতিহাস ও বঙ্গ-সমাজ ১৯৩

হজবত ফাতেমা জোহরাব জীবনচরিত ২০৬-১০, ২১৭

হজবত সৈয়দ শাহা মোবাবক গাজী সাহেবেব

সংক্ষিপ্ত জীবনী ২৮১-৮৫

হজরত বড় পীরের গুণাবলী ৩০১, ৩০৪

হজবত বড় পীরেব জীবনী ও আশ্চর্য্য কেরামত ১৮

হজবত ফাতেমা ১৭, ২০৬

হজবত মোহাম্মদ মোস্তাফার জীবনচরিত ২০৭

হিজলীৰ মসনদ-ই আলা ৩১৬, ৩১৯

## গ্রন্থ নির্ঘণ্ট ( ইংরাজী )

Akbarnama ৪০

Life of Mahmmad ২৮

Notes on Arabic and Perrian Inscription in the

Hooghly District ২৮৬

.Sufi saints and shrines in India ১

Bengal Settlement Record ৩৪

## গ্রন্থকারসহ অন্যান্য ব্যক্তি-নির্ঘণ্ট

( ১ )

অরবিন্দ পোন্ধার ৬  
 অনুকূলচন্দ্র দাস ৩৭  
 অমূল্যচরণ দাস ৯৬  
 অনিল ভট্টাচার্য্য ১৮১  
 অকণ্ঠচন্দ্র চৌধুরী ৪১২  
 অক্ষয়কুমার কন্ঠাল ৪৫৫  
 অমরনাথ চৌধুরী ৪১২  
 আবদুল ওয়াহিদ আল কাশেমী ১০৬  
 আবু ইশহাক চিশতী ১০৮  
 আকবর ১০৫, ১০৯, ৪৫০  
 আবদুল ওয়াহাব ৩৬  
 আবদুল গফ্ফর সিদ্দিকী ৭৪, ৭৭, ১১২,  
 ১৩৫, ১৮১, ২৮৭  
 আকবাম খাঁ ৬  
 আজহার আলি ১৮, ১০৫  
 আবদুর রহিম ২৭০  
 আবদুল কবির ( সাহিত্য বিশারদ )  
 ৭৪, ৭৬, ১৫১, ৪৪৭, ৪৯৫  
 আবদুর বহমান সিদ্দিকী ১১০  
 আলবেকগী ৬  
 আশক মহম্মদ ২৪, ৭৫  
 আবদুল আজিজ আল আমীন ১৭,  
 ৭৮, ৯১, ১০৭, ১৯৬  
 আদম শহীদ ৪, ৩৪  
 আবদুল কাদের জিলানী ১৫

আনোয়ার আলী ৪৬  
 আহম্মদ আবদাল ১০৮  
 আবদুল ওহুদ ১১৫  
 আবদুস সুকুব ১১৫  
 আবদুল আজীজ ১১৮  
 আবদুর বসুল ১৩৬  
 আলাউদ্দীন খিলজী ১৫০, ১৫১  
 আবুল ফজল মহম্মদ আবদুল ১৫২  
 আজমতুল্লাহ খোন্দকার ২০৬  
 আজিজ দেওয়ান ২২৬  
 আভিলাব বহমান ২৬৯  
 আশরাফ আলী ১৮  
 আবদুল ওয়াহীদ ১৮  
 আরিক ২৪, ৪৬২  
 আবাল সিদ্দিকী ৩৬-৩৯  
 আছাদুর রহমান ৩৭  
 আহম্মদ উল্লাহ ৪০  
 আজিজাব বহমান ৭৪  
 আবদুল করিম ( ডঃ ) ১০৭  
 আবুবকর সিদ্দিকী ১৯৩  
 ( ফুরফুরা )  
 আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী ২২০  
 আবদুল মজিদ ৩৫০  
 আজিব মোল্লা ৩৬৬  
 আহম্মদ শবীক ৩৭৩

আজিবৰুৱা ৩৮০  
ইব্রাহিম ৪  
ইমাম মালিক ৪  
ইখতিয়াৰ-উদ্দীন বখতিয়াৰ ৫  
ইব্রাহিম শৰ্কী ২২০  
ঈশ্বৰচন্দ্ৰ গুপ্ত ২৬, ৪৬৪, ৪৯৬  
ইবাহিবা ৩৩  
ইবন বতুতা ১৫২  
ইমাম হোসেন ২  
ইউনুস বিশ্বাস ৩৯০  
উইলিয়াম কেৰী ৭৫  
উবয়দুল হক ২১৯  
ইল্হনাৰাষণ চৌধুৰী ৪৬৫  
এনাথুল হক ১৭৯, ৩২১, ৪৯৭  
এইচ. ৱকম্যান ২৮৬  
একদিল ৪০—১১  
এসাবত মণ্ডল ৩৮০  
এককব আলি ৩৮৭  
এসাবত শাহজী ৪৫১  
ওৱাসা ২  
ওমালী ৭২  
ওলাবিবি ৩৭৩-৭৭  
কলেমঙ্গী গায়েন ২৬৪  
কৃষ্ণচৰণ পণ্ডিত ১৮  
কৃষ্ণবাম দাস ৭৪, ২৬১, ২৮৮  
কৃষ্ণহৰি দাস ১৭, ৪৪৯  
কতিবা ২  
কেবামত আলি ২৭  
কৃষ্ণচন্দ্ৰ বাৰ ৩৪, ৪৩, ৪৫২, ৪৬৫  
কাজী আজিজাৰুৱা ৪৩, ৫০  
কান্ত দেওবান ৯২

কালু গাজী ৯৬  
কুতুবুদ্দীন বখতিয়াৰ কাকী ১০৫  
কসিমুদ্দীন শাহজী ১২৩  
ক্যাণ্টোৱেল শ্বিথ ১৭৮  
কাজী বদিউদ্দীন ২০৬  
ক্ষেত্ৰমোহন তেওঁযাবী ৪২  
কামদেব বাৰ ১৬৫  
কালীপ্ৰসন্ন মুখোপাধ্যায় ১৮৯  
কাজী আশৱক আলি ৩০৮  
কাজী গোলাম ৱহমান ৩৫১  
কালু মণ্ডল ৩৮০  
কালিপদ বোৰ ৩৮৯  
কফিলদিন ৪৩৭  
ৰাজা মৈনুদ্দীন চিশ্ৰুতি ৫, ১০০-১০৮  
খুঁড়ি বিবি ৭৮-৮১  
খোদা নেওৱাজ ১৩১  
খোন্দকাৰ আহম্মদ আলী ২৮৮  
গোপাল হালদাৰ ৮  
গোপালচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য ১৮  
গোপেন্দ্ৰকৃষ্ণ বসু ৩৭৫, ৩৭৭  
গোলাম মহম্মদ ইল্লাছিন  
১৮, ১৯৬, ৩৫০  
গোবাৰ্চাদ ১১১-৬০  
গোবমোহন সেন ১৮, ২৭১-৮১  
গোবা সইদ ১৬২  
গোলাম মোস্তাফা ১৬১  
গোলাম মাওলা সিদ্দিকী ১৩৫  
গিয়াসুদ্দীন ১৪৯, ২৮৭  
গাজী সাহেব/গাজী বাবা ২২৪  
চাঁদ বা ৪১, ৭৯  
চৈতন্য দেব ১৪

চম্পাবতী ১৬৫  
 ছানাদ আলি খোন্দকাব ৩২২  
 ছেকু দেওয়ান ৩৪৩-৪৪  
 জনিদ ২  
 জাহাঙ্গীৰ ১১০  
 জাফর খাঁ ২০৪, ২৮৭  
 জাহাঙ্গীৰ সিমনানী ২২০  
 জেহেব আলি পাভ ২৬৯  
 জমায়ত আলী কান ৪৭  
 জইদি ২২৩, ৪৪৫  
 জসিমদ্দিন বিশ্বাস ৩৮০  
 জয়বদ্দিন ৪২৩, ৪৪৫  
 জয়নাবায়ণ সেন ৪৪৭  
 ঠাকুরবৰ সাহেব ১৬৮-৭৫, ২৮৫  
 ঠাণ্ডাবালা বায় ৩৭৬  
 ডব্লিউ হাণ্টাৰ ১৭৮  
 তিতুমীৰ ১৭৬-৯২  
 ভাৱাশঙ্কৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২২  
 ভৈষ্যব আলি ১২৮  
 জৈলোক্য পীৰ ৩৮২-৮৫  
 তছিরদ্দিন শাহজী ৪৫১  
 থৰ্ণটন ১৮০  
 দীনমহম্মদ তবফদাৰ ১১৭  
 দীনবন্ধু মিত্ৰ ৪১৮  
 দেবেন নাথ ৩৯, ৩৪০  
 দববেশ আলি ১২৮  
 দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০  
 দাদাপীৰ ১৯৩  
 দাবা শিকোহ ৭  
 দুৰ্ণভ সৰ্দাৰ ৩৬০  
 দীনেশচল্ল সেন ৪৪৭, ৪৬৫

দাউদ আলি শাহজী ৪৫১  
 ধৰণীমোহন বাব ৪২  
 নগেন্দ্ৰনাথ বসু ২৬৪  
 নুৰুদ্দীন ৩৮, ৩৯  
 নবেল্দ্ৰনাথ কৰ্মকাৰ—৪৭  
 নেসার আলি ৪৯  
 নুব খাঁ ৭৯  
 নবিম মোল্লা ১২৫  
 নিৰ্ধিন শাহ ২০১  
 নুব কুতবুল আলম ২২০  
 নানাজী ২২৬  
 নুব মহম্মদ দেওয়ান ২৮১  
 নগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত ৪৪৯  
 নবেল্দ্ৰনাথায়ণ ৪৬৪  
 প্রভাতকুমাৰ পাল ১৭৯, ১৮৪  
 প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১৮, ১৮১  
 প্যাবীমোহন বাব ৪২  
 প্রভাপাদিত্য ১০৯, ২৮৬  
 পাঁচু সাধুখাঁ ২০৬  
 পিজিবদ্দিন ১৩৪, ৪১৭, ৪২৩  
 পাঁচকড়ি খাঁ ১৬৫  
 প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭২  
 পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ১৭২  
 পবেশচল্ল ভট্টাচার্য ৩৪০  
 পাগল পীৰ ৩৮৬  
 ফকিৰ আহম্মদ ৪৩  
 ফাতেমাল বাদা ১০৯  
 ফাতেমা বিবি ২০৫-১৮  
 ফকিৰ মহাম্মদ ২৮১, ৪২৩, ৪৩৭, ৪৪  
 ফৈজুল্লাহ/ফয়জুল্লাহ/ফৈজল্যা/ফউজুল  
 ফউজুল ২৪, ৫৫৪-৫৫

বিপ্লবদাস পিপলাই ৭৪  
 বাহাউদ্দীন নক্শবন্দ ১৫  
 বসন্তবর্ষ স্মৃতি ২৮  
 বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪৫, ৮৫  
 বদকদ্দীন ৪৬  
 বসন্তবর্জন মোদক ৪৬  
 ঝাঁকা-উল্লা বিশ্বাস ৪৯  
 বিলাষেত আলি ৪৯  
 বাহাব আলী ৫০  
 বিনোদ মণ্ডল ৭৪  
 বেচু কর্মকাৰ ৯৩  
 বেলাষেত হোসেন ৪৯, ১১৭  
 বিহাবীলাল সরকার ১৭৯  
 বিহাবীলাল চক্রবর্তী ১৮০  
 ববখান গাজী ২০৪, ২২৪  
 বদৰপাঁর ২১৯  
 বডখাঁ গাজী ২২৪-২৫  
 বায়োজিদ বিস্তারী ৪, ৫  
 বডপাঁর ২৯৬-৩১০  
 বাবন পাঁর ৩১২  
 বিনয় ঘোষ ৩১৫, ৩৭৫  
 বিপিনবিহারী সরকার ৩৮০  
 বারিভুল্লাহ ফকির ৩৮৬  
 ববোদাকান্ত ঘোষ ৩৮৯  
 বনবিবি ৩৯০-৪১২  
 বখনউদ্দিন  
 বিবি ববকত ৪১৩-১৫  
 বসন্তবর্জন বাষ ৪৪৭  
 বাসাবত শাহজী ৪৫১  
 বসিবউদ্দিন শাহজী ৪৫১  
 বল্লভ ৪৬৩

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (ডঃ) ৫  
 ভূদেবচন্দ্র তেওয়ারী ৪২, ৪৩  
 ভাবতচন্দ্র রায় ২৪, ৪৬৪, ৪৬৫  
 মেহেব আলী ৩৭  
 মহম্মদ এবাদুল্লা ৩৭, ১১২, ১২৮  
 মনসুব আলী ৪৬  
 মাসচটক ৪৭  
 মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ডঃ) ১২৯, ১৪৮, ২৮৬  
 মৌলভী আবদুল মজিদ ৩০৪  
 মানিক পাঁর ৪১৭  
 মনির উদ্দীন ইউসুফ ১৭, ২০৬, ২১০-১৭  
 মহেন্দ্রনাথ করণ ৩১৬-১৭  
 মাকফ্ আল্ করখী ১  
 মসনদ আলি ১৬, ৩১৫-৩২০  
 মেহের আলি ৩৬  
 মহেন্দ্র সবদাৰ ৩৭  
 মাখন চন্দ্র মোদক ৪৬  
 মহিম রায় ৮৪  
 মুনশী বদকদ্দীন ৯৩  
 মনসুর আলি সিদ্দিকী ১০৯  
 মোজাম্মেল হোসেন ১১৬  
 মুনশী ফকির ১১৮  
 মোকসেদ আলি ১১৮, ১৬১-৬৩  
 মহম্মদ মুজিবব রহমান ১২৮  
 মুজফ্ফব আহম্মদ ১৩৬  
 মুজিম বিশ্বাস ১৮০  
 মহম্মদ সহবালি ১৮৪  
 মাসুব বহমান ১৯৫  
 মনসুব বাগদাদী ১১৫, ৪৪৭  
 মোবাবক শাহ গাজী ২২৪

মব্রা গাজী ২২৪  
 মুকুট বার ১৬৫, ২৮৫, ২৮৭  
 মহম্মদ মুনসী সাহেব ২৮৮, ৪০৫  
 মাদাব পীর ৩২১-২৭  
 মহীউদ্দিন ওস্তাগব ৩৪৮  
 মজলজান ফকির ৩৭৮  
 মহেশচন্দ্র দাস ৩৮৩, ৩৮৫  
 মনোহর সেন ৩৮২  
 মৌলানা কহুল আমিন ১৯৬  
 মুনসী মুহম্মদ খাতের ৪১২  
 মুহম্মদ আলিমুদ্দিন ৪১৬  
 যোগেশচন্দ্র বাগল ১৮০  
 রাসবিহারী ধর ৩৬  
 বামেশ্বর ১৮  
 বেজাউল করিম ৭  
 রামমোহন রাই ৪২, ৪৩, ৮৪  
 বোন্নাব মণ্ডল ১১৯  
 রামেশ্বর ভট্টাচার্য ২৪, ৪৯২  
 রামগঙ্গা ৩৮২  
 রূপবাম চক্রবর্তী ৪৪৯  
 বজনীকান্ত চক্রবর্তী ৪৪৯  
 বামাই পণ্ডিত ৪৪৮  
 বামচন্দ্র মুন্সী ৪৬৫, ৪৬৯  
 বৈরাঙ্গুদীন আহম্মদ ২০৬  
 বামচন্দ্র খান ২৮৫  
 ককুনুদীন কৈকাউস ২৮৬  
 বঙশন বিবি ৩২৮-৩৩  
 রত্নেশ্বর বার ৩৬৯  
 রামেশ্বর দাস ৫৪৫  
 জালন শাহ ৩৩৪-৪২

লুইপাদ ৩৩৭  
 শেখ তনু ২০৬  
 শেখ লাল ১২৯, ১৪৯  
 শাহজালাল এয়মনি ৪  
 শশীভূষণ ঘোষ ৪৯  
 শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ ১০৭  
 শুকুবউল্লাহ ১১৫  
 শেখ জয়নুদ্দিন ১৪৯  
 শামসুব বহমান চৌধুরী ১৪৯, ২২০  
 শেখ জালাল ১৫১  
 শইখ শবফুদীন ১৫২  
 শাহজালাল ভবরেজী ১৫২  
 শান্তিময় বার ১৭৯, ১৮১  
 শ্যামাকান্ত দাস ১৮, ১৮১, ১৯০  
 শুকজান বিবি ২০৬  
 শেখ সেববাজ চৌধুরী ২০৬  
 শামসুজ্জোহা মোল্লা ৩২৯  
 জীচৈতন্য ২৮৫  
 শারেন্তা খাঁ ২৮৬  
 শঙ্কবাচার্য ১৮  
 শেখ দারামালিক ১২৯  
 শেখ মোজাম্মেল হক ১৬৫  
 শেখ আবদুল হক দেহলভী ৩২১  
 শফীকুল আলম ৩৪৩-৫৫  
 শাহমুফী সুলতান ৩৪৬-৫০  
 শাহচাঁদ ৩৫১-৫৫  
 সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ৮, ২৯  
 সুকুমার সেন ১৬, ১৫২, ২৮৫, ৩২২,  
 ৩৫০, ৩৮২, ৪৪৯, ৪৬৫,  
 সতীশচন্দ্র চৌধুরী ১৭, ২৪৮-৬১, ২৮৮,  
 ৪০৯, ৪১২

সত্যেন রায় ১৬০, ৪১৮, ৪২২  
 সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১২২  
 সাদেক উল্লাহ ১৮  
 সহল তন্তুরী ১  
 সালেহা খাতুন ১১৭  
 সূর্যকান্ত মাইতি ১২২  
 সরৎ উল্লাহ ১২৪  
 সতীশচন্দ্র মিত্র ১৪৮, ১৫০  
 সত্য বহুনাথ সরকার ১৫০, ১৫২  
 সুপ্রকাশ বার ১৮১  
 সাজন গাজী ১৮৪  
 সৈয়দ আলি ২২৬  
 সুফী খাঁ ২৮৬  
 সত্যপীৰ/সত্যানাবরণ ৮, ৪৪৭-৯৮  
 সাই সিদ্দিক ৩০  
 সুভদ্রা বার ১৬৫  
 সোকব আলি ৩২৯  
 সাভবণ পীর ৩৫৬-৫৯  
 সাহান্দী সাহেব ৩৬০-৬৫  
 সদাই সরদার ৩৬০  
 সন্তোষ কুমার ঘোষ ৩৮৮  
 হারুণ-উদ্-রসিদ ৫  
 হোসেন শাহ ৪০, ১১২, ১৫১, ৪৪৭,  
 ৪৪৮  
 হাজেব মণ্ডল ৪৭  
 হালু/হেলু মিল্লা ৫০, ৭৫

হাজের গাজী ৯৬  
 হাজের শাহজী ১১৭  
 হবি মণ্ডল ১১৮  
 হাসনু হেনা ১২৬  
 হরমুজ আলি ১২৯, ১৪২, ১৪৪, ১৪৮  
 হাসিরানি দেবী ১৪৮  
 হাছামুদ্দীন ২৬৯-৭০  
 হজবত আব্দুল কাদের জিলানী ১৫  
 হজরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দী ১৫  
 হাজের মণ্ডল ৪৬  
 হলান্দ ৭২  
 হবি শৌভিক ১৬৯  
 হাকীর ১৭৮  
 হাবাণ আলি শাহজী ৩৫৬  
 হাসান পীর ৩৬৬-৩৬৮  
 হাবদার পীর ৩৬৯  
 হরিনাবরণ দাস ৩৮২  
 হরিবাম দাস ৩৮২  
 হজবত মহম্মদ (দঃ) ১, ২, ৪, ইত্যাদি  
 হেরাত মামুদ ৪৪৫  
 Bos Worth Smith ২৮  
 H. Blochman ২৮৬  
 Mr. Farnest Makay ৩৭৫  
 Sunderlal Hora ৩৭৫  
 Mankhaio/Manichee ৪১৭  
 John A. Subhan ১



## অতিরিক্ত নাম-নির্ধারক

( ২ )

অম্বিকারচণ ব্রহ্মচারী ৪৯৩  
 অযোধ্যাবাস রায় কবিচন্দ্র ৪৯৩  
 ঈশান গোস্বামী ৪৯৩  
 ওয়াজেদ আলি ৪৯৫  
 কৃষ্ণকান্ত ৪৯৩  
 কাশীনাথ ভট্টাচার্য সার্বভৌম ৪৯৩  
 কুমুদানন্দ দত্ত ৪৯৪  
 কিঙ্কর ৪৯৪  
 কৃষ্ণবিহারী ৪৯৪  
 কোতুকবাস চট্টোপাধ্যায় ৪৯৫  
 কালাচাঁদ ৪৯৬  
 কালীচরণ ৫৯৬  
 কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন ৪৯৭  
 কুমুদ বিহারী বসু ৪৯৭  
 খোকনরাম দাস ৪৯৫  
 গোবিন্দ ভাগবত ৪৯৩  
 গঙ্গাবাস ৪৯৪  
 গবীবুজ্জাহ ৪৯৫  
 গুরুচরণ নাথ ৪৯৬  
 গণপতি চক্রবর্তী ৪৯২  
 ঘনবাস চক্রবর্তী ৪৯২  
 ঘনবাস কবিবল্লভ ৪৯৬  
 জগবন্ধু বিদ্যাবিনোদ ৪৯৬  
 জৈমিনী ৪৯৬  
 ভাবিনীশঙ্কর ঘোষ ৪৯৫  
 দুর্গাপ্রসাদ ঘটক ৪৯৩, ৪৯৬  
 দ্বিজ দীনবাস ৪৯৪  
 দ্বিজ বসুরাম ৪৯৪

দ্বিজ হবিদাস ৪৯৭  
 দ্বিজ গুণনিধি ৪৯৪  
 দ্বিজ শুকদেব ৪৯৪  
 দ্বিজ কৃষ্ণধন ৪৯৪  
 দ্বিজ বিশ্বেশ্বর ৪৯৩  
 দ্বিজ গিরিশ্বর ৪৯৩  
 দ্বিজ কৃপাবাস ৪৯৩  
 দ্বিজ নন্দরাম ৪৯৩  
 দ্বিজ বামভদ্র ৪৯৩  
 দ্বিজ জনাৰ্দ্দন ৪৯৩  
 দ্বিজ অমর সিংহ ৪৯৩  
 দ্বিজ রামচন্দ্র ৪৯৩  
 দ্বিজ কালিদাস ৪৯৩  
 দ্বিজ বিশ্বনাথ ৪৯৩  
 দ্বিজ বাম কিশোর ৪৯৩  
 দ্বিজ বামানন্দ ৪৯৪  
 দ্বিজ বসুনাথ ৪৯৪  
 দ্বিজ বামকৃষ্ণ ৪৯৪  
 দেবকীনন্দন ৪৯৪  
 দয়াল ৪৯৪  
 নবহবি ৪৯৩  
 নন্দানন্দ ৪৯৩  
 নন্দবাস মিত্র ৪৯৫  
 নারায়ণ মল্লাজ গাজী ৪৯৬  
 নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৪৯৭  
 পঞ্চানন মণ্ডল ৪৯৫  
 ফকিরদাস ৪৯২  
 ফকিরচাঁদ ৪৯৪

ফকিবরাম ৪১৪  
 বৃন্দাবনচন্দ্র চক্রবর্তী ৪১৬  
 বিপ্রনাথ সেন ৪১৩  
 বিজয় ঠাকুর ৪১৪  
 বিদ্যাপতি ৪১৪  
 বিকল চট্ট ৪১৩  
 বেচাম ৪১৫  
 বীৰচন্দ্র চক্রবর্তী ৪১৬  
 ভৈৰবচন্দ্র ঘটক ৪১২  
 মৌজিৰাম ঘোষাল ৪১৩  
 যুক্তারাম দাস ৪১৪  
 মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ৪১৬  
 মধুসূদন ৪১৩  
 মন্যথনাথ শ্বাতিয় ৪১৬  
 মধুবেন ৪১৬  
 যোগেন্দ্রনাথ কাব্যরত্ন ৪১৬  
 হাদবেন্দ্র ভৰ্কবত্ন ৪১৬  
 যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৪১৬  
 বামশঙ্কর সেন ৪১৩

বহুনাথ সার্বভৌম ৪১৬  
 রাধানাথ মিত্র ৪১৬  
 রমনীমোহন গুপ্ত ৪১৬  
 রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৪১৬  
 রাজকৃষ্ণ রায় ৪১৭  
 রামানন্দ ৪১৬  
 লাল জয়নারায়ণ সেন ৪১৬  
 লেণ্টো ফকির ৪১৫  
 লালমোহন ৪১৪  
 শিবচন্দ্র সেন ৪১৩  
 শিব নারায়ণ ৪১৪  
 শঙ্কর আচার্য্য ৪১৪  
 শিবচরণ ৪১৩  
 সেবাজ চৌধুরী ৪১৫  
 সৰ্বোজ্ঞ চক্রবর্তী ৪১৬  
 সুবনাথ ভট্টাচার্য্য ৪১৬  
 হরেকৃষ্ণ চক্রবর্তী ৪১৫  
 হরীকেশ দত্ত ৪১৬

## শব্দার্থ

শব্দার্থ তালিকার অধিকাংশ শব্দ আববী ও ফারসী। ধর্মীয় আদর্শ ও লৌকিক বিশ্বাসে কোন কোন শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থও থাকতে পারে।

জগণিডে	আগুনে	আওয়াল	আউলিয়া শব্দের
জলি/ওলি	অভিভাবক, রক্ষক		অপভ্রংশ
অর্থ	পূজার উপকরণ	আজমানেস	যুক্তি-পবামর্শ
অজু/ওজু	নামাজ পড়বার আগে		( স্থানীয় শব্দ )
	হাত-মুখ ধোয়া	আজর	বোগ, পীড়া
আরজ	আজি বা প্রার্থনা	আশা/আসা	পীৰ বা ফকিবের
আরশ	আল্লার আসন		হাতেব দণ্ড ( লাঠি )
আলিম/আলেম	বিদ্বান	আজান	নামাজ পড়িতে
আবের	অন্ত সকলের		সাধারণকে আহ্বান
আদম	ইসলামী, খ্রীষ্টীয় ও ইহুদী	আজব	অদ্ভুত
	পুরাণোক্ত প্রথম সৃষ্ট	আইট	ক্ষেতের আইলৈব পাশে
	মানুষের নাম		বা গারে ছোট ছোট
আলেক	ভালবাসা		মাটির চিবি। 'আইল'
আড	আডাল		শব্দের অপভ্রংশ হতে
আহমান	আকাশ		পারে। (আঞ্চলিক শব্দ)
আছিজেলগপফুল	পৃথিবী হর্বোধ্য	ইমান	পরিপূর্ণ বিশ্বাস
	শব্দ	ইমাম/এমাম	মুসলিমদেব প্রধান
আমিন	তাই হোক		ধর্ম-নেতা
আউলিয়া	আউল সম্প্রদায়ের লোক	ইয়াব	বন্ধু, ফাজিল ব্যক্তি
অওরত	রমণী, পত্নী	ইয়াদ	স্মরণ, খেয়াল
আখ্বেব	পরিণাম		

ইনসাল্লা	প্রকৃতিক নিয়মানুসারে আল্লাহ ইচ্ছাব বিকাশেব ধাবান্ন ।	ওরার ওরাজ	অপ্রয়োজনীর কাজ বজ্জতা
উজ্জালা	উজ্জল	কাক্কেব/কাফির	ইসলামে অবিশ্বাসী লোক
উবস	পীরের জন্ম/মৃত্যু স্রবণে বিশেষ জিরাবৎ অনুষ্ঠান	কবুল	স্বীকার
উতাবে	নামিয়ে দেয়	কেনে	(কেন শব্দের অপভ্রংশ)
এলাহি/এলাহী/ইলাহী	আল্লাহ তাল্লা	কল্লে	কবিলে
একিন	নিশ্চয়, দৃঢ় বিশ্বাস	কেচ্ছা	কাহিনী
এখা	এখানে, অত্র	কাওরাল	যে দাববেশী সুয়ে
এছা	এমন	গান কবে	
এ্যানাগুলি	( ৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )	কালাম	জ্ঞানের বাণী
এনসাল্লা	( ইনসাল্লা দ্রষ্টব্য )	কোস্তভ/কোস্তভ	পূবাণে কথিত
এন্নহার	এমন	কৈনু	মহি বিশেষ
এন্নহা/এইসা	এমন	কৈনু	কহিলাম ( পণ্ডে )
এজ্জিরাব/এখজিরাব	কমতা	কোলা	ঘোটা, গকর গলার
একিদা	ধর্মে বিশ্বাস	কোলা	বোগ বিশেষ
এ'শে	গকর পাবের কুব-সংলগ্ন একবকম যা (আঞ্চলিক শব্দ)	কুমে	কমিলা
এসাডি	এই রকম	কাঁড়/কাঁড়ি	ভূগ, গকর কাঁধের
এসমাল/এজ্জমালি	যৌথ	কাঁকাগি/কাঁকল	ঘা বিশেষ
এন্তেকাল/হিন্তিকাল	মৃত্যু	কাঁকাগি/কাঁকল	কোমর
এমাম	( ইমাম দ্রষ্টব্য )	কুতার	কুমাৰ
এমন	আববেব একটি স্থানের নাম	কনি	কণা, আত্মতৃপ্তি
ওডন	জীলোকের পাতলা চাদর	কিন্নব	দেবলোকের গায়ক
ওলি	( অলি দ্রষ্টব্য )	কাওমালি/কাওমালী	দাববেশী সুব
ওস্ত/ওস্তাও/অস্ত	বাব, সম্মান	কন্মা	ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র
ওম্বালেদ	বংশধর	কাকেলা	তীর্থ যাত্রীর দল,
ওফে/ওবফে	ডাক নাম, বেনাম	কুতব	ধর্ম-প্রচারকের দল
ওলা	নামা, দাস্ত হওয়া	কেবামভ	সাধক শ্রেণীর এক পর্যায়
ওম্বাভিব	অবশ্য করণীয়	কুদরত	শক্তি, বাহাহুবি
		কোরবান	বহয়
			মুসলিম শাস্ত্রানুসারী
			বলি ( পণ্ড )

কামেল	পরিপূর্ণ	চুলা	উনান,
খালে	খাইল	চিভ	চিভ
খিদা	ক্ষুধা	চাহা	ইচ্ছা
খোঁজা/খোঁজাজ	আল্লাহের	চুলি	চুল
	দুত বিশেষ	ছালাম/সালাম/সেলাম	মুসলিম
খেতি	কৃতি		প্রথায় অভিবাদন
খাপা	ক্ষিপ্ত	শহীদ/শহিদ	ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি
খোশাল	খুশি	ছোন্দল/সোন্দল	শোভাযাত্রা
খচম/খসম	স্বামী, পতি		(আঞ্চলিক ভাবে ব্যবহৃত)
খুব-ছুরত/খুব-সুবৎ/খুবসুবত	খুব	ছেদেক	শুদ্ধ, পবিত্র
	সুন্দর বা সুন্দরী	ছেবে	শিবে
খালাছ/খালাস	মুক্তি	ছিলিমিলি	খিলিমিলি
খামস	সংঘত হওয়া	ছেপাই/সিপাই	সিপাহী, গ্রহরী
খেলাফত	খলিফা সংক্রান্ত [ খলিফা দ্রষ্টব্য ]	ছোবহান	পবিত্র
খররাত/খররাত	বিভরণ, দান	ছামনেতে	সম্মুখে
খোর	গরুর একপ্রকার বোগ	ছুরত/সুরৎ	আকৃতি, চেহারা
খোলাব	স্বপ্ন	ছাডার	পাতলা পায়খানা কবে
খলিফা/খলীফা	মুসলিম জগতে শ্রেষ্ঠ	ছেপার	লুকান
	নৃপতি ও ধর্মনেতার উপাধি	ছবক	শিক্ষা
গায়েব	অদৃশ্য	জীবরিল	বাহক যেবেস্তা
গেহে	গৃহে	জিনে	জয় কবে
গাতি অল্প	জোভ-জমা	জমিন	জমি
গোনাগার	অপবাদের শাস্তি	জোনাব/জনাব	মহাশয়
গোণা	অপরাধ		(মুসলিম আদর্শে ব্যবহৃত)
গুণের চট	শনের সুতোয় তৈরী চট	জেকের/জিগীব/জিগিব	উচ্চ-ধনি
গোস্তা/গোস্তা	বাগান্নিত	জাহের/জাহির	প্রচাষিত
গোর	কবর, সমাধি	জরিপানা	জরিমানা
গোসাঁই/গোসাঞি	গুরু, গোস্বামী	জোনাজাত	প্রতিজন
গোজারিল	অভিবাহিত কবিল	জুনা	তফাৎ
গীরিদা	ভাকিয়া	জক/জোক	স্ত্রী
		জিজিব	শিকল

জারগীর/জারগির	পূবস্কাব প্রাপ্ত	দোরা	আশীর্বাদ
	নিষ্কব ভূ-সম্পত্তি	দোজখ	নরক
জার	ভালিকা, বিস্তৃত হিসাব	দিশা	সন্ধান
জেন্দা/জিন্দা	জীবিত	দস্তগীর	যিনি হাত ধরে নিয়ে
জাহান	জগৎ		ষেতে সাহায্য কবেন
জারনামাজ	নামাজ পড়বার জন্য	দুষা	মিস্কাব
	ব্যবহৃত বিছানা	ধিরান	ধ্যান
জিন্নাবৎ	পীরের বা তৎস্থানীয়	ধড	হিন্ন মন্তক দেহ
	ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য	নবি/নবী	পন্নগবর
	প্রার্থনা কবা	নজবগাহ	নজব দেওয়া বা
জেহাদ	অস্তব এবং বাহিবেবর শত্রুর		অল্পক্ষণ অবস্থান কবার
	বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা	ন্যও	মুক্তি-পূর্ণ জাহগা।
জক	যুদ্ধ	নসিব/নহিব	নৌকা
জান্নাতুল	বেহেষ্ত বা স্বর্গ সংক্রান্ত	নিখাবান/নিগাবান	ভাগ্য
ভগ	শীর্ষদেশ	নেসানি	পাহাবাদাব
চু'ড়ে	খোঁজ করে	নাশানি	নিশানা
তুডিয়া	ভাক্র।	নাঈ	নাহি
তেবা	তোদের	নর্জুম	গণৎকাব
তোহিদ	সাম্য, শান্তি ও স্বাধীনতা,	নুব	আলো
	আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস	নাস্তা	খাবার
তাজ্জব	অভূত	নাচার	নিরুপায়
তেবিজ	পাশ কাটিয়ে যাওয়া	পুছিলাম	জিজ্ঞাসা করলাম
তবিখ/তবীকা	ধাবা	পেবাব/পিরার	আদক
তামাম	সমগ্র	পিছনে	পিছন দিক থেকে
তরহ/তবস্ত	বাস্ত		( আঞ্চলিক শব্দ )
তওবা	পীর কর্তৃক সংসাবত্যাগ ও	গোলাপান	ছেলেপুলে
	আল্লাহব এবাদতে মশগুল থাকা	গামব	পাগিষ্ঠ, নবাধম
তছবি/তসবি/তসবী	মুসলিমের জপমালা	পষদা	সৃষ্টি
	পবিত্রতা	পবওষাব	শক্তিমান
তসাউওফ	পবিত্রতা	পেবেশান	পবিত্রাস্ত
দবগা/দরগাহ	সমাধি, কবব	পেষ্ঠাই	পিষ্ঠ কবা জিনিস

পরমাই	পরমায়ু	বাড়ন	বাড়ী
পিঞ্জিরা	খাঁচা	বেউব/বেউড বাঁশ	কাঁটামুক্ত বাঁশ
পয়জাব	চটীজুতা		বিশেষ
ফবজন্দ	সন্তান	বীরবোলি	পুরুষের কুণ্ডল বা
ফিকে	ছুঁড়ে		কর্ণাভরণ
ফতে	জয়, সিদ্ধি	বএ	বহন কবে
ফেরেস্তা	আল্লাহের দূত	বিজএ	বিজবে
ফরমাইস/ফরমাস	আদেশ	ভাতার	স্বামী
কণ্ড	সর্বস্বাত্ত, শেষ	ভেজিবে	পাঠাইবে
কতোরা	নিজ বিপদের ঝুঁকি	ভেড়ে	দ্বৈশ, ভেড়ুবা
	নিয়ন্তেও পবেব	মাজা	কোমব
	উলকার কবা	মানসির	মানুষের
বগ	বক	মোনাজাত	প্রার্থনা
বিচে	মধ্যে	মামদোবাজি/মামদো	মুসলমান
বেগব	ব্যতীত		ভূত
বোরে	বোবো ধান বিশেষ	মস্তবীকরণ	তামাসা কবা
বাও	বাতাস	মুকি	মুখে
ব্যানা	তৃণ বিশেষ	মুই	আমার
বেহেস্ত	স্বর্গ	মোমিন	ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান
বাত	কথা	মজি	খুশি
বন্দেগী	সেলাম	মাজার	কবব
বদকাম	খাবাগ কাজ	মকবুল	প্রিয়
বাহানা	বাবনা	মোবসেদ/মুবশিদ	গুরু
বিধু	চন্দ্র	মাগ	স্ত্রী
বেভাব	ব্যবহার	মুছিবত	বিপদ
বাহাল	নিয়োগ	মুতে	প্রস্তাব করে
বকবি	ছাগী		( আঞ্চলিক শব্দ )
বেপিব	খিনি পীর নন	মুবিদ	শিষ্ট
বাখান	গোশালা,	মবদ	বীব পুরুষ
	পশুপালন	মগবব	পশ্চিম
বেশোমার/বেশুমাব	অসংখ্য	মডম্বা	মডাব মতন

মুছল্লি	হাঁবা মসজিদে নামাজ	সোতার	স্রোত
	সমাধা কবেন।	সেবাইত/সেবায়ত	জিন্দাদার
মেকাইল	আল্লাহের দূত	সরা/অওলা	নিষ্ঠাবান
মুডে	ভাঁজ কবে	সরা/শরিয়ত	ইসলাম ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক
মুনশী	কেরানী, শিক্ষক, বিদ্বান	সাঃ	সাল্লাল্লাহু আলাইক সালাম
মকছেদ	মনোবাসনা, সংকল্প		( মুসলিমগণের দ্বারা
মোতাবেক	অনুযায়ী		পরগণের প্রতি সম্মান
মাজাইয়া	চাহিয়া		জানানোর জন্য ব্যবহৃত
মজলিস	সভা		শব্দ )
মোকাম	বাসস্থান	সজুদ	বদান্ততার সহিত বা
মকুব	বেহাই		সখার সহিত
মরিকত	প্রকৃত জ্ঞান	হাদু	মহাদেব
মৌলে	মধুসংগ্রহকারী	সাভে	সাথে
বওজা	সমাধি-স্থান	মুগিয়া	সমর্পণ করে
রব্বানা	আল্লাহ্	সাদী	বিবাহ
লাল-লাহা	"There is no God.	সরমেন্দা	লজ্জিত
	সেই জন্ম ইহা নকি বা	সোবহান	( ছোবান শব্দ দেখুন )
	Negation ইল্লাহা। But	সাজাল	গোয়ালোর মধ্যে মশা
	there is God. প্রঃ		তাড়ানোর জন্য ধোঁরা
	মতিলাল দাস ও পীরু		দেওয়া
	কান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত	সাই/সাঁই	ধর্ম গুরু
	লালন গীতিকা, কলিকাতা।	হর	অঙ্গবী
	বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬।	হাসেল/হাসিল	সমাপ্ত করা,
গুধা	শোধ করা		আদায় করা
শবীফ/শরিক	মহানুভব	হামেশা	প্রায়ই
শিরনী/শীবনী	পীরের উল্লেখ	হজ	মক্কার তীর্থ দর্শন ও অস্থায়
	প্রদত্ত মিস্ত্রি প্রবাদি		বর্মানুষ্ঠান করা
শোকরানা/শোকব	কৃতজ্ঞতা	হএ	হয়ে
শোরশাব	মেবামত	হটে	হটকারিতার
শহীদ	ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি	হাসারত	ইচ্ছা
সিবনী	শিরনী দ্রষ্টব্য		



## শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	পঠিতব্য
৩০	৫	তিতুমীবেব
৪২	১	স্বার্থায়েষী
৪৫	২১	যান
৭৪	৮	৩২
১০৭	২২	৬১
১০৭	২৪	১৪
১২৯	২	বালাগুাব
৪৫৭	২৪	সাক্ষনা

## তথ্যপঞ্জী

- ১। আকবরনামা : আবুল ফজল।  
( ভলুঃ ১ পৃষ্ঠা ১৮ )
- ২। ইসলামি বাংলা সাহিত্য : ডঃ মুকুন্দের সেন।
- ৩। ইসলামি বাংলা সাহিত্য : ( খিসিস ) ডঃ ওসমান গণি।
- ৪। এক্ষণ ( ষষ্ঠ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ১৩৭৫ ) : বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম  
শিল্পবীড়ির ধারাবাহিকতা : ডেভিড ম্যাককাটিনন।
- ৫। কুশদহ পত্রিকা ( ১৩১৮ বাং আশ্বিন )।
- ৬। কুশদহ পত্রিকা ( ১৩১৮ বাং কার্তিক )।
- ৭। কুশদহ পত্রিকা ( ১৩১৮ বাং পৌষ )।
- ৮। কুশদহ পত্রিকা ( ১৩২২ বাং ভাদ্র )।
- ৯। কুশদহের ইতিহাস : হাসিবালি দেবী।
- ১০। কৃষ্ণবাম দাসের গ্রন্থাবলী ( আলোচনা ) ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য।
- ১১। রাজা মঈনুদ্দীন চিশতী : মৌলভী আজহার আলী।
- ১২। খুলনা গেজেটিয়ার : পৃষ্ঠা ১৮২
- ১৩। গাজী-কালু-চম্পাবতী : আবদুস বহিম সাহেব।
- ১৪। গোড় কাহিনী : শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ।
- ১৫। গাজী সাহেবের গান : কলেমদী গারেন (সংকলন : নগেন্দ্রনাথ বসু)
- ১৬। Journal of Royal Asiatic society of Bengal 1818.
- ১৭। ঢাকা ইতিহাস ( ১ম খণ্ড ) : শতীন্দ্রমোহন রায়।
- ১৮। ঢাকা বিভিউ : Voll. VIII
- \*১৯। ধণ্ড জীবনের পুণ্য কাহিনী : আবদুল আজীজ আল আমীন।
- \*২০। নেদায়ে ইসলাম : ( ১৩৬৫ বাং ১ম সংখ্যা )
- \*২১। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা : ( ৩য় খণ্ড ) ১৯৬১ সবকারী  
গেজেট।

- ২২। পীর গোরাচাঁদ (পাঁচালী) : মহম্মদ এবাদোজ্জা।
- ২৩। পুঁথি পরিচিতি : আবদুল কবির সাহিত্য বিশারদ।
- ২৪। পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলামের আলো : শামসুর রহমান চৌধুরী।
- ২৫। পূর্ব-পাকিস্তানে সুফী সাধক : গোলাম সাকলায়েন।
- ২৬। পুঁথির ফসল : আহমদ শবীফ।
- ২৭। ফুবফুবা শবীফের ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী : গোলাম মহম্মদ ইয়াছিন
- ২৮। ফুবফুবাব হজ্জবত দাদাপীর সাহেব  
কেবলার বিস্তারিত জীবন : মাওলানা কহল আমীন।
- ২৯। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : ডঃ নীলেশ সেন।
- ৩০। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা : ১৩২৫ বাং ৪র্থ সংখ্যা
- ৩১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা : ১৩২০ বাং
- ৩২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা : ১৩২৩ বাং
- ৩৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা : ১৩২৫ বাং
- ৩৪। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা : ১৩৩৫ বাং
- ৩৫। বঙ্গে সুফী প্রভাব : ডঃ এমামুল হক
- \*৩৬। বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পত্রিকার প্রবন্ধ ( ১৯৩৬ ) :  
শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৩৭। India Through the Ages : Sir J. N. Sarkar.
- ২৮। বাংলার লৌকিক দেবতা : শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।
- ৩৯। History of Beagal (Vol-II)—Sir Jadu Nath Sarkar
- ৪০। বালাগুাব পীর হজ্জরত গোবাচাঁদ রাজী : আবদুল গফুর সিদ্দিকী।
- ৪১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ( প্রথম খণ্ড, অপবর্ধ ) :  
ডঃ সুকুমার সেন।
- ৪২। বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপ : গোপাল হালদার।
- ৪৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের কপরেখা : গোপাল হালদার।
- ৪৪। Bengal Settlement Record—1928-31.
- ৪৫। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সত্যপীরের কথা।
- ৪৬। Bengal Gazette—1928, 1953.
- ৪৭। Bengal District Gezetteer
- ৪৮। বাংলাদেশের ইতিহাস : ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।
- ৪৯। History of India : Dr. R. C. Majumdar.
- ৫০। ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনাব ধারা : ক্রিতিমোহন সেন।

মিহির পত্রিকা : ( মার্চ ১৮৯২ )

মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ : ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার ।

বশোহর খুলনার ইতিহাস : সতীশচন্দ্র মিত্র ।

রায়মঙ্গল কাব্য : কৃষ্ণবাম দাস ।

শতকপা—( ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩৭৯ বাং )

( রচনা : শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় ) ।

শহীদ ভিত্তুমীর : আবদুল গফুর সিদ্দিকী ।

শ্রীঅমিয় নিমাই বচিত ( ৫ম সংস্করণ, ৩য় খণ্ড ) : শিশিরকুমার ঘোষ ।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত : ( ২য় খণ্ড, ২য় ভাগ )

সাংস্কৃতিকী ( ১ম খণ্ড ) অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

সুন্দরবনের ইতিহাস : আবুল ফজল মহম্মদ আবদুল ।

সুকীবাদ ও আমাদের সমাজ : ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ,

ডঃ আবদুল কবির, মনিব-উদ্দীন ইউসুফ প্রমুখ ।

Sufism and Its Saints and Shrines : John A. Subtan.

সাধক দাবা শিকোহ : রেজাউল করিম ।

হজরত বড় পীরের জীবনী : মোলভী আবদুল মজিদ ।

হজরত বড় পীরের জীবনী : মোলভী আজহার আলী ।

হজরত ফাতেমা : মনিব-উদ্দীন ইউসুফ ।

হজরত ফাতেমার জীবন চরিত : বেবাজুদ্দিন আহম্মদ ।

হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলী শাহ সাহেবের জীবনচরিতাখ্যান :

—গৌরমোহন সেন ।

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : বিনয় ঘোষ ।

হিজলীব মসনদ-ই আলা : মহেন্দ্রনাথ করণ ।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : ডঃ আবুতৌব ভট্টাচার্য ।

মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম :

শ্রীসুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় ।

লালন-শাহ ও লালন গীতিকা : মোহাম্মদ আবু তালিব ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা ( ১৯৭৫ )

রচনা : জাহুবী কুমার চক্রবর্তী :

Islam in India and Pakistan : M. T. Titus.

বাংলাব বাউল ও বাউল গান : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ।

- ৭৭। বাংলাৰ ইতিহাসেৰ দুশ বছৰ : শ্ৰীসুখময় মুখোপাধ্যায় ।
- \*৭৮। বিশ্বকোষঃ নগেন্দ্ৰনাথ বসু ।
- ৭৯। তাজকিৰা আউলিয়ায়ে বাঙ্গালা : মোলানা মোহাম্মদ আবিদুল হক ।
- \*৮০। বাংলাৰ ইতিহাস : ডঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত ।
- \*৮২। মিজান ( পত্ৰিকা )
- \*৮৩। কোবাণ প্রচার
- \*৮৪। ছতোম পেঁচাব নক্সা : কালীপ্ৰসন্ন সিংহ
- \*৮৫। সেকণ্ডভোদমা : ( সংস্কৃত ) হলায়ুধ ।
- \*৮৬। বাংলা সবকাৰেৰ গেজেট ( এল. এস. এস. ওমালী )
- \*৮৭। বেতাৰ জগৎ ( ১৯৭০ )
- \*৮৮। আজাদ ( পত্ৰিকা )
- \*৮৯। জঙ্গম ( পত্ৰিকা ) ১৩৭১
- \*৯০। ভাৰতেৰ মুসলমান ( ডবল্যু ডবল্যু হাষ্টাব )
- \*৯১। তিতুমীৰ : শান্তিময় বান্ন ।
- \*৯২। তিতুমীৰ ও নাৰিকেল বেড়িয়াৰ লডাই : বিহাৰীলাল সবকাৰ ।
- \*৯৩। ভাৰতে আধুনিক ইসলাম : ক্যান্টোনেল স্মিথ ।
- \*৯৪। ভাৰতেৰ কৃষক বিদ্ৰোহ ও গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম : সুপ্ৰকাশ বান্ন ।
- \*৯৫। ঝাঁটুৰাৰ ইতিহাস ও কুশধীপ কাহিনী : বিহাৰীলাল চক্ৰবৰ্তী
- \*৯৬। ভাৰতেৰ ইতিহাস : ঝনটন ।
- \*৯৭। মুক্তিৰ সন্ধানে ভাৰত : যোগেশচন্দ্ৰ বাগল ।
- \*৯৮। Note on Arabic and Persian Inscriptions in the  
Hooghly District : J. A, S. XII
- ৯৯। শ্ৰীশ্ৰীৰামকৃষ্ণ কথামৃত : শ্ৰীম
- ১০০। বঙ্গ ভূমিকা : ডঃ সুকুমাৰ সেন ।
- ১০১। সত্যপ্ৰকাশ পত্ৰিকা ।

## जैन विश्व भारती वर्द्धमान ग्रंथागार

**लाडनूँ [राजस्थान]**

दिनांक स्लीप

श्रेणी सं० 813.3 परिग्रह सं० 11449

यह पुस्तक निम्नलिखित दिनांक तक या उसके पूर्व  
पुस्तकालय को लौटादी जानी चाहिये ।

[illegible]